# ইসলাম

## সকল ধর্মের প্রতি একটি উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ

জি. এ. পারভেজ

অনুবাদ: তারেক হাসান

সম্পাদক: সাদিক মোহাম্মদ আলম

# সূচীপত্র

ভূমিকা
শব্দকোষ

**অধ্যায় ১: ধর্ম কী?**
ধর্মের তথাকথিত আহ্বান
ধর্মের সংজ্ঞা
স্রষ্টার ধারণা
ধর্ম কী?

**অধ্যায় ২ : দ্বীনের কার্যকারিতা**
দ্বীন ও মানুষ
নফস বা আত্মা
আত্মার কুরআনিক ধারণা
স্রষ্টা ও মানুষ
ধর্ম বা দ্বীন
ইসলাম

**অধ্যায় ৩: মানুষের আত্মা এবং তার ভাগ্য**
আত্মা ও দৈহিক শরীর
আত্মা ও স্মৃতি
আত্মার অস্তিত্ব
মানুষ
পরকাল
অনৈতিকতা
জীবনের স্রষ্টা

**অধ্যায় ৪: ঐশ্বরিক নির্দেশনা**

নির্দেশনার প্রমাণ

ওহী ও সৃষ্টি জগৎ

মানুষ ও ওহী

নবুওয়াত

উপসংহার

ওহীর বিশ্বাস ছাড়াই স্রষ্টা বিশ্বাস

**অধ্যায় ৫: যুক্তি এবং ঈমান**

যুক্তি এবং ইহার সীমাবদ্ধতা

যুক্তির কার্যকারিতা

যুক্তি ও বিশ্বাস (ঈমান) - কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি

অলৌকিক ঘটনা

কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

**অধ্যায় ৬: দ্বীনে যুক্তির ভূমিকা**

যুক্তি এবং আবেগ

যুক্তি এবং ওহী (প্রত্যাদেশ)

প্রত্যাদেশ এবং মূল্যবোধ

অপরিহার্য ঈমান

**অধ্যায় ৭: ঐশ্বরিক আইনের কার্যকারিতা**

চুড়ান্ত শাসক হিসেবে একজন স্রষ্টা

কুরআন অনুসারে ঐশ্বরিক ইচ্ছা

স্রষ্টার বিষয়ে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

**অধ্যায় ৮: প্রতিফল আইন (Law of Requital)**

প্রতিফল আইন কী?

মানুষ এবং প্রতিফল (প্রতিদান) আইন

এর কার্যকারিতা

**অধ্যায় ৯: পরিত্রাণ**

ধর্ম এবং পরিত্রাণ

পরিত্রাণ সম্পর্কে কুরআনের ধারণা

জীবন: একটি সংগ্রাম

উপসংহার

**অধ্যায় ১০: জীবন যাপন: ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত**

জীবনের প্রতি মানুষের আবেগ

জীবন এবং মৃত্যু

ইচ্ছা এবং কর্ম

ইহকাল এবং অনন্তকাল

**অধ্যায় ১১: মানব ব্যক্তিত্বের বিকাশ**

রবুবিয়্যাতের (প্রভুর) আইন

আত্ম-বিকাশের জ্ঞান

**অধ্যায় ১২: প্রভুর আদেশ (কুরআনের অর্থনীতি)**

প্রভুর আদেশ: এর প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য

জান্নাত

আল্লাহ

জীবিকার সমস্যা

অতীন্দ্রিয় পথ

**অধ্যায় ১৩: প্রভুর আদেশ: এর লক্ষ্য এবং পরিধি**

সমাজের রবুবিয়্যাত ধারা

পুঁজিবাদ এবং রবুবিয়্যাত ধারা

উৎপাদনের উপায়

পরিবর্তনকালীন সময়

**অধ্যায় ১৪: ক: রাজনৈতিক ব্যবস্থা: প্রথম পর্ব**

মানবসৃষ্ট ব্যবস্থা

আদিম যুগ

শাসক এবং প্রজার লড়াই

ক্ষমতাই আইন (শক্তিই ন্যায়)

চুক্তির থিওরী

গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের ব্যর্থতা

জাতিসংঘের প্রশ্নাবলী

দেশপ্রেম

পশ্চিমা চিন্তাবিদগণ

নৈতিক মান

লকের (Locke) ভুল

উচ্চতর আইন

আলোর সন্ধানে আধুনিক মানুষ

মানবাধিকারের ঘোষণা

স্থায়ী মূল্যবোধের সন্ধান

**অধ্যায় ১৫: খ: রাজনৈতিক ব্যবস্থা: দ্বিতীয়  পর্ব**

মানবতার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

সর্বজনীন মানবতা

আন্তর্জাতিক মানবতা

স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং সৌন্দর্য

আদল ও ইহসান

যুদ্ধ এবং আদর্শগত পার্থক্য

সাম্প্রদায়িকতা

**অধ্যায় ১৬: মানুষ এবং যুদ্ধ**

সুদূর অতীত

খ্রিস্টধর্ম এবং যুদ্ধ

কুরআন এবং যুদ্ধ

আইন এবং বলপ্রয়োগ
আচরণবিধি
যুদ্ধবন্দী
যুদ্ধের বিলোপ কি অসম্ভব?

**অধ্যায় ১৭: জাতির উত্থান ও পতন**
কুরআন ও ইতিহাস
কার্যকর আইন
ইতিহাস সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি
জাতির ধ্বংস
মহাজাগতিক প্রক্রিয়া

**অধ্যায় ১৮: মানুষ এবং তার পরিবেশ**
মানুষ এবং মহাবিশ্ব
মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে কুরআন
জ্ঞান
জ্ঞান প্রাপ্ত ব্যক্তি

**অধ্যায় ১৯: নারী**
পুরুষ ও নারী: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন
নারী (মা)
দাসী (ক্রীতদাসী নারী)
যৌনতা ও সমাজ
সতীত্ব

**উপসংহার**
ধর্ম ও দ্বীন
স্রষ্টার ধারণা
স্থায়িতা ও পরিবর্তন
মানুষের ব্যক্তিত্ব
স্থায়ী মূল্যবোধ

তুলনা

গ্রন্থপঞ্জি

# ভূমিকা

মানবজাতির ইতিহাস পাঠ করে করুণ পরিণতির উদাহরণ পাওয়া যায়।। যুগ যুগ ধরে আমরা কেবল বিভিন্ন জাতির ধারাবাহিক উত্থান, বৃদ্ধি, পতন এবং পতনের মুখোমুখি হই না, আমরা তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্থান পতনের ধারাবাহিকতার মুখোমুখি হই। নিঃসন্দেহে, মানুষ সর্বদাই অসাধারণ গঠনমূলক প্রতিভা দেখিয়েছে, মাঝে মাঝে অনেক বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে, এমনকি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও। কিন্তু তার গঠনমূলক প্রতিভা সর্বদা তার আদর্শ বা তার জীবনযাত্রার অন্তর্নিহিত কিছু দুর্বলতা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত তার প্রচেষ্টার এক বিপর্যয়কর পরিণতি ডেকে আনে। তবুও, মানবজাতির সার্বজনীন কল্যাণের ধারণা বাস্তব রূপ নেওয়ার পর ধারাবাহিকভাবে কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ঘটেছে, তবে সেই সমস্ত সভ্যতা ও সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য সর্বদা হতাশাই রয়ে গেছে।

একই হতাশাজনক দৃশ্য যুগের পর যুগ পুনরাবৃত্তি হয়। আমরা এমন কয়েকটি জাতিকে দেখতে পাই যারা একটি মহান সভ্যতা তৈরির জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যা তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। তারা তাদের সাফল্যকে মানব প্রচেষ্টার শীর্ষস্থান হিসাবে দেখেছিল। তারা আশা করেছিল যে, এই সভ্যতা অবশেষে মানবজাতিকে অত্যাচার এবং দাসত্বের খপ্পর থেকে মুক্ত করবে এবং চিরন্তন শান্তি, নিরাপত্তা এবং তৃপ্তির যুগের সূচনা করবে। তারা এক অতুলনীয় সভ্যতা গড়ে তোলার ভ্রান্ত ধারণায় ডুবে রইল, যার বিকাশ তাদের জন্য সর্বদা গর্ব এবং আনন্দের উৎস ছিল। এর অগ্রগতির জন্য তারা যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছিল তা তাদের হৃদয়ে মানব কল্যাণ এবং অগ্রগতি অর্জনের জন্য আশার এক নতুন আলো জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু প্রক্রিয়াটি কখনই কাঙ্ক্ষিত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়নি এবং মূল লক্ষ্যটি সর্বদা মরীচিকা হিসাবে থেকে যায়। লক্ষ্যে পৌঁছানোর অনেক আগেই, প্রায়শই একটি হতাশাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, এবং মানুষ নিজেই সেই দুর্দান্ত স্থাপনা ভেঙে ফেলার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা সে যুগ যুগ ধরে নির্মাণ করেছিল। এটা চূর্ণ করে দেয় তার সকল আশা, আদর্শ এবং আকাঙ্ক্ষা।

ইতিহাস বিভিন্ন মানব সভ্যতার উত্থান, বিকাশ এবং ধ্বংস ও পতন এবং চূড়ান্ত পতনের গল্পে পরিপূর্ণ। প্রাচীন ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীস, ইরান, রোম, ভারত এমনকি নতুন বিশ্বের কিছু অংশ এখন গৌরবময় পুরাতন সভ্যতার কবরস্থান। এসব মানুষের করুণ ব্যর্থতার গল্পের জীবন্ত সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলি সংবেদনশীল দর্শকদের মধ্যে চিন্তাশীল মেজাজ জাগিয়ে তোলে এবং তাদের কিছুক্ষণের জন্য থমকে যেতে এবং কোরআনের এই সতর্কীকরণ বার্তাটি নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করে: মনে রেখো! তোমরা

সেই বৃদ্ধা মহিলার মতো হয়ো না যে কঠোর পরিশ্রম করে তার সুতা কাটে এবং তারপর তা টুকরো টুকরো করে ফেলে (১৬:৯২)।

## সমসাময়িক সভ্যতা

অন্যদিকে, আসুন, আমরা সমসাময়িক বিশ্বের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করি যেখানে পশ্চিমা জাতি সমূহ নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছে। সেই সভ্যতার জাঁকজমক এবং উজ্জ্বলতা সত্যিই চমকপ্রদ। নিঃসন্দেহে, এই সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী সভ্যতা, যেমনটি দাবি করে, মানুষকে প্রকৃতির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু শক্তিকে কাজে লাগাতে সক্ষম করেছে। স্থল, সমুদ্র এবং আকাশপথে যোগাযোগের বিস্ময়কর অগ্রগতি দূরবর্তী স্থানগুলিকে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে নিয়ে এসেছে। তার দীর্ঘ এবং জটিল ইতিহাসে মানুষ আজ যতটা ক্ষমতা এবং প্রকৃতির শক্তিশালী শক্তি উপভোগ করছে, তার চেয়ে বেশি আগে কখনও তারা উপভোগ করেনি।

মানব সভ্যতার এই অসাধারণ পর্যায়টি প্রায় এক শতাব্দী পুরনো, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, অতীতের মতো, এর পতন এবং ধ্বংসের লক্ষণ ইতিমধ্যেই স্পষ্ট, যেমন ম্যাসন বলেছেন: "আমরা বৈজ্ঞানিক দক্ষতার যুগ শুরু করেছিলাম, এই আত্মবিশ্বাসের সাথে যে বস্তুবাদী বিজয় জীবনের সমস্যাগুলি সমাধান করবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা ভুল ছিলাম। জীবন এত সহজ নয়। [১]

প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষ এই ভয়ে চিন্তিত যে দুটি বিশ্বযুদ্ধের কারণে ইতিমধ্যেই ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে ওঠা এই সভ্যতা তৃতীয় ধাক্কায়ও টিকে থাকবে না। কেবল পুরো ভবনটিই ভেঙে পড়বে না, বরং এটি সমগ্র মানবজাতিকে এর নীচে পিষে ফেলবে, সম্ভবত, সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বহীন করে ফেলবে।

কেন এমন হবে? প্রাচীন সভ্যতা বা বর্তমান সভ্যতা কোনওটিই চিন্তাহীন মানুষের কাজ নয়। প্রকৃতপক্ষে, অতীত এবং বর্তমান উভয়ই, একটি অত্যন্ত উন্নত সৃজনশীল মনের প্রকাশ। অগ্রগতির এই বিপরীতমুখী সমস্ত চিন্তাশীল মনকে অনিবার্যভাবে আইনস্টাইনের এই বক্তব্যের দিকে নিয়ে যায়: বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা শিখেছি যে যুক্তিসঙ্গত চিন্তাভাবনা আমাদের সামাজিক জীবনের সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য যথেষ্ট নয়। তীক্ষ্ণ গবেষণা এবং তীব্র বৈজ্ঞানিক কাজের প্রায়শই মানবজাতির জন্য দুঃখজনক প্রভাব রয়েছে। একদিকে এমন আবিষ্কার তৈরি হয়েছে যা মানুষকে ক্লান্তিকর শারীরিক শ্রম থেকে মুক্তি দিয়েছে, তার জীবনকে সহজ এবং সমৃদ্ধ করেছে; কিন্তু অন্যদিকে, তার জীবনে এক গুরুতর অস্থিরতা প্রবর্তন করেছে, তাকে তার প্রযুক্তিগত পরিবেশের দাস করে তুলেছে, এবং সবচেয়ে বিপর্যয়কর হল - তার নিজের গণ ধ্বংসের উপায় তৈরি করেছে। এটি, প্রকৃতপক্ষে, অপ্রতিরোধ্যে এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। [২]

অন্য কথায়, মানুষের যুক্তি প্রকৃতির শক্তিকে দমন করতে পারে কিন্তু মানবজাতির সমস্যার জটিলতার সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে পেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, কিছু মৌলিক প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত এগুলি সমাধান করা যাবে না। আর তা হচ্ছে- মানব জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কী? বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বিভিন্ন জাতির স্বার্থের দাবি প্রায়শই পারস্পরিক বিরোধী হয় কেন, এবং কীভাবে তাদের সম্মিলন করা যেতে পারে?

কোন জিনিসগুলি মানবজাতির স্বার্থের জন্য সহায়ক এবং কোন জিনিস গুলি ক্ষতিকারক? মানবতার সাধারণ মূল্যবোধগুলি কী এবং সেগুলি কীভাবে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত? কেন এই মূল্যবোধগুলি রক্ষা এবং সংরক্ষণ করা প্রয়োজন এবং কীভাবে? মানুষের মৌলিক অধিকার কী এবং কীভাবে সেগুলি সুরক্ষিত করা যেতে পারে? এটা স্পষ্ট যে মানবিক যুক্তি এবং তার প্রকাশ: বিজ্ঞান - এই প্রশ্নগুলির সমাধানে আমাদের সাহায্য করে না এবং করতে পারে না। আমি আবার আইনস্টাইনের কথা উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞান কেবল কী তা নির্ধারণ করতে পারে, কিন্তু কী হওয়া উচিত তা নয়, এবং তার ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে সকল ধরণের মূল্য বিচার অপরিহার্য থাকে.... বিজ্ঞানের প্রতিনিধিরা প্রায়শই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তিতে মূল্যবোধ এবং লক্ষ্যের ক্ষেত্রে মৌলিক বিচারে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন এবং এইভাবে ধর্মের বিরোধিতা করেছেন। এই দ্বন্দ্ব মারাত্মক ত্রুটি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। . . বিজ্ঞানীর কাছে, কেবল "সত্তা" আছে, কিন্তু ইচ্ছা নেই, মূল্যায়ন নেই, ভালো নেই, মন্দ নেই, লক্ষ্য নেই। [৩]

যেহেতু মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান উপরোক্ত প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তরের উপর নির্ভর করে এবং যেহেতু কেবল মানবিক যুক্তিই সেগুলির সঠিক উত্তর দিতে পারে না, তাই জ্ঞানের অন্য কোনও উৎস অনুসন্ধান করা উচিত- যার থেকে আমরা সঠিক উত্তর পেতে পারি যা মানবজাতিকে তার মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানে সহায়তা করতে পারে।

## ঐশ্বরিক নির্দেশনা

মানব বুদ্ধি এই বিষয়ে আমাদের খুব কমই সাহায্য করে, কারণ এটি নিজের জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনও জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে অবগত নয়। এই কঠিন অনুসন্ধানে মানবজাতির জন্য কেবল একজনই পথপ্রদর্শক অবশিষ্ট আছে; এবং যা আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করে যে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষমতা তাদের রয়েছে: মহাবিশ্বের সকল বস্তু সৃষ্টিকারী স্রষ্টা তাদেরকে তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন করার এবং সেই লক্ষ্যে পরিচালিত করার দায়িত্বও নিয়েছেন (কোরআন, ২০:৫০)।

স্রষ্টার কাছ থেকে সরাসরি আসা এই নির্দেশনাকে ওহী বলা হয়। এটি বিভিন্ন আম্বিয়াদের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সময়ের বিপর্যয় এবং ধর্মগ্রন্থ সমূহের মাঝে মানুষের বিকৃতির কারণে, পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণের ওহী সমূহ তাদের মূল আকারে বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায়নি। অবশেষে, প্রায় চৌদ্দ শতাব্দী আগে, সেই নির্দেশনার সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত সংস্করণটি রাসূলের সিরিজের শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে মানবজাতির কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল। নির্দেশনার এই সংস্করণটি হুবহু তার মূল আকারে কোরআনে মূর্ত রয়েছে।

**কোরআন**

প্রায় তেইশ বছর ধরে সময়ে সময়ে কোরআন নাজিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) কোরআনের প্রতিলিপি এবং সংরক্ষণের জন্য নিখুঁত ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর আগে এটি সম্পূর্ণরূপে একটি বই আকারে সংকলিত হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষের দ্বারা মুখস্থ করা হয়েছিল। এইভাবে বইটি তার মূল আকারে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে এবং এটি একটি ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য যে চৌদ্দ শতাব্দীর অস্তিত্বের সময়কালে বইটির একটি অক্ষরও পরিবর্তন করা হয়নি। এই মহান এবং অতুলনীয় বইটি চিরন্তন সত্য এবং চিরস্থায়ী সার্বজনীন মূল্যবোধের একটি অনন্য প্রমাণ, এবং মানব জীবনের সকল দিকের বিষয়ে আলোকিতকরণ এবং নিখুঁত নির্দেশনা প্রদান করে।

মানুষের দ্বারা রচিত যে কোন গ্রন্থ বা  লেখা  তাদের পরিবেশের বস্তু এবং কিছু ধারণা প্রকাশ করার জন্য এবং এক বা একাধিক সীমিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তৈরী করা হয়েছে। অতএব, এই ধরনের লেখার জীবন ক্ষণস্থায়ী, এবং তাদের আগ্রহ এবং উপযোগিতা সীমিত। অন্যদিকে, যে বই চিরকাল প্রকাশিত নির্দেশনা বহন করে তা সময়, স্থান এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয়। এর শিক্ষা সমূহ কখনও পুরানো হয় না এবং এমন কোনও সীমা নেই, যার বাইরে এটি মানুষকে আলোকিত এবং নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হতে পারে। এটি সেই নীতি নির্দেশ করে যা ব্যক্তিগত সম্ভাবনার বিকাশ এবং উপলব্ধি নির্ধারণ করে এবং জাতির উত্থান, পতন এবং পতনকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন আইন সমূহকে ব্যাখ্যা করে। অতএব, কোরআন একটি ঐশ্বরিক গ্রন্থ যা এই সমস্ত গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক, এবং স্রষ্টা কর্তৃক মানবজাতির জন্য চিরকালের জন্য নির্ধারিত চূড়ান্ত জীবন বিধান হওয়ায়, এটি প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত এবং সম্পূর্ণ।

সর্বশক্তিমান স্রষ্টার এই মহান গ্রন্থ আমাদের বলে যে মানবজাতির সমস্ত ব্যর্থতা এবং হতাশা, পৃথিবী যে সমস্ত ধ্বংস এবং রক্তপাতের শিকার হয়েছে, তার কারণ জীবনের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি যা মানুষ বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিকৃত চিন্তাভাবনার মাধ্যমে গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে একটি হল জীবনের বস্তুবাদী ধারণা- যার মতে মানুষ কেবল প্রাণীজ জীবনের সবচেয়ে উন্নত নমুনা, তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে তার শারীরিক শরীরের উপর নির্ভরশীল এবং এর ক্ষয় দিয়ে শেষ হয়। তারা মনে করে, মানব জীবন সম্পূর্ণরূপে শারীরিক আইন দ্বারা

পরিচালিত হয়। মানুষের বস্তুগত কল্যাণের সংরক্ষণ এবং প্রচারই একমাত্র লক্ষ্য যার জন্য প্রচেষ্টা করা দরকার। এই লক্ষ্য অর্জনে মানুষকে সাহায্য করা মানুষের বুদ্ধির কাজ। যারা জীবনের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করে তারা অনিবার্যভাবে জঙ্গলের আইনের শ্রেষ্ঠত্বকে গ্রহণ করে যা সঠিক। এই আইন স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি করে, যা অবশেষে বিশ্বব্যাপী সংঘাত এবং জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপক ধ্বংস এবং দুঃখজনক মানবিক দুর্দশার দিকে পরিচালিত করে। সংক্ষেপে, সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য মানবজাতি যে সমস্ত পথ গ্রহণ করেছে তা শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তা ও শান্তির দিকে নয়, বরং পারস্পরিক ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করেছে। "দ্য মেকিং অফ হিউম্যানিটি" বইতে, রবার্ট ব্রিফোল্ট সমস্যার মূল কারণটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন, যাতে তিনি বলেছেন: মানব সংগঠনের এমন কোনও ব্যবস্থা যা তার নীতিগতভাবে, তার ভিত্তিগতভাবে মিথ্যা, সেই মিথ্যাকে যে কোনও পরিমাণে চালাকি এবং দক্ষতার মাধ্যমে, যে কোনও পরিমাণে ভাসাভাসা সমন্বয় এবং ছলনা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে পারে না (পৃষ্ঠা ১৫৯)।

## জীবন সম্পর্কে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

অন্যদিকে, কোরআন বলে যে মানুষ কেবল একটি শারীরিক সত্তা নয় বরং তার দেহ ছাড়াও অন্য কিছু দিয়ে গঠিত, যাকে বলা হয় মানব ব্যক্তিত্ব। তবে, এই ব্যক্তিত্ব মানুষ সম্পূর্ণরূপে বিকশিত অবস্থায় উত্তরাধিকারসূত্রে পায় না; এটি একটি সুপ্ত আকারে বিদ্যমান এবং এর বিকাশ মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সঠিকভাবে বিকশিত হলে, এই নশ্বর জগতে তার জীবন শেষ হওয়ার পর ব্যক্তির জীবন উচ্চতর আকারে বিকশিত হতে সক্ষম হয়। একজন ব্যক্তির দৈহিক অস্তিত্বের বিকাশ কিছু প্রাকৃতিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ বিভিন্ন আইনের অধীন যা সময়ে সময়ে ঐশ্বরিক ওহীর মাধ্যমে মানবজাতিকে দেওয়া হয়েছে এবং এখন কোরআনে সম্পূর্ণরূপে মূর্ত হয়েছে।

## মানব সমাজের সংগঠন

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে এবং কেবল সমাজের মধ্যেই তার ভাগ্য পূরণ করতে পারে, বিচ্ছিন্নভাবে নয়। অতএব, মানব ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত কোরআনের আইন সমূহ সেই নীতির রূপরেখা দেয় যার উপর ভিত্তি করে সংগঠনটি মানব সমাজের ভিত্তি হওয়া উচিত। কোরআনের আইন অনুসারে বিকশিত একটি সামাজিক ব্যবস্থার লক্ষ্য সমগ্র মানবজাতির অগ্রগতি এবং পূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করা। এটি ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে স্বার্থের সংঘাত থেকে মুক্ত একটি সমাজ তৈরি করে। কারণ, এর মৌলিক নীতি অনুসারে, একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অন্যান্য ব্যক্তিত্বের বিকাশে তার অবদানের সরাসরি অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং যে সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি অন্যদের সাহায্য করার জন্য (নিজের ব্যক্তিত্বের স্বার্থে) যথাসাধ্য চেষ্টা করে, সেখানে ব্যক্তিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় না। এবং একবার মানুষের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেলে, বিশ্বের চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব, অত্যাচার এবং বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী অন্যান্য সমস্ত জটিলতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অদৃশ্য

হয়ে যাবে। অতএব, কোরআন এমন একটি প্যাটার্ন তৈরি করে, যার অনুসারে সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি সুস্থ সামাজিক সংগঠন গঠন করা যেতে পারে।

জীবনের বস্তুবাদী ধারণার ফলস্বরূপ, মানবজাতি আজ এমন একটি সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে যার ইতিহাসে সম্ভবত কোনও নজির নেই। মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত এই সংকট ধর্মের বিরুদ্ধে একটি সর্বজনীন বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে। এটি কোনও নির্দিষ্ট স্থান বা মানুষের গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি কোন নির্দিষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, বরং সকল ধর্মের বিরুদ্ধেই। নিঃসন্দেহে, সভ্যতার আবির্ভাবের পর থেকে প্রতিটি ধর্মই এক না এক সময়ে তীব্র সমালোচনার শিকার হয়েছে, কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিদ্রোহ সমসাময়িক জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উইলিয়াম আর্নেস্ট হকিং বলেন, "সকল জীবন্ত ধর্মই হল দুর্ভাগ্যজনক পাত্র। তারা সকলেই পবিত্রতায় আবৃত, আত্মতৃপ্তিতে ধূলিমলিন, তাদের ধর্মীয় অহংকারের মরিচায় আবদ্ধ, সঙ্গতির চাবুকের নিচে এতটাই ভয়ঙ্কর যে চিন্তা করার বিপজ্জনক কাজটি খুব কম লোকই করতে সাহস করে।"

রাসেল এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলেন: ধর্ম আমাদের শিশুদের যুক্তিসঙ্গত শিক্ষা থেকে বাধা দেয়; ধর্ম আমাদের যুদ্ধের মৌলিক কারণগুলি অপসারণ থেকে দূরে রাখে; ধর্ম আমাদের পাপ এবং শাস্তির পুরানো ভয়ঙ্কর মতবাদের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার নীতি শিক্ষা থেকে বাধা দেয়। এটা সম্ভব যে মানবজাতি একটি স্বর্ণযুগের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে; কিন্তু, যদি তাই হয়, তাহলে প্রথমে দরজার পাহারাদার ড্রাগনটিকে হত্যা করা প্রয়োজন, এবং এই ড্রাগন হল ধর্ম। [৫]

এভাবে আমাদের যুগ ধর্মের প্রতি এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

এই চ্যালেঞ্জটি সম্পূর্ণরূপে অভূতপূর্ব নয়। চৌদ্দ শতাব্দী আগে ধর্ম একই ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল - এবং সেই চ্যালেঞ্জটি ছিল এক ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জটি কোরআন দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল। এটি সেই সময়ের ধর্মগুলিকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করেছিল: ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, ম্যানিচেইজম, মূর্তিপূজা, তারকা-পূজা, প্রকৃতি-পূজা এবং কুসংস্কার। অধিকন্তু, এটি কেবল ধর্মের একটি নির্দিষ্ট রূপের উপাদানগুলির সত্যতা এবং বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেনি, বরং জোর দিয়েছিল যে "ধর্ম" স্বয়ং মিথ্যা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই দাবি কেবল অমুসলিমদের কাছেই নয়, এমনকি মুসলমানদের কাছেও অবাক হওয়ার কারণ হতে পারে। যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে ইসলাম নিজেই একটি ধর্ম (এবং কোরআন ধর্মের একটি গ্রন্থ) এবং কোরআন ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক- এ কথা বলা, একটি বিরোধী বক্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, এটি কোনও

চুড়ান্ত দ্বন্দ্ব নয় বরং এটিকে কেবল একটি বিরোধ হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে, যা একটি মৌলিক ভ্রান্ত ধারণা এবং ইসলামের প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গৃহীত ভুল ধারণা থেকে উদ্ভূত। ইসলামকে সাধারণত একটি ধর্ম (মাযহাব) হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যদিও বাস্তবে এটি একটি মাযহাব নয় বরং একটি দ্বীন। এখন মাযহাব এবং দ্বীন, যা সাধারণত সমার্থক হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু এটা কেবল ভিন্নই নয় বরং পারস্পরিক বিরোধী। সুতরাং, উপরে উল্লিখিত দাবিটি সঠিকভাবে উপলব্ধি করার আগে উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য স্পষ্টভাবে বোঝা উচিত। আজকের ভয়াবহ সংকট থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এই পার্থক্যের সঠিক ধারণাও অপরিহার্য।

কোরআন আমাদের বলে যে মানুষ যখন দলবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে, তখন স্বার্থের সংঘর্ষ শুরু হয়। এবং এর ফলে সহিংস সংঘাত এবং রক্তপাত ঘটে। যেহেতু এই বিশৃঙ্খলা মানুষের নিজস্ব সীমাবদ্ধতার ফলস্বরূপ ছিল, তাই এর প্রতিকার করা তার ক্ষমতার বাইরে ছিল। যা প্রয়োজন ছিল, তা হল মানব-উপরবর্তী উৎস থেকে স্পষ্ট নির্দেশনা। স্পষ্টতই, এই উৎস ঐশ্বরিক জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না, কারণ সমগ্র বিশ্বে তার স্রষ্টা - স্বয়ং স্রষ্টা ছাড়া মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন স্বত্বা বা শক্তি নেই। মানবজাতি যে জঞ্জালের মধ্যে পড়েছিল তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে ঐশ্বরিক নির্দেশনার প্রয়োজন ছিল তা রাসূল (স্রষ্টার বার্তাবাহক) এর মাধ্যমেই তার কাছে পৌঁছেছিল।

এভাবে সময়ে সময়ে ঐশ্বরিক বার্তাবাহকদের (রাসুল) এই দীর্ঘ ধারাবাহিকতা মানবজাতির কাছে ঐশ্বরিক নির্দেশনার একটি কোড নিয়ে এসেছিল এবং তাঁরা সেই কোডে অন্তর্ভুক্ত স্থায়ী মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে একটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এইভাবে সেই সমাজের পুরানো দ্বন্দ্ব এবং প্রচেষ্টার অবসান ঘটেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থের সাধনা সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণের আদর্শ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। নিপীড়ন এবং শোষণ বিলুপ্ত করা হয়েছিল এবং ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মানুষের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা এবং একে অপরের প্রতি পরাধীনতার অবসান ঘটেছে। প্রতিটি ব্যক্তিকে তার চাহিদার যথাযথ সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা হয়েছিল। অতএব, সে সন্তুষ্ট ছিল এবং ঐশ্বরিক আইন (অথবা ঐশ্বরিক আইনে নিহিত স্থায়ী মূল্যবোধ) ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি বা শক্তির আনুগত্য করতে বাধ্য ছিল না। সমাজের সকল সদস্য এইভাবে প্রকৃত স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা উপভোগ করত; নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা কেবল এই পৃথিবীতে মানুষের শারীরিক অস্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং পরকালীন জীবনেও নিশ্চিত করা হয়েছিল। এই জীবনধারা, এই আইনের বিধান, এই সামাজিক ব্যবস্থাকে দ্বীন বলা হত।

এই সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাতা নবীর জীবদ্দশায় এবং তার কিছু সময়ের জন্য বিরাজমান ছিল। কিন্তু আজ হোক বা কাল হোক, দ্বীন দ্বারা দমন করা শক্তিগুলি আবার তাদের কুৎসিত মাথা তুলে একে দুর্বল করতে

শুরু করে, অন্যায়, শোষণ এবং অত্যাচারের মতো পুরানো মন্দকে পুনরুজ্জীবিত করে। পুরাতন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায়, এই শক্তিগুলি সাধারণত ধার্মিকতার পোশাক পরে আবির্ভূত হয় এবং স্রষ্টার নামে কথা বলা মানুষের সেবা গ্রহণ করে। তারা স্রষ্টার ইচ্ছার ব্যাখ্যাকারী হিসেবে নিজেদের জাহির করে এবং এভাবে দ্বীনের নীতি ও নীতিমালা বিকৃত করে।  যার ফলে তা আর সমাজে জীবন্ত শক্তি হিসেবে থাকেনি এবং যুক্তি, জ্ঞান এবং এই পৃথিবীর জীবনের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মাহীন বিশ্বাস, প্রাণহীন মতবাদ এবং আনুষ্ঠানিক আচার-অনুষ্ঠানের একটি সেটে পরিণত হয়েছিল। তারা সাধারণ মানুষকে মতবাদ এবং আচার-অনুষ্ঠানের গোলকধাঁধায় আটকে রাখতে চেয়েছিল। এবং শোষক, ধর্মীয় এবং পার্থিব উভয়কেই প্রতারিত জনসাধারণের উপর তাদের দমন-পীড়ন বজায় রাখার এবং অন্যদের শ্রমের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব করার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এটি ছিল দ্বীনকে মাযহাব বা ধর্মে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া, যেমনটি প্রাচীনকালেও করা হয়েছিল।

কিন্তু এই ধরণের শৃঙ্খলা, বা শৃঙ্খলার অভাব, অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে পারেনি, এবং শীঘ্রই আরেকজন রাসূল (স্রষ্টার বার্তাবাহক) দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়ে "ধর্ম" এর পতাকাবাহীদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং অবশেষে তাঁর পূর্বসূরীর দ্বারা প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত দ্বীন বা জীবনধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দ্বীনের পুনরুজ্জীবন ও মানব সমাজের অবক্ষয়ের এই ধারা এবং বিপরীত প্রক্রিয়া যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে এবং ইসলামের সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে শেষ হয়, যার মাধ্যমে কোরআনে মূর্ত ঐশ্বরিক নির্দেশনার একটি নিখুঁত কোড মানবজাতির কাছে আনা হয়েছিল। এই কোডের ভিত্তিতে সর্বশেষ নবী যে সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ছিল দ্বীনের পরিপূর্ণতার প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণতি।

মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসের সংক্ষেপে হচ্ছে- দ্বীন এবং মাযহাবের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বের ইতিহাস, যা একে অপরের উপর বিজয়ী হওয়ার মাধ্যমে শেষ হয়।

"ধর্ম" ধারণাটি স্বার্থপরতার জন্য নিবেদিতপ্রাণ মানুষের মনের একটি ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি। তাদের লক্ষ্য হল- অন্যদের ব্যয়ে নিজেদের উপভোগ করা। শিক্ষাদানের একটি নিরন্তর প্রক্রিয়ার ফলে, জনসাধারণ তাদের প্রশংসা করতে এবং আশীর্বাদ করতে শিখে, যারা তাদের পছন্দের বিভিন্ন ছদ্মবেশে তাদের প্রতারণা করেছিল।

জনগণকে বোকা বানানোর এবং তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সমস্ত প্রচেষ্টায়, "ধর্মের" আদর্শ ধারকরা সর্বদা প্রধানত একটি কৌশলের উপর নির্ভর করেছে: তারা তাদের নিজস্ব লক্ষ্য এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে "স্রষ্টার ইচ্ছা" থেকে উদ্ভূত বলে অভিহিত করেছে। এটিই জনসাধারণের মনের উপর

"ধর্মের" দৃঢ় দখলের রহস্য; এবং এই দখল বজায় রাখার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল জনগণকে অজ্ঞ রাখা, তাদের যুক্তিকে পঙ্গু করা এবং তাদের স্বাধীন চিন্তাভাবনা করতে অক্ষম করা, এবং অজ্ঞতা, মূর্খতা এবং অন্ধ আনুগত্যকে ধার্মিকতা ও ধার্মিকতার লক্ষণ হিসাবে ধরে রাখা। "ধর্মের" নেতারা আমাদেরকে বিশ্বাস কোতে চান যে একজন ব্যক্তি যত বেশি অস্পষ্ট এবং অসংলগ্নভাবে কথা বলেন, তিনি স্রষ্টার তত বেশি নিকটবর্তী হন; এবং তিনি তার মনোভাব এবং পদ্ধতিতে যত বেশি অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক হন, তার প্রতি তত বেশি সম্মান দেখানো উচিত।

"ধর্মের" সমর্থনে যে যুক্তিটি উপস্থাপন করা হয়েছে তা হল এটি তাদের পূর্বপুরুষরা অনুসরণ করেছিলেন যারা পবিত্রতার নিশ্চয়তা দেন। যদি কারো কোন ধর্মীয় বিশ্বাস বা রীতিনীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার সাহস থাকে, তাহলে "ধর্ম" নেতারা, তার বিরুদ্ধে তাদের বিখ্যাত পূর্বপুরুষদের অপমান এবং অপমানের অভিযোগ এনে- তার বিরুদ্ধে জনগণের ক্রোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। "ধর্ম" নেতারা তাদের সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে এবং তাদের চিরন্তন ভীতির মধ্যে রাখতে, জনগণের ক্রোধের ভয়কে বেশ কার্যকরভাবে ব্যবহার করেছেন। মাযহাবের এই জঘন্য খপ্পর ভেঙে ফেলা এবং দ্বীনকে একটি কার্যকর নির্দেশনা হিসেবে পুনরুদ্ধার করার জন্য, স্রষ্টা সময়ে সময়ে মানুষের মধ্যে তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছিলেন।

যেহেতু মিথ্যার তার উপর দাঁড়ানোর জন্য কোন পা নেই, তাই এটি সর্বদা সত্যের আবরণে আবির্ভূত হয়। একইভাবে, "ধর্ম" দ্বীন হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করে, তার পরিভাষা এবং উপকরণ ব্যবহার করে গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করে। যাতে দ্বীন আত্মা এবং শক্তি নেই বরং মানুষকে ইহার ছায়া গ্রহণে প্রতারিত করার চেষ্টা করে। মাযহাব আসলে দ্বীন-এর সুগন্ধি মৃতদেহ। মানুষের অবচেতনে ধর্মের দখল কতটা আশ্চর্যজনকভাবে দৃঢ় তা একটি সহজ তথ্য দ্বারা অনুমান করা যায়।

খ্রিস্টধর্ম আদি পাপের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিল যার ফলে মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং একটি নির্জীব, নির্ধারিত বস্তুর অবস্থায় পরিণত হয়েছিল। কারণ, যখন মনে করা হত যে প্রতিটি মানব শিশু জন্মের সময় তার নিজের কোনও দোষ ছাড়াই পাপে কলঙ্কিত হয়ে দিনের আলো দেখতে পায় এবং তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে যা থেকে মুক্তি পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তখন সে বেশ অসহায় প্রাণীতে পরিণত হয়। এই বিশ্বাসের যৌক্তিক উপসংহার ছিল যে তাকে তার ভুলের জন্য দায়ী করা যাবে না। অতএব, নিয়তিবাদ এবং দায়িত্ব থেকে মুক্তি খ্রিস্টধর্মের স্বাভাবিক ফল হয়ে ওঠে।

পশ্চিমা বিশ্বের অনেক বিজ্ঞান ও চিন্তাবিদ যুক্তির আলোকে খ্রিস্টধর্মকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছেন। তারা এমনকি স্রষ্টা বিশ্বাসকে নিছক অযৌক্তিকতা বলে গণ্য করার সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছেন; এবং নিশ্চিত নাস্তিক ও বস্তুবাদী হয়ে উঠেছেন। তবুও, এটা লক্ষ্য করা আশ্চর্যজনক যে- খ্রিস্টধর্মের মৌলিক ধারণাগুলি তাদের

মনে কতটা গভীরভাবে প্রোথিত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা যে গবেষণা করেছেন, তা কেবল একটি জিনিসকেই তুলে ধরে, অর্থাৎ মানুষের সম্পূর্ণ অসহায় এবং তার কর্মের জন্য দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত।

ডারউইনের গবেষণা হোমোস্যাপিয়েন্সকে জৈবিকভাবে নির্ধারিত প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, যাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড তার শারীরিক উত্তরাধিকারের ফলাফল এবং সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। আচরণবিদরা তাকে অভ্যাস এবং প্রতিফলনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিলেন এবং পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে তার সমস্ত কর্ম শারীরিক উদ্দীপনা দ্বারা নির্ধারিত হয়। নৃবিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছিলেন যে মানুষের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বংশগতির উপর ভিত্তি করে তৈরী এবং সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন যে তার সামাজিক পরিবেশ তার সমস্ত কর্ম এবং আচরণের জন্য দায়ী। ফ্রয়েডীয়রা তাকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে নির্ধারিত বলে মনে করেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে "অহংকার তার নিজের ঘরে কর্তৃত্ব করে না", কারণ এর সমস্ত সিদ্ধান্ত অবচেতন মন দ্বারা নেওয়া হত- যা যৌন ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। মার্কসবাদীরা তাকে অর্থনৈতিকভাবে নির্ধারিত একটি সত্তা হিসাবে দেখেছিল।

কী নির্দেশ করে? এটি তাদের "ধর্ম" এর সেই শক্তিশালী ছিঁড়ের ফলাফল যা দ্বারা তারা সম্পূর্ণরূপে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। যদিও তারা মানসিকভাবে ধর্মীয় বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করেছিল, তবুও তাদের অবচেতন মন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়নি। এটি এমন ছিল কারণ "ধর্ম" এর নেতিবাচক চিন্তাভাবনা থেকে নিজেদের মুক্ত করার পরেও, তারা দ্বীনের ইতিবাচক চিন্তাভাবনা গ্রহণ করেনি। আর যেহেতু প্রকৃতিতে শূন্যতা থাকা অসম্ভব, তাই তাদের মন অন্যান্য উৎস থেকে আসা নেতিবাচক চিন্তায় ভরে গিয়েছিল। এখন সময়ের প্রয়োজনীয়তা তাদেরকে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে বাধ্য করেছে, বিশেষ করে কারণ নিয়তিবাদের দর্শনের প্রভাবে যে প্রজন্ম গড়ে উঠেছে, তাদের আইন-শৃঙ্খলার প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই এবং তারা কোন অপরাধকে অপরাধ হিসেবে মনে করে না; কারণ, তারা বোঝে যে তারা তাদের কর্মের জন্য দায়ী নয়। তাদের পথে একমাত্র বাধা হিসেবে কাজ করতে পারে সমাজের চাপ। কিন্তু যখন সমাজ নিজেই এমন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হয় যারা নৈতিক বিধিনিষেধের প্রতি কোন শ্রদ্ধা রাখে না, তখন তাদের অনৈতিক সমাজের আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন পরিবর্তন করতে কোনও অসুবিধা হবে না। তাই পশ্চিমে সামাজিক আইনগুলিও ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে,যা নৈতিক স্তরকে নিম্নমুখী করছে। এটি তাদের চিন্তাবিদদের তাদের গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে এবং তারা এখন নিয়তিবাদের ধারণাকে ত্যাগ করে স্বাধীন ইচ্ছার ধারণার দিকে ঝুঁকছে, যার অর্থ অন্য কথায়, মানব ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস।

এখানে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন ওঠে যে কেন মানুষ ধর্মীয় শোষণের প্রতি এত প্রবণ। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর সাধারণত দেওয়া হয় যে, "ধর্মের প্রতি আকাঙ্ক্ষা" মানুষের মধ্যে সহজাত।

মানুষকে অবশ্যই কিছু না কিছুতে বিশ্বাস করতে হবে—সেটা স্রষ্টা হোক, ধন হোক বা অন্য কিছু। তবে, এটি এমন একটি ভুল যা ইতিহাসে এসেছে এবং "চিরন্তন সত্য" হিসেবে গৃহীত হয়েছে, যার কোনও সতর্কতার প্রয়োজন নেই। এই দাবির সমর্থনে যে যুক্তিটি পেশ করা হয়েছে তা হল, মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস এই "আকাঙ্ক্ষা"র সাক্ষ্য দেয় যা মানুষ বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। ধর্মের নায়করা আজ এভাবেই এটিকে ন্যায্যতা ও যুক্তিসঙ্গত করে তোলেন। এমনকি কিছু সৎ ও প্রকৃত পণ্ডিত এবং চিন্তাবিদও মানুষের মধ্যে এই অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। আসুন এখন এই প্রস্তাবটি পরীক্ষা করে দেখি এবং দেখি ধর্মের প্রতি এই তথাকথিত আকাঙ্ক্ষার ভিত্তি বা প্রকৃতি কী।

মানুষের দুটি মৌলিক এবং সবচেয়ে শক্তিশালী চালিকাশক্তির মধ্যে একটি হল আত্ম-সংরক্ষণ। সে ধ্বংস হতে চায় না: সে বেঁচে থাকতে চায়। বেঁচে থাকার জন্য এই সংগ্রাম মানব শিশুর জন্মের সাথে সাথেই তার খাদ্যের জন্য চিৎকার করে ওঠে। মানুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ না করা পর্যন্ত এই সংগ্রামের তীব্রতা কখনও হ্রাস পায় না। মানুষের আত্মরক্ষার এই প্রবৃত্তি প্রাণীদের মতই, কিন্তু কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতি একটি প্রাণীকে পর্যাপ্ত অস্ত্র এবং বেঁচে থাকার এবং আত্মরক্ষার উপায় প্রদান করে; নিছক শারীরিক শক্তি এবং শক্তি, ধারালো দাঁত, লোহার মতো নখর, উড়ার জন্য ডানা, বিষাক্ত হুল, রঙের সুরক্ষার ছদ্মবেশ, সাঁতার কাটা বা লাফিয়ে লাফিয়ে বজ্রপাতের গতিতে দৌড়ানোর ক্ষমতা - প্রাণীরা জৈবিকভাবে এই সরঞ্জামগুলি তাদের অধিকার হিসাবে উত্তরাধিকারসূত্রে পায়। তুলনা মূলকভাবে মানুষ অসহায়। ধ্বংসাত্মক দুর্যোগের মুখে হিংস্র পাখি এবং পশু, এমনকি তার নিজস্ব প্রজাতির আক্রমণের ক্ষেত্রেও, মানুষকে আত্মরক্ষার জন্য হাতিয়ার আবিষ্কার করতে হয়। প্রাণীদের বিপরীতে, মানুষের ইতিহাস হল আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার এই ধরণের হাতিয়ারের বিকাশের ইতিহাস।

মানুষের এই অসহায়ত্ব এবং আত্মরক্ষার তার প্রবল প্রবৃত্তির বিপরীতে যা তাকে শক্তিশালী, দরকারী বা ক্ষতিকারক যেকোনো কিছুর সামনে মাথা নত করতে বাধ্য করেছিল। সে প্রকৃতির প্রকাশের সামনে প্রণাম করত, পশুদের পূজা করত, গাছপালাকে শ্রদ্ধা করত এই আশায় যে এটি করে সে বেঁচে থাকবে। এই মিথ্যা এবং কৃত্রিম আশ্রয়গুলিতে, সে বেঁচে থাকার জন্য তার প্রধান অবলম্বনের জন্য নিরর্থকভাবে অনুসন্ধান করেছিল।

গবেষণার জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হতে পারে যে যেখানেই এবং যখনই কোনও জাতি তাদের হাতিয়ার তৈরির প্রক্রিয়ায় উচ্চতর অগ্রগতি করেছে, তারা তাদের মিথ্যা দেবতাদের থেকে দূরে সরে গেছে এবং এমনকি ধর্মহীন হয়ে উঠেছে। তাদের অত্যন্ত উন্নত অস্ত্রশস্ত্র তাদের আত্মবিশ্বাস দেয়; তাদের চারপাশের বিশ্বজয় তাদেরকে এই ধরণের সমস্ত কুসংস্কার প্রত্যাখ্যান করতে প্ররোচিত করে। এমনকি একজন ব্যক্তির জীবনেও, একই রকম প্রক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। যৌবনে, শারীরিক শক্তি এবং

পরাক্রম তাকে সাহসের সাথে ধর্ম এবং কুসংস্কারের প্রতি উদাসীন রাখে, কিন্তু শারীরিক অঙ্গগুলির ক্ষয় হওয়ার সাথে সাথে সে আরও বেশি ধর্মীয়ভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে, যৌবনে যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তার সবকিছুতে সমর্থন খোঁজে। একইভাবে, যখন সে জীবনে সফল হয়, তখন সে খুব কমই এই মিথ্যা দেবতাদের সমর্থন খোঁজে; কিন্তু যখন সে ব্যর্থতার মুখোমুখি হয় এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য তার নিজস্ব উপায় অপর্যাপ্ত বলে মনে হয় তখন সে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধার সাথে তাদের সন্ধান করে।

কিন্তু বেঁচে থাকার সমস্যাটি কেবল শারীরিক বেঁচে থাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পশুদের মতো নয়, একজন মানুষের মানুষের স্তরে বেঁচে থাকার তাগিদ থাকে। একটি প্রাণী পেট ভরে খাওয়ার পরে সম্পূর্ণ তৃপ্ত বোধ করে এবং কেবল তখনই আবার কর্মে আসে যখন সে ক্ষুধা বা নিজের অস্তিত্বের জন্য হুমকির সম্মুখীন হয়। মানুষের ক্ষেত্রে এমনটি হয় না। যদি তাকে সারা জীবন অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য একটি নিরন্তর এবং হতাশাজনক সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়, তবে সে প্রকৃতপক্ষে তার দুর্দশায় এতটাই মগ্ন থাকে যে সে অন্য কোনও বিষয় নিয়ে ভাবতে পারে না। কিন্তু একবার অর্থনৈতিক এবং শারীরিক নিরাপত্তা অর্জন করার পরে, সে মানব স্তরে বেঁচে থাকার তাগিদের মুখোমুখি হয়। আজ সকল কল্যাণমূলক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই অনুন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি তীব্রতা এবং বিস্তৃত পরিসরে এই সমস্যার মুখোমুখি। তাদের বৈজ্ঞানিক শক্তি এবং সমৃদ্ধ অর্থনীতির কারণে, তাদের মনোযোগ অনিবার্যভাবে শারীরিক ব্যতীত অন্য কিছুর উপর নিবদ্ধ। অস্তিত্ববাদ এই গুরুতর সমস্যার তীব্র প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। চিন্তাবিদ এবং বিজ্ঞানীদের (বিশেষ করে তাদের বৃদ্ধ বয়সে) ধর্ম বা রহস্যবাদের প্রতি প্রবণতা মানব বেঁচে থাকার এই অনুসন্ধানের আরেকটি রূপ।

এটাই তথাকথিত "ধর্মের আকাঙ্ক্ষা"  এটি আদিম মানুষের প্রকৃতি-উপাসনা হতে পারে, অথবা আধুনিক চিন্তাবিদদের রহস্যবাদ হতে পারে। এবং এটিই ধর্মের নামে স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা প্রায়শই এবং এত সফলভাবে শোষিত তাড়না। যুগ যুগ ধরে, আম্বিয়াদের দ্বীন শোষকদের মুখোশ উন্মোচিত করেছে এবং মানুষের মনকে উঁচুতে তুলে ধরা মিথ্যা দেবতাদের চ্যালেঞ্জ করেছে। কোরআনে মূর্ত এই আওয়াজটি গতকালের আদ্যনের মতো আজ এবং আগামীকাল পালন করার জন্য নির্ধারিত।

কোরআন আত্ম-সংরক্ষণের প্রবৃত্তির দাবিগুলিকে স্বীকৃতি দেয়। তাই, এটি এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যা প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা দেয়। এটি ঘোষণা করে যে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে সক্ষম, যদি সে জীবনের স্থায়ী মূল্যবোধগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে, তবে তার মানব সত্তার বেঁচে থাকা নিশ্চিত; কারণ, তাহলে তার ব্যক্তিত্বের কোন মৃত্যু নেই। কোরআনে সংরক্ষিত স্থায়ী মূল্যবোধ সমূহ অপরিবর্তনীয় এবং সত্য, তাই বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য। তা মিথ্যা দেবতাদেরকে সত্য স্রষ্টা দিয়ে প্রতিস্থাপন করে এবং ধর্মের অর্থহীন কুসংস্কারগুলিকে যুক্তিসঙ্গত দৃঢ় বিশ্বাসের শক্তি দিয়ে

প্রতিস্থাপন করে। সংক্ষেপে, কোরআন শারীরিক এবং মানবিক উভয় স্তরেই আত্ম-সংরক্ষণের প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করে এবং এইভাবে মানুষকে ধর্মের শৃঙ্খল এবং কুসংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত করে।

এটাই ছিল আম্বিয়াগণের সর্বশেষ রাসূল- মুহাম্মদ (সা.) দ্বারা প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত দ্বীন।

দুর্ভাগ্যবশত, মুহাম্মদ (সা.) দ্বারা এই দ্বীন - অর্থাৎ ইসলামী সামাজিক ব্যবস্থা - প্রতিষ্ঠার খুব বেশি পরেই, ইসলামও পূর্ববর্তী যুগের মতো একই পরিণতির মুখোমুখি হয়েছিল। আল্লাহ কোরআনে ইসলামী দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করেছিলেন এবং রাসূল (সা.) মুসলমানদের কাছে কিতাব পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং তার উপর একটি সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরপরই, শোষণের শক্তিগুলি আবার তাদের কুৎসিত মাথা তুলতে শুরু করে। তারা পুঁজিবাদ দ্বারা টিকিয়ে রাখা বংশগত রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের প্রথম সাফল্য অর্জন করে। তারপর, তাদের নিজস্ব টিকে থাকা এবং সুসংহতকরণ নিশ্চিত করার জন্য, এই দুটি শক্তি ইসলামের দ্বীনকে একটি মাযহাবে বিকৃত করতে শুরু করে। এবং শীঘ্রই, তারা সফল হয়। প্রাচীন আম্বিয়াদের যুগের মতো, ইসলামও ধীরে ধীরে তার আত্মা এবং সারবস্তু একটি দ্বীন হিসাবে হারিয়ে ফেলে এবং একটি প্রাণহীন মাযহাবে অধঃপতিত হয়ে ধর্মমত এবং রীতিনীতির  আবদ্ধতায় আবদ্ধ। এই অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া এবং পূর্ববর্তী ইতিহাসের নজিরগুলির মধ্যে একমাত্র পার্থক্য ছিল যে ইসলামের কোড - কোরআন - তার আসল আকারে অক্ষত ছিল, যা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে, ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত।

এটি মনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সত্য। কারণ, মানবজাতির অন্য কোনও ধর্ম যদি তার আদি পবিত্রতাকে একটি দ্বীন হিসেবে ফিরিয়ে আনতে চায়, তবে তার নিজস্ব নবীর কাছে অবতীর্ণ মূল ওয়াদা অনুপস্থিতিতে তারা এই কাজটি অসম্ভব বলে মনে করবে। একমাত্র মুসলমানরাই ইসলামকে দ্বীন হিসেবে তার আসল আকারে পুনরুদ্ধার করার আশা করতে পারে, কারণ ইসলামী দ্বীনের সম্পূর্ণ কোড কোরআনে নিহিত এবং প্রায় চৌদ্দ শতাব্দী আগে মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল ঠিক সেই একই আকারে সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত।

কোরআন মানুষকে ধ্বংসের ভয়ঙ্কর শক্তি দ্বারা ভীত না হওয়ার এবং সম্ভাবনাকে অন্ধকার এবং ভয়ঙ্কর মনে করলেও হতাশ না হওয়ার বা নিরাশ না হওয়ার আহ্বান জানায়। এটি তাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি এবং এর দ্বারা নির্ধারিত সামাজিক ব্যবস্থার উপর বিশ্বাস রাখতে এবং এর ন্যায্য বিচার করতে উৎসাহিত করে। যদি তারা আন্তরিকভাবে তা করে, তবে এটি তাদের আশ্বস্ত করে যে তারা শীঘ্রই ক্ষয় ও ধ্বংসের সমস্ত প্রতিকূল শক্তিকে পরাজিত করবে এবং তাদের বর্তমান দুর্দশার গভীরতা থেকে সাফল্য ও গৌরবের উচ্চতায় উঠে আসবে।

এবং কোরআন কর্তৃক নির্ধারিত সামাজিক ব্যবস্থার সারমর্ম হল: প্রকৃতির শক্তিগুলিকে দমন করা উচিত এবং বিজয়ের লাভগুলি আল্লাহর নাযিলকৃত গ্রন্থে নিহিত চিরন্তন মূল্যবোধ অনুসারে বৃহত্তর মানবজাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য ব্যবহার করা উচিত: কারণ, কেবলমাত্র সেই জীবনধারাই টিকে থাকতে পারে যা সমগ্র মানবজাতির জন্য উপকারী (কোরআন ১৩: ১৭)।

আমি আমার জীবনের সেরা অংশটি বর্তমান সময়ে মানবতাকে ঘিরে থাকা সমস্যা, অসুবিধা এবং বিপদের সমাধানের জন্য কোরআন যে সমাধান প্রদান করে তা অধ্যয়নের জন্য ব্যয় করেছি। আমি প্রায় এক চতুর্থাংশ শতাব্দী ধরে এই বিষয়ে লিখছি এবং আমার লেখাগুলি পৃথিবীর সমস্ত অংশে পৌঁছেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এগুলি কেবল উর্দু ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। এখন আমার কাছে ইংরেজি মাধ্যমে সমসাময়িক সমস্যার কোরআনের সমাধান বৃহত্তর শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপন করার তাগিদ অনুভব করা হয়েছে।

আমার প্রধান উদ্দেশ্য হল এটি দেখানো যে মানুষের মুখোমুখি আপাতদৃষ্টিতে অমীমাংসিত সমস্যাগুলির দ্বারা অভিভূত হওয়ার বা নিজেকে অসহায় ও ঘৃণ্য বলে মনে করার এবং হতাশায় আত্মসমর্পণ করার কোনও কারণ নেই। এখনও এমন একটি উৎস আছে- যার দিকে সে (আলো এবং আশার দিকে) ফিরে যেতে পারে, এবং যদি সে আলো অনুসরণ করে, তবে সন্দেহ নেই যে সে তার কাছে অমীমাংসিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে বিবর্তনের আরও ধাপ অতিক্রম করতে সক্ষম হবে।

এই প্রচেষ্টায় আমি যে গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি তা হল কোরআনের শব্দ এবং দ্বীন সম্পর্কিত বাক্যাংশের ইংরেজি অনুবাদ। আরবি শব্দের জন্য প্রচলিত ইংরেজি সমার্থক শব্দগুলির বেশিরভাগই মাযহাবের সাথে সম্পর্কিত, এবং যদি আমি সেগুলি ব্যবহার করি, তাহলে দ্বীনকে মাযহাব থেকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং কাজের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। বলা যেতে পারে যে আমি ইংরেজি শব্দভাণ্ডার থেকে উপযুক্ত সমার্থক শব্দ বেছে নিতে পারতাম; কিন্তু বাস্তবে এটা অসম্ভব, কারণ ইংরেজি শব্দভাণ্ডারে এমন শব্দ এবং বাক্যাংশ নেই যা প্রাসঙ্গিক কোরআনের পরিভাষার সঠিক অর্থ প্রকাশ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, "দ্বীন" শব্দটিই ধরুন। ইংরেজি ভাষায় এর কোন সমার্থক শব্দ নেই। ঠিক এই কারণেই অন্য ভাষায় বিশ্বস্ততার সাথে কোরআন অনুবাদ করা কার্যত অসম্ভব। আমি এখানে সুপরিচিত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ অধ্যাপক এইচ.এ.আর. গিবকে উদ্ধৃত করছি, যিনি তার বিখ্যাত বই "মডার্ন ট্রেন্ডস ইন ইসলাম" (পৃষ্ঠা ৪) এ বলেছেন: কোরান মূলত অনুবাদযোগ্য নয়, ঠিক যেমন মহান কবিতা অনুবাদযোগ্য নয়। দ্রষ্টা কখনও সাধারণ ভাষায় তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে পারেন না। তিনি কেবল ভাঙা চিত্রের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন, যার প্রতিটি প্রতিচ্ছবি, প্রতিটি সূক্ষ্মতা এবং বিষয় পাঠকের উপর প্রভাব ফেলার আগে দীর্ঘ এবং আন্তরিকভাবে অধ্যয়ন করতে হয় - চিত্রগুলিও, যেখানে শব্দের সঙ্গীত

বার্তা গ্রহণের জন্য শ্রোতার মনকে সংযত করতে একটি অনির্বচনীয় ভূমিকা পালন করে। অন্য কথায় এগুলোকে ব্যাখ্যা করা কেবল তাদের বিকৃত করা, সূক্ষ্ম সোনার পরিবর্তে মাটি ব্যবহার করা, স্বজ্ঞাত উপলব্ধির ডানাযুক্ত উড়ানের পরিবর্তে পথচারী বুদ্ধিমত্তার ঝাঁকুনি। . . . কোরানের একটি ইংরেজি অনুবাদে আরবি ভাষার বহুমুখী এবং রত্ন-সদৃশ বাক্যাংশের জন্য সুনির্দিষ্ট এবং প্রায়শই ইচ্ছামত শব্দ ব্যবহার করা উচিত; এবং এটি যত বেশি আক্ষরিক হবে, ততই ধূসর এবং বর্ণহীন হবে। (কোরআন ৫০: ৪৩)

"নিশ্চয়ই আমরা জীবন ও মৃত্যু দান করি এবং আমাদেরই যাত্রা" এর মতো সহজ বাক্যেও, মূলের ছয়টি শব্দে পাঁচবার পুনরাবৃত্তি করা শক্তি ইংরেজিতে (অথবা সম্ভবত অন্য কোনও ভাষায়) উপস্থাপন করা অসম্ভব।

এই গুরুতর অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে, আমার জন্য একমাত্র বিকল্প ছিল মূল কোরানের শব্দ এবং বাক্যাংশগুলি ধরে রাখা এবং একটি শব্দকোষে তাদের অর্থ ব্যাখ্যা করা। এই

অর্থগুলি আমার দ্বারা "উদ্ভাবিত" হয়নি। এগুলি ব্যুৎপত্তিগত বিবেচনা এবং প্রাসঙ্গিক শব্দ এবং বাক্যাংশের মূলের মূল অর্থের উপর ভিত্তি করে তৈরি; এগুলি প্রামাণিক আরবি অভিধান এবং যে কোরআনের আয়াতগুলিতে এগুলি এসেছে তার দ্বারা সমর্থিত। আমি এই ধরণের কোরআনের একটি বিস্তৃত অভিধানও সংকলন করেছি এবং এটি ইতিমধ্যে চারটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এবং এই ভিত্তিতে, আমি একটি পৃথক খণ্ডে কোরআনের অর্থ ব্যাখ্যা করেছি। (এই দুটি রচনা উর্দুতে, এবং আমি প্রস্তাব করছি যে, অন্তত দ্বিতীয়টি, যার নাম মাফহুম-উল-কোরআন, ইংরেজিতে অনুবাদ করা হোক। প্রকৃতপক্ষে এই রচনাটি ইতিমধ্যেই সমাপ্তির কাছাকাছি।)

দ্বীন এবং মাযহাবের তুলনামূলক অধ্যয়ন থেকে দেখা যাবে যে উভয়ের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে; উদাহরণস্বরূপ, স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস, ঐশ্বরিক নির্দেশনা এবং পরকালের জীবনে। তবে এই মিল খুব গভীর বা যথেষ্ট বিস্তৃত নয়; কারণ যদি কেউ এই বাক্যাংশগুলির প্রকৃত অর্থ নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে দ্বীন এবং মাযহাবের মধ্যে এই মিল কেবল ভাসাভাসা। মূলত, বিশ্বাসের এই ধারাগুলিরও দ্বীন এবং মাযহাবের মধ্যে বিভিন্ন অর্থ এবং অর্থ রয়েছে; বরং, এই অর্থগুলি অনেক দিক থেকে পারস্পরিকভাবে পরস্পরবিরোধী।

এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে স্রষ্টা এবং ধর্মের ধারণার একটি ঐতিহাসিক আলোচনা রয়েছে। এটিকে দ্বীনের আলোচনা হিসেবে নেওয়া উচিত নয়; অথবা এটি অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামের তুলনা

করা এবং তাদের উপর এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা নয়। এই ভূমিকায় পূর্বে করা পর্যবেক্ষণ থেকে, এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে ইসলাম এবং বিদ্যমান ধর্মগুলির মধ্যে তুলনা করা প্রশ্নাতীত। ইসলাম একটি দ্বীন, অথবা জীবনধারা, যা কেবল অন্য জীবনধারার সাথে তুলনা করা যেতে পারে, কোনও ধর্মের সাথে নয়, কারণ এই ধর্মের পৃথিবীতে মানব জীবনের সমস্যার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে, কোরআন কেন ইসলামকে অন্য কোনও ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উপস্থাপন করে না, তা এই কারণেই ব্যাখ্যা করে যে, এই দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানবসৃষ্ট ব্যবস্থার উপর বিজয়ী হবে (৯:৩৩)। অতএব, আমি আপনাকে অনুরোধ করব, দয়ালু পাঠক, এই গ্রন্থটিকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করবেন না; এটি কেবল একটি দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করা উচিত এবং তা হল: এটি যে জীবনধারা ব্যাখ্যা করে তা মানবজাতি বর্তমানে যে গুরুতর সমস্যা এবং সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তার সমাধান প্রদান করে কিনা।

আজ, সমস্ত চিন্তাশীল মানুষ বস্তুবাদ এবং ধর্ম (মাযহাব) উভয়ের প্রতিই বিতৃষ্ণার্ত, কারণ এগুলির কোনওটিই মানবতার বর্তমান দুর্দশা থেকে মুক্তির উপায় প্রদান করে না। একমাত্র সমাধান হল পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে বর্ণিত দ্বীনের মাধ্যমে। এই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত। শুধুমাত্র কোরআনের আয়াতে, কারণ, যেমনটি ইতিমধ্যেই সকল নাযিলকৃত আদি গ্রন্থের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা ঠিক একই আকারে অক্ষত রয়ে গেছে যেভাবে এটি মুহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল যিনি মানবজাতির কাছে এটি পৌঁছে দিয়েছিলেন।

অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যুগের সমস্ত সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর, এবং পুঁজিবাদ বা কমিউনিজম কোনটিই এর পর্যাপ্ত এবং কার্যকর সমাধান প্রদান করে না। ইসলামী আমাদের এই ক্ষেত্রেও মুক্তির পথ দেখায়। তবে বর্তমান গ্রন্থে ইসলামের এই দিকটি কেবল আকস্মিকভাবে স্পর্শ করা হয়েছে; এটি অন্য একটি গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যা এখন প্রেসের জন্য প্রস্তুত।

ঘটনাক্রমে, পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে, পাঠক অসংখ্য উদ্ধৃতি পাবেন, বিশেষ করে পশ্চিমা লেখকদের কাছ থেকে। আমি শুরুতেই স্পষ্ট করে বলতে চাই যে এই উদ্ধৃতিগুলি কোরআনের কোনও নীতি বা বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়নি। কোরআনের সমস্ত বিবৃতি এবং দাবি স্বতঃস্ফূর্ত সত্য এবং এর জন্য কোনও বাহ্যিক সমর্থনের প্রয়োজন নেই।

উদ্ধৃতিগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তৈরি। প্রায় চৌদ্দ শতাব্দী আগে কোরআন একটি নতুন সামাজিক ব্যবস্থার রূপরেখা উপস্থাপন করেছিল। তখন মানুষ কেবল এর সাথে দ্বিমত পোষণই করেনি বরং এর বিরোধিতাও করেছিল।

কিন্তু আজকের সময়ের চাহিদা এবং মানবজাতি যে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছে তা মানবতাকে ধীরে ধীরে ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থার কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন অমুসলিম চিন্তাবিদ, যারা কিছুদিন আগে পর্যন্ত, কোন ঐশ্বরিক নির্দেশনা ছাড়াই মানুষের দ্বারা প্রণীত বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার একটি বা অন্যটির উপর তাদের সমস্ত আশা স্থাপন করতেন, তারা এখন তাদের কাছ থেকে হতাশ হতে শুরু করেছেন। এবং মানবজাতির জন্য শান্তি, ন্যায়বিচার এবং সুখ নিশ্চিত করার জন্য তারা এখন যে নতুন পরিকল্পনাগুলি বিবেচনা করছেন, তার রূপরেখা অনেকটা বহু বছর আগে কোরআন দ্বারা নির্ধারিত সামাজিক ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই সত্যটি ব্যাখ্যা করার জন্যই আমি কিছু বিশিষ্ট পশ্চিমা চিন্তাবিদদের লেখা থেকে প্রায়শই উদ্ধৃত করেছি। মানব বুদ্ধি ধীরে ধীরে কোরআনে বর্ণিত স্থায়ী মূল্যবোধের বোধগম্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শোষণের শক্তি সত্ত্বেও, চিরন্তন সত্য অবশেষে জয়লাভ করতে বাধ্য, মানবজাতির মুক্তির জন্য যত তাড়াতাড়ি তা হবে ততই তা মঙ্গলজনক হবে।

### *তথ্যসূত্র*


১. জে.ডব্লিউ.টি. ম্যাসন, ক্রিয়েটিভ ফ্রিডম, পৃষ্ঠা ১৮৩-৪।

২. আলবার্ট আইনস্টাইন, আউট অফ মাই লেটার ইয়ারস, পৃষ্ঠা ১৫২,

৩ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫, ১১৪।

৪. ধর্মীয় জীবনযাপন এবং বিশ্ব বিশ্বাস পৃষ্ঠা ২০২।

৫. বার্ট্রান্ড রাসেল, কেন আমি খ্রিস্টান নই, পৃষ্ঠা ৩৭।

# অধ্যায় এক : ধর্ম কী?

## ১. ধর্মের তথাকথিত আহ্বান

ধর্ম মানুষের মধ্যে আত্ম-সচেতনতার উত্থানের মতোই প্রাচীন, কিন্তু এর উৎপত্তি, মানুষের মতোই, অস্পষ্টতায় ঢাকা। মানুষ সম্ভবত প্রায় দশ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে বাস করেছে। এই সময়ের বেশিরভাগ সময় ধরে, তার কোনও সভ্যতা ছিল না এবং কোনও টেকসই উপাদানের উপর তার ছাপ ফেলেনি। আমরা তার সম্পর্কে যা জানি তা তার জীবাশ্ম ধ্বংসাবশেষের উপর ভিত্তি করে, এবং যদিও তারা আমাদের তার শারীরিক আকৃতি এবং গঠন সম্পর্কে অনেক কিছু বলে, তারা তার মধ্যে থাকা মানুষ সম্পর্কে খুব কমই বলে। মানুষ যখন পাথর এবং ধাতুর উপর কাজ শুরু করে এবং নিজের জন্য হাতিয়ার তৈরি করতে শুরু করে, যা সে এখন পর্যন্ত প্রকৃতি থেকে তৈরি করেছিল, তখন সভ্যতার কিছু প্রাথমিক ধারণা অর্জন করে। তবে তার নিদর্শনগুলির ধ্বংসাবশেষ তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং বিশ্বাসের উপর মূল্যবান আলোকপাত করে।

ধর্মের সন্ধান পাওয়া যায় মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে। আদিম মানুষের গুহা, যেখানে মৃতদেহ খাদ্য ও অস্ত্রের ব্যবস্থা সহকারে রাখা হত, সেগুলি এমন বিশ্বাস এবং অনুশীলনের ইঙ্গিত দেয় যা স্পষ্টতই ধর্মীয় চরিত্রের। মনে হয় মানুষ আত্ম-সচেতনতার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা মানসিক বিকাশের পর্যায়ে পৌঁছানোর সাথে সাথে এবং সভ্যতার পথে যাত্রা শুরু করার সাথে সাথেই তার চারপাশের জগতের প্রতি তার নিঃশ্বাসহীন বিস্ময় তার উৎপত্তি এবং ভাগ্য এবং বিশ্ব সৃষ্টিকারী এবং এটিকে টিকিয়ে রাখার শক্তি সম্পর্কে অনুমানের দিকে ঠেলে দেয়। তার চিন্তাভাবনা পৌরাণিক কাহিনী তৈরির রূপ নেয় এবং তার চিন্তাভাবনার হাতিয়ারগুলি ধারণা নয় বরং প্রতীক ছিল। তিনি তার চারপাশের জগতে অস্পষ্ট কিন্তু তীব্রভাবে একটি অসীম শক্তি কাজ করছে বলে অনুভব করেছিলেন।

এই অস্পষ্ট-সংবেদনশীল শক্তি তার মধ্যে ভয় এবং শ্রদ্ধা বা উপাসনার প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলে। উপাসনার তাড়না সর্বদাই ছিল বলে মনে হয়, কিন্তু মানুষ কেবল তার নিজের অসহায়ত্বের কারণে যাকে সে ভাল এবং শক্তিশালী বলে মনে করে তার উপাসনা করতে পারে। আদিম মানুষ ধীরে ধীরে এবং বেদনাদায়কভাবে ধর্মের ধারণার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সে তার স্বল্প সম্পদ দিয়ে এমন একটি বস্তুর সন্ধান করছিল যাকে সে সন্তুষ্ট করতে, শ্রদ্ধা করতে এবং উপাসনা করতে পারে। নিঃসন্দেহে, সে অশোধিত বস্তু বা সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনার উপাসনা করত, কিন্তু আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তার কাছে তারা কেবল মহাবিশ্বে কর্মরত সর্বোচ্চ শক্তির প্রতীক ছিল। উপাসনা একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্মীয় কার্যকলাপ এবং নৃতাত্ত্বিকরা প্রমাণ করেছেন যে আদিম মানুষ কিছু না কিছু উপাসনা করত। এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে

আদিম উপজাতিরা, যারা এখনও জীবিত, তারা বিশ্বাসকে লালন করে এবং এমন অভ্যাসে লিপ্ত হয় যা নিঃসন্দেহে চরিত্রগতভাবে ধর্মীয় কারণ তারা কোনও দেবতা বা দেবতা এবং মৃত্যুর পরের জীবনের কথা উল্লেখ করে।

এই আবিষ্কারের আলোকে কেউ নিরাপদে নিশ্চিত করতে পারে যে ধর্ম একটি সর্বজনীন ঘটনা (যে সহজ কারণে, ভূমিকায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আত্ম-সংরক্ষণের প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত)। প্লুটার্ক, যিনি খ্রিস্টীয় যুগের প্রথম শতাব্দীতে তাঁর সময়ের জগৎ সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান নিয়ে বিকশিত হয়েছিলেন, তিনি নিশ্চিত করেছেন:

পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ানোর সময়, আপনি প্রাচীর ছাড়া, বিজ্ঞান ছাড়া, শাসক ছাড়া, প্রাসাদ ছাড়া, ধনসম্পদ ছাড়া, অর্থ ছাড়া, জিমনেসিয়াম বা থিয়েটার ছাড়াই এমন শহর খুঁজে পাবেন, কিন্তু দেবতাদের মন্দির ছাড়া, প্রার্থনা, শপথ এবং ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়াই এমন একটি শহর খুঁজে পাবেন, এমন একটি শহর যা কোনও মানুষ এখনও দেখেনি এবং কখনও দেখতে পাবে না।[১]

আধুনিক যুগে, ধর্ম বিভিন্ন দিক থেকে দৃশ্যমান - কখনও কখনও এটিকে একটি প্রাকৃতিক ঘটনা হিসাবে দেখা হয় এবং তাই এটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে। কিন্তু, ব্যক্তির অভিজ্ঞতা হিসাবে, এটি মনোবিজ্ঞানের আওতার মধ্যে পড়ে, অন্যদিকে, একটি সামাজিক সত্য হিসাবে, এটি সমাজবিজ্ঞানীর উদ্বেগ। তবে, সমাজবিজ্ঞানী কেবল সমাজে একটি সমন্বিত শক্তি হিসাবে ধর্মের ভূমিকায় আগ্রহী। মানব ইতিহাসে ধর্মের ভূমিকাও উপেক্ষা করা হয়নি: এটি অধ্যয়ন করা হয়েছে। ধর্মের প্রকৃতি বোঝার প্রয়াসে, আমরা প্রথমে বিভিন্ন বিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদদের দ্বারা প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলি বিবেচনা করব যারা এই বিষয়ের উপর বিশেষ অধ্যয়ন করেছেন।

## ২. ধর্মের সংজ্ঞা

ধর্মের ছাত্র ধর্মের বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্য দেখে যতটা বিভ্রান্ত হন, প্রতিটি ধর্মের জটিলতা দেখে ততটাই বিভ্রান্ত হন। তিনি বিশ্বাস এবং অনুশীলনের জটিল এবং ভিন্নধর্মী ভর থেকে অপরিহার্য উপাদানটি বের করা প্রায় অসম্ভব বলে মনে করেন যার মধ্যে এটি নিহিত। এই পরিস্থিতিতে, তার জন্য এমন কিছু দিক নির্বাচন করা স্বাভাবিক যাকে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচনা করেন এবং এই নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেন। এটি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ধর্মের এত সংজ্ঞা থাকার মূল কারণ; কিন্তু তাদের কোনওটিই সমগ্র ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করে না বা সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার দাবি করে না। প্রকৃতপক্ষে, এই ক্ষেত্রের প্রতিটি গবেষক তার নিজস্ব সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং কেউ কেউ একাধিক প্রস্তাব করেছেন। আশ্চর্যজনকভাবে, তাদের মধ্যে কিছু এমনকি স্ববিরোধীও। কিছু পণ্ডিত মনে করেন যে

ধর্মের জন্য কিছু মতবাদ অপরিহার্য; অন্যরা বিশ্বাস করেন যে ধর্ম কোনও বিশ্বাস ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে আবেগগত মনোভাব হিসাবে বিদ্যমান থাকতে পারে। আবার, কারও কারও কাছে, স্রষ্টা বিশ্বাস হল ধর্মের প্রাণ - কিন্তু অন্যরা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বৌদ্ধধর্ম এবং অন্যান্য নাস্তিক ধর্মের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে। যাইহোক, আসুন আমরা ধর্মের কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংজ্ঞা পরীক্ষা করি, আশা করি আমরা তাদের সকলের মধ্যে এমন কিছু সাধারণ উপাদান খুঁজে পাব যা একটি বিস্তৃত সংজ্ঞার সূত্র হিসেবে কাজ করে:ধর্ম হল (ব্যক্তিগতভাবে বিবেচিত) ঐশ্বরিক আদেশ হিসাবে সমস্ত কর্তব্যের স্বীকৃতি। (কান্ট)

ধর্ম হল সমস্ত ব্যক্তিগতকে সমগ্রের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা, সীমাবদ্ধ সবকিছুকে অসীমের প্রতিনিধিত্ব হিসাবে গ্রহণ করা (শ্লেইরমাচার)। যা সমস্ত ধর্মের অন্তর্নিহিত প্রবণতা প্রকাশ করে তা হল মূল্যবোধ সংরক্ষণের স্বতঃসিদ্ধ (হফডিং)।

উইলিয়াম জেমস ধর্মকে "একান্তে ব্যক্তিদের অনুভূতি, কাজ এবং অভিজ্ঞতা, যতদূর তারা নিজেদেরকে ঐশ্বরিক বলে মনে করতে পারে তার সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করে"। ক্যালভার্টন ধর্ম সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন, "যাদু এবং ধর্ম", তিনি নিশ্চিত করেন, "বিবর্তিত হয়েছে (ক) এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে (মানুষ) বিশ্বাস করে যে সে (তার পরিবেশের উপর) ক্ষমতা অর্জন করতে এবং মহাবিশ্বকে তার ইচ্ছার কাছে নত করতে সক্ষম"।

অধ্যাপক হোয়াইটহেড ধর্মকে "ব্যক্তি তার নিজের একাকীত্বের সাথে যা করে" হিসাবে উল্লেখ করেছেন, [২] এবং অন্য জায়গায় এটিকে "অভ্যন্তরীণ অংশগুলিকে পরিষ্কার করে বিশ্বাসের শক্তি" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। [৩] ধর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে হোয়াইটহেডের বিবেচিত মতামত তার "বিজ্ঞান এবং আধুনিক বিশ্ব" বইয়ে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে আরও সম্পূর্ণ এবং স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে: ধর্ম হল এমন কিছুর দৃষ্টিভঙ্গি যা তাৎক্ষণিক জিনিসের প্রবাহমান প্রবাহের বাইরে, পিছনে এবং ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে; এমন কিছু যা বাস্তব, এবং বাস্তবায়িত হওয়ার অপেক্ষায়; এমন কিছু যা একটি দূরবর্তী সম্ভাবনা, এবং তবুও বর্তমান তথ্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; এমন কিছু যা যা চলে যায় তার অর্থ দেয়, এবং তবুও আশঙ্কা এড়িয়ে যায়; এমন কিছু যার দখল চূড়ান্ত মঙ্গল, এবং তবুও সমস্ত নাগালের বাইরে; এমন কিছু যা চূড়ান্ত আদর্শ এবং আশাহীন অনুসন্ধান।[৪]

ধর্মের বিভিন্ন সংজ্ঞা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক জি. গ্যালোওয়ে বলেন, "যখন আমরা ধর্মীয় চেতনার মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলি এবং সেগুলি যেভাবে কাজ করে তা মনে রাখি, তখন ধর্মের কিছু সংজ্ঞা তাদের অপ্রতুলতা এবং একপেশেতা দ্বারা আমাদের আঘাত করে। আমরা দেখতে পাই যে, সম্ভবত,

সেগুলি ধর্মের নির্দিষ্ট পর্যায়ে প্রযোজ্য কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে নয়, অথবা তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বাদ দেয়।" যাইহোক, এত মহান পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় সাফল্যের অভাবের কারণে অবিচলিত হয়ে, গ্যালোওয়ে তার নিজস্ব সংজ্ঞাটি এগিয়ে নিয়েছেন। তিনি ধর্মকে "নিজের চেয়েও বেশি শক্তিতে মানুষের বিশ্বাস" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যার মাধ্যমে সে মানসিক চাহিদা পূরণ করতে এবং জীবনের স্থিতিশীলতা অর্জন করতে চায়, এবং যা সে উপাসনা ও সেবার মাধ্যমে প্রকাশ করে।"[৫]

এ.সি. ক্যাম্পবেল, তার আলোকিত গ্রন্থ "স্বার্থ ও স্রষ্টাত্ব সম্পর্কে" -এ, ধর্মের সংজ্ঞার সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য একটি অধ্যায় উৎসর্গ করেছেন। তিনিও তাঁর নিজস্ব একটি সংজ্ঞা পেশ করেছেন যা বিবেচনার যোগ্য: ধর্মকে মনের এমন একটি অবস্থা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যার মধ্যে রয়েছে অতিপ্রাকৃত সত্তা বা অতীন্দ্রিয় শক্তি এবং মূল্যে সমৃদ্ধ সত্তার বাস্তবতায় বিশ্বাস, এবং এর সাথে এর সাথে অন্তর্নিহিতভাবে উপযুক্ত উপাসনার জটিল আবেগগত মনোভাব।[৬].

লিউবা তার "অ্যা সাইকোলজিক্যাল স্টাডি অফ রিলিজিয়ন" বইতে ধর্মের কমপক্ষে আটচল্লিশটি ভিন্ন সংজ্ঞা তালিকাভুক্ত করেছেন, প্রতিটি খ্যাতিমান পণ্ডিত দ্বারা প্রদত্ত। এমনকি এটি একটি সম্পূর্ণ তালিকা হতে অনেক দূরে যেমন ডুকাস তার "অ্যা ফিলোসফিক্যাল স্ক্রুটিনি অফ রিলিজিয়ন" বইতে সাতশটি অন্যান্য সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন।[৭]

বিভ্রান্তি আরও বাড়ানোর জন্য, যেমনটি আগে দেখা গেছে, অনেক সংজ্ঞা একে অপরের সাথে বিরোধিতা করে। যেমন অধ্যাপক এইচ.জে. প্যাটন উল্লেখ করেছেন, "ধর্মের যেকোনো গুরুতর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, সর্বদা আরেকটি, সমানভাবে গুরুতর, খুঁজে পাওয়া সম্ভব, যা তার ঠিক বিপরীত বলে মনে হয়।"[৮].

উসপেনস্কি, বিরোধপূর্ণ সংজ্ঞার ভয়াবহ বিন্যাস দেখে, ধর্মের আপেক্ষিক তত্ত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তাঁর মতে, "ধর্ম একজন মানুষের সত্তার স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; এবং একজন মানুষের ধর্ম অন্য একজন মানুষের জন্য মোটেও উপযুক্ত নাও হতে পারে।"[৯]

তাঁর সংজ্ঞা স্পষ্টতই অপর্যাপ্ত এবং অসন্তোষজনক কারণ এটি ধর্ম যে বাস্তবতাকে নির্দেশ করে তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে এবং এটিকে যেকোনো ধরণের বস্তুনিষ্ঠতা অস্বীকার করে।

আমরা এমন একটি উপাদান অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছি যা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞার সাথে সাধারণ। যদি সেই উপাদানটি পাওয়া যায়, তবে তা ধর্মের মূল গঠন করবে এবং তাই প্রতিটি ধর্মে কেন্দ্রীয় স্থান দখল করবে বলে আশা করা যেতে পারে। যে উপাদানটি আমরা বেশিরভাগ সংজ্ঞার সাথে সাধারণ বলে মনে

করি, যদিও সকলের সাথে নয়, তা হল একটি অতীন্দ্রিয় মহাজাগতিক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস যার সাথে "ঐশ্বরিক" শব্দটি সাধারণত প্রয়োগ করা হয়। ঐশ্বরিকতাকেও একটি একক সত্তা এবং একই সাথে অনেক হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে; তবে বহুত্ববাদী ধারণার চেয়ে অদ্বৈতবাদী ধারণাটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। যদিও ধর্মীয় লোকেরা সর্বোচ্চ শক্তির অস্তিত্ব নিয়ে খুব কমই প্রশ্ন তোলেন, তার প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের ধারণাগুলি অস্পষ্ট, যতটা অনির্দিষ্ট ধর্মের সংজ্ঞা যতই বৈচিত্র্যময় হোক না কেন, ধর্মের প্রতিটি মহান লেখকই স্রষ্টাকে তার নিজস্ব উপায়ে কল্পনা করেছেন বলে মনে হয়। এখানে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। কান্ট স্রষ্টাকে "নৈতিক আইন দাতা" হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং উইলিয়াম জেমস তাঁকে "মহাবিশ্বের উচ্চতর অংশ" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ম্যাথিউ আর্নল্ড বিশ্বাস করেন যে স্রষ্টা হলেন "ধার্মিকতার জন্য শক্তি"। [১০]

স্যার জেমস জিনসের মতে, তিনি "গণিতবিদদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ"। বার্গসন তার পূর্ববর্তী একটি রচনায় তাঁকে সৃজনশীল শক্তির সাথে চিহ্নিত করেছিলেন। পরবর্তীতে, যখন তার চিন্তাভাবনা রহস্যময় মোড় নেয়, তখন তিনি স্রষ্টাকে "প্রেম এবং প্রিয়" হিসেবে উল্লেখ করেন। [১১]

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে ধর্মের মতো স্রষ্টারও অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। তবে জোর দেওয়ার বিষয় হল যে স্রষ্টা অসীম এবং তাই, আমাদের সীমাবদ্ধ বোধগম্যতা কখনই তাঁর প্রকৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। যারা স্রষ্টাকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের কল্পনাকে মুক্ত রাখেন এবং বাস্তবতার সংস্পর্শে আসার বাইরে বন্য জল্পনা-কল্পনায় লিপ্ত হন। অন্যরা, এমন কিছু খুঁজছেন যা তাদের মন দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারে, স্রষ্টাকে প্রকৃতির সাথে সনাক্ত করে। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে স্রষ্টা অতীন্দ্রিয়। তাঁকে অনুভব করা যেতে পারে কিন্তু উপলব্ধি করা যায় না। স্রষ্টার উপলব্ধি রহস্যময় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে হওয়ার কথা, *কিন্তু মহান রহস্যবাদীরা যেমন সাক্ষ্য দেন, এই ধারণা কেবল খণ্ডিত, অধরা এবং লোভনীয়। অতএব, স্রষ্টার একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা সম্ভব নয়। তবুও, স্রষ্টার কিছু ধারণা তৈরি করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু ধর্ম এতে সন্তুষ্ট নয়। এর জন্য স্রষ্টা সম্পর্কে আরও পর্যাপ্ত ধারণা প্রয়োজন। অতএব, আমাদের এই প্রশ্নটি গ্রহণ করা উচিত যে স্রষ্টার এই ধারণাটি কীভাবে তৈরি করা যেতে পারে।

### ৩. স্রষ্টার ধারণা

স্রষ্টো বিশ্বাস ধর্মের প্রাণ। স্রষ্টা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি স্বাভাবিকভাবেই ধর্মের সমর্থক এবং বিরোধীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। স্রষ্টা কী, এবং আমরা তাঁকে কীভাবে জানি, এমন প্রশ্ন যা ধর্মের কোনও গুরুতর শিক্ষার্থী এড়িয়ে যেতে পারে না। এই মৌলিক প্রশ্নগুলির পর্যাপ্ত এবং সন্তোষজনক উত্তর আমাদের স্রষ্টার প্রকৃতি বুঝতে এবং ধর্মের মূল্য মূল্যায়ন করতে সক্ষম করবে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা দেখতে পাই যে

এই প্রশ্নগুলিও ভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী উত্তর পেয়েছে। এটা মনে রাখা আকর্ষণীয় যে, প্রশ্নগুলিও প্রতিটি লেখকের দৃষ্টিকোণ অনুসারে তৈরি করা হয়েছে। যারা ইতিবাচকতাবাদীদের নিয়োগ করেন

*এই তথাকথিত "অভিজ্ঞতা"-এর প্রকৃতি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। পন্থাটি "মানুষের মনে স্রষ্টার ধারণা কীভাবে উত্থিত হয়েছিল?" আকারে প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন গ্রান্ট অ্যালেন এবং আই. জি. ফ্রেজার এই লেখকদের ন্যায্য প্রতিনিধি। তাদের উত্তরটি এভাবে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে।

আদিম মানুষ প্রকৃতির হিংস্র শক্তির প্রতি অবিরাম ভয়ে বাস করত যা তাকে শারীরিক আঘাত এমনকি মৃত্যুরও হুমকি দিত। ঝড়, বজ্রপাত, ভূমিকম্প এবং প্রকৃতির অন্যান্য বিপর্যয় তাকে ভীত ও আচ্ছন্ন করে ফেলত, এবং যখন তার মনে সর্বপ্রাণবাদী প্রবণতা আধিপত্য বিস্তার করত, তখন সে প্রকৃতির শক্তিগুলিকে মূর্ত করে তুলেছিল এবং তাদের পূজা ও বলিদানের মাধ্যমে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করেছিল। এভাবে সে পৃথিবীকে দেবতাদের দ্বারা জনবহুল করে তুলেছিল। পরবর্তীতে, মানুষের মন বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে, সে তাদের প্রতি তার পুরানো আসক্তিকে যুক্তিসঙ্গত করার প্রয়োজন অনুভব করেছিল। ঐক্যের তাড়না তাকে দেবতাদের বহুবিধতাকে এক সর্বোচ্চ দেবতার কাছে হ্রাস করতে পরিচালিত করেছিল। তিনি পরম সত্তার একটি বিমূর্ত ধারণা তৈরি করেছিলেন এবং তারপর অবচেতন আবেগগত তাড়না দ্বারা পরিচালিত হয়ে সেই ধারণাকে বস্তুনিষ্ঠ করেছিলেন। এইভাবে বিবর্তিত স্রষ্টা হলেন একজন ব্যক্তিত্বপূর্ণ স্রষ্টা। শিনের ভাষায়, "একমাত্র স্রষ্টা যাকে সম্পূর্ণরূপে আবেগপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অর্জিত হয় তিনি হলেন একজন ব্যক্তিত্বপূর্ণ স্রষ্টা যা নিজের অনুভূতি থেকে জন্মগ্রহণ করে।" [১২]

সংক্ষেপে, এটি হল বিবর্তনীয় তত্ত্ব, যা এক স্রষ্টার ধারণার উৎপত্তি এবং বিকাশের একটি বিবরণ দেওয়ার দাবি করে। ধারণা করা হয় যে স্রষ্টার ধারণা কেবলমাত্র আধুনিক মানুষের উচ্চতর ধর্মগুলিতে পাওয়া যায় এবং এটি আদিম মানুষের মনে অপরিচিত ছিল।

তবে সম্প্রতি, বাস্তব প্রমাণ প্রকাশিত হয়েছে যা প্রমাণ করে যে এই অনুমানটি ভুল। এই তথ্যের ভিত্তিতে, কিছু পণ্ডিত এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে কথা বলেছেন যে আদিম মানুষের মনও স্রষ্টার সচেতনতার সাথে প্রতিভাবান ছিল। অধ্যাপক টয়েনবির মতে, এই দৃষ্টিভঙ্গি ফাদার শ্মিট পেশ করেছেন, যিনি "পৃথিবীর জনবসতিপূর্ণ পৃষ্ঠের বিপরীত প্রান্তে গর্ত এবং কোণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সবচেয়ে আদিম জীবিত মানুষের ধর্মের সাধারণ উপাদান" সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে তাঁর তত্ত্বটি তৈরি করেছিলেন। [১৩].

বর্তমান লেখক বলতে পারবেন না যে এই ক্ষেত্রে কাজ করা পণ্ডিতরা এই তত্ত্বের প্রতি কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। যদি তারা এটিকে অন্তত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার যোগ্য বলে মনে করেন, তাহলে এর অর্থ হবে যে "স্রষ্টা কী?" প্রশ্নটির একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব। যদি সবচেয়ে আদিম মানুষও স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে, তাহলে নিরাপদে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে স্রষ্টার ধারণার বাস্তবের সাথে একটি প্রকৃত উল্লেখ রয়েছে, তা যতই অসম্পূর্ণ এবং অপর্যাপ্ত হোক না কেন এটি বাস্তবের প্রতিনিধিত্ব করুক। অতএব, ধর্মও, বাস্তবের সাথে যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসেবে বৈধ হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রকাশ হওয়ার পরিবর্তে, ধর্ম বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতার সাথে লেনদেন হিসেবে দেখা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের লক্ষ্য কল্পনার ভূত নয় বরং বাস্তবতা।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, আমাদের এর তাৎপর্যগুলি মনে রাখা উচিত যা আমাদের পরে বিবেচনা করতে হবে। আপাতত, এটি উল্লেখ করা যথেষ্ট যে এই প্রসঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা। বাস্তবতা এবং আমাদের থেকে স্বাধীনভাবে বিদ্যমান এমন একটি সত্তার প্রতি বিশ্বাস - এমন একটি সত্তা যিনি সর্বব্যাপী এবং অতিক্রান্ত - মূল ধর্মের একটি ম্লান স্মৃতি।*

আমরা এখন প্রশ্নটি নিতে পারি, "ধর্ম কী?"

## ৪. ধর্ম কী?

পূর্ববর্তী অংশে স্রষ্টা সম্পর্কে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা হয়েছিল। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, স্রষ্টা হলেন চূড়ান্ত বাস্তবতা, এবং দ্বিতীয়টি অনুসারে, স্রষ্টা কেবল মানুষের মনের একটি ধারণা হিসাবে বিদ্যমান। স্রষ্টা সম্পর্কে এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, ধর্মের দুটি দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ভূত হয়। একটির মতে, ধর্ম পরমকে নিয়ে কাজ করে। এর কাজ হল পরমকে আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করা এবং আমরা কীভাবে এর কাছাকাছি যেতে পারি তা বলা। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, ধর্ম হল মানুষের ইচ্ছা এবং কল্পনা থেকে জন্ম নেওয়া একটি কুসংস্কার। এর কাজ হল মানুষের ইচ্ছাগুলিকে মায়াময় তৃপ্তি প্রদান করা, যা ভৌত জগতে সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, ধর্মের উৎপত্তি মানুষের আদিম মানসিকতায় তার অজ্ঞতা, তার ভয় এবং আশা থেকে। উদাহরণস্বরূপ, জং ধর্মকে মানব সত্তা এবং তার সামাজিক কাঠামোকে বিচ্ছিন্নতার শক্তির বিরুদ্ধে রক্ষা করার জন্য একটি জৈবিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এটা স্পষ্ট এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মকে ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয়ের অবস্থানে ফেলে দেয়, এমন কিছু যা তার কাছে কেবল একটি কাল্পনিক মূল্য রাখে এবং স্বার্থপর ব্যক্তিদের কল্পনা থেকে খুব কমই আলাদা ভূমিকা গ্রহণ করে। এইভাবে ধর্মীয় কার্যকলাপ কেবল আদিম, অযৌক্তিক বা অযৌক্তিক এবং বাস্তব জগতের সাথে সম্পূর্ণরূপে যোগাযোগের বাইরে বলে মনে হবে। [* দীন পরে ব্যাখ্যা করা হবে]

অন্যদিকে, ধর্মের প্রতি বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি অভিজ্ঞতামূলক এবং ঐতিহাসিক। তিনি ধর্মকে একটি প্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করেন এবং আদিম সমাজে এর উৎপত্তিস্থল এবং ইতিহাসের ধারায় এর পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করে এটিকে বোঝার আশা করেন। তার প্রধানত ধর্মের সামাজিক কার্যকারিতার উপর জোর দেওয়া হয়। তিনি মনে করেন যে ধর্মের উৎপত্তি এবং টিকে থাকার কারণ এটি সামাজিক সংহতি এবং গোষ্ঠী সংহতিকে উৎসাহিত করে: কিন্তু তিনি আদিম সমাজে প্রচলিত ধর্মের সারাংশ বুঝতে ব্যর্থ হন, কারণ সেখানে এটি অদ্ভুত ধারণা এবং অদ্ভুত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। (তথাকথিত) আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির অভাবের কারণে, তিনি সমগ্র জনগোষ্ঠীকে ধর্ম হিসাবে বিবেচনা করেন এবং এর উপরিভাগের দিকগুলিকে ধর্মের মূল গঠন হিসাবে গ্রহণ করেন।

অগাস্ট কোঁতে এই ধরণের তদন্তের পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানব চিন্তাভাবনা, তার বিকাশের সময়, তিনটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গেছে - ধর্মতাত্ত্বিক, অধিবিদ্যক এবং অবশেষে, বৈজ্ঞানিক। ধর্ম এইভাবে মানসিক বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। এই পর্যায়ে, বাস্তবতার প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আবেগগত এবং অযৌক্তিক - সংক্ষেপে, কেবল রহস্যময়, যখন অধিবিদ্যক পর্যায়ে, তিনি বাস্তবতার হৃদয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যুক্তির উপর বেশি নির্ভর করেছিলেন। শেষ পর্যায়ে, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে, তিনি যে জগতে বাস করতেন তার কিছু জ্ঞান অর্জনের জন্য পর্যবেক্ষণমূলক তথ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। যদি আমরা কমটের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি, তাহলে এর অর্থ হবে আধুনিক বিশ্বের সাথে ধর্মের কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই, এবং এর চিত্রকে অতীতের একটি নিছক ধ্বংসাবশেষ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, আধুনিক জ্ঞানের পরিকল্পনায় এর কোন স্থান নেই এবং বর্তমান জীবনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, যা অপ্রচলিত ধারণার অন্তঃস্থলে নিক্ষিপ্ত হওয়ার যোগ্য।

আরেকটি অভিজ্ঞতা ভিত্তিক তত্ত্ব ধর্মের উৎপত্তি এবং বিকাশের আরও যুক্তিসঙ্গত বিবরণ দেয়। এটি উল্লেখ করে যে আদিম মানুষ প্রকৃতির শক্তির প্রতি অবিরাম ভয়ে বাস করত। তাদের মুখোমুখি হয়ে, সে অসহায়ত্বের তীব্র অনুভূতিতে ভুগছিল। সে এই শক্তিগুলিকে মূর্ত ও দেবী রূপে রূপান্তরিত করেছিল এবং তাদের শান্ত করার জন্য বলিদান এবং উপাসনা করেছিল। এটি ছিল ধর্মের প্রথম পর্যায়, যেখানে মানুষ এই দেবতাদের শান্ত করার এবং তাদের তাকে রক্ষা করার জন্য প্ররোচিত করার আশায় বিনীতভাবে নিজেকে প্রণাম করেছিল। পরে, সে কিছুটা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং ভেবেছিল যে সে প্রাকৃতিক ঘটনার গতিপথে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং এই শক্তিগুলিকে তার ইচ্ছার কাছে বাঁকানোর পদ্ধতি তৈরি করতে পারে। এই মনোভাব ধর্মের একটি নতুন পর্যায় তৈরি করেছিল যা ছিল জাদুর পর্যায়। তারপর মানুষ মন্ত্র, মন্ত্র, মন্ত্র এবং গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে দেবতাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, এবং এইভাবে সম্ভবত সমস্যাটি মোকাবেলা করার জন্য পুরোহিতত্বের প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় এবং জাদুকররা প্রথম পুরোহিত হয়ে ওঠে।

মানব গোষ্ঠীর আকার বৃদ্ধি এবং তাদের কাঠামো জটিল হয়ে ওঠার সাথে সাথে, উপজাতি রীতিনীতি আর তাদের সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল এবং এইভাবে রাজত্বের প্রতিষ্ঠানটি প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল। একজন একক ব্যক্তিকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এবং সমগ্র প্রশাসন তার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল।

তিনি সাধারণ মানুষের চেয়ে উচ্চতর অবস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাদের জীবন ও সম্পত্তির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতেন। তাঁর কথা ছিল আইনের আনুগত্য, যা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হত। তিনি কোনও বিরোধিতা সহ্য করতেন না। ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত। রাজা যতই শক্তিশালী হোন না কেন, তিনি আরও বৃহত্তর ক্ষমতা চেয়েছিলেন। সময়ের সাথে সাথে, এটি তাকে তার প্রজাদের প্রতি তার আচরণ অনুসারে ভয়, ঘৃণা বা ভালোবাসার বস্তুতে পরিণত করেছিল। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র একটি অপরিহার্য শর্ত, এই তত্ত্বটি সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয়েছিল। সুতরাং, এটি ধর্মকেও প্রভাবিত করতে বাধ্য হয়েছিল।

স্রষ্টার ধারণাটি পরম রাজার মডেলে তৈরি হয়েছিল এবং তাকে স্বর্গ ও পৃথিবীর উপর একজন স্বেচ্ছাচারী স্বৈরশাসক হিসেবে শাসনকারী সত্তা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল। তিনি ছিলেন রাজাদের রাজা, বিশ্বজগতের প্রভু, যার ইচ্ছা ছিল প্রশ্নাতীত এবং যার পথ ছিল রহস্যময়। মানুষ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল - একটি নীচ এবং অসহায় প্রাণী। এই তত্ত্ব অনুসারে, ধর্ম এখন তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। স্রষ্টাকে একজন অত্যাচারী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল, এবং ধর্ম নিপীড়নের একটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এটি শাসক শ্রেণীর সেবা করতো, যারা ঐশ্বরিক প্রভু কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে ভূমিতে ক্ষমতা প্রয়োগ এবং জনগণের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। "আধ্যাত্মিক নিষেধাজ্ঞা"র মাধ্যমে এটি শাসক শ্রেণীকে নিপীড়িত জনগণের ক্রোধ থেকে রক্ষা করতো। ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, শাসকরা, দায়মুক্তির সাথে, সাধারণ মানুষের অধিকারকে পদদলিত করতে পারতো যা এখনও অসংজ্ঞায়িত ছিল।

সংক্ষেপে, এটিই ধর্মের মার্কসীয় তত্ত্ব। মার্কসবাদীরা ধর্মকে সর্বহারা শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বুর্জোয়াদের দ্বারা ব্যবহৃত একটি ধূর্ত হাতিয়ার হিসেবে দেখে। তারা বলে, ধর্ম হল একটি আফিম যা জনগণকে তাদের খকষ্টের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে এবং তাদের অসুখী ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্ররোচিত করে। ধর্মের এই দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমরা বলতে পারি যে ধর্মের জগৎ এখনও পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি। শুধুমাত্র দ্বীনই এটি মোকাবেলা করতে পারে, যেমনটি আমরা পরে আলোচনা করব।

বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে, এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে ধর্ম তাদের কাছে বাস্তবতার প্রতি একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিজ্ঞান বাস্তবতার একটি দিকের সত্য ও স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলছে, অন্যদিকে ধর্ম প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নাগালের বাইরের জগতে বাস্তবতা এবং এর সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং অর্থ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা এবং আরও পর্যাপ্ত ধারণা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিখ্যাত পদার্থবিদ অধ্যাপক হাইজেনবার্গ তার সাম্প্রতিক এক লেখায় লক্ষ্য করেছেন যে বিজ্ঞান যতই নিখুঁত হচ্ছে, ততই এটি বাস্তবতা থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে এবং বিমূর্ততার জগতে প্রবেশ করছে। বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলি যতই বিমূর্ত হয়ে উঠছে, ততই তারা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বাস্তব জগৎ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণতার কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া প্রতিটি পদক্ষেপ এটিকে জীবনের বাস্তবতা থেকে আরও দূরে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে, ধর্ম জীবন্ত বাস্তবতার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করে এবং এর ধারণাগুলিও, যদিও তারা বৈজ্ঞানিক প্রকাশের রূপ নাও নিতে পারে, তবুও আরও অর্থবহ এবং মানব জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

ধর্মের প্রতি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই বিজ্ঞানীর চেয়ে বেশি উপযুক্ত। দার্শনিকের অনুসন্ধান অর্থের জন্য এবং তিনি ধর্ম এবং মানব জীবনের প্রতি এর মূল্য সম্পর্কে একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করেন। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক দার্শনিক তাদের পূর্ব ধারণা দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়েছেন এবং তাই তাদের অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়েছেন। তাছাড়া, মানবিক যুক্তিরও গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং এটি আমাদেরকে বাস্তবতার মূলে নিয়ে যেতে পারে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। কিছু দার্শনিক, গভীর এবং নিবিড় প্রতিফলনের ফলে, নিঃসন্দেহে, স্রষ্টার ধারণায় পৌঁছেছেন, কিন্তু এই স্রষ্টা কেবল একটি বিমূর্ততা হয়ে উঠেছে, যা ধর্ম যে জীবন্ত স্রষ্টাকে বোঝার চেষ্টা করে তার থেকে অনেক আলাদা। যুক্তি, সংক্ষেপে, নিজেই, আমাদের এখনও পর্যন্ত "ধর্ম কী?" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম করেনি।

আসুন এখন রহস্যবাদীর দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ফিরে যাই। তিনি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতি আবেদন করেন যা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য এবং সর্বোচ্চ সন্তোষজনক বলে মনে করেন, অন্তত নিজের জন্য। তিনি দাবি করেন যে এই অভিজ্ঞতায় তিনি নিজেকে পরম সত্তার সাথে ঘনিষ্ঠ এবং জীবন্ত যোগাযোগ বলে মনে করেন। দুর্ভাগ্যবশত, এই অভিজ্ঞতা, যেমন রহস্যবাদী নিজেই স্বীকার করেন, অবর্ণনীয় এবং অসংলগ্ন। তিনি তার জ্ঞান অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন না এবং তিনি অন্যদেরও বোঝাতে পারেন না যে তার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত এবং মায়াময় ছিল না। অধিকন্তু, রহস্যবাদীর পরম স্থির এবং অপরিবর্তনীয়। সময়কে কেবল একটি মায়ায় পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। স্রষ্টা যদি সময়ের স্রোতের বাইরে থাকেন, তাহলে পরিবর্তনের উৎস কী? মরমীবাদীদের কাছে এই প্রশ্নের কোনও যুক্তিসঙ্গত উত্তর নেই।

সম্ভবত বিশ্বের উচ্চতর ধর্মগুলির (যা মূলত সময়ে সময়ে বিভিন্ন আম্বিয়াদের দ্বারা একই ধর্ম গ্রহণ করেছিল) একটি সমীক্ষা সক্ষম করতে পারে ধর্মের প্রকৃতি এবং বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের সাহায্য করতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি সহজ কাজ নয়। প্রতিটি আদ্যানের মূল্য সম্পর্কে সঠিক অনুমান করার আগে আমাদেরকে কঠিন বাধা অতিক্রম করতে হবে। বেশিরভাগ রাসুলের জীবন এবং আদ্যানের ইতিহাস অস্পষ্টতায় ঢাকা, এমনকি ঐতিহাসিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও তাদের জীবনকে ঘিরে থাকা কুয়াশা ভেদ করতে পারে না। তাদের জীবন সম্পর্কে খাঁটি তথ্য পাওয়া কঠিন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের চারপাশে বোনা মিথের জট দ্বারা সমস্যাটি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এমনকি ধৈর্যশীল ঐতিহাসিক গবেষণাও প্রায়শই কল্পকাহিনী থেকে সত্যকে আলাদা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ফলস্বরূপ, তাদের জীবনের বিবরণগুলি বেশিরভাগই শোনা কথা বা অনুমানমূলক। আরও খারাপ, এমনকি তাদের শিক্ষাও তার আসল আকারে আমাদের কাছে আসেনি। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না, কখন তাদের তথাকথিত বাণী লেখার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল, এবং বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে পবিত্র গ্রন্থগুলি, যা সাধারণত তাদের শিক্ষাকে ধারণ করে বলে মনে করা হয়, সময়ে সময়ে বিকৃত করা হয়েছে। মনে হচ্ছে ধারাবাহিক সংস্করণের সময় অনেক অংশ কেটে ফেলা হয়েছে এবং অনেক অংশ বিকৃত করা হয়েছে। রাসূলের শিক্ষা অবশ্যই ধর্মগ্রন্থে সংরক্ষিত হয়েছে কিন্তু কেবল বিকৃত আকারে। অতএব, এই আদ্যানগুলির মূল রূপ এবং সারাংশ পুনরুদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব।

একমাত্র ব্যতিক্রম হল ইসলামের দ্বীন। এর নবী এবং তাঁর সাহাবীরা ইতিহাসের আলোয় বাস করতেন। তাঁর শিক্ষা এবং কর্মকাণ্ড তাঁর অনুসারীরা ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের দেওয়া বিবরণ দ্বারা সেগুলি যাচাই করা যেতে পারে। তাঁর জীবন এবং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য অসংখ্য এবং সমসাময়িক রেকর্ডে সহজেই পাওয়া যায়।

অধিকন্তু, কোরআন, যার উপর ইসলাম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, ঠিক যেমনটি রাসূলের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছিল, ঠিক তেমনই আমাদের কাছে এসেছে। এটি সর্বদা সতর্কতার সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কোনও মুসলিম লেখক কখনও একটি অক্ষরও বাদ দেওয়ার বা সন্নিবেশ করার সাহস করেননি। ইসলামের উৎস এভাবে অস্পৃশ্য এবং অভেদ্য রয়ে গেছে। তাই আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করতে পারি যে ইসলামের ঘনিষ্ঠ অধ্যয়ন আমাদের দ্বীনের প্রকৃত প্রকৃতি এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেবে।

### *তথ্যসূত্র*

১. ডব্লিউ.এম. আরবান, হিউম্যানিটি অ্যান্ড ডিটি, পৃষ্ঠা ১৫।

২. ই.এস., ব্রাইটম্যান, আ ফিলোসফি অফ রিলিজিয়ন পৃষ্ঠা ১৮।

৩. জে.হাক্সলি, রিলিজিয়ন উইদাউট রিভিলেশন, পৃষ্ঠা ৪০।

৪. এ.এন. হোয়াইটহেড, সায়েন্স অ্যান্ড দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড, পৃষ্ঠা ২২২।

৫. জর্জ গ্যালোওয়ে, দ্য ফিলোসফি অফ রিলিজিয়ন, পৃষ্ঠা ১৮১, ১৮৪।

৬. এ.সি. ক্যাম্পবেল, অন সেল্ফহুড অ্যান্ড গডহুড, পৃষ্ঠা ২৪৮।

৭. সিএফ. আপ্রাগুক্ত., পৃষ্ঠা ২৩৪।

৮. এইচ.জে. প্যাটন, দ্য মডার্ন প্রেডিকামেন্ট, পৃষ্ঠা ৫৯।

৯. পি.ডি. ওস্পেনস্কি, ইন সার্চ অফ দ্য মিরাকুলাস, পৃষ্ঠা ২৯৯।

১০. ব্রাইটম্যান, অপ. সিট., পৃষ্ঠা। ৮১.

১১. হেনরি বার্গসন, ধর্ম ও নৈতিকতার দুটি উৎস, পৃষ্ঠা ২৪৫-৬।

১২. ফুলটন জে. শিন, ধর্মের দর্শন, পৃষ্ঠা ২৩৮।

১৩. আর্নল্ড টয়েনবি, ধর্মের প্রতি একজন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি, পৃষ্ঠা ১৮।

# অধ্যায় ২
## দ্বীনের কার্যকারিতা

### ১. দ্বীন ও মানুষ

আমরা বলেছি যে ইসলামের একটি যত্ন সহকারে অধ্যয়ন আমাদেরকে দীনের প্রকৃতি এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দেবে। তবে, এই গবেষণা শুরু করার আগে, মানব জীবনে এর ভূমিকা বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত হবে। দীনের প্রাথমিক কাজ হল মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

এটি জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে এবং তার কাছে জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। এটি মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে একটি সুরেলা জীবন ব্যবস্থায় সংগঠিত করে তার চরিত্রের রূপান্তরের লক্ষ্য রাখে। এই লক্ষ্যে এটি যতটা সফল হয়, এটি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের উৎসগুলিকে দূর করে এবং মানুষকে নিজের সাথে এবং তার পরিবেশের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে সক্ষম করে। সাফল্য এবং সুখ মূলত একটি প্রকৃত ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাসের ফল। কিন্তু দ্বীনেরও সামাজিক দিক আছে। এটি মানুষের সাথে সম্পর্কিত কারণ সে সামাজিক সম্পর্কের একটি নেটওয়ার্কে বিদ্যমান। এটি মানুষকে তার সামাজিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে না; বরং, এটি তাকে তার সহ-সত্তার কাছাকাছি নিয়ে আসে। একজন ব্যক্তি হিসেবে মানুষের জন্য এর একটি অর্থ রয়েছে; কিন্তু একটি সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে তার জন্য এর আরও সমৃদ্ধ অর্থ রয়েছে।

দ্বীন মানুষকে এই উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায় যে সে কেবল তার সহ-মানুষদের সাথে সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা করেই তার সম্ভাবনা বিকাশ করতে পারে। এইভাবে, এটি রীতিনীতি, আইন এবং প্রতিষ্ঠানের বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতএব, এটি কেবল মনোবিজ্ঞানীর জন্যই নয়, ইতিহাসবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানীর জন্যও অধ্যয়নের উপযুক্ত বিষয়। সকলেই এটিকে গুরুত্ব সহকারে নিতে বাধ্য এবং এটিকে (ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন) একটি বিভ্রম বা কেবল ব্যক্তিগত উদ্বেগের বিষয় হিসাবে ব্যাখ্যা করার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নয়। দার্শনিকেরও দ্বীনের বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গির বৈধতা পরীক্ষা করার এবং সমাজে একটি সমন্বিত শক্তি হিসাবে এর মূল্য মূল্যায়ন করার অধিকার রয়েছে। দ্বীনের একটি নিরপেক্ষ তদন্ত থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বিজ্ঞান ও দর্শনের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত পরিচালিত সবচেয়ে ভয়াবহ আক্রমণের মধ্যেও এটি টিকে আছে।

ইকবাল যথার্থই পর্যবেক্ষণ করেছেন: "বিজ্ঞান শেখার অনেক আগেই উচ্চতর ধর্ম ..... [কংক্রিট]* অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তাকে তার ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।"[২]

তিনি আরও লিখেছেন, মানব অভিজ্ঞতার সকল তথ্যের সংশ্লেষণে দ্বীনের কেন্দ্রীয় অবস্থানের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। [৩]

এই প্রসঙ্গে এটি লক্ষ করা উচিত যে বাস্তবতার প্রতি দ্বীনের প্রতিক্রিয়া আংশিক নয়। এটি বিজ্ঞান ও দর্শনের মতো কেবল জ্ঞানীয় নয়, নান্দনিকতার মতো কেবল আবেগগতও নয়। এটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সমস্ত উপাদানকে জড়িত একটি সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া। তদুপরি, এটি একটি সুসংগত সুরেলা ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়া, একটি সংশ্লেষিত নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত একটি ব্যক্তিত্ব। ইকবালের ভাষায়, "ধর্ম ... কেবল চিন্তাভাবনা নয়, কেবল অনুভূতিও নয়, কেবল কর্মও নয়; এটি সমগ্র মানুষের প্রকাশ।" [৪]

দ্বীনের প্রকৃত প্রকৃতি বুঝতে চাইলে আমাদের এই সত্যটি ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

আসুন আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য বিবেচনা করি। দ্বীন যদি সমগ্র মানুষের প্রকাশ হয়, তাহলে কর্মক্ষেত্রে বা চিন্তার ক্ষেত্রে তার অর্জনগুলি অবশ্যই তার দ্বীনের সাথে বা অন্য কথায়, চূড়ান্ত বাস্তবতার সাথে তার সম্পর্ক সম্পর্কে তার মৌলিক বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। এই বিশ্বাসগুলো মূলত দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত। তাহলে আমরা দেখতে পাই যে দ্বীন মানুষের মহৎ উদ্যোগকে উৎসাহিত করেছে। সাধারণত দাবি করা হয় যে একটি বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু এটি সত্য নয়, কারণ একটি বৈজ্ঞানিক বা বস্তুবাদী মতাদর্শ, তার স্বভাবগতভাবেই, সমগ্র মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। এটি তার যুক্তি বা আগ্রহের প্রতি আবেদন জানাতে পারে কিন্তু অবশ্যই, তার ব্যক্তিত্বের অন্যান্য উপাদানের সাথে সম্পর্কহীন থাকবে এবং কার্যত ব্যক্তিত্বেরই খণ্ডিতকরণের দিকে পরিচালিত করবে।

বিজ্ঞান এবং শিল্প যথাক্রমে মানব প্রকৃতির যুক্তিবাদী এবং আবেগগত (নান্দনিক) দিকগুলিতে সন্তুষ্টি নিয়ে আসে। কিন্তু দ্বীন বিশ্বের এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করার জন্য যাত্রা শুরু করে যা মানুষের সমস্ত গভীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। দ্বীন কি সত্যিই এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পারে? আধুনিক যুগের কিছু মহান চিন্তাবিদ যারা দ্বীনকে ধর্মের সাথে গুলিয়ে ফেলেন, তারা এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন এবং দৃঢ়ভাবে দাবি করেছেন যে এটি তা করতে পারে না। তারা উল্লেখ করেছেন যে অতীতে ধর্মের ফল শান্তি ও সম্প্রীতি নয় বরং দ্বন্দ্ব এবং বিবাদ ছিল। ধর্মের উপর ক্যাসিরারের সমালোচনা সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করার যোগ্য:ধর্ম কেবল তাত্ত্বিকভাবেই নয়, নীতিগত দিক থেকেও একটি ধাঁধা হিসেবে রয়ে গেছে। এটি তাত্ত্বিক বিরোধিতা এবং নীতিগত দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। এটি আমাদের প্রকৃতির সাথে, মানুষের সাথে, অতিপ্রাকৃত শক্তির সাথে এবং দেবতাদের সাথে যোগাযোগের প্রতিশ্রুতি দেয়। তবুও এর প্রভাব একেবারে বিপরীত। এর বাস্তব রূপে, এটি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে গভীর বিরোধ এবং ধর্মান্ধ সংগ্রামের উৎস হয়ে ওঠে। ধর্ম একটি পরম

সত্যের অধিকারী বলে দাবি করে, কিন্তু এর ইতিহাস ত্রুটি এবং ধর্মবিরোধী ইতিহাস। এটি আমাদের মানব অভিজ্ঞতার সীমা ছাড়িয়ে একটি অতিক্রান্ত বিশ্বের প্রতিশ্রুতি এবং সম্ভাবনা দেয় - এবং এটি মানবিক, সম্পূর্ণ মানবিক। [৫]

এটি অবশ্যই একটি ধ্বংসাত্মক সমালোচনা, এবং বর্তমান যুগের একজন নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদ যেমন এটি করেছেন, এটি আমাদের গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার যোগ্য। এটিকে বিন্দু বিন্দু পরীক্ষা করলে, আমাদের অনেক দূরে নিয়ে যাবে। আমরা কেবল ধর্ম থেকে আলাদাভাবে ধর্মের প্রতিরক্ষার সাধারণ লাইনটি নির্দেশ করতে পারি। ধর্মের সমালোচকদের বেশিরভাগের মতোই অধ্যাপক ক্যাসিরারের অসুবিধা হল, তিনি দ্বীনকে কেবল কিছু নির্দিষ্ট ধর্ম হিসেবে অধ্যয়ন করেননি, বরং কিছু নির্দিষ্ট ধর্মের উপর গবেষণা করেছেন, এবং যেগুলি হয় মনুষ্যসৃষ্ট অথবা প্রকাশিত ধর্ম, যদিও তাদের উৎপত্তিতে সত্য, পরবর্তীতে মানুষের অন্তর্নিহিত দ্বারা বিকৃত হয়েছিল। তিনি যদি দ্বীন অধ্যয়ন করতেন তবে তিনি ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেন। একটি সত্য ধর্ম, যদি আদৌ দ্বীনকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়, তবে তা কোনও ধাঁধা নয়; বরং এটি মানুষ এবং মহাবিশ্বের অনেক ধাঁধার সমাধান করে। একটি সত্য ধর্মের কোনও বিরোধ নেই। অন্যদিকে, এটি জীবনের দ্বন্দ্বগুলিকে একত্রিত করে এবং মানুষের আচরণের পরীতগুলিকে সামঞ্জস্য করে। এটা সত্য যে ধর্ম অতীতে মানব সমাজে দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি মতবিরোধের দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়েছে। কিন্তু এটি প্রতিটি প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর দ্বারা উপভোগ করা সত্যের অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল।

অন্যদিকে, দ্বীন নম্রতা এবং বিনয়ের জন্ম দেয়, অহংকার এবং অহংকার নয়। মানুষ অবশ্যই ধর্মের নামে নিজেদের মধ্যে লড়াই করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ছদ্মবেশে। কিন্তু দ্বীনে বিশ্বাসী ব্যক্তি অন্যদের উপর তার মতামত চাপিয়ে দিতে অনিচ্ছুক। পরিশেষে, দ্বীন একটি অতীন্দ্রিয় জগতের বিশ্বাসকে বোঝায় কিন্তু এটা বলা ভুল যে এই অতীন্দ্রিয় জগৎ মানব অভিজ্ঞতার জগত থেকে পৃথক, দূরবর্তী এবং এর সাথে সংযোগহীন। দ্বীনের অতীন্দ্রিয় জগৎ কেবল একই বাস্তবতার একটি দিক যার ইন্দ্রিয়ের জগৎ আরেকটি দিক। প্রকৃতপক্ষে, তারা একে অপরের সাথে সংযুক্ত এবং একই পরম বাস্তবতার অন্তর্গত। দ্বীন আমাদের শেখায় যে ইন্দ্রিয়জগৎ বাস্তবতা থেকে একটি বিমূর্ততা এবং আমাদের নিজেদেরকে সম্পূর্ণ বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া উচিত, এর কোনও একটি দিকের সাথে নয়।

আমরা অধ্যাপক ক্যাসিরারের সাথে একমত যে "ধর্ম" (দ্বীন, যেমনটি আমরা বলি) "মানব, সম্পূর্ণ মানবিক"। মানবজীবনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যার ফলে ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত করে এবং সমাজের একজন কার্যকর সদস্য হয়ে ওঠে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, এটি এমন কিছু স্থায়ী মূল্যবোধ প্রদান করে, যা জ্ঞানের অন্য কোনও উৎস প্রদান করতে পারে না। এটি মানুষকে প্রকৃতির শক্তিকে জয় করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি মহাবিশ্বে তাকে যে অবস্থান দেয় তা স্রষ্টার পরেই, এবং সমগ্র

মানবজাতির বিকাশের জন্য এইভাবে অর্জিত শক্তিকে কাজে লাগাতে। এটি তাকে পশুর স্তর থেকে উপরে উঠে মানুষের জীবনযাপনের পথ দেখায়। এটি কেবল তখনই সম্ভব যদি সে স্থায়ী মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তার জীবন পরিচালনা করে। যদি কোন দিন না থাকে তবে কোন স্থায়ী মূল্যবোধ থাকবে না এবং যদি কোন স্থায়ী মূল্যবোধ না থাকে তবে মানবজাতি পশুর পালের চেয়েও ভালো থাকবে না। এটিই মানবজীবন এবং কার্যকলাপে কালের আসল মূল্য এবং স্থান যা দুর্ভাগ্যবশত অধ্যাপক ক্যাসিরারের নজর এড়িয়ে গেছে।

## ২. নফস বা আত্মা

এখন পর্যন্ত আমরা পরম বাস্তবতার সাথে তার অসীম দিকগুলির সাথে উদ্বিগ্ন। এই দিকগুলির মধ্যে একটি হল আমাদের অভিজ্ঞতার স্থানিক-কালিক জগৎ। এখন, আমরা আমাদের মনোযোগ মানব সত্তার দিকে দিতে পারি যা বাস্তবতার সাথে একটি অর্থপূর্ণ সম্পর্ক খোঁজে। মানব সত্তার সাথে সম্পর্কিত বাস্তব হল স্রষ্টা, এবং বাস্তবের প্রতি আত্মার মনোভাব হল দীন। স্বত্বা স্থায়ী মূল্যবোধের মাধ্যমে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ হয় যা স্রষ্টা নামক প্রকৃত সত্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য।

মানব সত্তার প্রকৃতি কী এবং মহাবিশ্বের পরিকল্পনায় এর স্থান কী? আমরা প্রথমে আধুনিক বিজ্ঞান এবং দর্শন এই প্রশ্নগুলির উত্তরগুলি বর্ণনা এবং সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করব। প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় দর্শনে আত্মা আত্মার সমার্থক ছিল, এবং আত্মাকে একটি অবিনাশী পদার্থ বলে মনে করা হত যা বস্তুগত দেহের সাথে অস্থায়ী সংযোগের আগে বিদ্যমান ছিল এবং যা দেহের বিলীন হওয়ার পরেও টিকে থাকে। আত্মার ধারণাটি আদিম চিন্তাভাবনা থেকে নেওয়া হয়েছিল এবং দার্শনিকদের দ্বারা পরিমার্জিত এবং বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

অ্যারিস্টটলই একমাত্র মহান দার্শনিক যিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি আত্মাকে দেহের মূল অংশ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন এবং যেহেতু এটি দেহের রূপ ছিল, তাই এটি এছাড়াও এর থেকে অবিচ্ছেদ্য ছিল। এইভাবে আত্মাকে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে স্পষ্টভাবে স্থাপন করা হয়েছিল। তবে, অ্যারিস্টটলের পরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, স্বাধীন এবং অতিপ্রাকৃত আত্মার প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক উভয়ের দ্বারাই গৃহীত হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞান যখন ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিল তখনই এটিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

আঠারো শতকে, "আত্মা" শব্দটি প্রচলিত হয়েছিল। প্রকৃতির কাছাকাছি থাকার সুবিধা ছিল "আত্মা" শব্দটির চেয়ে যার একটি অতিপ্রাকৃত স্বাদ ছিল। "আত্মা" শব্দটিকে অভিজ্ঞতার বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হত।

চেতনার ঐক্য, যা পৃথিবীতে অনন্য, কেবল একটি আত্মার আলোকে বোধগম্য হয়ে ওঠে যা চেতনা গঠনকারী বিভিন্ন সংবেদন, অনুভূতি এবং ধারণাগুলিকে ধারণ করে এবং একত্রিত করে। এটিকে মুক্ত এবং প্রাকৃতিক আইনের অধীন নয় বলে মনে করা হত। অধিকন্তু, এটি বিশ্বাস করা হত যে আত্মা ব্যক্তির জীবনকাল জুড়ে অপরিবর্তিত এবং অভিন্ন থাকে।

যাইহোক, লকের সাথে শুরু হওয়া এবং হিউমের দর্শনে সমাপ্ত চিন্তাধারা ইংরেজ চিন্তাবিদদের কাছে আত্মার এই ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। লক মানব মনকে একটি ফাঁকা ট্যাবলেট হিসাবে কল্পনা করেছিলেন যা নিষ্ক্রিয়ভাবে বাইরের জগৎ থেকে ছাপ গ্রহণ করে। মনের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক জগৎ থেকে উদ্ভূত; এটি নিজে কিছুই তৈরি বা সৃষ্টি করেনি। এটি কেবল বাহ্যিক বস্তু এবং শক্তি থেকে ছাপ গ্রহণ এবং সঞ্চয় করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মনের যেকোনো কার্যকলাপকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। লক মনে করতেন যে মনের যেকোনো ধারণা যা ছাপের মাধ্যমে এর উৎসে খুঁজে পাওয়া যায় না তা কেবল বানোয়াট। বার্কলে এই পরীক্ষাটি আত্ম-ধারণার উপর প্রয়োগ করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে এটি একটি বৈধ ধারণা নয়। তবুও, তিনি বিশ্বাস করতেন যে ধারণার প্রবাহ সুশৃঙ্খল এবং বৈধ ছিল কারণ এগুলি স্রষ্টার মনে বিদ্যমান ছিল এবং তাঁর মালিকানাধীন ছিল।

হিউম একটি স্বাধীন আত্মার জনপ্রিয় বিশ্বাসকে অভ্যুত্থান প্রদান করেছিলেন। তিনি মনের একটি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং এর অস্তিত্বের জন্য কোনও প্রমাণ খুঁজে পাননি। তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যে যখনই তিনি তার মনের দিকে তাকান তখন তিনি একটি সংবেদন, একটি চিত্র বা অনুভূতি দেখতে পান, কিন্তু সেই আত্মার সাথে নয় যার সাথে তারা সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। তার মতে, মন কেবল ধারণার একটি ধারাবাহিকতা যা চেতনার একই বা ধারাবাহিক অবস্থায় বিদ্যমান থাকার কারণে বাহ্যিকভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। একজন পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতাবাদী হিসেবে, তিনি এমন কোনও ধারণা গ্রহণ করতে পারতেন না যা চেতনার প্রকৃত বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মনের বিষয়বস্তুর শৃঙ্খলা এবং সংগতি সম্পূর্ণরূপে সংঘবদ্ধতার নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এরপর, ইংরেজ অভিজ্ঞতাবাদী চিন্তাবিদরা আত্ম ধারণাটিকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন।

কান্ট একমত হন যে আত্ম বা অহং অভিজ্ঞতার একটি বাস্তবতা নয়। তবুও, তিনি বিশ্বাস করতেন যে অভিজ্ঞতার ভিত্তি ছিল অতীন্দ্রিয় অহং। তাই আদর্শবাদী দার্শনিকরা অতীন্দ্রিয় সত্ত্বা এবং অভিজ্ঞতার সাথে এর সম্পর্ক সম্পর্কে অনুমান করতে থাকেন।

মনোবিজ্ঞানীরা তাদের প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় সত্ত্বার ধারণাটিকে তাদের জন্য অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। তারা অভিজ্ঞতার তথ্য অধ্যয়নের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন। যাইহোক, যেহেতু

তারা দেখতে পান যে মনের বিষয়বস্তু বিচ্ছিন্ন নয় বরং একটি "আমি" বা অহংকে কেন্দ্র করে, তারা অভিজ্ঞতামূলক সত্ত্বার ধারণাটি তৈরি করেন। তারা অভিজ্ঞতামূলক সত্ত্বার উত্থান এবং মানসিক বিকাশের সময় এর পরিবর্তনের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করেন। যাইহোক, মনোবিজ্ঞান একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের মর্যাদা অর্জন করার সাথে সাথে, অভিজ্ঞতামূলক সত্ত্বার ধারণাটিকেও স্থায়ী এবং স্থিতিশীলতার ধারণার সাথে যুক্ত বলে বাতিল করা হয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তিত্বের ধারণাটি প্রাচীন স্বত্ত্বার ধারণাকে প্রতিস্থাপন করেছে। মনোবিজ্ঞানী এখন ব্যক্তিত্বের উৎপত্তি এবং এর বিকাশের প্রক্রিয়া এবং অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে এর বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করেন। ব্যক্তিত্বকে একটি সত্তা হিসেবে কল্পনা করা হয় না বরং মনের কাঁচামাল যখন এটি সংগঠিত করে তখন সেই রূপ বা প্যাটার্ন হিসেবে কল্পনা করা হয়। জীবনের গঠনমূলক বছরগুলিতে ব্যক্তির জৈবিক সরঞ্জাম গঠনকারী সহজাত আকাঙ্ক্ষা, প্রবণতা এবং ক্ষমতাগুলির সংগঠন দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়। সর্বাধিক প্রচলিত মতামত অনুসারে, জীবনের প্রথম পাঁচ বছরে ব্যক্তিত্বের ভিত্তি-পরিকল্পনা তৈরি হয়। দুটি বিষয়, শারীরবৃত্তীয় এবং সামাজিক, ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরবর্তী পথ নির্ধারণ করে। শারীরবৃত্তীয় বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি দ্বারা নিঃসৃত হরমোনগুলি ব্যক্তিত্বের বৃদ্ধি এবং স্বাভাবিক কার্যকারিতা নির্ধারণে একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে।

অন্যদিকে, সামাজিক মনোবিজ্ঞানীরা মানব শিশু যে সামাজিক পরিবেশে বেড়ে ওঠে তাকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা রাখেন। তাদের বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হয়। শিশুটি গোষ্ঠী কোড এবং সামাজিক নিয়মগুলিকে অভ্যন্তরীণ করে তোলে যা অবিলম্বে তার সহজাত আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্দেশ্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। গোষ্ঠীটি তাকে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকাও অর্পণ করে এবং শিশুটি সক্ষমতা বিকাশ করে এবং সফলভাবে ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রবণতাগুলিকে মুক্ত সুযোগ দেয়।

ফ্রয়েড ব্যক্তিত্বের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি তত্ত্ব তৈরি করেছেন, যা সর্বজনস্বীকৃত না হলেও, সাধারণত এই অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান অবদান হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি ব্যক্তিত্বের জন্য পারিবারিক প্রভাবকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার তত্ত্বটি আলোকপাত করে যে কেন মানুষ তার নৈতিক নীতির প্রতি এত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকে, এমনকি যখন এটি তার স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর এবং এমনকি যখন তার যুক্তি এটিকে অনুমোদন করে না। কারণ নৈতিক নীতি তার বুদ্ধির মাধ্যমে শিশুর মনে প্রবেশ করে না, যা এখনও অপরিণত, কিন্তু গ্রহণ করে এবং তার প্রকৃতির আবেগগত অংশে শিকড় গেড়ে।

শিশু তার বাবা এবং মা উভয়কেই ভালোবাসে—কিন্তু ভিন্ন উপায়ে। মায়ের প্রতি তার ভালোবাসা অধিকারী ধরণের। সে চায় মা সবসময় তার সাথে থাকুক, তার চাহিদাগুলি দেখা মাত্রই তা পূরণ করুক। এই ভালোবাসাও কামকামী বা এতে যৌনতার উপাদান রয়েছে। মা হলেন ব্যক্তির প্রথম প্রেমের বস্তু। অন্যদিকে, বাবার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা দ্বিধাগ্রস্ত, অথবা এতে শত্রুতার উপাদান রয়েছে। শিশুটি তার ইচ্ছা পূরণের ক্ষেত্রে বাবাকে বাধা মনে করে এবং তাকে মায়ের ভালোবাসার প্রতি তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা করে। স্বাভাবিকভাবেই সে বাবার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। তবে, শীঘ্রই সে দেখতে পায় যে তার বাবার এই ঘৃণা তার উপর তীব্র সামাজিক অসম্মতি বর্ষণ করে। একই ব্যক্তির প্রতি পরিচালিত প্রেম এবং ঘৃণার পরস্পরবিরোধী আবেগ শিশুর মনে এক তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, যা সে যুক্তিসঙ্গতভাবে সমাধান করতে অক্ষম। সে পিতার প্রতি তার শত্রুতা দমন করে এটি সমাধান করে। অবদমিত আবেগ এবং এর সাথে সম্পর্কিত ধারণাগুলি ইডিপাস কমপ্লেক্স গঠন করে।

পিতার ভাবমূর্তি এবং নৈতিক কোড, যার প্রধান প্রতিপাদক ছিলেন পিতা, শিশুর অবচেতনে ডুবে যায় এবং অতি-অহংকার বা সাধারণ ভাষায়, বিবেক গঠন করে। যেহেতু শিশুটি ভয় দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে, নিঃসন্দেহে পিতার আনুগত্য করেছিল, তাই এখন তার কাছে অতি-অহংকার বাধ্যবাধকতা মেনে চলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই, যা সে মনে করে, তার নিজের বাইরে উৎস। তার বাবার প্রতি তার মনোভাব অতি-অহংকারে স্থানান্তরিত হয় যা পিতার অবদমিত ভাবমূর্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি। ফ্রয়েডের মতে, এটিই ব্যক্তির মনের উপর বিবেকের শক্তিশালী প্রভাবের গোপন রহস্য।

সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে মানব ব্যক্তিত্ব একটি সামাজিক পরিবেশে শিকড় গেড়ে এবং সামাজিক শক্তি দ্বারা গঠিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ অনুসারে, ব্যক্তি তার নিজস্ব বিকাশে একটি নগণ্য ভূমিকা পালন করে। সমাজ তাকে এমন একটি রূপে রূপ দেওয়ার সময় সে নিষ্ক্রিয় থাকে যা এই মুহূর্তে সামাজিক অনুমোদন উপভোগ করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির অপ্রতুলতা স্পষ্ট, কারণ আমরা এটি আমাদের চোখের সামনে ঘটতে দেখি। একই সামাজিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা দুটি শিশু বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। সমাজবিজ্ঞানীদের কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে ব্যক্তিত্বের দিক থেকে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যরা একে অপরের থেকে আলাদা হতে পারত না। সমাজবিজ্ঞানীদের তুলনায় মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যের সাথে বেশি একমত নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার ফলে বিকশিত হয়।

ব্যক্তিত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ব্যক্তি যে সামাজিক প্রভাবের মুখোমুখি হয় তা নয়, বরং সে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়। অতএব, মানুষ নিষ্ক্রিয়ভাবে ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করে না বরং সক্রিয়ভাবে ব্যক্তিত্ব অর্জন

করে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য মানুষের মধ্যে কার্যকারী জৈবিক উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, সামাজিক উপাদানটিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। মানুষ যে গোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল এবং যা তাকে সুরক্ষা এবং জীবনের প্রয়োজনীয়তা প্রদান করে তার চাহিদার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য এবং যা তাকে সুরক্ষা এবং জীবনের প্রয়োজনীয়তা প্রদান করে। মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব অনুসারে, যা উভয় কারণের সাথে ন্যায়বিচার করে, ব্যক্তিত্ব হল মানুষের বংশগত গঠন এবং তার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফসল।

বিজ্ঞান কেবল জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না, বরং সঠিক জ্ঞান অর্জনের উপরও লক্ষ্য রাখে। নির্ভুলতা কেবল তখনই সম্ভব যখন বিষয়বস্তু পরিমাপের জন্য সংবেদনশীল হয় এবং যখন পরিমাপের কৌশলটি নিখুঁত হয়। দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বাস করা হত যে ব্যক্তিত্বের মতো এত অধরা এবং দুর্ভেদ্য কোনও ঘটনার ক্ষেত্রে পরিমাণগত পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। আমরা মনোবিজ্ঞানীদের প্রশংসা অস্বীকার করতে পারি না যারা প্রশংসনীয় ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম এবং চতুরতার সাথে এই কঠিন সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। তারা প্রথমে ব্যক্তিত্বকে বৈশিষ্ট্যগুলিতে বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং তারপরে আবিষ্কার করেছিলেন যে প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা রয়েছে।

পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল প্রতিটি বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে পরিমাপ করার কৌশল তৈরি এবং নিখুঁত করা। পরিমাপের ফলাফলগুলিকে একত্রিত করে আমরা ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বের প্রোফাইলের একটি সামগ্রিক চিত্র পাই, যেমনটি বলা হয়। রোরশ্যাচ, থারস্টোন, লিকার্ট এবং গডার্ড এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর কাছে এখন মানব ব্যক্তিত্বের প্রতিটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য বিশেষ কৌশলগুলির একটি ভাণ্ডার রয়েছে।

যাইহোক, যদিও ব্যক্তিত্বের অধ্যয়নে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ প্রচুর ফলাফল এনেছে, তবে এর বেশিরভাগই ধর্মে বৃহৎ প্রশ্নগুলির সাথে খুব কমই সম্পর্কিত। মানুষের মধ্যে এমন কী আছে যা তাকে পরম বাস্তবতার সাথে মানিয়ে নেওয়ার বিপজ্জনক এবং আপাতদৃষ্টিতে মরিয়া উদ্যোগে যাত্রা করতে প্ররোচিত করে? কেন এবং কীভাবে সে স্রষ্টার সাথে ঘনিষ্ঠ এবং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে নিজেকে পরিপূর্ণ করার আশা করে?

আসুন প্রথমে দেখি মনোবিজ্ঞান এবং দর্শন এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে আমাদের কতটা সাহায্য করতে পারে। আমরা যখন মনোবিজ্ঞানীকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করি, তখন তিনি আমাদের ব্যক্তিত্বের মনস্তাত্ত্বিক সংজ্ঞার দিকে নির্দেশ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান যুগের সমস্ত প্রধান মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা গৃহীত কোনও সংজ্ঞা নেই। ব্যক্তিত্বকে ব্যক্তির আচরণের সামগ্রিক গুণ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই

সংজ্ঞা ব্যক্তিত্বের ঐক্য এবং জটিলতা উভয়ই প্রকাশ করে। ব্যক্তিত্ব অন্তর্ভুক্ত, যাতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য, প্রবণতা বা ক্ষমতা এর বাইরে না থাকে, এবং তবুও এর একটি ঐক্য রয়েছে যা প্রকৃতির অন্য কোথাও সমান্তরাল নয়। আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যে আরও একটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা যথেষ্ট হবে। ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির পরিমাপযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং প্রেরণামূলক অন্তর্নিহিত স্রোতের একীকরণ।

এই প্রক্রিয়াটি শৈশবকালে শুরু হয় এবং বয়ঃসন্ধিকালে প্রথমে ধীরে ধীরে এবং তারপরে ত্বরান্বিত গতিতে এগিয়ে যায় যতক্ষণ না প্রাপ্তবয়স্কের পরিণত ব্যক্তিত্বের উত্থান হয়। এরপরও, ব্যক্তিত্বের জীবনে সামান্য হলেও কিছু পরিবর্তন আসতে থাকে। বার্ধক্যজনিত কারণে, অথবা রোগ বা আঘাতজনিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, বিপরীত দিকে একটি প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া ব্যক্তিত্বের বিভক্তি বা এমনকি খণ্ডিতকরণের দিকে পরিচালিত করতে পারে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা দ্বৈত এবং বহু-ব্যক্তিত্বের ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করেছেন; বিভক্ত ব্যক্তিত্বকে পুনঃসংহত করার জন্য থেরাপিউটিক কৌশলগুলিও তৈরি করেছেন।

আমরা এখন স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন কিছু নেই যা মনোবিজ্ঞানী কল্পনা করেছেন। এটি কেবল একটি কাঠামোগত রূপ যা মানসিক উপাদানগুলি গ্রহণ করতে বা বর্জন করতে পারে। দার্শনিকদের দিকে ফিরে, আমরা দেখতে পাই যে অস্তিত্ববাদীরা কোনও অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে। তারা অভিজ্ঞতার জগতের বাইরে এক ধাপও যেতে অস্বীকার করে। তাদের জন্যও, মানব সত্তা বাস্তবতার অংশীদার হয় না।

লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা তাৎক্ষণিকভাবে এমন কোনও ধারণা প্রত্যাখ্যান করে যা অভিজ্ঞতার সত্যে ফিরে পাওয়া যায় না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও অভিজ্ঞতার দিগন্তের বাইরে প্রসারিত হয় না। যা কিছু অভিজ্ঞতাগত সত্য নয় তা তারা অস্তিত্বহীন বলে উড়িয়ে দেয়।

এই মুহূর্তে, এটা জিজ্ঞাসা করা স্বাভাবিক যে দ্বীন কি ব্যক্তিত্বের ধারণার সাথে মানিয়ে নিতে পারে নাকি অভিজ্ঞতাগত স্ব-এর সাথে?

স্পষ্টতই তা সম্ভব নয়। মনোবিজ্ঞানী বা লজিক্যাল পজিটিভিস্টের ক্ষণস্থায়ী সত্ত্বার জন্য এর কোন ব্যবহার থাকতে পারে না। এর এমন কিছু বাস্তবের প্রয়োজন যা চূড়ান্ত বাস্তবের সাথে একটি অর্থপূর্ণ লেনদেনে প্রবেশ করতে পারে। এর এমন কিছু স্বত্বের প্রয়োজন যা মানসিক ঘটনার মধ্যে বিদ্যমান এবং তাদের অন্তর্নিহিত ভিত্তিও। দিনী কার্যকলাপ হল মানুষের মধ্যে বাস্তবতার প্রকাশ এবং এটি মহাবিশ্বের বাস্তবের দিকে পরিচালিত হয়। ব্যক্তিত্বের ধারণা বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক হতে পারে, কিন্তু কোনওভাবে এটি

আমাদের অসন্তুষ্ট করে। আমরা মনে করি যে আমরা যে বিষয়ের পিছনে ছুটছি তা আমাদের এড়িয়ে গেছে এবং আমরা যা আঁকড়ে ধরেছি তা কেবল একটি ছায়া। আমরা সন্দেহ করি যে মানব জীবনের গভীরতার বিষয়গুলির প্রতি খুব কম মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। মনোবিজ্ঞানী মনের পৃষ্ঠ থেকে নীচের দিকে কাজ করেন এবং প্রায়শই মানুষের মনের গভীরতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন।

আমাদের আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে আমরা সত্ত্বার কোরআনের ধারণাটি পরীক্ষা করব। এখানে আসুন আমরা আধুনিক মানুষের জীবনে সত্ত্বার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব বিবেচনা করার জন্য থেমে যাই। আধুনিক মানুষ একটি অতিমাত্রায় জীবনযাপন করে। সে ক্ষুদ্র এবং স্বার্থপর লক্ষ্য অনুসরণ করে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে সে অসন্তুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট। তার গভীরতম আকাঙ্ক্ষাগুলি অতৃপ্ত থেকে যায়। এভাবে সে নিজের সাথে এবং তার সহকর্মীদের সাথে উভয়ের সাথেই দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এই প্রসঙ্গে, ইকবালের মন্তব্যগুলি সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করার যোগ্য: এইভাবে, তার বৌদ্ধিক কার্যকলাপের ফলাফল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয়ে, আধুনিক মানুষ আত্মার সাথে, অর্থাৎ ভেতর থেকে বেঁচে থাকা বন্ধ করে দিয়েছে। চিন্তার ক্ষেত্রে সে নিজের সাথে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে বাস করছে; এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে সে অন্যদের সাথে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে বাস করছে। সে নিজেকে তার নির্মম অহংকার এবং তার অসীম সোনার ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম বলে মনে করে যা ধীরে ধীরে তার মধ্যে সমস্ত উচ্চতর প্রচেষ্টাকে হত্যা করছে এবং তাকে কেবল জীবন-ক্লান্তি এনে দিচ্ছে। 'সত্য', অর্থাৎ, অনুভূতির আলোকীয়ভাবে উপস্থিত উৎসে নিমজ্জিত হয়ে, সে তার নিজের অস্তিত্বের অস্পষ্ট গভীরতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। [৬]

আধুনিক মানুষ অবশ্যই ইকবাল যে দুটি ধরণের দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন তার শিকার। সেই ক্ষেত্রে, মানুষ সর্বদা এই ধরণের দ্বন্দ্বে ভুগতে পারে। তবে, আধুনিক সভ্যতা এটিকে আরও জোরদার করেছে বলে মনে হয়। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে দ্বন্দ্ব দুঃখ ও অসুখের একটি সক্রিয় উৎস। মানসিক দ্বন্দ্ব কি বহিরাগত কারণের কারণে, নাকি মনের অন্তর্নিহিত কারণের কারণে?

জীবনের সমস্যাগুলির উপর দীর্ঘ ধ্যানের মাধ্যমে ইকবাল এই বিষয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ রায় দেওয়ার জন্য প্রশংসনীয়ভাবে উপযুক্ত ছিলেন। উপরে উদ্ধৃত অংশটি স্পষ্ট করে যে তিনি আধুনিক সভ্যতার উপর দ্বন্দ্বকে দোষারোপ করেন যা মানুষের স্বার্থপর দিককে প্রাধান্য দেয় এবং সমগ্রের পরিবর্তে কেবল নিজের একটি অংশের জন্য সন্তুষ্টি প্রদান করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার দাবি রাখে।

তবে, প্রশ্নটির সমস্ত দিক বিচার করার জন্য, আমরা দুজন মনোবিজ্ঞানীর মতামতকে উপেক্ষা করতে পারি না যারা এই ক্ষেত্রে দৃঢ় অবদান রেখেছেন।

মানব মনের গভীরতা অন্বেষণকারী প্রথম মনোবিজ্ঞানী ছিলেন ফ্রয়েড। বিস্তৃত ক্লিনিকাল কাজের ভিত্তিতে, তিনি একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন যা অনেক বিষয় আলোকিত করেছিল যা এখন পর্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। তিনি সাইকি শব্দটি পছন্দ করেছিলেন, কারণ এর কোনও আধিভৌতিক প্রভাব ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন, সাইকি হল অনেক সহজাত প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থল, যার প্রতিটি অন্ধভাবে এর সাথে জড়িত উত্তেজনাকে দূর করতে বা হ্রাস করার চেষ্টা করে। এই প্রতিটি চালিকাশক্তির উপর মানসিক শক্তির একটি তহবিল বিনিয়োগ করা হয়। এই মানসিক শক্তি, যখন স্বস্তি বা আনন্দ অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যকলাপে প্রসারিত হয়, তখন তাকে কামশক্তি বলা হয়। চেতনার উৎপত্তি হয় মানসিকতার পৃষ্ঠ থেকে, যা জীবের পৃষ্ঠও, কারণ এটি পরিবেশগত শক্তির প্রভাব গ্রহণ করে। যেহেতু চেতনা পরিবেশের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখে, তাই এটি মানসিকতার অভ্যন্তর এবং পরিবেশের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণ করে। সচেতন ব্যক্তিত্ব সহজাত চালিকাশক্তির উপর একটি নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে এবং তাদের উপযুক্ত সময়ের জন্য সন্তুষ্টি বিলম্বিত করতে বাধ্য করে। ইডিপাস কমপ্লেক্সের গঠন সুপার-ইগোর জন্ম দেয়, যা সাইকির তৃতীয় উপ-ব্যবস্থা।

সুপার-ইগো, যেহেতু এটি গ্রুপ কোড এবং গ্রুপ আদর্শকে মূর্ত করে, তাই সামাজিক অনুমোদনের লক্ষ্য অর্জন করে। সাইকির তিনটি উপাদান রয়েছে - আইড (সাইকির সহজাত চালিকাশক্তি যা নৈর্ব্যক্তিক), অহং এবং অতি-ইগো।

প্রাপ্তবয়স্কদের যৌন কার্যকলাপে কামশক্তি তার সাধারণ প্রকাশ খুঁজে পায়। অতএব, এটিকে যৌন শক্তি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই কারণে, ফ্রয়েডকে, বরং অন্যায্যভাবে, একজন প্যান সেক্সুয়ালিস্ট হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

শুরুতে অহং এবং অতি-অহংকার কোনও কামশক্তির অধিকারী নয়। কিন্তু কামশক্তি নিজেই অত্যন্ত স্থানান্তরযোগ্য। এটিকে সেই আবেগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে যা এটির মালিক এবং অন্য সমাজে স্থানান্তরিত হতে পারে যা সমাজ অনুমোদিত। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় পরমানন্দ। অহং কামনা বাসনাকে দমন করে এবং এইভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত শক্তিকে সামাজিকভাবে অনুমোদিত চ্যানেলে স্থানান্তরিত করে। সভ্যতা যৌন ইচ্ছার দমনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তবে যৌন আবেগকে নির্বাপিত করা যায় না। এইভাবে উভয়ের মধ্যে একটি অন্তহীন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কামশক্তির চাহিদা এবং সভ্য সমাজের চাহিদা। তবে সভ্যতা অনিরাপদ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষা যেকোনো সময় বিস্ফোরিত হতে পারে এবং সভ্যতার চাপিয়ে দেওয়া কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে পারে। মানুষের মনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বা দ্বন্দ্ব হল সভ্যতার জন্য আমাদের যে মূল্য দিতে হয়।

সামাজিক সংগঠনের জটিলতার প্রতিটি বৃদ্ধির সাথে সাথে এই দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হয়। তবে, এটি সম্পূর্ণ গল্প নয়। ফ্রয়েড বিশ্বাস করেন যে জীবিত প্রাণী হিসেবে মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে আরও গভীর এবং মৌলিক দ্বন্দ্ব পেয়েছে। তিনি প্রবৃত্তিকে পূর্ববর্তী অস্তিত্বের অবস্থা এবং কার্যকারিতার পূর্ববর্তী স্তরে ফিরে যাওয়ার আদিম প্রবণতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন। একটি জীবন্ত প্রাণী ক্রমাগত অস্থির অবস্থায় থাকে। পদার্থের পূর্ববর্তী জড় পদার্থে জীবনের প্রথম আলোড়নের সাথে সাথে, এটি পূর্ববর্তী স্থিতিশীলতা এবং প্রাণহীনতার অবস্থায় ফিরে যাওয়ার অপরিহার্য তাড়না অনুভব করে। ফ্রয়েড বিশ্বাস করেন যে মৃত্যুর তাড়না আমাদের অস্তিত্বের মূলে নিহিত। মৃত্যু জীবনের অবিচ্ছেদ্য উত্তেজনা থেকে চূড়ান্ত মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়। মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা হল মানসিকতার সবচেয়ে গভীর আকাঙ্ক্ষা। আমরা বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি এবং নির্বাণের জন্য তার আকাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দিই।

ফ্রয়েড হয়তো শোপেনহাওয়ারের হতাশাবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কারণ তাঁর মতে, আমাদের জীবনের প্রতি 'না' বলার আহ্বান জানানো হয়েছে। সচেতনভাবে আমরা হয়তো আত্ম-বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করছি এবং তার জন্য প্রচেষ্টা করছি, কিন্তু অবচেতনভাবে আমরা আত্ম-ধ্বংসের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সামনে খোলা তিনটি বিকল্পের মধ্যে কোনটি বেছে নেওয়া উচিত - গ্রহণযোগ্যতা, প্রত্যাখ্যান বা নাম-প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মনোভাব? এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই বিলুপ্তির সম্ভাবনা থেকে পিছিয়ে আসে, সে আবেগের সাথে অমরত্বের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে এবং সে দৃঢ়ভাবে এমন বিশ্বাসের সাথে আঁকড়ে থাকে যা মৃত্যুর পরেও জীবনের ধারাবাহিকতার সাথে সম্পর্কিত। আমরা আরও লক্ষ্য করতে পারি যে বৌদ্ধধর্ম বাদে বিশ্বের প্রতিটি ধর্মের একটি অপরিহার্য অংশ। কাব্যিক কল্পনার সর্বোচ্চ উড়ান প্রায়শই এই আশা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে যে মৃত্যু জীবনের শেষ নয় বরং জীবনের একটি উচ্চতর অবস্থায় রূপান্তর।

আমরা ফ্রয়েডের ধর্মের প্রতি আচরণ সম্পর্কে সংক্ষেপে মন্তব্য করতে পারি। তার কাছে ধর্ম হল একটি মায়া যা মানুষ সৃষ্টি করেছে দুঃখ এবং দুঃখে পরিপূর্ণ পৃথিবীতে সান্ত্বনা এবং সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য। মানুষের সবচেয়ে শক্তিশালী আকাঙ্ক্ষাগুলি হতাশ হয়ে পড়ে এবং তাদের শক্তি বন্ধ হয়ে যায়। এটি কল্পনাপ্রসূত কার্যকলাপের মধ্যে একটি পথ খুঁজে পায় যা কল্পনা তৈরি করে। বাস্তব জগতে যেসব অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলি তৃপ্তি বঞ্চিত হয়, তারা আদর্শ স্তরে তা খুঁজে পায়। অচেতনের গভীরে সমাহিত পিতার প্রতিচ্ছবি, স্রষ্টা হিসেবে মহাবিশ্বের কাছে প্রক্ষেপিত হয়। ডঃ উইলিয়াম ব্রাউন, যিনি নিজে একজন মনোবিশ্লেষক, এই দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র ব্যতিক্রম করেছেন। তার ক্লিনিকাল কাজের ভিত্তিতে তিনি নিশ্চিত করেছেন যে রোগীর মনোবিশ্লেষণ করা হলে সাধারণত একটি জটিলতা অদৃশ্য হয়ে যায়। তবে ধর্ম অদৃশ্য হয় না, বরং মনোবিশ্লেষণ করা রোগীর মনেও তা শক্তিশালী হতে পারে।

আমরা আরেকজন প্রধান মনোবিজ্ঞানী, কার্ল জং-এর মতামত বিবেচনা করতে পারি। আসুন দেখি তিনি আন্তঃব্যক্তিক এবং আন্তঃব্যক্তিক দ্বন্দ্বের কারণগুলির উপর কী আলোকপাত করেন। তার ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব, কিছু উপায়ে, মনোবিশ্লেষণমূলক তত্ত্বের চেয়েও গভীর। তার দৃষ্টিতে, মানব ব্যক্তিত্ব একটি জটিল ব্যবস্থা যা বেশ কয়েকটি উপ-ব্যবস্থা নিয়ে গঠিত। এইগুলির মধ্যে যেকোনো একটি এবং অন্যগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। জং-এর ব্যক্তিত্ব তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল এবং জটিল, কিন্তু আমাদের এটি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। আমরা এর সেই অংশেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখব যা আমাদের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যের সাথে প্রাসঙ্গিক। বর্তমান যুগে অসন্তোষের প্রধান উৎস সম্পর্কে জং-এর পর্যবেক্ষণগুলি সাবধানতার সাথে বিবেচনার দাবি রাখে: এগুলি হল বিভিন্ন ব্যবস্থার বিপরীত প্রবণতাগুলি একে অপরের সাথে সংঘর্ষের সম্ভাবনা রয়েছে। সচেতন আকাঙ্ক্ষা অচেতনের বিপরীত হতে পারে।

একজন মানুষ সচেতনভাবে সম্পদ কামনা করতে পারে এবং অর্থ উপার্জনের জন্য নিজেকে নিবেদিত করতে পারে। কিন্তু তার অবচেতন মন শিল্পী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে পারে। এই ধরনের মানুষ, এমনকি যদি সে কোটিপতি হয়, তবুও অসুখী থাকে কারণ অচেতন মন হতাশ। দ্বন্দ্বের প্রতিকার ব্যক্তিত্বের মধ্যেই নিহিত। এর একটি অতিপ্রাকৃত কার্যকারিতা রয়েছে। এই ফাংশনটি বিভিন্ন ব্যবস্থার বিপরীত প্রবণতাগুলিকে একত্রিত করার এবং নিখুঁত পূর্ণতা (আত্মত্ব) এর আদর্শ লক্ষ্যের দিকে কাজ করার ক্ষমতা দিয়ে সজ্জিত।

জং-এর প্রতীক সম্পর্কে ধারণা ধর্মের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ধর্মীয় সত্যগুলি সাধারণত প্রতীকী ভাষায় প্রকাশ করা হয়। জং নিশ্চিত করেন যে একটি প্রতীকের দুটি দিক রয়েছে - পূর্ববর্তী এবং সম্ভাব্য। এর পূর্ববর্তী দিক থেকে, প্রতীকটি সঞ্চিত জাতিগত জ্ঞানকে প্রকাশ করে। এর সম্ভাব্য দিক থেকে এটি উন্নয়নের এমন একটি স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে যা মানুষের বর্তমান অবস্থানের চেয়ে অনেক এগিয়ে। মানুষের ভাগ্য, মানসিকতার সর্বোচ্চ বিবর্তন, প্রতীক দ্বারা তার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা এইভাবে দেখতে পাই যে ধর্মে প্রতীকগুলি উন্নয়নের উচ্চতর স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে।

জং এর  আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। তিনি বিশ্বাস করেন যে একটি তহবিল মানুষের মধ্যে মানসিক আকাঙ্ক্ষা তাকে মহাবিশ্বের সাথে একীভূত হওয়ার দিকে পরিচালিত করে। সে আবেগের সাথে এর সাথে একাত্ম হতে চায়। শান্তি ও সুখ অর্জন করতে হলে বাস্তবতার সাথে একীভূত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। কিন্তু আজকের জীবনের পরিস্থিতি এই আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করে দেয়, তাই আধুনিক মানুষ অসন্তুষ্ট এবং অসুখী বোধ করে, যদিও সে তার মনের এই অবস্থার কারণ জানে না।

## ৩. আত্মা সম্পর্কে কোরআনিক ধারণা

আত্মার কোরআনের ধারণাকে উপলব্ধি করার, বিচার করার এবং উপলব্ধি করার জন্য এখন আমাদের কাছে উপযুক্ত পটভূমি রয়েছে। আমরা আধুনিক মনোবিজ্ঞান এবং দর্শনে প্রচলিত "ব্যক্তিত্ব", "মানসিকতা" এবং "অভিজ্ঞতামূলক স্ব" শব্দগুলির পরিবর্তে ইচ্ছাকৃতভাবে পুরানো শব্দ "আত্মা" বেছে নিয়েছি। এই পছন্দের কারণগুলি এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। "আত্মা" শব্দটি সম্প্রতি প্রচলিত যেকোনো শব্দের চেয়ে কোরআনের "নফস" শব্দের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, এই প্রতিটি শব্দই একটি ক্ষণস্থায়ী ঘটনার ইঙ্গিত দেয় যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে আবির্ভূত হয় এবং অল্প সময়ের পরে সূক্ষ্ম বাতাসে অদৃশ্য হয়ে যায়, তার অস্তিত্বের কোনও চিহ্ন রেখে যায় না। এই ধরনের ঘটনা একটি নৈতিক প্রতিনিধি বা দায়িত্বশীল সত্তার মর্যাদা উপভোগ করতে পারে না। এটি কী এবং এটি যা অর্জন করে তা তার নিজের জন্য বা বিশ্বের জন্য কোনও তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এটি একটি মোমবাতির শিখার মতো যা এক মুহূর্তের জন্য জ্বলে ওঠে এবং তারপরে চারপাশের অন্ধকার দ্রুত গ্রাস করে। অবশেষে, অবাস্তব হওয়ার কারণে, এটি একটি অর্থপূর্ণ সম্পর্কে প্রবেশ করতে পারে না এবং সহযোগিতা যা আমরা কোরআনে পাই, তা আমাদেরকে নিজের সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা এবং তার ক্ষমতার ন্যায্য মূল্যায়ন তৈরি করতে সক্ষম করবে।

১. আত্মা বাস্তবতার অংশীদার হয় এবং ফলস্বরূপ স্থায়ীত্ব এবং স্থিতিশীলতা উপভোগ করে। এটি তার কর্মজীবন জুড়ে তার পরিচয় ধরে রাখে। এটি যে পরীক্ষাগুলির মধ্য দিয়ে যায় এবং যে প্রভাবগুলির মুখোমুখি হয় তা এটিকে নিজের থেকে ভিন্ন কিছুতে রূপান্তরিত না করেই পরিবর্তন করে। এটি একটি অব্যবহৃত আকারে তার কর্মজীবন শুরু করে কিন্তু অপরিমেয় সম্ভাবনায় সজ্জিত। এটি এই সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তবায়িত করতে পারে বা নাও পারে কিন্তু এটি কখনও নিজেই থেকে বিরত হয় না। এটি কোনও নিষ্ক্রিয় বস্তু নয়, যা বাহ্যিক শক্তি দ্বারা গঠিত; এটি মূলত সক্রিয় এবং গতিশীল। এর সাধারণ কার্যকলাপ হল সর্বোচ্চ অর্থে দীনি কার্যকলাপ, অর্থাৎ, এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ এবং বাস্তবায়ন, এবং এর মাধ্যমে পরম নিখুঁত স্ব-স্রষ্টার "নিকটবর্তী হওয়া" - যার গুণাবলী মানব সত্তার জন্য একটি বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে এবং এইভাবে তাঁর নৈকট্যের আনন্দ উপভোগ করে। মৃত্যু সত্তার কার্যকলাপকে শেষ করে না; এটি তার কর্মজীবনের একটি পর্ব মাত্র।

২. অধিকন্তু, কোরআনে যেমন সত্তা কল্পনা করা হয়েছে, তা স্বাধীন। স্বাধীনতা সত্তার একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পত্তি। যদিও এটি প্রকৃতির ক্ষেত্রে কাজ করে, তার কার্যকলাপ তার নিজস্ব প্রকৃতি থেকে প্রবাহিত হয় এবং প্রাকৃতিক কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয় না। ডঃ রাইন তার বই, নিউ ওয়ার্ল্ড অফ দ্য মাইন্ডে যথাযথভাবে মন্তব্য করেছেন: "মানুষের মধ্যে এমন কিছু সক্রিয় আছে যা পদার্থের নিয়ম অতিক্রম করে।"

কারণ সত্তা মুক্ত, এটি একটি নৈতিক এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত সত্তার জন্য কর্তব্য এবং বাধ্যবাধকতার কোনও অর্থ নেই। যদি আত্মা স্বাধীন না হত, তাহলে "অবশ্যই" এর দাবির প্রতি এটি সংবেদনশীল হত না এবং কেবল "অবশ্যই" এর দাবির প্রতি সাড়া দিত। এর দায়িত্ববোধ, স্বাধীনতার অনুভূতি থেকে উদ্ভূত; এটি কেবল স্বাধীন বলেই একটি নৈতিক জীবনযাপন করতে সক্ষম। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে আত্মার কর্মের একটি বাস্তব পছন্দ রয়েছে। এটি তার জন্য উন্মুক্ত কর্মের যেকোনো বিকল্প পথ বেছে নিতে পারে এবং তার পছন্দের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে তার উপর বর্তায়।

অবশ্যই, আত্মা পরম এবং সীমাহীন স্বাধীনতা উপভোগ করে না। এর স্বাধীনতা তার জীবনযাত্রার পরিবেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ। বাস্তব জগৎ বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন মাত্রায় তার কার্যকলাপ পরীক্ষা করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে। এই সীমাবদ্ধতার অধীনে আত্ম বিরক্ত হয়। এটি কেবল একটি নিয়ন্ত্রিত সমাজের পরিবেশে বিকাশ লাভ করে যার কর্মক্ষেত্র ক্রমবর্ধমান সংকোচনের শিকার হতে পারে। এই ধরনের সমাজ সকল ধরণের আত্ম-প্রকাশকে নিরুৎসাহিত করে এবং কর্মের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে। এই পরিস্থিতিতে, আত্মা ক্ষীণ হতে শুরু করে। এটি কেবল তার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে তার প্রাণশক্তি ফিরে পেতে পারে। স্বাধীনতার পরিবেশেই উচ্চ চিন্তাভাবনা এবং মহৎ কর্মকাণ্ডে আত্ম-উদ্ভূত হয়, প্রস্ফুটিত হয় এবং ফল দেয়। স্বাধীনতা আত্মার মূলে থাকে এবং বাহ্যিক বাধ্যবাধকতার অধীনে এটি নির্মূল করা যায় না। তবে, একটি নিয়ন্ত্রিত এবং সর্বগ্রাসী সমাজে, অথবা "অন্য-নির্দেশিত অনুসারী", অথবা ধর্ম ব্যবস্থায় আত্মা সংকীর্ণ এবং হতাশ বোধ করে। রাষ্ট্র, যার ক্ষমতা সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, আত্মার অখণ্ডতার জন্য একটি গুরুতর হুমকি। এটি ক্রমাগত এবং নিরলসভাবে আত্মার রাজ্যে প্রবেশ করছে। আধুনিক রাষ্ট্র দ্বারা ব্যক্তির স্বাধীনতা গুরুতরভাবে হ্রাস পেয়েছে, যেমনটি পরামর্শ, প্রচার এবং মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের বৈজ্ঞানিক কৌশল দ্বারা সজ্জিত। সরকার এখন ব্যক্তির মনকে এমন পরিমাণে প্রভাবিত করতে পারে যা অতীতে অপ্রত্যাশিত ছিল। এটি কেবল মানুষের প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডই নয়, তার অভ্যন্তরীণ চিন্তাভাবনাকেও নিয়ন্ত্রণ করুন। এই পরিস্থিতিতে, একমাত্র দুর্গ যেখানে স্বাধীনতা আশ্রয় নিতে পারে তা হল দীন। এটি স্থায়ী মূল্যবোধের কাঠামোর মধ্যে আত্ম-স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। অতএব, যেকোনো মূল্যে দীনকে রক্ষা করা উচিত, কারণ সেই অঞ্চল যেখানে মানুষ এখনও স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে এবং কেবল একটি যন্ত্রের কগ হিসেবে নয় বরং একটি স্বরূপ হিসেবে কাজ করতে পারে।

৩. আবার, কোরআনের দৃষ্টিতে সত্তা স্থির নয়। এর বিকাশের অসীম ক্ষমতা রয়েছে। নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে (অবশ্যই স্থায়ী মূল্যবোধ দ্বারা চিহ্নিত রেখা অনুসারে), এটি অস্তিত্বের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। কোরআন বলে, "নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করব" (৮৪: ১৯)। সত্তা তার সম্ভাবনাগুলি বিকাশ এবং বাস্তবায়িত করে নিজেকে পরিপূর্ণ করে। মৃত্যুর সাথে সাথে, মানুষ অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটায় না বরং অস্তিত্বের উচ্চতর স্তরে চলে যায়। কোরআন দীন বা জীবনযাত্রা নির্ধারণ করেছে, যা মানুষের জন্য

উচ্চতর স্তরের জন্য উপযুক্ত। যখন মানুষ উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়, তখন তার মনে হয় যেন তার জন্য স্বর্গের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, যখন সে নিম্ন স্তরে পড়ে যায়, তখন সে অনুভব করে যে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

কোরআন মানুষের জন্য বিকাশের এক বিশাল পথ খুলে দেয়। তার অগ্রগতির জন্য কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। প্রতীকের মাধ্যমে মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত। তবে প্রতীকগুলো বোঝার জন্য আমাদের প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। যখন আমরা উচ্চ স্তরের এক ঝলক দেখতে পাই, তখনই কেবল প্রতীকটি যেটিকে প্রতিনিধিত্ব করে তা বোধগম্য হয়। যখন আমরা কোন স্তরের দিকে ইঙ্গিত করে তার কোনও ধারণা পাই না, তখন প্রতীক নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। বুদ্ধিমত্তার সাথে কোরআন অধ্যয়ন করলে, এই প্রতীকগুলির প্রকৃত অর্থ বোঝার জন্য আমাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

৪. সত্তার মূল্য-অনুভূতির ক্ষমতা আছে। এটি তার অভিজ্ঞতার উচ্চতর গুণাবলীর প্রতি সংবেদনশীল এবং তাদের মূল্য উপলব্ধি করে। অ-মানব স্তরে মূল্য-অনুভূতি অস্তিত্বহীন। এটি তখনই সম্ভব হয় যখন সত্তার আবির্ভাব ঘটে। মূল্য-অনুভূতি নিম্ন বা উচ্চ স্তরের হতে পারে। অভিজ্ঞতার মাত্রা যত বেশি হবে, তত বেশি তৃপ্তিদায়ক হবে। যখন আত্মা উচ্চতর স্তরে পৌঁছানোর জন্য উপযুক্ত হয়, তখন সে এতদিন যা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল তার চেয়েও উচ্চতর মূল্যবোধের অভিজ্ঞতার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। উচ্চমূল্যের অভিজ্ঞতা আত্মাকে সমৃদ্ধ এবং উন্নত করে।

৫. আত্মা মূলত তার নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিকশিত হয়। এটি তার নৈতিক বা অনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উত্থিত বা পতনশীল। কোরআন বলে: "আত্মা (নফস) কেবল তাই অর্জন করে যা সে অর্জন করে" (৭৪: ৩৮) এবং এটি যা আত্মীকরণ করে, তা দিয়েই পরিবর্তিত হয়, ভালো বা খারাপ। আত্মা প্রতিফল আইনের অধীন। এটি আ'মাল-উল-হাসানাহ তার মূল্য বৃদ্ধি করে এবং আ'মাল-উস-সায়্যি'আহ তাকে অবনমিত করে। স্রষ্টা কখনও আত্মার উপর অন্যায় করেন না। কোরআন এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলেছে। যদি আত্মা অবনমিত হয়, তবে এটি তার নিজের কাজ। বাহ্যিক শক্তি আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না এবং স্রষ্টা কখনও তার সাথে অন্যায় আচরণ করেন না। তাই আত্মা তার নিজস্ব কর্মের ফলাফল ছাড়া আর কিছুই দ্বারা প্রভাবিত হয় না। দুঃখ-কষ্ট হলো আ'মাল-উস-সাইয়্যতের ফল।

৬. পরিশেষে, সত্তা বাস্তবতার অংশীদার হয় এবং ঐশ্বরিক গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটায়। "আমি তার (মানুষের) মধ্যে আমার রূহ - ঐশ্বরিক শক্তি - ফুঁকে দিয়েছি," কোরআন বলে (১৫:২৯)। নবী (সা.) বলেছেন, "তোমরা নিজেদের মধ্যে সেই গুণাবলী গড়ে তোল যা ঐশ্বরিক গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটায়।" এই গুণাবলী গড়ে তোলার মাধ্যমে, সত্তা বিকশিত হয় এবং স্রষ্টার কাছাকাছি আসে, অর্থাৎ।

আ'মাল-উস-সাইয়্যতের মাধ্যমে, এটি স্রষ্টা এবং বাস্তবতা থেকে আরও দূরে সরে যায়।
আ'মাল-উল-হাসানাহ, যেমনটি ইতিমধ্যেই দেখা গেছে, সত্তাকে শক্তিশালী করে এবং দুর্বল করে। স্রষ্টা এবং মানুষের সত্তার মধ্যে দূরত্ব পরেরটির দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং প্রথমটির দ্বারা হ্রাস পায় যা ঐশ্বরিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। এটি কোরআনের শিক্ষা। অধিকন্তু, সত্তা স্রষ্টার গুণাবলী নিজের মধ্যে বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে আরও বাস্তব হয়ে ওঠে এবং তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার সাথে সাথে আরও অবাস্তব হয়ে ওঠে। ঐশ্বরিক গুণাবলী একটি বস্তুনিষ্ঠ মডেল হিসেবে কাজ করে যার পরে মানুষ নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে।

## ৪. স্রষ্টা এবং মানুষ

আত্মা কেবল অন্য সত্তার সাথেই অর্থপূর্ণ সম্পর্কে প্রবেশ করতে পারে, এবং নিজেকে উপলব্ধি করার জন্য তাকে অন্যান্য সত্তার সাহায্য, সহানুভূতি এবং সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে হয় যাদের প্রকৃতি মূলত তার নিজস্ব প্রকৃতির মতো। অতএব, আত্মা অন্যান্য সত্তার সন্ধান করে এবং তাদের সান্নিধ্যে সমৃদ্ধ হয়। এটি এমন সত্তার মধ্যে থাকতে আকাঙ্ক্ষা করে যাদের সাথে এটি যোগাযোগ করতে পারে এবং যাদের আকাঙ্ক্ষা এবং কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই কারণে মানুষ কোথাও একাকী জীবনযাপন করে না, বরং সর্বত্র তাকে একটি সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র সমাজেই মানুষ মানসিক স্বাস্থ্য উপভোগ করতে পারে এবং দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে।

কিন্তু, সর্বোপরি, আত্মা পরম সত্তা বা স্রষ্টার সাথে সহযোগিতার জন্য, অর্থাৎ সহকর্মী হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। এই ধরনের সহযোগিতা এটিকে টিকিয়ে রাখে এবং পুনরুজ্জীবিত করে। এটি ছাড়া, আত্মা ঝুলে পড়ে, নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং জীবন এবং কার্যকলাপের জন্য তার উৎসাহ হারায়। এটি তখনই সুখী হয় যখন এটি উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপে নিযুক্ত থাকে এবং যখন এর মহাজাগতিক উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণের অনুভূতি থাকে তখন সবচেয়ে সুখী হয়। নিজের মধ্যে এক প্রবল তাড়না তাকে জীবন এবং জগতের অর্থ অনুসন্ধান করতে অনুপ্রাণিত করে। আমার চেহারায় ভৌত জগৎ উদ্দেশ্যহীন এবং অর্থহীন। ঈমান জীবন এবং জগৎকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। এই কারণেই সত্তা পরম সত্তা, সবচেয়ে নিখুঁত এবং আদর্শ সত্তার উপর বিশ্বাসের প্রতি আবেগ এবং দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে থাকে।

কোরআনে স্রষ্টার যে ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে তা সরল এবং মহৎ উভয়ই। স্রষ্টা হলেন সৃজনশীল শক্তি যা সমগ্র বিশ্ব জুড়ে কাজ করছে। স্রষ্টা প্রকৃতির দৃশ্যমান জগতে নিজেকে প্রকাশ করেন। কোরআন বলে, "যেদিকেই তুমি মুখ ফিরাও, স্রষ্টার মুখের দিকে তাকাও" (২:১১৫)। কোরআন আমাদেরকে মহান প্রাকৃতিক ঘটনাবলী - পৃথিবী ও আকাশ, বাতাস ও বৃষ্টি, সূর্য, চন্দ্র ও তারা - সম্পর্কে চিন্তাভাবনা এবং চিন্তা করার আহ্বান জানায়। সমস্ত প্রকৃতি স্রষ্টার সৌন্দর্য এবং মহিমা প্রতিফলিত করে। স্রষ্টার রুবুবিয়্যাহ

বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, যার অনুসারে তিনি প্রতিটি প্রাণীকে লালন-পালন করেন এবং লালন-পালন করেন, এবং এইভাবে সবচেয়ে নীচু জীবটি বিকাশ লাভ করে এবং পরিপক্কতা এবং আপেক্ষিক পরিপূর্ণতা অর্জন করে। যেহেতু স্রষ্টা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন, তাই বিশ্ব প্রক্রিয়া উদ্দেশ্যহীন এবং অর্থহীন নয়। স্রষ্টা মহাজাগতিক প্রক্রিয়াটিকে একটি মহান গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করেন এবং নির্দেশ দেন। মানব ইতিহাসে একটি ঐশ্বরিক পরিকল্পনা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে তৈরি হচ্ছে এবং মানুষের জন্য একটি চমৎকার ভাগ্য অপেক্ষা করছে। কোরআনে, স্রষ্টাকে সর্বব্যাপী এবং সর্বব্যাপী উভয় রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি পৃথিবীতে একটি সৃজনশীল তাড়না হিসেবে কাজ করেন এবং এর বাইরেও এর ভিত্তি হিসেবে বিদ্যমান। তিনি প্রকৃতিতে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং তবুও এটিকে অতিক্রম করেন। তিনি চিরন্তন এবং তবুও পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রতিদিন তাঁর মহিমার একটি নতুন পর্যায় আমাদের দৃষ্টিতে উপস্থাপিত হয় (৫৫: ২৯)।

কোরআন মানুষ এবং স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্কের উপর নতুন আলোকপাত করে। এটি অংশীদারিত্বের একটি, যদিও অংশীদারদের মধ্যে একটি অন্যটির চেয়ে অপরিমেয়ভাবে উচ্চতর। তবে, মানুষকে স্রষ্টা থেকে পৃথক করে এমন প্রশস্ত ব্যবধান তাদের মধ্যে ফলপ্রসূ সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি অপ্রতিরোধ্য বাধা নয়। মানুষ একটি স্বত্ব দ্বারা সমৃদ্ধ, এবং আমরা দেখেছি যে একটি স্বত্ব কেবল অন্য একটি স্বত্বের সাথে সহযোগিতা করতে পারে। একটি স্বত্বের অধিকারী হওয়ার কারণে, মানুষ, তার নম্র ক্ষমতায়, ঐশ্বরিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্রষ্টার সাথে একসাথে কাজ করতে পারে। পৃথিবীর ভবিষ্যতের উপর মানুষের একটা প্রভাব আছে এবং একজন স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে সেই ভবিষ্যৎ কী হবে তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা তার আছে, তা যত সামান্যই হোক না কেন। এটি মানুষকে এই অনুভূতি প্রদান করে যে সে ঐশ্বরিক পরিকল্পনার সাফল্যে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখছে। কোরআন মানুষকে আন্তরিকভাবে স্রষ্টার সাথে কাজ করার জন্য আহ্বান জানায় যাতে এমন একটি পৃথিবী তৈরি করা হয় যেখানে ন্যায়বিচার এবং কল্যাণ কেবল ধারণা নয় বরং বাস্তবতা। সে মহাবিশ্বের কল্যাণের সমষ্টিতে অবদান রাখতে পারে এবং রাখা উচিত।

মানুষের স্বার্থপর এবং লোভী প্রবৃত্তি তাকে স্বার্থপর এবং লোভী করে তোলে এবং তাকে তার সহকর্মীদের সাথে দ্বন্দ্বে ফেলে। ফলে সে ঐশ্বরিক পরিকল্পনার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। যাইহোক, তার সৃজনশীল প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত এবং লালন করে, যা তাকে মূল্যবোধ তৈরি করতে সক্ষম করে, সে মহাবিশ্বের নৈতিক শৃঙ্খলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করতে সক্ষম হবে এবং পূর্ণ আত্ম-উপলব্ধি এবং পরিপূর্ণতার লক্ষ্যের দিকে স্থিরভাবে এগিয়ে যাবে। একই সাথে, সে বিশ্বকে মূল্যবোধ দিয়ে সমৃদ্ধ করবে এবং এটিকে মুক্ত এবং সৎ উভয় মানুষের জন্য উপযুক্ত আবাসস্থল করে তুলবে। সে ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য অর্জনে তার সামান্য অংশ নেবে। কোরআন মানুষকে কল্যাণের জন্য অন্য মানুষের সাথে সহযোগিতা

করার আহ্বান জানিয়েছে। কোরআন বলে "ন্যায় ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য করো", (৫:২)।

বিগত যুগে বিবর্তন অত্যন্ত ধীর গতিতে এগিয়েছে, এবং প্রায়শই, প্রাণীজগতে একটি উচ্চতর গুণের আবির্ভাবের আগে লক্ষ লক্ষ বছর অতিবাহিত হয়েছে। একটি মুক্ত সচেতন সত্তার আবির্ভাবের সাথে সাথে, সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যখন স্রষ্টার নির্দেশনায় মুক্ত মানুষ বিশ্ব প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তখন বিবর্তনের গতি অবশ্যই ত্বরান্বিত হবে। কোরআন আমাদের স্পষ্টভাবে যে সঠিক পথ দেখিয়েছে তা অনুসরণ করে, আমরা আমাদের সমস্ত সুপ্ত সম্ভাবনা বিকাশ করতে পারি এবং পরিপূর্ণতার চূড়ান্ত লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারি।

মানুষ যখন একটি সত্তার মালিক, তখন তার স্রষ্টা বা পরম সত্তার সাথে একটি স্বাভাবিক সখ্যতা থাকে। এই সখ্যতা তাকে অধিকার প্রদান করে এবং স্রষ্টার ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করার দায়িত্ব তাকে অর্পণ করে। এইভাবে কাজ করার মাধ্যমে মানুষ কেবল নিজেকে উপলব্ধি করে না বরং মানব সমাজের অগ্রগতিতেও প্রেরণা যোগায়।

পরম সত্তা যেভাবে মহাবিশ্বে তার গুণাবলী প্রকাশ করে, তা মানুষের মধ্যে বিস্ময়, শ্রদ্ধা এবং প্রশংসার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই যাকে প্রশংসা করে তা অনুকরণ করে, তাই সে নিজেকে বিকশিত করার এবং একজন সসীম সত্তার পক্ষে যতটা সম্ভব স্রষ্টার মতো হওয়ার চেষ্টা করে। স্রষ্টা একটি মডেল হিসেবে কাজ করেন এবং একটি বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ড হিসেবেও কাজ করেন যার সাথে মানুষ নিজেকে তুলনা করতে পারে এবং আত্ম-উপলব্ধিতে তার অগ্রগতি বিচার করতে পারে। মানুষের স্রষ্টাকে একজন সহকর্মী এবং আদর্শ হিসেবে প্রয়োজন।

## ৫. ধর্ম বা দ্বীন

ভূমিকায় ইতিমধ্যেই যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ধর্মের জন্য কোরআনের শব্দটি "দ্বীন"। তবে, দ্বীন কেবল ধর্মের সমার্থক নয়। দ্বীন হল ধর্মের চেয়ে বিস্তৃত এবং গভীর ধারণা যা সাধারণত বোঝা যায়। ধর্মকে সাধারণত কিছু মতবাদ, একটি বিস্তৃত আচার-অনুষ্ঠান এবং তুচ্ছ অভ্যাসের একটি সেট বলা হয়। জীবনের সাধারণ কার্যকলাপগুলি বেশ কয়েকটি নিয়ম এবং নিষেধাজ্ঞা দ্বারা আবদ্ধ থাকে। খাওয়া এবং বিবাহের মতো সহজ কাজগুলি উপ-পৃষ্ঠ জটিল আনুষ্ঠানিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আচরণ ক্ষুদ্রতম বিশদে নিয়ন্ত্রিত হয়। কোরআনে উপস্থাপিত দীন কোনও আচার বা আনুষ্ঠানিকতার বিষয় নয়। এটি জীবনের বিস্তৃত লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের কর্মসূচীর সাথে সম্পর্কিত। দীন মানুষের উদ্যোগ এবং বিচক্ষণতার পূর্ণ সুযোগ দেয়। এটি একজন স্বাধীন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য, যার নিজের জন্য চিন্তা

করার, বিচার করার এবং কাজ করার সাহস রয়েছে। দীন এমন বিস্তৃত নীতি প্রদান করে যা মানুষকে জীবনের অভিযানে নির্দেশনা দেয় এবং যা তাকে আত্ম-উপলব্ধি এবং সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম করে। তবে, এই নীতিগুলি অন্ধভাবে অনুসরণ করার জন্য নয়। এগুলি বুদ্ধিমত্তা এবং পূর্বচিন্তার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। দীন-এর সারমর্ম উপলব্ধিকারী ইকবাল মন্তব্য করেছেন যে এটি "আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে মানব সমাজের বিবর্তনকে পরিচালিত করে এমন একটি সার্বজনীন গুরুত্বের মৌলিক নীতি" [৭] ব্যাখ্যা করে। অতএব, দীন-এ কঠোর এবং দ্রুত নিয়মের কোনও স্থান নেই। দীন তার উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে পূরণ করেছে যদি এটি জীবনের আদর্শকে সাহসী রেখায় চিত্রিত করে, তার সাধনা পরিচালনাকারী নীতিগুলি ব্যাখ্যা করে এবং আদর্শের প্রতি মানুষের উৎসাহ ও নিষ্ঠাকে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামের দীন মানুষের উপর নিয়ম-কানুন এবং নিয়ম-কানুনগুলির ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয় না। এটি কেবল যেখানে প্রয়োজন সেখানেই তাকে নির্দেশনা দেয় এবং তাকে স্থায়ী মূল্যবোধ প্রদান করে। অনুপ্রেরণা এবং দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য মানুষের দ্বীনের সাহায্য নেওয়া উচিত; যদি সে কেবল আচার-অনুষ্ঠান এবং আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনে আগ্রহী হয় তবে তার অন্য কোথাও তাকানো উচিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, দীন একটি আফিম নয়, যেমন মার্ক্সীয়রা দাবি করেন, বরং একটি উদ্দীপক এবং কর্মের জন্য একটি উদ্দীপক। দীন আমাদের মধ্যে জিনিস যেমন আছে তেমনই সন্তুষ্টি জাগায় না; এটি আমাদের সমাজের উন্নততর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে, ধর্ম কর্তৃত্বের প্রতি নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণ এবং সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রেরণা দেয়, তা যতই নিপীড়ক এবং অন্যায্য হোক না কেন। সর্বোপরি, এটি আমাদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেয়। দীন আমাদেরকে অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার এবং ন্যায়বিচারের কারণকে সক্রিয়ভাবে প্রচার করার আহ্বান জানায়।

"দ্বীন"-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য ধর্মের সাথে এর সাধারণ অর্থে পার্থক্য করে। "দ্বীন" হল দূরদর্শী: এর আদর্শ মানুষকে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। লোকবর্তিকার মতো এটি তার পদক্ষেপগুলিকে একটি গৌরবময় ভাগ্যের দিকে পরিচালিত করে। "দ্বীন" চায় না যে মানুষ দূরবর্তী এবং অন্ধকার অতীতের কোন স্বর্ণযুগের দিকে তাকিয়ে থাকুক, বিস্মিত হয়ে থাকুক: মানুষের কর্তব্য হল তার পদক্ষেপকে পিছনে ফিরে না দেখে বরং ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া। "দ্বীন" হল সম্ভাব্য, পশ্চাদপসরণমূলক নয়। এটি "পেছনের দিকে" নয়, "সামনের দিকে"। এই কারণেই "দ্বীন" হল আশার উৎস এবং আশাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়; এতটাই যে আশা ত্যাগ করাকে কুফর হিসেবে গণ্য করা হয় (কোরআন, ৩৯:৫৩; ১২:৮৭)।

পরিশেষে, কোরআন স্পষ্ট প্রত্যয়ের উপর জোর দেয় যাকে এটি ঈমান বলে। কোরআনের বেশ কয়েকটি আয়াত স্পষ্ট করে যে "দ্বীন"-এর ক্ষেত্রে জোরপূর্বক কোন স্থান নেই। "দ্বীন" মানুষকে স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে হবে। যে ধর্ম একজন ব্যক্তির উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়, তার তার জন্য বা সমগ্র বিশ্বের জন্য কোন মূল্য নেই। মানুষের দ্বীনের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে পছন্দ করার অধিকার

রয়েছে। "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোরজবরদস্তি নেই," কোরআন জোর দিয়ে বলে (২:২৫৬)। যদি এই আদেশটি সরল বিশ্বাসে গৃহীত হয় এবং পালন করা হয়, তবে এটি অবশ্যই সমস্ত ধর্মান্ধতা এবং ধর্মীয় বিরোধের অবসান ঘটাবে। সঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে, এই আদেশটি চিন্তাভাবনা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার সনদ, এমনকি যারা এতে বিশ্বাস করে না তাদের জন্যও। অতএব, দ্বীন মানুষের হাতে পছন্দ এবং কাজ করার ক্ষমতা ছেড়ে দেয়। তার ব্যক্তিগত উদ্যোগ, চরিত্রের শক্তি, সাহস, দৃঢ়তা, সংকল্প এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মানুষ তার ভাগ্য গঠন করতে পারে এবং নিজের জন্য এমন একটি ভবিষ্যত অর্জন করতে পারে যা অবশ্যই তার অধিকারভুক্ত হবে যদি সে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ঐশ্বরিক ওহী গ্রহণ করে এবং অনুসরণ করে।

## ৬. ইসলাম

পূর্ববর্তী অংশে দ্বীনের ধারণাটি স্পষ্ট করা হয়েছে। স্পষ্টতই, ইসলাম দ্বীনের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। ইকবাল যেমন বলেছেন, "ইসলাম কোন মতবাদ নয়, পুরোহিতত্বও নয়, আচার-অনুষ্ঠানও নয়।"[৮]

এটি এই সকলের চেয়ে অনেক বেশি কিছু। এটি স্রষ্টার নির্দেশমূলক শক্তি এবং তাঁর আইনের অটল কার্যকারিতার স্পষ্ট অনুভূতি। এটি স্রষ্টার জ্ঞান এবং তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস। এটি জীবনের ঊর্ধ্বমুখী প্রগতিশীল ধারা এবং গতিতে আন্তরিক অংশগ্রহণ এবং স্রষ্টার সৃজনশীল শক্তির প্রকাশ হিসাবে দেখা জগত। ইসলাম জীবন পরিপূর্ণতার পক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং জীবন-অস্বীকৃতিকে মানুষের অযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। এটি আমাদেরকে তথ্যের মুখোমুখি হতে এবং সেগুলি থেকে সঙ্কুচিত না হয়ে কল্পনার আশ্রয় নিতে নির্দেশ দেয় এবং আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার করতে বাধ্য করে। তপস্যা, নীরবতা এবং সন্ন্যাসবাদ সবই ইসলামের কাছে ঘৃণ্য। ইসলাম সামাজিক জীবন এবং মানুষের জন্য এর মূল্যের উপর জোর দেয়, এবং শরীরকে একটি মন্দ এবং "আধ্যাত্মিক" অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হিসাবে বিবেচনা করে না। এটি চায় মানুষ শরীরের অধিকারের পাশাপাশি আত্মার অধিকারকেও সম্মান করুক। এই কারণে, ইসলাম আত্মত্যাগ এবং আত্ম-ক্ষোভকে অনুমোদন করে না।

এর মধ্যে রহস্যময়তা রয়েছে এবং এতে রহস্যবাদের কোন স্থান নেই। এর লক্ষ্য স্থায়ী মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে একটি সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেখানে এর সকল সদস্য স্বাধীন এজেন্ট হিসেবে কাজ করে একটি উচ্চতর এবং মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য প্রচেষ্টা চালাবে যাতে এই পৃথিবীতে মানুষের বাসস্থান আরও সুন্দর হয়ে ওঠে এবং তাকে জীবনের আরও বিবর্তনীয় পর্যায়ের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।

ইসলাম, একটি জীবন্ত শক্তি হিসেবে, মানবজাতির নৈতিক উন্নতি এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক একীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাবে। এটি মানবজাতির জ্ঞান ও সংস্কৃতিতে

মূল্যবান অবদান রাখতে থাকবে। সর্বোপরি, এটি মানুষের "আধ্যাত্মিক" [৯] জীবনকে সমৃদ্ধ করতে থাকবে এবং এইভাবে তার সত্তা বা তার ব্যক্তিত্বকে শক্তিশালী ও উন্নত করবে।

### *তথ্যসূত্র*

১. যখন ইকবাল ইসলামের প্রসঙ্গে "ধর্ম" শব্দটি ব্যবহার করেন, তখন এটিকে দ্বীন হিসাবে বোঝা উচিত।

২. এম. ইকবাল, ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন, পৃষ্ঠা ১৭২।

৩. প্রাগুক্ত., পৃষ্ঠা ২.

৪. প্রাগুক্ত.

৫. আর্নেস্ট ক্যাসিরার, মানুষের উপর একটি রচনা, পৃষ্ঠা। ৭২.

৬. ইকবাল, অপ. সাইট., পৃ. ১৭৭.

৭. প্রাগুক্ত., পৃ. ১৭০.

৮. প্রাগুক্ত., পৃ. ১৭৮.

৯. "আত্মা" বা "আধ্যাত্মিক" শব্দটি খ্রিস্টীয় মতাদর্শে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং কোরআন কোথাও এই অর্থে ব্যবহার করেনি। কোরআন মানুষের বস্তুগত ও নৈতিক অগ্রগতি বা অবক্ষয়ের কথা বলেছে, "আধ্যাত্মিক" নয়। এমনকি মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কেও বলা হয়েছে, "এবং অবশ্যই তোমার রয়েছে মহৎ নৈতিকতা" (৬৮:৪)। "আধ্যাত্মিক" শব্দটি এই বইতে ইংরেজি ভাষায় প্রচলিত ব্যবহারের পরে ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ শারীরিক ব্যবহারের বিপরীতে, এবং ইসলাম বা মুসলমানদের প্রসঙ্গে যেখানেই এটি ব্যবহার করা হোক না কেন কেবল সেই অর্থেই নেওয়া উচিত।

# অধ্যায় ৩

## মানুষের আত্মা এবং তার ভাগ্য

### ১. আত্মা এবং শারীরিক দেহ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে, আমরা সংক্ষেপে মানব ব্যক্তিত্ব বা আত্মার উৎপত্তি এবং বিকাশের মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ বিবেচনা করেছি। এই শব্দগুলো মানুষের ঐক্যবদ্ধ এবং সমন্বিত সারাংশের ক্ষেত্রে বিনিময়যোগ্য, এবং কোনটি ব্যবহার করা হচ্ছে তা অমূল্য। যাইহোক, "আত্ম" শব্দটি তখনই পছন্দ করা হবে যখন মানুষের স্বায়ত্তশাসিত সত্তা হিসেবে কল্পনা করা সারাংশের কথা বলা হবে, যা যদিও একটি ভৌত ম্যাট্রিক্সে বিকশিত হয়েছে, তবুও এটি টিকে থাকতে এবং নিজস্ব স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম। এখন আমাদের প্রধান উদ্বেগ হবে স্ব-প্রকৃতি এবং ভাগ্যের উপর।

ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তা নিঃসন্দেহে ভৌত জীবের উপর কেন্দ্রীভূত। কিন্তু বিশ্বাস করার বৈধ কারণ রয়েছে যে এটি শরীরের সাথে অভিন্ন নয়। মানুষ তার ভৌত ব্যক্তিসত্তা থেকেও বেশি কিছু, এটি সহজেই দেখা যায় যে তার শরীর ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, তার অভ্যন্তরীণ গঠন এবং বাহ্যিক চেহারা উভয় ক্ষেত্রেই, তার ব্যক্তিসত্তা অপরিবর্তিত রয়েছে। তাহলে, তার আসল ব্যক্তিসত্তা কী? উত্তর হল, অহং বা "আমি" যার আসল প্রকৃতি আমরা কিছুই জানি না যতদূর পর্যন্ত এটি তার আচরণ বা কার্যকলাপে নিজেকে প্রকাশ করে যা দেহ দ্বারা মধ্যস্থতা করা হয়। জীববিজ্ঞান আমাদের বলে যে মানবদেহ একটি জৈব কাঠামো, লক্ষ লক্ষ জীবন্ত কোষ দ্বারা গঠিত যা ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। যে মুহূর্তে একটি কোষ অস্তিত্বহীন হয়ে যায়, সেই মুহূর্তেই তার স্থলাভিষিক্ত হয় একটি নতুন কোষ। কারিগরি ভাষায়, বিপাক প্রক্রিয়াটি অ্যানাবোলিজম প্রক্রিয়ার দ্বারা ভারসাম্যহীন হয়। বিভাজন এর পরে দ্রুত পুনঃসংহতকরণ ঘটে। এর ফলে, নতুন কোষ তৈরি হচ্ছে এবং পুরানো কোষগুলির স্থান দখল করছে। ধ্বংস এবং নির্মাণ পাশাপাশি চলছে। অতএব, মানবদেহ ক্রমাগত একটি নতুন কোষে পরিবর্তিত হচ্ছে, এতটাই যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্নবীকরণ করতে তিন বছরের বেশি সময় লাগে না, যেমন কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, সাত বছর সময় লাগে না।

এখন, যদি " ব্যক্তিসত্তা" বলতে আমরা শারীরিক ব্যক্তিসত্তাকে বলতে চাই, অর্থাৎ, যে দেহ তিন বা সাত বছর পর পর সম্পূর্ণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই তার দেহ যতবারই অস্তিত্বহীন হয়ে যায় ততবারই তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। যতই অসম্ভব হোক না কেন, যদি মানুষকে তার শরীরের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব যে সে প্রতি তিন বা সাত বছর অন্তর একটি নতুন ব্যক্তিতে পরিবর্তিত হয়। এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহারিক পরিণতি সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে। ধরুন, A, B-এর বন্ধু হওয়ায়, ধৈর্য ধরে বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করে, এই আশায় যে B তার

সুবিধাজনক সময়ে টাকা ফেরত দেবে। যখন A মনে করে যে সে যথেষ্ট অপেক্ষা করেছে, তখন সে টাকা দাবি করে। B, তবে, তাকে বলে যে, যাদের মধ্যে লেনদেন হয়েছে, তাদের দুজনের অস্তিত্বই আর নেই। A জোর দিয়ে বলতে পারে যে সে লেনদেনটি মনে রাখে এবং B সেই ব্যক্তি যিনি টাকা ধার করেছিলেন, কিন্তু B জোর দিয়ে বলতে পারে যে সে নিজেই টাকা ধার করেনি এবং তাই টাকা ফেরত দিতে বাধ্য নয়।

আবার, ধরুন, একজন মহিলা একদিন সকালে তার স্বামীকে বলেন যে, দশ বা বারো বছর আগে যে মহিলাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন, তিনি এখন সম্পূর্ণ নতুন মহিলাতে রূপান্তরিত হয়েছেন এবং তাই, বিবাহ চুক্তিটি টিকে নেই এবং তিনি আর তার স্ত্রী নন। এটা স্পষ্ট যে, "নিজে" বলতে যদি আমরা শারীরিক ব্যক্তিসত্তা বলতে চাই, তাহলে এই ধরনের অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত অনিবার্য। যতই গুরুত্ব সহকারে হোক, বিজ্ঞানী বলতে পারেন যে, শারীরিক ব্যক্তিসত্তা অল্প সময়ের মধ্যেই রূপান্তরিত হয়। এবং তাই আমরা সেই সময়ের আগে যা করেছি তার জন্য দায়ী নই, কেউ, এমনকি বিজ্ঞানী নিজেও, এটিকে আচরণের সঠিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ, দেহ যতই পরিবর্তিত হোক না কেন, আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় এর ফলে প্রভাবিত হয় না। আমাদের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত আমরা একই থাকব। শারীরিক সত্ত্বা, দেহ, পরিবর্তিত হতে পারে কিন্তু আসল সত্ত্বা, অহংকার বা "আমি" নয় যা আমাকে আমার মতো করে তোলে। ব্রাইটম্যানের উদ্ধৃতি: যদি একজন ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতার সমস্ত পরিবর্তনের মাধ্যমে সত্যিকারের অভিন্ন ঐক্য না হন, তাহলে আধ্যাত্মিক বিকাশ অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, নৈতিক বিকাশ এই ধারণার উপর নির্ভর করে যে আমি অতীতের উদ্দেশ্য এবং চুক্তির জন্য নিজের কাছে দায়ী; তবুও যদি আমি সেই ব্যক্তি না হই যিনি সেই উদ্দেশ্যগুলি উপভোগ করেছেন এবং চুক্তি করেছেন, তাহলে আমি কোনও দায়িত্ব বা ক্রমাগত বৃদ্ধি অনুভব করি না। [১]

এর প্রতি বিজ্ঞানী হয়তো বলতে পারেন যে বিজ্ঞান হল জ্ঞানের নিঃস্বার্থ সাধনা, এবং সত্যকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, এমনকি যদি এর অপ্রীতিকর পরিণতি হয়। তিনি উল্লেখ করতে পারেন যে তার আগ্রহ বিজ্ঞানে, নীতিগত আচরণ এবং সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু এই বিজ্ঞানী কি স্বীকার করতে প্রস্তুত যে, তার তত্ত্ব অনুসারে, তিনি ছয় বা সাতবার সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিতে পরিবর্তিত হয়েছেন? তিনি কি তার পুরো কর্মজীবন অস্বীকার করে বলবেন যে, অন্য কেউ স্কুলে গিয়েছিলেন এবং আরও একজন যিনি এক ডজন বছর আগে পরীক্ষাগারে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করেছিলেন? স্পষ্টতই না। আবার, নতুন কোষ দ্বারা পুরাতন কোষের প্রতিস্থাপন, যার ফলে শরীরের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে, একটি ধীর, ধীরে ধীরে এবং সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া, এতটাই যে আমরা বলি যে পরিবর্তনটি একই শরীরে ঘটছে।

এটি কি দেখায় না যে পরিবর্তনশীল দেহে এমন কিছু আছে যা স্থির থাকে? আমরা কীভাবে এর জন্য দায়ী থাকব? এর কারণ কি মৃত কোষগুলি কোনওভাবে শরীরের শারীরিক পরিচয় নতুন কোষে স্থানান্তরিত

করেছে? এটি অবশ্যই সম্ভব নয়। তাহলে আত্মার পরিচয়ের রহস্য কী? উত্তর, যা অন্তত অসম্ভব নয়, তা হল যে শারীরিক আত্মার পিছনে একটি আত্মা রয়েছে যা অনেক বেশি বাস্তব, যদিও অনেক বেশি সূক্ষ্ম, যাকে আমরা অহং, "আমি" বা ব্যক্তিত্ব হিসাবে জানি। "আমি" বা অহং, যা আমার ব্যক্তিত্বের মূলে রয়েছে এবং যার উপর সমস্ত পরিবর্তন ভিত্তি করে তৈরি বলে মনে হয়, কারণ এটি আমার মনে এবং আমার শরীরে ক্রমাগত পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও টিকে থাকে। বারদ্যায়েভ সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে: "ব্যক্তিত্ব হল পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তনীয়তা।"[২]

আমার সমস্ত কাজ, চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, জ্ঞান এবং ইচ্ছা অহংকার দ্বারা মালিকানাধীন যা আমাকে এমন পরিবর্তনের মধ্যে আমার পরিচয় ধরে রাখতে সক্ষম করে যা আমার শরীরকে ভিন্ন কিছুতে রূপান্তরিত করছে। হেগেল পর্যবেক্ষণ করেন: "আমার অনেক ধারণা আছে, আমার মধ্যে প্রচুর চিন্তাভাবনা আছে, এবং তবুও আমি এই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, একটিই রয়েছি।"[৩]

তার চিন্তা-উদ্দীপক রচনা "স্বার্থ ও স্রষ্টাত্ব"-এ, অধ্যাপক এ.সি. ক্যাম্পবেল একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় উৎসর্গ করেছেন এই প্রশ্নের আলোচনার জন্য যে একটি ভৌত দেহ আত্মার জন্য অপরিহার্য কিনা, এবং নেতিবাচকভাবে উত্তর দিয়েছেন। "ছোট বাচ্চারা," তিনি বলেন, "তাদের দেহ আছে তা জানার অনেক আগেই জৈব সংবেদন অনুভব করে।"[৪]

তিনি আরও বলেন, "এমন কিছু রোগগত অবস্থার প্রমাণ পাওয়া গেছে যেখানে জৈব সংবেদন সম্পূর্ণরূপে স্থগিত থাকে এবং রোগী আত্মসচেতন থাকে।" ডঃ এফ.আর. টেন্যান্ট আমাদের বলেন যে "যখন রোগের মাধ্যমে, কো-এনেস্থেসিস স্থগিত থাকে, তখন একজন রোগী তার শরীরকে একটি অদ্ভুত এবং প্রতিকূল জিনিস হিসাবে বিবেচনা করবেন, তার নিজের নয়।"[৫]

অতএব, এটা স্পষ্ট যে মানুষের আত্মা শরীরের সাথে অভিন্ন নয় বা শারীরিক আইনের অধীন নয়। আত্মা শরীরের থেকে স্বাধীন এবং ব্যক্তির সারা জীবন ধরে অপরিবর্তিত থাকে। তাই "আমি," অহংকার বা আমার আসল আত্মা, যা আমাকে আমি যা ভাবি, অনুভব করি বা কাজ করি তার দায়িত্ব নিজের উপর নিতে বাধ্য করে। যেহেতু কাজগুলি আমার ইচ্ছায় করা হয়েছিল, তাই আমি তাদের পরিণতি থেকে পালাতে পারি না, তাদের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, ভাল বা খারাপ। "ব্যক্তিগত পরিচয় ছাড়া," যেমন ব্র্যাডলি বলেছিলেন, "দায়িত্ব নিছক অর্থহীন।"[৬]

## ৩. আত্মা এবং স্মৃতি

তবে এটা যুক্তিযুক্ত যে আমাদের পরিচয় অহংকার উপর নির্ভর করে না, যা কেবল আমাদের চেতনার অবস্থার সমষ্টি। এটি স্মৃতি যা আমাদের অভিজ্ঞতাগুলিকে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করে আমাদের স্ব-পরিচয়ের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। যদি স্মৃতি কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে আমরা আমাদের পরিচয়ের বোধ হারিয়ে ফেলব। এই দৃষ্টিভঙ্গির অপ্রতুলতা সহজেই প্রমাণিত হতে পারে। এটা সত্য যে মানসিক ঘটনার বাইরে আত্মাকে বিদ্যমান বলে কল্পনা করা যায় না, কারণ শরীরকে যে অঙ্গগুলির দ্বারা এটি গঠিত তা ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। কিন্তু জীবন্ত দেহ যেমন তার অংশগুলির সমষ্টির চেয়ে বেশি কিছু, তেমনি আত্মাও মানসিক ক্রিয়াকলাপের চেয়ে বেশি কিছু। মন এবং শরীর উভয়ই সম্পূর্ণ এবং এগুলিকে অবশ্যই সেভাবেই বিবেচনা করা উচিত। এগুলিকে অংশে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা, যেন অংশগুলি বাস্তব এবং সম্পূর্ণ নয়, তাদের আসল প্রকৃতি মিস করা। সম্পূর্ণরূপে আত্মার নিজস্ব একটি বাস্তবতা রয়েছে। এটি "আমি" বা আত্মা যা ইচ্ছা করে, চিন্তা করে এবং চার্জ করে, এটি বিভিন্নভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। আত্মকে নিশ্চিত করার অর্থ হল তার পরিচয় নিশ্চিত করা। বিষয়টি সহজেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরুন, যার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত, সে কিছু ধরতে চায়। সে তা ধরতে চায় কিন্তু তার হাত নিষ্ক্রিয় থাকে। এটা স্পষ্ট যে হাতটি ইচ্ছুক এজেন্ট হতে পারে না কারণ হাতটি অক্ষম হয়ে গেলেও ইচ্ছুক এজেন্ট ঘটে। ইচ্ছুক এজেন্টটি রয়ে গেছে যদিও এটি সাধারণত যে যন্ত্রটি ব্যবহার করত তা আর কোনও কাজে আসে না। আবার, আত্মা মস্তিষ্কের টিস্যুগুলির মাধ্যমে তার অতীত স্মরণ করে যা অতীতের অভিজ্ঞতার চিহ্ন ধরে রাখে। যদি মস্তিষ্ক গুরুতরভাবে আহত হয়, তাহলে আত্মা এমন একটি যন্ত্র হারিয়ে ফেলেছে যা অতীত স্মরণ করার জন্য অপরিহার্য ছিল। যদি আমাদের রেডিও সেটটি অকার্যকর হয়, তাহলে আমরা দিনের সম্প্রচার অনুষ্ঠান শুনতে পারি না, তবে আমরা বিশ্বাস করি না যে সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেছে। আবার, ধরুন আমি আয়নায় আমার প্রতিচ্ছবি দেখছি। যদি দৈবক্রমে আয়নাটি ভেঙে যায়, তাহলে প্রতিচ্ছবিটিও অদৃশ্য হয়ে যায়। তবে, আয়নায় প্রতিফলিত ব্যক্তিটি অদৃশ্য হয়ে যায় না। মাধ্যমটি ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু যা মধ্যস্থতা করা হয়েছে তা নয়। মস্তিষ্ক এমন একটি মাধ্যম যার উপর আত্মা তার অবস্থাকে প্রভাবিত করে। কিছু শারীরবিজ্ঞানী যেমন বিশ্বাস করেন, মস্তিষ্ক স্মৃতি সঞ্চার করে না। অতীতকে স্মরণ করার ক্ষমতা আত্মার আছে, যদিও এর জন্য মস্তিষ্কের প্রয়োজন। এই বিষয়ে বার্গসনের পর্যবেক্ষণগুলি যত্ন সহকারে বিবেচনার দাবি রাখে। তিনি বলেন:তাহলে আমরা বুঝতে পারি কেন স্মৃতি মস্তিষ্কের অবস্থার ফলাফল হতে পারে না। মস্তিষ্কের অবস্থা স্মৃতিকে অব্যাহত রাখে, এটি তাকে যে বস্তুগততা প্রদান করে তার দ্বারা বর্তমানকে ধরে রাখে কিন্তু বিশুদ্ধ স্মৃতি একটি আধ্যাত্মিক প্রকাশ। স্মৃতির সাথে আমরা আত্মার ক্ষেত্রে সত্যই আছি।[৭]

ডঃ গ্যালোওয়ে, অমরত্বের সমস্যার একটি আকর্ষণীয় আলোচনার সময়, "স্মৃতি কি মস্তিষ্কের একটি কাজ?" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যেহেতু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমরা যে প্রশ্নটি বিবেচনা করছি তার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত, তাই এটি সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করা হয়েছে: তবে, এটি আপত্তি করা যেতে

পারে যে স্মৃতির ভিত্তি স্নায়ুতন্ত্রের চিহ্নগুলিতে রয়েছে এবং তাই শরীরের বিলুপ্তি টিকে থাকতে পারে না। অবশ্যই আমরা এটা বলার অধিকার রাখি না যে স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে মনের ব্যাপার, কারণ অনেক মানসিক অভ্যাস স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের মধ্যে নিহিত বলে মনে হয়। এবং রোগগত পরিস্থিতিতে স্মৃতিশক্তির ব্যর্থতা, অথবা যখন বৃদ্ধ বয়সে টিস্যুর অবক্ষয় কর্টেক্সের সংযোগস্থলে পৌঁছায়, তখন মস্তিষ্কের চিহ্ন বা প্রক্রিয়ার উপর স্মৃতির কিছু নির্ভরতার ইতিবাচক প্রমাণ। সমস্যাটি এই নির্ভরতার প্রকৃতি এবং মাত্রার উপর নির্ভর করে। এখন, স্নায়ু চিহ্নগুলি মনে রাখার একমাত্র শর্ত নয়, এমনকি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তও নয়; কারণ যদি তাই হয়, তাহলে স্মৃতি সরাসরি পুনরাবৃত্তির উপর নির্ভর করবে। কিন্তু এটি স্পষ্টতই সত্য নয়। সত্য হল যে স্মৃতি মনে রাখা জিনিসগুলিতে অর্থের উপস্থিতির উপর অনেক বেশি নির্ভর করে; এবং মনের মধ্যে অর্থ বজায় রাখার জন্য মস্তিষ্কের স্বভাব নয় বরং মানসিক স্বভাব উল্লেখ করা উচিত। অতএব, এটা সম্ভব যে আত্মা, যার মধ্যে এই জীবনের সময় গঠিত মানসিক স্বভাব অন্তর্ভুক্ত, বর্তমান ক্রম এবং অস্তিত্বের একটি উচ্চতর ক্রম মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার উপায় বহন করতে পারে। যদি আত্মা জীবদ্দশায় দেহের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন সত্ত্বেও অর্থের এক জগৎ বজায় রাখতে পারে, তাহলে ধারণা করা যায় যে আরও আমূল রূপান্তরের মাধ্যমেও এটি বজায় রাখা সম্ভব। সর্বক্ষেত্রে স্মৃতির একটি দল থেকে যেতে পারে, যা ব্যক্তিগত ধারাবাহিকতার অনুভূতি প্রদানের জন্য যথেষ্ট। [৮]

একটি পাদটীকায় তিনি বিষয়টিকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন: উদাহরণস্বরূপ, একই সংখ্যক অর্থহীন শব্দ বারবার পুনরাবৃত্তি করার চেয়ে একবার শোনার পরে একটি যুক্তিসঙ্গত বাক্য মনে রাখা অনেক সহজ।

গ্যালোওয়ে তার সমর্থনে ম্যাকডুগালকেও উদ্ধৃত করেছেন। এই বিষয়ে আগ্রহী কেউই অধ্যাপক এরউইন শ্রোডিঙ্গারের এই বিষয়টির আলোকিত এবং মূল্যবান আলোচনাকে উপেক্ষা করতে পারবেন না। এটি তার ছোট, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই, "জীবন কী"-এ পাওয়া যাবে। বইয়ের শেষে তার ধারণাগুলি সংক্ষেপে তিনি লিখেছেন: তবুও আমাদের প্রত্যেকেরই এই অবিসংবাদিত ধারণা রয়েছে যে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতির সমষ্টি অন্য যেকোনো ব্যক্তির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি ঐক্য গঠন করে। তিনি এটিকে "আমি" বলে উল্লেখ করেন। এই "আমি" কী?

যদি তুমি এটিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করো, আমার মনে হয়, তুমি দেখতে পাবে যে এটি কেবল একক তথ্যের (অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতি) সংগ্রহের চেয়ে একটু বেশি কিছু, অর্থাৎ ক্যানভাসের উপর সেগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। এবং তুমি, ঘনিষ্ঠ আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে, দেখতে পাবে যে "আমি" বলতে তুমি আসলে যা বোঝাতে চাও তা হল সেই ভিত্তি যার উপর সেগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। তুমি হয়তো দূর দেশে এসে তোমার সমস্ত বন্ধুদের দৃষ্টি হারাবে, হয়তো তাদের ভুলে যাবে; তুমি নতুন বন্ধু পাবে, তুমি তাদের সাথে তোমার পুরানোদের মতোই তীব্রভাবে জীবন ভাগাভাগি করবে। ক্রমশ কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে

যে, তোমার নতুন জীবনযাপন করার সময়, তুমি এখনও পুরানোটিকে স্মরণ করো। "যে যৌবন ছিলাম আমি," তুমি হয়তো তৃতীয় পুরুষের ভাষায় তাকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করবে, প্রকৃতপক্ষে তুমি যে উপন্যাসটি পড়ছো তার নায়ক সম্ভবত তার কাছাকাছি।

হে তোমার হৃদয়, অবশ্যই আরও তীব্রভাবে জীবন্ত এবং তোমার কাছে আরও পরিচিত। তবুও কোনও মধ্যবর্তী বিরতি, কোনও মৃত্যু হয়নি। এমনকি যদি একজন দক্ষ সম্মোহনবিদ তোমার পূর্বের সমস্ত স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে সফল হন, তবুও তুমি দেখতে পাবে না যে সে তোমাকে হত্যা করেছে। কোনও ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত অস্তিত্বের ক্ষতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করার কিছু নেই। আর কখনও হবে না।[৯]

অতএব, এটা অত্যন্ত সম্ভাব্য বলে মনে হয় যে শারীরিক পরিবর্তনগুলি আত্মাকে আমূল পরিবর্তন করতে পারে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলার পরেও এটি টিকে থাকে, বরং পুরো শরীরের মৃত্যুর পরেও এটি থাকা উচিত। সংক্ষেপে, "আমি" বা অহং - পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনহীনতা - যা নিজেই তার পরিচয়ের উৎস।

## ৩. আত্মার বেঁচে থাকা (আত্মার অস্তিত্ব)

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে উদ্ধৃত তথ্যগুলি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে যে অহং বা আসল আত্মা শরীরের অবস্থার কোনও পরিবর্তনের দ্বারা অপরিবর্তিত থাকে এবং এটি সবচেয়ে খারাপ শারীরিক আঘাতের পরেও তার রূপ ধরে রাখে। যদি তাই হয়, তাহলে কি মৃত্যুর ধাক্কাও সহ্য করার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি নয়? জীবনের অল্প সময়ের পর যদি হঠাৎ করেই আত্মের বিকাশের বিশাল ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়, তাহলে তা উদ্দেশ্যহীন হবে। এটা বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত হবে যে মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব এবং বিকাশ অব্যাহত থাকে, এবং অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণ, যদিও চূড়ান্ত নয়, এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে। অন্তত এই বিষয়টি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে সত্য হবে যে এই জীবন যে বিকাশের সুযোগগুলি প্রদান করে তা অবহেলা করেনি। যে আত্ম জীবনে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে সে অস্তিত্বের উচ্চতর স্তরে প্রবেশের জন্য উপযুক্ত হবে।

ইসলাম ব্যক্তিকে মৃত্যুর পরে উচ্চতর জীবনের জন্য নিজেকে সজ্জিত করার জন্য দায়ী করে। সে তার মধ্যে সুপ্ত শক্তিগুলি উপলব্ধি করে তা করতে পারে। অবশ্যই, ইসলাম জোর দিয়ে বলে যে এটি কেবলমাত্র একটি সামাজিক পরিবেশেই সঠিকভাবে করা যেতে পারে। সংক্ষেপে, সমাজের কর্তব্য হল তার সদস্যদের আত্ম-বিকাশের সুযোগ প্রদান করা এবং এই সুযোগগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বিবেচনায় নেওয়া তাদের কর্তব্য। সম্পূর্ণরূপে বিকশিত ব্যক্তিত্বের জন্য, মৃত্যু আরও বিকাশের একটি দৃষ্টিকোণ উন্মুক্ত করে। ওস্পেনস্কির বই থেকে নিম্নলিখিত অংশটি এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য কাজ করবে। ওস্পেনস্কি তার দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে গুরজিফের উদ্ধৃতি দিয়েছেন: যদি একজন মানুষ প্রতি মিনিটে পরিবর্তিত হয়, যদি

তার মধ্যে এমন কিছু না থাকে যা বাহ্যিক প্রভাব সহ্য করতে পারে, তাহলে এর অর্থ হল তার মধ্যে এমন কিছু নেই যা মৃত্যু সহ্য করতে পারে। কিন্তু যদি সে বাহ্যিক প্রভাব থেকে স্বাধীন হয়, যদি তার মধ্যে এমন কিছু আবির্ভূত হয় যা নিজে থেকেই বেঁচে থাকতে পারে; এই জিনিসটি হয়তো মরবে না। সাধারণ পরিস্থিতিতে আমরা প্রতি মুহূর্তে মারা যাই।

বাহ্যিক প্রভাব পরিবর্তিত হয় এবং আমরা তাদের সাথে পরিবর্তিত হই, অর্থাৎ, আমাদের অনেক "সত্তা" মারা যায়। যদি একজন মানুষ নিজের মধ্যে একটি স্থায়ী "আমি" বিকাশ করে যা বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে টিকে থাকতে পারে, তবে এটি ভৌত দেহের মৃত্যুতেও টিকে থাকতে পারে।[১০]

নিচে উদ্ধৃত অধ্যাপক ক্যাম্পবেল একই অর্থে লিখেছেন, মানুষের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রকাশিত বিভিন্ন ধরণের আত্ম-প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের আত্মা তার সমস্ত কিছু প্রকাশ করে তা দাবি করার কোনও কারণ থাকতে পারে না। আধ্যাত্মিক পদার্থ হিসেবে একটি অন্তঃতাত্ত্বিক সত্তা হিসেবে 'সত্তা', আমরা যা বলতে পারি, তার বিপরীতে, মানব জীবনের পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ "অভিজ্ঞতামূলক সত্তা"-এর ছদ্মবেশে, অর্থাৎ "অভিজ্ঞতামূলক সত্তা"-এর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী একটি সত্তা হতে পারে। [১১]

তিনি আরও বলেন: আমি মনের অতীত অভিজ্ঞতাগুলিকে তার ভেতরে ধরে রাখার এবং উপযুক্ত উদ্দীপনা প্রাপ্তির পর, ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতার সময় সেগুলিকে ব্যবহারের ক্ষমতার কথা উল্লেখ করছি। [১২]

ডিক্সনের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটিও একই বিষয়ের উপর নির্ভর করে: যদি কবরের বাইরে জীবনের পুনর্নবীকরণকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে, আমরা কার্যত জীবনের সমস্ত বর্তমান মূল্যবোধকে অস্বীকার করি না, তবে আমি জানি না যে সেগুলিকে আরও দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করার উপায় কোথায় পাব। [১৩]

এখন আসুন আমরা ঐশ্বরিক সত্তার সাথে মানুষের সত্তার সম্পর্কের প্রশ্নে আসি, যা নিঃসন্দেহে নিখুঁত সত্তা। "তিনিই একমাত্র চিরন্তন, জীবিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ" (কোরআন, ২: ২৫৫)।

মানব সত্তার ঐশ্বরিক গুণাবলীর আদলে নিজেকে বিকশিত করার ক্ষমতা রয়েছে। এরপর এটি অস্তিত্বের মাপকাঠিতে আরও উঁচুতে উঠে যায়। এটি একটি কঠিন কাজ এবং মানুষের উচিত ভেতর থেকে হোক বা বাইরে থেকে হোক, তার সত্তাকে দুর্বল ও ক্ষয়ক্ষতির হুমকি দেয় এমন সকল কিছুর বিরুদ্ধে সর্বদা সতর্ক থাকা। কেবল শক্তিশালী সত্তাই আত্ম-উপলব্ধির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে। দুর্বল সত্তা সহজেই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে। কোরআন ব্যক্তির উপর যে বিধিনিষেধ আরোপ করে তা তার স্বাধীনতাকে রোধ করার জন্য নয় বরং তাকে শক্তিশালী করার জন্য এবং ধ্বংসাত্মক শক্তির বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধকে

কঠোর করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যাতে সে একটি শক্তিশালী চরিত্র গঠন করতে পারে এবং একটি স্থায়ী ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারে। দুর্বল চরিত্রের লোকেরা প্রায়শই ভাল সংকল্প করে কিন্তু খুব কমই তা বাস্তবায়ন করে। একজন মানুষ হয়তো সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠার সংকল্প করতে পারে; কিন্তু যখন সময় আসে, তখন তার আরামদায়ক বিছানা ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছাশক্তি থাকে না। অন্য একজন মানুষ হয়তো একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে পারে; কিন্তু শেষ মুহূর্তে তার সংকল্প দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সে ফিরে আসতে ব্যর্থ হয়। উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষরা তাদের চরিত্রের মারাত্মক দুর্বলতার কারণে ব্যর্থ হয়েছিল। কোরআনের জীবনধারার উদ্দেশ্য হলো নফসকে শক্তিশালী করা, যাতে সে তার অখণ্ডতার জন্য হুমকিস্বরূপ সকল শক্তির সফলভাবে প্রতিরোধ করতে পারে এবং কল্যাণের সন্ধানে অবিচল থাকে। কোরআন এই বিষয়টিতে স্পষ্টভাবে বলে: যারা বলে: আমাদের রব আল্লাহ, এবং তারপর তার উপর স্থির থাকে, তাদের উপর মালাইকা অবতীর্ণ হবে (৪১:৩০)।

শৃঙ্খলা অহংকারকে শক্ত করে। তিরস্কার এবং হতাশা এর মধ্যে সর্বোত্তমকে ডাকে। বাধাগুলি এটিকে আরও জোরালো প্রচেষ্টার দিকে ঠেলে দেয়। এই ধরনের শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব কখনও বিলীন হতে পারে না। ইকবাল সুখী ভাষায় এই ধারণাটি প্রকাশ করেছেন:জীবন একটি খোলের মতো এবং নফস হল এর মধ্যে মুক্তার ফোঁটা (কংক্রিটেশন); যদি মুক্তার ফোঁটাটিকে মুক্তায় রূপান্তর করতে না পারে তবে খোলের মূল্য কী? আত্ম-জ্ঞান, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং আত্ম-বিকাশের মাধ্যমে, নফস এমনকি মৃত্যুকেও জয় করতে পারে। (দারবে-এ-কালিম, পৃ. ২৫)।

অন্যদিকে, একটি দুর্বল এবং অনুন্নত ব্যক্তিত্ব সামান্যতম ধাক্কার কাছেও আত্মসমর্পণ করে। এটি ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। আত্ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে কঠিন এবং দৃঢ় উদ্দেশ্য দ্বারা টিকে থাকা ব্যক্তিত্ব জীবনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজের সাথে অভিন্ন থাকে এবং মৃত্যুর ছায়া থেকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কোরআনে উল্লিখিত কিছু ঐশ্বরিক গুণাবলী এমন যা কেবল স্রষ্টারই হতে পারে। কোন সীমাবদ্ধ সত্তা এগুলি অর্জন করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, কোরআন স্রষ্টা সম্পর্কে বলে যে "তিনি প্রথম এবং শেষ" (৫৭:৩)। অন্যান্য, যেমন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শক্তি ইত্যাদি, মানুষ ভাগ করে নিতে পারে, যদিও কেবল কিছু পরিমাণে, অর্থাৎ, মানুষের সীমার মধ্যে। এর বর্ণনা একই সাথে আদর্শ সত্তার বর্ণনা: নিশ্চয়ই আমরা আপনার প্রতি একটি কিতাব নাযিল করেছি যা আপনার নিজস্ব মহত্ত্বের কথা উল্লেখ করে (২১:১০)।

এই গুণাবলীর কিছু, যা মানুষের নাগালের মধ্যে, মৌলিক, আবার অন্যগুলিকে একটি সাপেক্ষিক চরিত্রের বলা যেতে পারে। ইখলাস শিরোনামে কোরআনের সংক্ষিপ্ত সূরায় এগুলিকে একটি সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এই গুণাবলী স্রষ্টার সাথে পরম সত্তা হিসেবে

সম্পর্কিত, কিন্তু, সত্তা থাকার কারণে, মানুষও মানবিক সীমার মধ্যে এগুলি অর্জন করতে পারে। চারটি শ্লোক ঘনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করলে অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে মনে হবে। আসুন আমরা প্রথম শ্লোকটি গ্রহণ করি: "বলুন যে তিনি, স্রষ্টা, এক" (১১২:১): "এক" (আহাদ) শব্দটি অর্থে অসাধারণ সমৃদ্ধ। এটি ঐক্য, অনন্যতা এবং সম্পূর্ণতা বলতে পারে না। এটি আত্ম-পরিচয়, স্ব-সঙ্গতি এবং অখণ্ডতা বোঝায়। বাইরে থেকে কোন কিছুই এতে আবাসন নিশ্চিত করতে পারে না। এর ঐক্য মহাবিশ্বের কোথাও সমান্তরাল নয়। অবশ্যই, কেবল একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বই এই ধরণের ঐক্যের অধিকারী।

একটি দুর্বল ব্যক্তিত্ব, তার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল মনোভাব সহ, এই ধরণের একত্বের দাবি করতে পারে না। বিকাশের মাধ্যমে সত্তার ঐক্য শক্তিশালী হয়। বিকাশের দিকেই সমস্ত পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু তারা কোনওভাবেই এর অপরিহার্য প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে না। এর মূলে এটি কোনও পরিবর্তন জানে না। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে: পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল প্রাণীর পরিবর্তন হচ্ছে, তবুও তারা তোমার রবের মুখমণ্ডল, মহিমান্বিত, মহিমান্বিত (৫৫:২৬-২৭) টিকে আছে।

একজন শক্তিশালী চরিত্রের মানুষ কখনও তার নির্বাচিত পথ থেকে বিচ্যুত হয় না এবং একটি শক্তিশালী চরিত্র একটি শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের সাথে যায়। যেমন বারদ্যায়েভ বলেছেন: "একটি শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব হল একটি প্রকাশিত চরিত্র।"[১৪] এই ধরনের ব্যক্তিত্ব আসলে তাই যা মনে হয়, কারণ এটি স্বয়ং সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন অধ্যাপক হোয়াইটহেড মন্তব্য করেছেন: সত্য হল বাস্তবতার সাথে আবির্ভাবের রূপান্তর।[১৫]

কারণ আত্মা বাস্তব এবং অলীক স্বাধীনতা উপভোগ করে না, তাই এটি যা করে, অনুভব করে বা চিন্তা করে তার জন্য দায়ী। এটিকে তার কর্মের পরিণতি বহন করতে হবে এবং এটিকে নিজের বোঝা বহন করতে হবে। কোরআন এই বিষয়ে স্পষ্ট: প্রত্যেক আত্মার জন্য তাই যা সে অর্জন করেছে, এবং তার বিরুদ্ধে কেবল তাই যা সে কাজ করেছে (২:২৮৬)।

আবার:কোনও ব্যক্তি অন্যের কোন উপকারে আসবে না, তার কাছ থেকে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, তার কোন প্রতিদানও নেওয়া হবে না, তাদের সাহায্যও করা হবে না (২:৪৮)।

সংক্ষেপে, এটিই প্রতিফল আইন। যদি কোন ব্যক্তি সাফল্য অর্জন করে, তবে তা ভাগ্যের অনুকূলে থাকার কারণে নয়, বরং সে সঠিক পথে কাজ করেছে বলে। যদি সে ব্যর্থ হয়, তবে সে ভাগ্যের উপর দোষ চাপাতে পারে না, কারণ ব্যর্থতা তার নিজের অন্যায়ের সরাসরি ফলাফল।

কোরআনের সূরা ইখলাস, প্রথম আয়াতে, যেমনটি দেখানো হয়েছে, আহাদিয়্যাহ বা একত্বের গুণাবলীর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে সামাদিয়্যাহ বা আত্মনির্ভরতার ঐশ্বরিক গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। এই শব্দটি স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরশীলতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে বোঝায়। "সামাদ" হল সেই সত্তা যা কেবল নিজের উপর নির্ভর করে এবং অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না, এমন একটি সত্তা যা চিরস্থায়ী এবং সম্পূর্ণ মুক্ত। স্রষ্টা সর্বোচ্চ মাত্রায় এই গুণের অধিকারী, কিন্তু মানুষ, তার নিজস্ব স্বভাব নিয়ে, কিছু পরিমাণে এটি অর্জন করতে পারে। সে স্বাধীনভাবে পছন্দ করতে পারে এবং বাহ্যিক পরিস্থিতি থেকে স্বাধীন হতে পারে। "তোমার যা ইচ্ছা তাই করো," কোরআন বলে (৪১:৪০)।

আবার অপর আয়াতে বলা হয়েছে : "যা ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যে তাকে প্রত্যাখ্যান করুক" (১৮:২৯)। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে, একমাত্র মানুষই প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করে।

স্বাধীনতা হলো মানবতার অপরিহার্য শর্ত। বাস্তব জীবন। নীতি এমন একটি সত্তার কাছে অপ্রাসঙ্গিক যার কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে তার বাইরের শক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয়। মানুষ উদ্যোগ নিতে সক্ষম। সে স্বাধীনভাবে দুটি বা ততোধিক বিকল্প কর্মপদ্ধতির যেকোনো একটি বেছে নিতে পারে। সে তার প্রচেষ্টাকে যে লক্ষ্যের উপর তার হৃদয় স্থির করেছে তা অর্জনের জন্য বাঁকাতে পারে। এই কারণে, সে কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দেয় এবং নৈতিক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়। অবশ্যই, মানুষ স্রষ্টার মতো স্বাধীনতা উপভোগ করে না: তার স্বাধীনতা বিভিন্ন চাপ এবং সীমাবদ্ধতার শিকার হয়। তবুও, সে এই অর্থে স্বাধীন যে তার কর্মগুলি স্ব-নির্ধারিত, যেগুলি তার যুক্তিসঙ্গত প্রকৃতি থেকে প্রবাহিত হয়। এটিই মানুষের উপভোগ করা স্বাধীনতার প্রকৃত ব্যাখ্যা। মানুষ তার কর্মের জন্য দায়ী কারণ তারা তার মৌলিক প্রেরণামূলক ধরণকে প্রতিফলিত করে এবং তার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। তাই সে নৈতিক বিচারের বিষয়। "দ্বীনে কোন বাধ্যবাধকতা নেই" (২:২৫৬) আয়াতটি মানুষের স্বাধীনতার প্রতি কোরআন যে অপরিসীম গুরুত্ব দেয় তার সাক্ষ্য দেয়।

স্বাধীনতার এই দৃষ্টিভঙ্গি ইকবাল প্রশংসনীয়ভাবে প্রকাশ করেছেন: এইভাবে অহংকারের কার্যকলাপে নির্দেশনা এবং নির্দেশিকা নিয়ন্ত্রণের উপাদানটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে অহং একটি স্বাধীন ব্যক্তিগত কার্যকারণ। তিনি চূড়ান্ত অহংকারের জীবন এবং স্বাধীনতার অংশীদার, যিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সক্ষম একটি সীমাবদ্ধ অহংকারের উত্থানের অনুমতি দিয়ে, তাঁর নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছার এই স্বাধীনতাকে সীমিত করেছেন। সচেতন আচরণের এই স্বাধীনতা কোরআনের অহংকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আসে। এই বিষয়ে কিছু আয়াত স্পষ্টভাবে স্পষ্ট:'এবং বলুন: সত্য আপনার প্রভুর কাছ থেকে এসেছে: তাহলে, যে ইচ্ছা বিশ্বাস করুক: এবং যে ইচ্ছা, সে অবিশ্বাসী হোক' (১৮:২৯)।

'যদি আপনি নিজের জন্য ভাল করেন তবে আপনি ভাল করবেন: এবং যদি আপনি নিজের বিরুদ্ধে মন্দ করেন তবে আপনি তা করবেন' (১৭-৭)। [১৬]

অবশ্যই, একমাত্র স্রষ্টাই সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু স্রষ্টা, তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে, মানুষকে, সীমিত সত্তাকে, কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছেন। যদি এর অর্থ স্রষ্টার ক্ষমতার উপর সীমাবদ্ধতা, তবে এটি স্পষ্টতই একটি স্ব-আরোপিত সীমাবদ্ধতা এবং এটি কোনওভাবেই স্রষ্টার সর্বশক্তিমানতা থেকে বিচ্যুত হয় না। কোরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে, "স্রষ্টা নিজের জন্য রহমত (অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টির বিকাশ ও বৃদ্ধির দায়িত্ব) নির্ধারণ করেছেন" (৬:৫৪)। এর অর্থ হল রহমত স্রষ্টার সত্তা থেকে প্রবাহিত হয়। এটি কোনও বহিরাগত সংস্থা দ্বারা তাঁর উপর আরোপিত হয় না। স্রষ্টা রহিম কারণ রহমত একটি অপরিহার্য ঐশ্বরিক গুণ। আমাদের কর্মকাণ্ড যখন আমাদের সত্তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হয় তখন আমরাও সত্যিই স্বাধীন বোধ করি। যখন আমরা আমাদের স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করি, তখন এটি সর্বোত্তম হিসাব গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্যে। এই বিধিনিষেধগুলি আমাদের স্বাধীনতাকে বিকৃত করে না, এবং এগুলি স্বাধীন এজেন্ট হিসাবে আমাদের মর্যাদার জন্য অবমাননাকরও নয়। স্বাধীনতা, সঠিকভাবে পরিচালিত, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই মানব বিকাশের প্রয়োজনীয় শর্ত। এই স্বাধীনতা হল কোরআনের সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতি, যা পরে বর্ণনা করা হবে।

তৃতীয় আয়াত, "তিনি জন্ম দেননি এবং তিনি জন্মগ্রহণ করেননি," আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐশ্বরিক গুণের কথা উল্লেখ করে। পরম সত্তা হিসেবে স্রষ্টা স্বয়ংসম্পূর্ণ। সত্তা, স্ব, প্রজননের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে না। অবশ্যই, মানুষ একটি জীবন্ত জীব এবং তাই, অন্যান্য প্রাণীর মতো, তার পিতামাতা দ্বারা জন্মগ্রহণ করে এবং তার পালাক্রমে, সন্তান জন্ম দেয়। তবে এটি কেবল তার শরীরের ক্ষেত্রেই সত্য। শরীর, মানুষ হোক বা প্রাণী, পিতামাতার শরীরের একটি অংশ যা নিজেকে পৃথক করে একটি নতুন জীবে বিকশিত হয়। জৈবিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ প্রাণীদের মতো একই স্তরে। তার শরীর প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, এবং বৃদ্ধি, ক্ষয়, প্রজনন এবং পুনর্জন্মের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এতে ঘটে। তবে, মানুষের সত্তা একটি উচ্চতর স্তরে বিদ্যমান এবং কাজ করে। এটি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নয় এবং প্রাকৃতিক বিভাজন দ্বারা অস্পৃশ্য। এটি একটি অবিভাজ্য ঐক্য এবং কোনও প্রক্রিয়া ভোগ করতে পারে না। এটি পিতামাতার আত্মার অংশ নয়, এবং এটি নিজের একটি অংশ সন্তানসন্ততিকে দান করতে পারে না। এটি নিজস্ব অভ্যন্তরীণ আইন মেনে চলে এবং নিজস্ব লাইনে বিকশিত হয়। এর কার্যকলাপ সৃজনশীল কিন্তু প্রজননমূলক নয়। এটি নতুন গুণাবলী এবং শক্তি তৈরি করে যা, তবে, এর নিজস্ব প্রকৃতিকে সমৃদ্ধ এবং প্রসারিত করে। প্রজনন একটি শারীরিক ক্রিয়া, এবং সৃষ্টি হল আত্মার ক্রিয়া। আমরা যে আয়াতটি বিবেচনা করছি তা স্পষ্ট করে যে ব্যক্তিত্ব শারীরিক বা জৈবিক আইনের ফসল নয় যা প্রজনন বা প্রজননের বাইরে যেতে পারে না।

চতুর্থ এবং শেষ আয়াত, "তাঁর সাথে তুলনীয় কেউ নেই," আরেকটি ঐশ্বরিক গুণকে নির্দেশ করে যা মানুষ নিজের মালিকানা থাকা সত্ত্বেও ভাগ করতে পারে। প্রতিটি আত্মা অনন্য। কোনও আত্মা অন্য কোনও আত্মার হুবহু অনুলিপি বা প্রতিরূপ নয়। আত্মার রাজ্যে, অনুকরণের কোনও স্থান নেই। কোনও আত্মার জন্য কোনও সাধারণ আইন প্রযোজ্য নয়, যা নিজের জন্য একটি আইন। একইভাবে, মুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত একটি সমাজ অনন্য। অন্য কোনও ধরণের সমাজ এর সাথে তুলনীয় নয়। মানুষ বিকাশের মাধ্যমে বেঁচে থাকে এবং মানব সমাজের জন্যও একই কথা সত্য।

## ৪. মানুষ

যেহেতু কোরআনে বর্ণিত দ্বীনের সম্পূর্ণ ভবনটি দৃঢ়ভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে তৈরি মানুষের ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এটি যে ভূমিকা পালন করে, মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে এর বিবরণ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়নের দাবি রাখে। মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কোরআনের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বিবর্তনের ধারায়, এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যখন জীবন্ত প্রাণীরা প্রজননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করে। প্রাণীদের মতো মানুষও প্রথমে মাতৃগর্ভে গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।

কোরআন এটিকে চিত্রিতভাবে বর্ণনা করে: নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে ভেজা মাটির উৎপত্তি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তাকে একটি ফোঁটা (বীজ) হিসেবে একটি নিরাপদ আবাসস্থলে স্থাপন করেছি; তারপর আমরা সেই ফোঁটাটিকে জমাট বাঁধিয়েছি; তারপর হাড়কে তৈরি করেছি; তারপর হাড়কে মাংস দিয়ে ঢেকেছি, এবং তারপর তাকে আরেকটি সৃষ্টি দিয়েছি (২৩:১২-১৪)।

"অন্য সৃষ্টি" শব্দটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হল এই পর্যায়ে মানুষ নতুনভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং একজন দায়িত্বশীল এবং সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নির্ধারক ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই নতুন জন্মের মাধ্যমে মানুষ প্রাণীজগতের উপরে একটি স্তরে উন্নীত হয়। সে এখন একটি "আত্মা" দ্বারা সমৃদ্ধ এবং একটি স্বায়ত্তশাসিত সত্তা হিসেবে বিশ্বের মুখোমুখি হয়। এটি ঘটে যখন স্রষ্টা "তার মধ্যে তার রূহ ফুঁকে দেন" (৩২:৯)। তারপর মালাইকাহ - প্রকৃতির শক্তিগুলিকে - তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে এবং তার সামনে সিজদা করতে আদেশ করা হয়। প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য কোরআনের প্রতীকী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে: যখন আল্লাহ মালাইকাহদের বলা হয়, দেখ! আমি কাদা থেকে একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। এবং যখন আমি তাকে তৈরি করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তার সামনে লুটিয়ে পড়ো, সিজদা করো (৩৮:৭১-৭২)।

এই রূহ বা ঐশ্বরিক শক্তিই মানুষকে স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়ার এবং কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করে। সে এখন প্রকৃত স্বাধীনতার অমূল্য উপহার পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে, সিম্পসনের "দ্য মিনিং অফ ইভোলিউশন" থেকে একটি অংশ যথাযথভাবে উদ্ধৃত করা যেতে পারে: মানুষকে একটি প্রাণী ছাড়া আর কিছুই বলা মানে অস্বীকার করা যে, সমস্ত প্রাণীর গুণাবলী ছাড়া তার অন্যান্য অপরিহার্য গুণাবলী রয়েছে। . . . এটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে তার অনন্য প্রকৃতির সারমর্ম সেই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে নিহিত যা অন্য কোনও প্রাণীর সাথে ভাগ করা যায় না। প্রকৃতিতে তার স্থান এবং মানুষের কাছে এর সর্বোচ্চ তাৎপর্য তার পশুত্ব দ্বারা নয় বরং তার মানবতা দ্বারা সংজ্ঞায়িত। মানুষের কিছু মৌলিক রোগ নির্ণয়ের বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাকে অন্য যে কোনও প্রাণী থেকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে আলাদা করে এবং যা অন্যান্য বিকাশের সাথে জড়িত, যা কেবল এই তীক্ষ্ণ পার্থক্যকে বৃদ্ধি করেনি বরং এটিকে একটি পরম পার্থক্য এবং কেবল ডিগ্রির আপেক্ষিক পার্থক্য নয়।[১৭]

তাহলে, রুহ কী? উত্তর হল এটি বুদ্ধি, মন, আত্মা, আত্মা নয়। এটি মানুষের সত্তা বা ব্যক্তিত্ব নয়, যা পৃথিবীতে অনন্য একটি সত্তা। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা দরকার।

প্রথমে বুদ্ধির কথা নেওয়া যাক। বুদ্ধি হল মনের একটি ক্ষমতা, যাকে কোরআনে কলব বা ফুয়াদ বলা হয়েছে। আমরা এটিকে এর প্রকাশের মাধ্যমে জানি - ফিকর (চিন্তা), শু'উর (চেতনা), তদাব্বুর (চিন্তা) এবং তা'আক্কুল (বুদ্ধি)। কিছুটা হলেও, প্রাণীরাও এটি ধারণ করে। প্রাণী সচেতন কিন্তু মানুষ আত্মসচেতন। আত্মসচেতনতা মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে আলাদা করে। তাছাড়া, মানুষের বুদ্ধিমত্তা তার পরিধি এবং ক্ষমতার দিক থেকে পশু বুদ্ধিমত্তার চেয়ে অনেক উন্নত। জ্ঞান অর্জনের প্রধান হাতিয়ার হলো বুদ্ধি। কোরআনে বারবার মানুষকে নিজেকে এবং বিশ্বকে বোঝার জন্য তার বুদ্ধি ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। যারা তাদের বুদ্ধি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয় তাদের পশুর চেয়েও খারাপ বলা হয়। প্রাণীদের প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে একটি নিশ্চিত পথপ্রদর্শক থাকে কিন্তু মানুষ কেবল তার বুদ্ধির উপর নির্ভর করতে পারে।

ফ্রয়েড দ্বারা মূলত প্রবর্তিত "মানসিকতা" শব্দটি বর্তমানে প্রচলিত, বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে। এটি একটি বিস্তৃত শব্দ যা সচেতন এবং অচেতন উভয় ধরণের সমস্ত মানসিক চালিকাশক্তি এবং কার্যাবলীকে নির্দেশ করে। তবে, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি কি মানসিকতা নিজেই একটি সত্তা নাকি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির সামগ্রিকতার জন্য একটি লেবেল, এখনও উত্তর দেওয়া হয়নি। মনোবিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট ঘোষণা করেননি।

"আত্মা" শব্দটির পিছনে একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এটি মধ্যযুগের শিক্ষাগত দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পণ্ডিত দার্শনিকরা মনে করতেন যে পৃথিবীতে দুটি স্বাধীন পদার্থ আছে, নফস বা আত্মা এবং পদার্থ। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই দ্বৈতবাদের তত্ত্বের উদ্ভব হয়। বিশ্বাস করা হত যে আত্মা এবং পদার্থের মধ্যে কোনও মিল নেই; প্রকৃতপক্ষে, তারা একে অপরের বিরোধী। দেহ, বস্তুগত হওয়ায়, আত্মার অগ্রগতির পথে বাধা হিসেবে বিবেচিত হত। আত্মা ছিল ধর্মের একমাত্র উদ্বেগ। আত্মা কেবল দেহকে বশীভূত করে এবং চূর্ণ করেই মুক্তি অর্জন করতে পারত। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনিবার্যভাবে পর-জাগতিকতা, তপস্যা এবং আত্ম-ত্যাগের দিকে পরিচালিত করে। সমস্ত আনন্দকে মন্দ বলে মনে করা হত। ধর্মপ্রাণ পুরুষ এবং সাধুরা আত্ম-ক্ষোভে গর্ব করতেন। যারা এই পার্থিব জীবনে আগ্রহী ছিলেন তারা স্বাভাবিকভাবেই এই চরম দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিতাড়িত হতেন। তারা বস্তুবাদের প্রতি অনুকূল প্রতিক্রিয়া দেখাতেন যা তাদের জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে বাধা দেয় না। এইভাবে চরম ধরণের আধ্যাত্মিকতার বিরোধিতা করেছিল সমানভাবে চরম ধরণের সঙ্গী। রিয়ালিজম।

তবে আধুনিক বিজ্ঞান আধ্যাত্মিকতা এবং বস্তুবাদ উভয়ের ভুল উন্মোচন করেছে। পুরাতন বস্তুবাদী তত্ত্ব এখন বেশ অগ্রহণযোগ্য। অবিভাজ্য এবং চূড়ান্তভাবে বাস্তব পরমাণু দ্বারা গঠিত পদার্থের পুরাতন ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়েছে এবং একই পরিণতি দ্বৈতবাদের তত্ত্বকে ছাপিয়ে গেছে। আধুনিক বিজ্ঞান পদার্থকে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে যা পূর্বে এর জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত হত, যথা, প্রসার এবং দৃঢ়তা। আধুনিক যুগের চিন্তাবিদরা কীভাবে পদার্থকে কল্পনা করেন তা দেখানোর জন্য আমরা কয়েকটি উদাহরণ দেব। স্যার জেমস জিন্স পদার্থকে "আবদ্ধ তরঙ্গ" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং বার্ট্রান্ড রাসেল "আন্তঃসম্পর্কিত ঘটনার একটি ব্যবস্থা" হিসাবে। আইনস্টাইন এটিকে "ঘনীভূত চিন্তা" হিসাবে এবং ওস্পেনস্কি "একটি নিছক অবস্থা" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

অতএব, আধুনিক বিজ্ঞান বা আধুনিক দর্শনে আত্মা এবং পদার্থের দ্বৈতবাদের কোনও স্থান নেই। যাইহোক, পশ্চিমে চার্চ এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য এখনও বজায় রয়েছে। চার্চ কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়গুলির সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। এর কার্যকলাপের ক্ষেত্র কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ। এইভাবে, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে আধুনিক রাষ্ট্রগুলির একটি অন্তর্নিহিত অংশ হল আত্মা এবং পদার্থের দ্বৈতবাদ।

তবে ইসলাম কখনও এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেনি যে আত্মা এবং পদার্থ পৃথক এবং একে অপরের বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে, এই শব্দগুলি কোরআনে পাওয়া যায় না, যেখানে মানুষকে একটি একক সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং দুটি মৌলিকভাবে ভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ হিসাবে নয়। আত্মার ধারণাটিও, একটি বস্তুগত দেহে বসবাসকারী একটি আধ্যাত্মিক সত্তা হিসাবে, কোরআনের এই দৃষ্টিভঙ্গির

সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যে মানুষ এক এবং অবিভাজ্য। কোরআন অনুসারে, সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি ঐশ্বরিক আদেশ (আমর) দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। এটি কী, তা কেবল স্রষ্টাই জানেন। আমরা অতীন্দ্রিয় বাস্তবতা অনুসন্ধান করার অনুমান করতে পারি না। আমরা কেবল বিশ্বাস করতে পারি যে এটি এক এবং অবিভাজ্য, যদিও এটি নিজেকে অসীম আকারে প্রকাশ করে। উপসংহারে, রুহ আত্মা, আত্মা, বুদ্ধি বা মন নয়। এটি এই সমস্ত কিছুর অতীন্দ্রিয় ভিত্তি।

কোরআন নিজেই আমাদেরকে সেই রূহের প্রকৃত উপলব্ধির দিকে পরিচালিত করে যা মানুষের মধ্যে ফুঁকে দেওয়া হয়েছে। মানুষের মধ্যে স্থান পাওয়ার পর এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব অর্জনের পর, রূহ মানুষের নফস (আত্মা) হিসেবে আবির্ভূত হয়। নিম্নলিখিত আয়াতগুলি এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে না: এবং নফস এবং এর পূর্ণতা। তিনি একে একীভূতকরণ এবং বিঘ্ন উভয়ের সম্ভাবনা দিয়ে দান করেছেন। যে ব্যক্তি এটিকে বিকশিত করে সে প্রকৃতপক্ষে সফল হবে। এবং যে ব্যক্তি এটিকে বাধাগ্রস্ত করে সে প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থ হবে (৯১:৭-১০)।

নফস হল মানুষের জন্য স্রষ্টার অমূল্য উপহার। যখন মানুষ এটি গ্রহণ করে, তখন এটি অস্পষ্ট কিন্তু অপরিসীম সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ। তার উপর এর সুপ্ত শক্তিগুলিকে বাস্তবায়িত করা এবং পূর্ণ মাত্রায় এটি বিকাশ করা নৈতিক বাধ্যবাধকতা। যে ব্যক্তি এই কর্তব্য এড়িয়ে যায় সে অস্তিত্বের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। সে বাস্তব থেকে সরে যায় এবং অবাস্তবের কাছাকাছি চলে যায়। আর যে ব্যক্তি অধ্যবসায়ের সাথে নফস (আত্মা) বিকশিত করে, "স্রষ্টার নিকটবর্তী" হয় (অর্থাৎ, স্রষ্টীয় গুণাবলী উপলব্ধি করে এবং প্রকাশ করে) এবং বাস্তবতাকে আরও বেশি করে গ্রহণ করে। নফসের স্বতন্ত্র গুণাবলী হল বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, সাহস, উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষমতা এবং স্বাধীনভাবে নির্বাচন ও কাজ করার ক্ষমতা। যখন এগুলো বিকশিত হয়, তখন নফস তার সমস্ত মহিমায় আবির্ভূত হয়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে নফস মানুষের সারাংশ, তা প্রগতিশীল। বিকশিত হওয়া তার স্বভাব। যদি এটিকে বিকাশ থেকে বিরত রাখা হয়, তাহলে এটি স্তব্ধ এবং কলুষিত হয়ে যায়। এর ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং এটি নিম্ন স্তরে আকৃষ্ট হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নফস শব্দটি তার মূল কোরআন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণ ভাষায় এর অর্থের সাথে সম্পর্ক এবং সূক্ষ্মতা রয়েছে যা আমাদের উদ্দেশ্যের সাথে অপ্রাসঙ্গিক। শব্দটির সাথে এর মূল অর্থ পুনরুদ্ধার করা এবং এটিকে নফসের সমতুল্য হিসাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে রূহ স্রষ্টার অংশ নয়। অংশ থাকা স্রষ্টার প্রকৃতিতে নেই। ইকবাল যেমন বলেছেন, রুহ হলো তাঁর নির্দেশমূলক শক্তি। ভিন্নভাবে বলতে গেলে, এটি তাঁর থেকে এসেছে কিন্তু তাঁর নয়। মানব সত্তা ঐশ্বরিক সত্তার অংশ নয়। আমরা ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করেছি যে প্রতিটি সত্তা অনন্য এবং অবিভাজ্য।

ঐশ্বরিক শক্তিতে অংশগ্রহণের কারণে মানব সত্তা ঐশ্বরিক গুণাবলীর বিকাশ করতে সক্ষম, তবে কেবলমাত্র একটি সীমাবদ্ধ সত্তার পক্ষে যতদূর সম্ভব।

### ৫. পরকাল

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা বিশ্বাস করার অনেক কারণ যোগ করেছি যে মানুষের মধ্যে কিছু আছে এবং এই কিছু কেবল তার সত্তা হতে পারে, যা প্রকৃতির নিয়ম অতিক্রম করে। যদি আমরা এই বিষয়টি স্বীকার করি, তাহলে বোঝা যায় যে সত্তা ক্ষয় এবং পচনের প্রক্রিয়া দ্বারা অস্পৃশ্য থাকে যা দেহের বিলুপ্তিতে পরিণত হয়। অতএব, সত্তা মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে যেমনটি এটি অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বেঁচে ছিল, এমনকি কিছু এমনকি তীব্র যা এই জীবনে দেহের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকার বিষয়ে স্বাভাবিক আপত্তিগুলি শারীরিক পচনের উপর ভিত্তি করে। কোরআন উল্লেখ করে যে এটি সত্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়: এবং বলো: যখন আমরা হাড় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত কণায় পরিণত হব, তখন কি আমরা অবশ্যই নতুন সৃষ্টি হয়ে পুনরুত্থিত হব? বলো: তোমরা পাথর, লোহা অথবা এমন কিছু হও যা তোমাদের মনে (জীবন গ্রহণ করা) খুব কঠিন (১৭:৪৯-৫১)।

কোরআন অনুযায়ী, মৃত্যুর পরের জীবন একটি সত্য। মৃত্যুর পর মানুষ কীভাবে এবং কার দ্বারা নতুন জীবন পায় এই প্রশ্নের উত্তরে কোরআন বলে: তারা বলবে: কে আমাদের ফিরিয়ে আনবে? বলো: যিনি তোমাদের প্রথমবার অস্তিত্বে এনেছিলেন (১৭:৫১)।

মূল কথা হল, যদি দ্বিতীয় জীবন অদ্ভুত মনে হয়, তবে প্রথমটিও অদ্ভুত হওয়া উচিত। জীবন একটি রহস্য এবং যেহেতু এটি একবার অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এসেছিল, তাই এটি আবারও তা করতে পারে। যদি স্রষ্টার সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকে, তাহলে অবশ্যই তিনি পুনর্নির্মাণের ক্ষমতাও রাখেন। কোরআন এই জীবন এবং মৃত্যুর পরের জীবনের সাথে সম্পর্কিত "প্রথম সৃষ্টি" এবং "দ্বিতীয় সৃষ্টি" শব্দগুলি ব্যবহার করে। দেহ আত্মাকে স্থানিক-কালিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করে, কিন্তু এর জন্য অপরিহার্য নয়। দেহ মরতে পারে, কিন্তু আত্মা বেঁচে থাকে।

মৃত্যুর পরে অমরত্ব এবং বেঁচে থাকার মধ্যে পার্থক্য করা যুক্তিসঙ্গত। যেখানে প্রতিটি মানুষের মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা রয়েছে, অমরত্ব কেবল তাদের জন্য সংরক্ষিত যারা আত্ম-বিকাশের উচ্চ স্তরে পৌঁছবে। তারাই যারা উচ্চ স্তরে তাদের আরোহণ অব্যাহত রাখতে সক্ষম। তারা স্বর্গে (জান্নাতে) প্রবেশ করার সাথে সাথে তাদের সামনে বিকাশের একটি নতুন দৃশ্য উন্মোচিত হবে। মৃত্যুর পরে বিকাশ অব্যাহত থাকে, তবে কেবল তাদের জন্য যারা এই জীবনে তা শুরু করেছেন। মানুষ যদি এই জীবন যে আত্ম-উপলব্ধির সুযোগগুলি গ্রহণ করে, তবে সে পরকালে আরও উচ্চ উচ্চতায় আরোহণ করতে পারে।

যদি তা না হয়, তবে সে নিজেকে কোরআনে উল্লেখিত জাহান্নামে (নরক) অবস্থানরত দেখতে পায়, যেখান থেকে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া যায় না।

### ৬. অমরত্ব

যেমনটি আমরা দেখেছি, স্বর্গে (জান্নাতে) প্রবেশ করা মানুষ আত্ম-উপলব্ধির প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারে এবং যাকে অমরত্ব বলা হয় তা তাদের দেওয়া হয়।
সেখানে তারা প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না (৪৪:৫৬)।

তারা আবার মরবে না কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তারা চিরকাল বেঁচে থাকবে। অমরত্ব চিরস্থায়ী নয়। কোরআন জান্নাতে প্রবেশকারীদের সম্পর্কে বলে যে, "যতক্ষণ আকাশ ও পৃথিবী টিকে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখানে থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহ ইচ্ছা করেন - এটি একটি অক্ষয় উপহার" (১১:১০৮)। অনন্তকাল বলতে হয়তো অসীম কালের বিন্দু বোঝায় না। এটি সময়ের বাইরে একটি অবস্থা, যা সময়হীনতার স্কেল নির্ধারণ করতে পারে। আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে থাকা জিনিসগুলি সম্পর্কে অনুমান করা থেকে বিরত থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এই বিষয়ে আমরা যা বলতে পারি তা হল একমাত্র স্রষ্টাই চিরন্তন।

### ৭. জীবনের স্রষ্টা

কোরআন আমাদের মধ্যে একটি দৃঢ় বিশ্বাস (প্রত্যয়) জাগিয়ে তোলে যে মানুষ এবং মহাবিশ্বের জন্য একটি মহিমান্বিত ভাগ্য অপেক্ষা করছে। আমরা বিশ্বাস করি যে মহাজাগতিক মিছিল একটি মহান লক্ষ্যের দিকে স্থিরভাবে এগিয়ে চলেছে। মানবজাতি এই মিছিলের অগ্রদূত। নির্দেশমূলক শক্তি স্রষ্টার কাছ থেকে আসে। প্রকৃতির ক্ষেত্রে এই শক্তি বেশিরভাগই বাইরে থেকে কাজ করে, মূলত ভেতর থেকেই কাজ করে। এটি মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত এবং আত্ম-উপলব্ধির তাড়না হিসেবে আবির্ভূত হয়। বাহ্যিক বাধ্যবাধকতা কর্তব্যবোধ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। প্রাণীরা অন্ধ প্রবৃত্তি দ্বারা সঠিক দিকে পরিচালিত হয়। মানুষকে তার বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে এটি নিজেই আবিষ্কার করতে হবে এবং স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায় এটি অনুসরণ করতে হবে। সে তার লক্ষ্য স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং যদি সে চায়, তা অর্জনের জন্য তার প্রচেষ্টাকে বাঁকিয়ে দিতে পারে। একজন বুদ্ধিমান, মুক্ত এবং নীতিবান সত্তা হিসেবে কাজ করা তার কর্তব্য। তাকে স্বাধীনভাবে তার লক্ষ্য বেছে নিতে হবে এবং তাকে নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা অর্জন করতে হবে।

মানুষ হিসেবে মানুষের একমাত্র যোগ্য লক্ষ্য হল আত্ম-বিকাশ। এর অর্থ আত্মের পূর্ণ উন্মোচন বা তার সমস্ত সম্ভাবনার বাস্তবায়ন। নৈতিক প্রচেষ্টার লক্ষ্য হল এই লক্ষ্যের আরও কাছে যাওয়া। আত্ম-বিকাশের দিকে পরিচালিত করে এমন সমস্ত কর্মই ভালো, এবং অনৈতিক কর্মই হল আত্ম-বিকাশের প্রক্রিয়াকে

বাধাগ্রস্ত করে। এটিই সেই মানদণ্ড যার দ্বারা আমরা আমাদের কর্মের মূল্য বিচার করতে পারি। এটি কখনই আমাদের ব্যর্থ করতে পারে না। মানব জীবনের কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা এই মানদণ্ডটিই পাই। কোরআনে বর্ণিত সমগ্র নৈতিক ব্যবস্থা মানব ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে। সঠিক এবং ভুল, ভালো এবং মন্দ কেবলমাত্র মানুষের সত্তার সাথে সম্পর্কিত অর্থপূর্ণ শব্দ। এমনকি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলিও কেবলমাত্র তাদের সত্তার উপর প্রভাবের আলোকে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। স্বাধীনতা বলতে আমরা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বাধীনতাকে বোঝাই, এবং বশ্যতা বলতে তার তা করতে অক্ষমতাকে বোঝায়, কারণ একজন মানুষ রাজনৈতিকভাবে মুক্ত সমাজের সদস্য হতে পারে, কিন্তু যদি তার আত্ম-বিকাশ এবং আত্মপ্রকাশের সুযোগ না থাকে তবে সে স্বাধীন নয়।

তবে, শারীরিক দেহের বিকাশের পদ্ধতি এবং আত্ম-বিকাশের পদ্ধতির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। শরীর বাইরে থেকে পদার্থ গ্রহণ করে এবং সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে বৃদ্ধি পায়; সংক্ষেপে, গ্রহণ করে। অন্যদিকে, আত্মা তার নিজস্ব প্রাচুর্য অন্যদের দান করে বৃদ্ধি পায়। আত্মা তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং অন্যান্য সম্পদ অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে শক্তিশালী হয়। যখন সে তার সম্পদ নিজের কাছে রাখে তখন এটি সংকুচিত হয়। এইভাবে সবচেয়ে ফলপ্রসূ কাজ হল দান। উদারতা তাকে সমৃদ্ধ করে এবং কৃপণতা তাকে দরিদ্র করে। আমাদের কখনই এই সত্যকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কোরআন এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ রাখে না: যে ব্যক্তি তার সম্পদ দান করে যাতে তার আত্মবিকাশ হয় (৯২:১৮)।

আসুন দেখি কিভাবে এই নীতিটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমনকি পশ্চিমের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলিতেও জাতীয় সম্পদ সুষ্ঠুভাবে বন্টিত হয় না। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই দুটি সামাজিক শ্রেণী তৈরি হয়েছে - ধনবান এবং ধনহীন। অল্প কিছু ধনবান ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি উপার্জন করে, অন্যদিকে বেশিরভাগ মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত উপার্জন করে না।

প্রাক্তন ব্যক্তির নৈতিক শক্তি বিলাসিতা দ্বারা এবং পরেরটির চরম দারিদ্র্য দ্বারা শিথিল হয়ে যায়। কারণগুলি ভিন্ন কিন্তু ফলাফল একই, আত্মার অবক্ষয় এবং দুর্নীতি। পশ্চিমা দেশগুলিতে দুটি প্রতিকার প্রস্তাব করা হয়েছে - কর আরোপ এবং দান। উভয়ই অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। তারা কেবল উপশমকারী ছিল এবং সামাজিক অস্থিরতা নিরাময় করতে পারে না। যদিও কর আরোপের বিরোধিতা করা হয় এবং তা এড়িয়ে যাওয়া হয়, দানশীলতা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে অবনমিত করে এবং তার আত্মসম্মানকে ক্ষুণ্ন করে। পূর্ব ইউরোপে বিশ্বাস করা হয় যে কমিউনিজম মন্দকে নিরাময় করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে এটি জোর দেওয়া যেতে পারে যে একটি সর্বগ্রাসী সমাজে ব্যক্তির নিজের মধ্যে সেরাটি প্রকাশ করার জন্য খুব কমই উৎসাহিত করা হয়। এই ধরনের সমাজে উদ্যোগ এবং উদ্যোগের চেতনা হ্রাস পায়। তা ছাড়া, একটি সমষ্টিগত নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা এতটাই সীমাবদ্ধ এবং ঘিরে রাখা হয় যে সে আর একটি

স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত সত্তা থাকে না। সর্বোপরি, যদি জীবনের ধারণা বস্তুবাদী হয়, তা পুঁজিবাদী সমাজে হোক বা সাম্যবাদী, অন্যদের উপকারের জন্য নিজের পরিশ্রমের পণ্য দেওয়ার কোনও উৎসাহ নেই।

ইসলামে মূল্যের কেন্দ্রবিন্দু হল ব্যক্তি সত্তা, সমাজ নয়। ব্যক্তির আত্ম-বিকাশ সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ। বাকি সবকিছু এই লক্ষ্যের অধীনস্থ হতে হবে। কোরআনের লক্ষ্য হল মুক্ত ও সৎ মানুষের উৎপাদন, এবং এই ধরনের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং তাদের নিজস্ব ইচ্ছায় তাদের সম্পত্তি তাদের সহকর্মীদের সাথে ভাগ করে নেবে। এই ধরণের মানুষের সমন্বয়ে গঠিত সমাজ এক শ্রেণীর বিলাসিতা এবং অন্য শ্রেণীর দারিদ্র্যের কুফল থেকে মুক্ত থাকবে। পরকালে বিশ্বাসের মাধ্যমে অন্যদের উদারতা এবং নিঃস্বার্থ সেবার এক শক্তিশালী প্রেরণা তৈরি হয়। যে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাস করে, সে স্বাভাবিকভাবেই সেই মূল্যবোধগুলিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেবে যা সে মৃত্যুর পরে ফেলে আসা বস্তুগত সম্পদের চেয়ে উচ্চতর স্তরে বহন করতে পারে। গথ এই ধারণাটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন:যে ব্যক্তি এই জীবনেও মৃত, অন্য জীবনে বিশ্বাস করে না। [১৮]

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রক্রিয়া, কোরআনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং পরকালীন জীবন পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আরও আলোচনা করা হবে।

### *তথ্যসূত্র*


১. ই.আই. ব্রাইটম্যান, A Philosophy of Religion, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬।

২. নিকোলাস বারদেয়েভ, Slavery and Freedom, পৃ. ৮।

৩. ডব্লিউ.এম. ডিকসন কর্তৃক উদ্ধৃত, The Human Situation, পৃ. ৩৮৪।

৪. এ.সি. ক্যাম্পবেল, On Selfhood and Godhood, পৃ. ৯৯।

৫. Philosophical Theology, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭১; তুলনীয়, ক্যাম্পবেল, পৃ. ১০২।

৬. ডিকসন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৭।

৭. হেনরি বার্গসন, Matter and Memory, পৃ. ৩২০।

৮. জর্জ গ্যালাওয়ে, The Philosophy of Religion, পৃ. ৫৬৫-৫৬৬।

৯. ই. শ্রডিংগার, What is Life, পৃ. ৯১-৯২।

১০. পি.ডি. উসপেনস্কি, In Search of the Miraculous, পৃ. ১০১।

১১. ক্যাম্পবেল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।

১২. একই, পৃ. ১২০।

১৩. ডিকসন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৫।

১৪. বারদেয়েভ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭।

১৫. এ.এন. হোয়াইটহেড, Adventures of Ideas, পৃ. ৩০৯।

১৬. এম. ইকবাল, Reconstruction of Religious Thought in Islam, পৃ. ১০২-১০৩।

১৭. জি.জি. সিম্পসন, The Meaning of Evolution, পৃ. ২৮১-২৮৪।

১৮. ডিকসন কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮।

# অধ্যায় ৪
# ঐশ্বরিক নির্দেশনা

## ১. নির্দেশনার প্রমাণ

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তা স্থির নয়, প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী এবং এর মধ্যে থাকা সবকিছু, সবই ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে কিছুটা ভিন্ন হয়ে উঠছে। প্রাথমিক গ্রীক চিন্তাবিদরা পরিবর্তনের ঘটনা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তারা মহাবিশ্বের উপস্থাপন করা পরিবর্তন এবং স্থায়ীত্বের পরস্পরবিরোধী চেহারা দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। পারমেনাইডস পরিবর্তনকে একটি মায়া হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যা হেরাক্লিটাস এটিকে একমাত্র বাস্তবতা হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। কয়েক শতাব্দী ধরে, দার্শনিকরা পরিবর্তনের সত্যকে উপেক্ষা করার প্রবণতা দেখিয়েছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের উত্থানের সাথে সাথে, বিশেষ করে ভূতত্ত্ব এবং জীববিজ্ঞানের জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে, মহাবিশ্ব সম্পর্কে একটি গতিশীল ধারণা সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে। বিবর্তন তত্ত্ব আমাদের বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে দিয়েছে, এবং এখন আমরা এর অতীত ইতিহাসের আলোকে সবকিছু বোঝার চেষ্টা করি। আমরা জানি যে পৃথিবীর একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এটি অগণিত যুগ ধরে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের ফসল; এবং লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জীবন ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে।

এই মুহূর্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। পৃথিবীতে যে পরিবর্তনগুলি নিঃসন্দেহে ঘটেছে, তা কি বেশ ভুল? এবং আকস্মিক, নাকি এগুলোর মধ্যে কোন ছন্দ আছে নাকি এগুলোর অন্তর্নিহিত কোন পরিকল্পনা আছে? আমাদের জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় এই প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর নেই। কিছু বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বিশ্বাস করেন যে পরিবর্তনগুলি লক্ষ্যহীন এবং মহাবিশ্ব, যদিও পরিবর্তিত হচ্ছে, একটি নির্দিষ্ট দিকে অগ্রসর হচ্ছে না, একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তো দূরের কথা। তারা ঘোষণা করেন যে তারা কেবল পরিবর্তনের পরে পরিবর্তন দেখতে পারেন, কারণ একটি তরঙ্গ অন্য তরঙ্গের পরে আসে। ফিশার, ইউরোপীয় ইতিহাসের বিশাল প্যানোরামা পর্যবেক্ষণ করে, স্বীকার করেন যে তিনি এতে কোনও সামঞ্জস্য দেখতে পান না। তিনি স্বীকার করেন যে অগ্রগতি আছে কিন্তু জোর দিয়ে বলেন যে "অগ্রগতির কোনও নিয়ম নেই।"[১]

তবে, লয়েডস মরগান এবং এইচ. বার্গসনের মতো অন্যান্য মহান চিন্তাবিদ দাবি করেন যে পরিবর্তনগুলি, যখন ঘনিষ্ঠভাবে এবং ব্যাপকভাবে দেখা হয়, তখন একটি প্যাটার্ন প্রকাশ করে এবং একটি লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে বলে মনে হয়।

পৃথিবী এবং এর মধ্যে বিদ্যমান প্রতিটি জিনিস যে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে তা পরিপূর্ণতা বলে মনে হয়। পরিপূর্ণতা মানে আত্ম-উপলব্ধি, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সত্তার অন্তর্নিহিত সমস্ত সম্ভাবনার বাস্তবায়ন। এইভাবে সংজ্ঞায়িত করলে, এটা স্পষ্ট যে পরিপূর্ণতাকে পরম অর্থে গ্রহণ করা উচিত নয়, বরং প্রতিটি পৃথক জিনিস বা ব্যক্তির ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং ক্ষমতার মাত্রা এবং অর্জনযোগ্য পরিপূর্ণতার মাত্রার মধ্যে সরাসরি অনুপাত রয়েছে। উন্নয়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি জিনিস নিজেকে উপলব্ধি করে এবং যে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম তা অর্জন করে।

প্রায় প্রতিটি ধর্মেই, ধর্মতত্ত্ববিদরা দীর্ঘকাল ধরে সৃষ্টির প্রকৃতি নিয়ে বিভ্রান্ত। তারা এটিকে বিভিন্ন উপায়ে কল্পনা করেছিলেন। বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টির ধারণাটি বিজ্ঞান যে তথ্যগুলি প্রকাশ করেছে তার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। এটি কোরআনে বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গির সাথেও খাপ খায়। মহাবিশ্ব হঠাৎ পরিবর্তনের দৃশ্য নয়। এগুলি বিবর্তনীয় পরিবর্তন যা নতুন এবং উচ্চতর গুণাবলী এবং নতুন উচ্চতর ধরণের সত্তার উত্থানের দিকে পরিচালিত করে। প্রতিটি প্রাকৃতিক জিনিস, যখন এটি অস্তিত্বে আসে, তখন বিকাশের একটি ক্যারিয়ারে প্রবেশ করে। সৃষ্টির সামগ্রিক ধরণে প্রতিটি সৃষ্ট প্রাণীর একটি নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে এবং সেই অর্থে এটি ভাল। কিন্তু এটি তার জীবনকাল জুড়ে একই থাকার উদ্দেশ্যে নয়। এটি অনেক সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ এবং সহজাতভাবে সেগুলিকে উপলব্ধি করার প্রবণতা রাখে, প্রক্রিয়াটিতে আরও নিখুঁত হয়ে ওঠে। ঐশ্বরিক নির্দেশনার মাধ্যমে, যাকে কোরআনে রুবুবিয়্যাহ বলা হয়েছে, জিনিসগুলি বিকশিত হয় এবং অবশেষে সেই আকারে পৌঁছায় যার আকার তারা সক্ষম। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নলিখিত আয়াতে সহজ এবং সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে: যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং নিখুঁত করেছেন, যিনি পরিমাপ করেছেন এবং পরিচালনা করেছেন (৮৭: ২-৩)।

এই আয়াতটি মহাবিশ্বের সাথে সম্পর্কিত চারটি সাধারণ ঐশ্বরিক কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে - খালক (সৃষ্টি), তাসবিয়া (পরিপূর্ণতা), তাকদীর (পরিমাপ এবং হুদা (পরিচালনা)। একটি প্রাকৃতিক জিনিস নির্দিষ্ট সম্ভাবনার অধিকারী এবং তার রবের দ্বারা পরিচালিত হয়, পর্যায়ক্রমে পর্যায়ক্রমে পূর্ণ বিকাশে পৌঁছানো পর্যন্ত। স্রষ্টার নির্দেশনা এবং লালন-পালন তার বিকাশের জন্য অপরিহার্য। ঐশ্বরিক নির্দেশনা মহাবিশ্বের সর্বত্র কাজ করে। এর প্রাপককে যে আকারে এটি প্রদান করা হয় তাকে কোরআনে ওহী বলা হয়। ওহীকে সাধারণত ওহী হিসাবে অনুবাদ করা হয়, তবে ওহী আরও সাধারণীকরণ করা হয় এবং ইংরেজি শব্দের চেয়ে এর বিস্তৃত পরিধি রয়েছে। এটি আমাদের ওহীর প্রকৃতি এবং কার্যকারিতা আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখার জন্য প্রতিদান দেবে।

## ২. ওহী এবং সৃষ্টি জগৎ

ওহীর আক্ষরিক অর্থ হল একজন ব্যক্তির মধ্যে চিন্তা বা অনুভূতি প্ররোচিত করা, অনুপ্রাণিত করা বা অনুপ্রাণিত করা। সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরে ওহী বিভিন্ন রূপে কাজ করে, যার মধ্যে রয়েছে অন্ধ তাড়না জাগানো থেকে শুরু করে চিন্তাকে অনুপ্রাণিত করা। বস্তুগত দেহ থেকে যুক্তিসঙ্গত প্রাণী পর্যন্ত সমস্ত জিনিসই ওহীর প্রতি আকৃষ্ট। পৃথিবী এবং আকাশমণ্ডলকে ঐশ্বরিক নির্দেশনার প্রতি আনুগত্যশীল হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে: তিনি প্রতিটি আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করেছেন (৪১:১২)।

আবার বলা হয়েছে যে এমন একটি দিন আসবে যখন "পৃথিবী তার সংবাদ প্রচার করবে। কারণ তোমার রব তাকে প্রেরণা দেবেন" (৯৯:৪-৫)।

প্রাণীজগতে, ঐশ্বরিক নির্দেশনা ওহী দ্বারা সহজাত প্রেরণার আকারে মধ্যস্থতা করা হয় যেমন নিম্নলিখিত আয়াতটি ইঙ্গিত করে: তোমার রব মৌমাছিকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, বলেছিলেন: পাহাড়ে, গাছে এবং তারা যা ঘাস খায় তাতে তোমার বাসস্থান বেছে নাও (১৬:৬৮)।

"আলো" শিরোনামের অধ্যায়ে নির্দেশক শক্তি সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে যা
সকল কিছুতে কাজ করে: তুমি কি দেখোনি যে যারা আকাশে এবং পৃথিবীতে আছে তারা আল্লাহর সেবা করে এবং পাখিরাও তাদের ডানা ছড়িয়ে দেয়। প্রত্যেকেই তার নির্ধারিত কাজ (নামাজ) এবং কীভাবে তা পালন করতে হবে (তাসবিহ) জানে (২৪:৪১)।

আরেকটি আয়াত এই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলে: পৃথিবীতে এমন কোন জীব নেই যা তার ডানায় উড়ে যায়, কিন্তু তারা তোমাদের মতোই জাতি (ঐশী নির্দেশনার অধিকারী) (৬:৩৮)।

প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই স্রষ্টার কাছ থেকে তার প্রয়োজনীয় সকল নির্দেশনা লাভ করে। নির্দেশক শক্তি, যার উৎস স্রষ্টা, তা মহাবিশ্বের সর্বত্র কার্যকর। ভৌত বস্তুর গতিবিধির নিয়মিততা এবং আচরণের উদ্দেশ্যমূলক চরিত্র, জীবের অস্তিত্ব, উভয়ই স্রষ্টার পথপ্রদর্শক হাত প্রকাশ করে। তিনি নক্ষত্রদের তাদের গতিপথে পরিচালিত করেন। তিনি গ্রহগুলিকে তাদের নির্ধারিত কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হতে দেন না। ভৌত জগতের শৃঙ্খলা হল ঐশ্বরিক নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশনার প্রত্যক্ষ ফলাফল। বস্তুগত দেহের গতিবিধি অপরিবর্তনীয় আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। স্বর্গীয় নক্ষত্রগুলি পদার্থের ক্ষুদ্র কণাগুলির মতো এই আইনগুলির কাছে আত্মসমর্পণ করে। সুতরাং সর্বত্র আমরা স্রষ্টার আইনের সম্পূর্ণ আনুগত্য দেখতে পাই। কোনও কিছুই তার কার্যকলাপের জন্য নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে না। "স্রষ্টার সামনে সিজদা" বলতে এটাই বোঝায়। কোরআন বলে: এবং জীবন্ত প্রাণী এবং মালেকাদের পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহর কাছে সিজদা পছন্দ করে (১৬ - ৪৯)।

প্রাণীজগতে, ঐশ্বরিক নির্দেশনা প্রবৃত্তির রূপ নেয়। প্রবৃত্তি প্রাণীকে তার পরিবেশের সাথে সন্তোষজনকভাবে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম করে। এটি তাকে তার মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে এবং এর ফলে নিজেকে এবং তার বাচ্চাদের উভয়কেই সংরক্ষণ করতে সক্ষম করে। প্রবৃত্তির বিস্ময় সম্পর্কে অনেক খণ্ড লেখা হয়েছে। একটি অদ্ভুত জগতে এটি প্রাণীকে কতটা দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে তা দেখানোর জন্য কয়েকটি উদাহরণ যথেষ্ট হবে। হাঁসের বাচ্চা এবং ছানাটি হয়তো একই মুরগির বাচ্চা থেকে বাচ্চা হয়েছে, কিন্তু প্রথমটি নির্ভীকভাবে পানিতে ডুবে যাওয়ার সময়, দ্বিতীয়টি সেখান থেকে সরিয়ে শুষ্ক ভূমিতে চলে যায়। মনে হয় প্রত্যেকেই সহজাতভাবেই জানে যে তারা কী করতে পারে এবং কী করতে পারে না। পরিযায়ী পাখিরা হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দেয়, মরুভূমি, বন, সমভূমি এবং পর্বতমালার উপর দিয়ে উড়ে যায় এবং সমুদ্র ও মহাসাগরের মধ্য দিয়ে মাছ ধরে, এবং কখনও তাদের পথ হারিয়ে যায় না। সহজাত প্রবৃত্তি তাদের সেই জলবায়ুতে নিয়ে যায় যেখানে তারা খুঁজছে। বোলতা তার ডিম পাড়ে এবং তার বাচ্চাদের জন্য খাবার সরবরাহ করে যা সে কখনও দেখতে পায় না। প্রতিটি প্রাণীর প্রকৃতিতে যে নির্দেশিকা উপাদানটি কাজ করে তা তাকে এমন কার্যকলাপে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে যা তার মৌলিক চাহিদা পূরণের দিকে পরিচালিত করে। প্রকৃতি যে সামঞ্জস্য এবং শৃঙ্খলা প্রদর্শন করে তার জন্য একই উপাদান দায়ী। ওহি আসলে এই উপাদানটির কার্যকলাপ। এই বিষয়ে গ্যালোওয়ের মন্তব্য লক্ষ্য করা উচিত: শব্দের বিস্তৃত অর্থে, প্রকৃতির ক্রম একটি উদঘাটন, কারণ এটি এমন একটি অর্থ প্রকাশ করে যার চূড়ান্ত উৎস স্রষ্টা।[২]

এ থেকে আমরা দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। প্রথমত, এটি ঐশী নির্দেশনা বা ওহী যা প্রতিটি জিনিসকে পর্যায়ক্রমে পর্যায়ক্রমে বহন করে যতক্ষণ না এটি তার পূর্ণ বিকাশে পৌঁছায়। দ্বিতীয়ত, সবকিছুকে সেই পথ অনুসরণ করতে হয় যা তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। এটিকে তার প্রকৃতি বলা যেতে পারে।

## ৩. মানুষ এবং ওহী

নিঃসন্দেহে, মানুষেরও ঐশী নির্দেশনা প্রয়োজন। এটি ছাড়া তার পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে, তাকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয় তা ভিন্ন ধরণের যা তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সাথে খাপ খায়। তার কার্যকলাপ অবিচল আইন দ্বারা পরিচালিত হয় না, যেমনটি জড় প্রাণীদের ক্ষেত্রে হয়, এবং সেগুলি তার অন্তর্নিহিত অন্ধ ইচ্ছা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হয় না। তাকে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এবং এর অর্থ হল সে সঠিক বা ভুল পথ বেছে নিতে স্বাধীন, এমনকি সে ভুল করার জন্যও স্বাধীন। সে তার জন্য যা ভালো তা বেছে নিতে পারে; তবে সে যা তার জন্য ক্ষতিকর তাও বেছে নিতে পারে। সে পছন্দের স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং ভুলের জন্য তাকে মূল্য দিতে হয়। এমনকি প্রবৃত্তি যে নিশ্চিত নির্দেশনা দেয় তাও তাকে অস্বীকার করা হয়। ছানাটি যখন নিজেকে পুকুরের ধারে দেখতে পায়, তখন সহজাতভাবে পিছিয়ে পড়ে

এবং নিজেকে বাঁচায়। মানব শিশু অভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতার কারণে তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করতে পারে এবং পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে যেতে পারে। প্রাণীদের সাথে মানুষের অনেক মিল রয়েছে তবে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে পার্থক্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা এবং বিশাল শেখার ক্ষমতা তাকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে। যাইহোক, যদিও প্রাণীদের তুলনায় সম্ভাব্যভাবে উচ্চতর, জীবনের শুরুতে সে জীবন সংগ্রামের জন্য তাদের তুলনায় অনেক খারাপভাবে সজ্জিত। যদি সে তার ক্ষমতা বিকাশ করে তবে সে দ্রুত প্রাণীদের ছাড়িয়ে যেতে পারে; কিন্তু যদি সে তাদের বিকাশে ব্যর্থ হয়, তবে সে সহজেই পশু স্তরের নীচে নেমে যেতে পারে।

আবার, মানুষ এক নীতিবান জীব, সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম এবং যে কোনও একটি বেছে নেওয়ার জন্য স্বাধীন। যাইহোক, সে দেখতে পায় যে ভালো থেকে মন্দের মধ্যে পার্থক্য করা সহজ নয়, ভালোটি বেছে নেওয়াও সহজ নয়, যখন এটি জানা যায়। তার নিজের মধ্যে ভালোর জন্য কোনও নিশ্চিত পথপ্রদর্শক নেই। কোনও নৈতিক প্রবৃত্তি তাকে নির্ভুলভাবে সঠিক পথে নিয়ে যায় না। এটা স্পষ্ট যে, বিশ্বে যতগুলি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আছে, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক নৈতিক নীতিমালা আছে, সর্বজনস্বীকৃত নয়। প্রতিটি উপজাতির নিজস্ব একটি নীতিমালা তৈরি হয়েছে বলে মনে হয়, যা অন্যান্য গোষ্ঠীর কাছে অগ্রহণযোগ্য। বিভিন্ন নৈতিক নীতিমালার একটি উদাসীন জরিপ আমাদেরকে নীতিগত আপেক্ষিকতার দৃষ্টিকোণে নিয়ে যায়। একটি আচরণবিধিকে সারাংশে ভালো বা খারাপ বলে বিচার করা যায় না। এটি এক সাংস্কৃতিক স্তরের জন্য ভালো এবং অন্য স্তরের জন্য খারাপ হতে পারে। অতীতে, বিবেককে সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা দেওয়া হত। এখন, মনোবিজ্ঞানীরা, পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানীরাও মনে করেন যে একজন মানুষের বিবেক সেই সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা গঠিত হয় যেখানে সে লালিত-পালিত হয়েছে। বিবেক হল কেবলমাত্র সেই গোষ্ঠী নীতিমালা যা ব্যক্তির মধ্যে অভ্যন্তরীণভাবে ধারণ করা হয়েছে।

এভাবে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত সঠিক ও ভালো দিকনির্দেশনার কোন নিশ্চিত পথপ্রদর্শক নেই। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে: "সে খায়েরের জন্য যেমন প্রার্থনা করে, তেমনি শরর প্রার্থনা করে (১৭:১১)।"

মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার ক্ষমতা যে সহজাত, এই দৃষ্টিভঙ্গির কোরআনে কোনও সমর্থন পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে প্রায়শই উদ্ধৃত করা আয়াত (৯১:৮) [৩] ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি "মানব প্রকৃতির" কোনও বৈষম্যমূলক গুণের কথা উল্লেখ করে না। কারণ যদি মানুষ ঐশ্বরিক নির্দেশনা ছাড়াই ভালো-মন্দ বিচার করার এবং এভাবে সঠিক-অন্যায় পার্থক্য করার ক্ষমতা রাখত, তাহলে নবুওয়াতের প্রতিষ্ঠানটি তার তাৎপর্য হারাবে। তাহলে কেন স্রষ্টা মানুষের মধ্য থেকে আম্বিয়াকে উৎপন্ন

করেছিলেন এবং তাদের উপর তাঁর লোকদের সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন? আবার, যদি ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার ক্ষমতা মানুষের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত থাকত, তাহলে সমগ্র মানবজাতি, তার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত, একই নৈতিক কোড অনুসরণ করত; কিন্তু, যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, কোনও সর্বজনীনভাবে গৃহীত নৈতিক মান নেই। প্রতিটি দলের নিজস্ব নৈতিক কোড রয়েছে এবং আরও বড় কথা, সময়ের সাথে সাথে এই কোডও পরিবর্তিত হয়েছে। অতএব, উপরে উদ্ধৃত আয়াতটির অর্থ এই নয় যে "মানব প্রকৃতি" - অথবা মানুষের বিবেক - নিজের থেকে সঠিক-ভুল জানার যোগ্য, অথবা এর মধ্যে খাইর এবং শারের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা রয়েছে। বিপরীতে, উপরে উল্লিখিত আয়াতের শব্দগুলি (অর্থাৎ, ৯১:৮) একটি সত্যের বিবৃতি, মানুষের ভাল বা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনার সত্যতা, যা সে নিজের জন্য নির্ধারণ করে। যেহেতু মানুষের ব্যক্তিত্ব (অথবা আত্মা) একটি অবিকশিত আকারে দেওয়া হয়েছে, তাই আয়াতটি বলে যে, সর্বোচ্চ কল্যাণ অর্জনের, অথবা ভুল কাজে নিজেকে নষ্ট করার সমান সম্ভাবনা রয়েছে। আয়াতের সঠিক অনুবাদ হল: "মানব আত্মাকে নিজেকে একীভূত করার বা কলুষিত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।"

আবার, যারা বিশ্বাস করেন যে বিবেক মানুষের জন্য একটি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক, তারা আয়াত (৩০ : ৩০) এর প্রতি আবেদন করেন যা সাধারণত এইভাবে অনুবাদ করা হয়: আল্লাহর প্রকৃতি (ফিতরাতুল্লা) যার মধ্যে তিনি মানুষকে তৈরি করেছেন।

তবে এটা মনে রাখা উচিত যে, আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দ "ফিতরাত" এর অর্থ ইংরেজি শব্দ "প্রকৃতি" এর মতো নয়। "প্রকৃতি" শব্দের অর্থ হল গঠন বা অপরিবর্তনীয় জিনিসের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে, ফিতরাত বলতে কেবল সৃষ্টি বা অস্তিত্বে আনা বোঝায়। অতএব, আমরা এই আয়াতটিকে এই অর্থে ব্যাখ্যা করতে পারি না যে মানুষেরও স্রষ্টার মতো একই প্রকৃতি রয়েছে। এটি কেবল আমাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে মানুষকে মহাবিশ্বের অন্যান্য জিনিসের মতো একই ঐশ্বরিক সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি আমরা স্বীকার করি যে মানুষকে "স্রষ্টার প্রকৃতিতে" সৃষ্টি করা হয়েছে, তাহলে আমরা কীভাবে এটিকে কোরআনে বর্ণিত তার কিছু "গুণাবলীর" সাথে সামঞ্জস্য করব? উদাহরণস্বরূপ, মানুষকে "দুর্বল সৃষ্টি করা হয়েছে" (৪:২৮), "তাড়াহুড়ো করে সৃষ্টি করা হয়েছে," "তাড়াহুড়ো করা" (১৭:১১), "অকৃতজ্ঞ" (১৭:৬৭), "লোভী" (১৭:১০০), "অধৈর্য" (৭০:১৯), "একজন অধৈর্য" (১৮:৫৪), "একজন অত্যাচারী এবং অজ্ঞ" (৩৩:৭২) বলা হয়েছে।

সত্য হল যে "মানুষের স্বভাব" বলে কোন জিনিস নেই যে অর্থে এই শব্দটি সাধারণত ব্যবহৃত হয়। কারণ, প্রকৃতির দ্বারা আমরা কোন জিনিসের সত্তা গঠনকারী বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পারি এবং তাই তার অস্তিত্বকে তার নিজস্বভাবে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করি। এটি তার প্রকৃতিই তার আচরণ নির্ধারণ করে। অতএব, এটি

তার প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। এটি একটি কঠোর আইনের মতো যা কোনও বস্তু লঙ্ঘন করতে পারে না। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, জল প্রবাহিত হতে হবে, আগুন জ্বলতে হবে এবং প্রাণীকে তার প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত পথ অনুসরণ করতে হবে। তবে, মানুষ একটি ভিন্ন স্তরে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও সে ভৌত জগতের একটি অংশ, তবুও এটা বলা যেতে পারে যে তার "স্বভাব" হল তার শারীরিক সত্তার স্বার্থে এর নিয়ম অনুসারে আচরণ করা, যদিও, যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, সে প্রায়শই সেই নিয়মগুলির বিরুদ্ধে যায়। তার বাস্তব সত্তার ক্ষেত্রে, সে তার জন্য উন্মুক্ত যেকোনো সম্ভাবনা বেছে নিতে স্বাধীন।

এই কারণেই নিম্ন স্তরের প্রাণীদের আচরণের অনমনীয়তা মানুষের আচরণের পরিবর্তনশীলতা এবং পরিবর্তনশীলতার সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত। "মানব প্রকৃতি" অত্যন্ত নমনীয়, এবং এত বিভিন্ন রূপ ধারণ করে যে এর কোনও পর্যাপ্ত সংজ্ঞা এখনও প্রণয়ন করা হয়নি। "মানব প্রকৃতি" সম্পর্কে অসংখ্য তত্ত্ব রয়েছে কিন্তু তাদের কোনওটিই সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল থেকে ফ্রয়েড এবং গার্ডিনার পর্যন্ত মানুষ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে; কিন্তু মানুষ কোনও না কোনওভাবে প্রতিটি তাত্ত্বিক কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসে।

কোরআনে বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, মানুষ ভালো বা খারাপ উভয়ই হওয়ার ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সে নিমজ্জিত সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ। যদি সে এগুলোকে বিকশিত করে এবং মানবজাতির নৈতিক ও বস্তুগত উন্নতির জন্য কাজে লাগায়, তাহলে তার আচরণ ভালো হবে; যদি সে তার বিশাল সম্পদ ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয় অথবা মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর কাজে লাগায়, তাহলে তার আচরণ খারাপ হবে। ওহী বা ঐশ্বরিক নির্দেশনা আত্ম-উপলব্ধি এবং জ্ঞান সুখ ও শান্তির পথ নির্দেশ করে। ওহীর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে, মানুষ অবশেষে "মো'মিন" মর্যাদা অর্জন করতে পারে। একজন "মো'মিন" নিজের সাথে এবং বিশ্বের সাথে শান্তিতে থাকে কারণ সে তার অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দ্বন্দ্ব সফলভাবে সমাধান করেছে।

ওহী ব্যক্তি মনে এবং মানব সমাজে সামঞ্জস্যের পথ দেখায়। উপরে উদ্ধৃত আয়াতগুলি যে অর্থে মানুষ খারাপ, তার অর্থ হল যে যদি সে ঐশী নির্দেশনা উপেক্ষা করে এবং তার নীচু আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে তবে সে আরও খারাপ এবং আরও খারাপ হতে পারে।

আসুন আমরা আবারও বলি যে কোরআন স্পষ্টভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করে যে মানব প্রকৃতির একটি নির্দিষ্ট ধরণ এবং কঠোরভাবে নির্ধারিত আচরণ রয়েছে, কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে।

## ৪. নবুওয়াত

উপরে যেমন বলা হয়েছে, জড় দেহ থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত, বিশ্বের সমস্ত জিনিস আত্ম-বিকাশ এবং তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ঐশী নির্দেশনার উপর নির্ভর করে। তবে, এই নির্দেশনা অনেক রূপ ধারণ করে, প্রতিটি রূপ অস্তিত্বের একটি নির্দিষ্ট স্তরের জন্য উপযুক্ত। মানব স্তরে এটি যে রূপ ধারণ করে তা বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে।

মানুষ একটি যুক্তিবাদী সত্তা এবং তার একটি স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত সত্তা রয়েছে। সে তার স্বাধীনতাকে মূল্য দেয়, জানে যে তার কর্মের জন্য সে একাই দায়ী এবং যদি তার পরিণতি অপ্রীতিকর হয় তবে অভিযোগ করার কোনও অধিকার তার নেই। সে অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক বাধ্যবাধকতার কারণে বিরক্ত হয়। তারও ঐশ্বরিক নির্দেশনার প্রয়োজন কিন্তু সে কেবল এমন একটি রূপে এটি পেতে পারে যা তার স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে না এবং নিজের জন্য বিচার করার অধিকার থেকে বিরত থাকে না। ওহী বা ওহীর মাধ্যমে মানুষকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। তবে, প্রতিটি মানুষ ওহীর প্রাপক হতে পারে না। কেবলমাত্র একজন ব্যতিক্রমী প্রতিভাধর ব্যক্তি, যাকে স্রষ্টা এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে আত্ম-নিয়ন্ত্রণে সক্ষম বলে মনে করেন, তিনিই স্রষ্টার কাছ থেকে সরাসরি নির্দেশনা পেতে পারেন। "নবী" উপাধিটি এমন ব্যক্তির জন্য প্রয়োগ করা হয় এবং নবুওয়াত নবীর দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যাবলীকে নির্দেশ করে। যেহেতু তিনি স্রষ্টার সাথে একীভূত হন, তিনি ঐশ্বরিক ওহী বা ওহী পান এবং যেহেতু তিনি তার সহ-সত্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন, তাই তিনি তাদের কাছে ওহী ঠিক সেই রূপে পৌঁছে দেন যেভাবে তিনি এটি পেয়েছেন। মাধ্যমের বিশুদ্ধতা সেই ওহীর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করে যা এটি প্রেরণ করে। অধিকন্তু, নবী তাঁর আদর্শ জীবন ও আচরণের মাধ্যমে ওহীকে একটি প্রাণবন্ত ও বাস্তব রূপে উপস্থাপন করেন যা মানুষকে মুগ্ধ করতে ব্যর্থ হতে পারে না।

নবুওয়াতের প্রকৃতি বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের একটি ভুল ধারণা থেকে মুক্তি পেতে হবে। ইহুদি-খ্রিস্টান ঐতিহ্যে, "নবুওয়া" হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন বা ভবিষ্যতের ঘটনাবলী ভবিষ্যদ্বাণী করেন। অস্বাভাবিক মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন, "নবুওয়া" কে ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি আগে থেকে দেখার ক্ষমতা বলে মনে করা হয় যার বিষয়ে তিনি মানুষকে সতর্ক করেন। নবী সম্পর্কে ইসলামী ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজিতে "নবুওয়া" শব্দটি "নবুওয়া" শব্দটির সমতুল্য নয় যা এই প্রসঙ্গে কোরআন ব্যবহার করে। নবী "নবুওয়া" বা ভবিষ্যদ্বাণীকারী নন। তাঁর কাজ ভবিষ্যদ্বাণী নয় বরং তাঁকে প্রদত্ত ওহীর আদান-প্রদান। ইহুদিদের দ্বারা বোঝা "নবুওয়া" নবীর মিশনের সাথে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। তিনি

তাঁর লক্ষ্য পূরণ করেন যদি তিনি ওহীকে যেমনটি পেয়েছেন তেমনভাবে প্রচার করেন, তাতে কিছু যোগ বা হ্রাস না করে। তাঁর উদ্দেশ্য ভবিষ্যদ্বাণী করা নয় বরং ঐশ্বরিক ওহীর আলোকে মানুষকে নৈতিক নির্দেশনা প্রদান করা। এটি একজন নবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আরেকটি শব্দ থেকে স্পষ্ট। তিনি "রাসূল" বা বার্তাবাহক। তিনি স্রষ্টার কাছ থেকে একটি বার্তা বহন করেন যা মানুষকে বলে যে সে কীভাবে একটি ভাল জীবনযাপন করতে পারে এবং কীভাবে সে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে। কোরআন এই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলে: হে আদমের সন্তান! যখনই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে রাসূলগণ আসবেন, যারা তোমাদের কাছে আমার ওহী বর্ণনা করবেন, তখন যারা তা অনুসরণ করবে এবং সংশোধন করবে, তাদের উপর কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না (৭:৩৫)।

এটা মনে রাখা উচিত যে ওহীর উদ্দেশ্য মানুষকে কোনও নির্দিষ্ট পথ বেছে নিতে বাধ্য করা নয়। ওহী কেবল তাকে জানিয়ে দেয় যে কোন পথ তার বৃদ্ধি এবং বিকাশের দিকে নিয়ে যায় এবং কোনটি তার ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, এবং তাকে নিজের জন্য বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেয়। ওহী মানুষকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদান করে যারা তখন তা অনুসরণ করতে বা না করতে স্বাধীন। কোরআন বলে: বলুন, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য। তাহলে যে কেউ বিশ্বাস করতে চায়, আর যে কেউ তাকে প্রত্যাখ্যান করতে চায় (১৮:২৯)।

আসুন আমরা কোরআনের ওহীর ধারণাটি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি। ওহী হল স্রষ্টার একটি উপহার, যা তিনি তাঁর নির্বাচিত ব্যক্তিকে প্রদান করেন। ওহী এমন কোনও পুরস্কার নয় যা একজন মানুষ নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজের জন্য অর্জন করতে পারে। তার সুপ্ত শক্তি বিকাশের মাধ্যমে, মানুষ নিজেকে নবুওয়াতের জন্য যোগ্য করে তুলতে পারে না। নবী সত্য আবিষ্কার করেন না; এটি স্রষ্টা কর্তৃক তার কাছে প্রকাশিত হয়। অতএব, কোরআন ওহীকে "প্রেরণ" বা "নুযুল" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে: নিশ্চয়ই আমরা আপনার প্রতি সত্য সহকারে কিতাব নাযিল করেছি (৩৯:২)।

মনে রাখার বিষয় হল যে ওহী গ্রহণ একটি তীব্র এবং গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা, কিন্তু এটি এমন কোনও অভিজ্ঞতা নয় যা ব্যক্তিগত কারণ দ্বারা প্ররোচিত হয়েছে। নবী তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে বস্তুনিষ্ঠ করেন না। তিনি খোদার সাথে তার সাক্ষাৎ সম্পর্কে তীব্র এবং স্পষ্টভাবে সচেতন। এবং তিনি নিজেকে এমন একটি বার্তার নিষ্ক্রিয় প্রাপক মনে করেন, যা তার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা এবং অনুভূতি দ্বারা দূষিত না হওয়া উচিত: তিনি, নবী (নিজের) ইচ্ছার কথা বলেন না (৫৩:৩)

এটিই আমরা ওয়াহির প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে যতদূর যেতে পারি। অতএব, এটা অদ্ভুত নয় যে তার সাধারণ জীবনে, নবী অন্যান্য মানুষের মতোই কথা বলেন এবং আচরণ করেন। শুধুমাত্র ওয়াহির অভিজ্ঞতার

সময়, তিনি নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের সাথে কথা বলেন এবং সেই সত্য প্রকাশ করেন- যা মানব বুদ্ধি নিজে থেকে আবিষ্কার করতে পারে না। এই অবস্থায় তিনি যে কথাগুলি বলেন তা তাঁর নয় বরং স্রষ্টার। যারা নবী মুহাম্মদ (সা.) কে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তারা এই সত্যটি লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যদিও ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ে তিনি সর্বদা তাঁর থেকে ভিন্ন ব্যক্তিদের প্রতি ছাড় দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, (অবশ্যই, ওয়াহি কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধের মধ্যে) যদি তা করে তিনি কোনও বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে পারেন, তবে তিনি তাকে প্রদত্ত ওহিতে সামান্যতম পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানাতে দৃঢ় ছিলেন। দৈনন্দিন জীবনে, তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি ছিল পারস্পরিক পরামর্শ এবং গ্রহণযোগ্যতার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তিনি তাঁর ওহী থেকে কোনও বিচ্যুতিকে সমর্থন করতেন না। তাঁর জীবনকালে তিনি কখনও সুবিধাজনক কারণে ওহীর একটি শব্দও পরিবর্তন করতে প্রলুব্ধ হননি। কোরআন এই সত্যের সাক্ষ্য দেয়: বলুন (হে মুহাম্মদ): আমার নিজের ইচ্ছায় এটি পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমি কেবল আমার কাছে যা অবতীর্ণ হয় তা অনুসরণ করি (১০:১৫)।

নবী আসলে ওহী পাওয়ার আগে তার কাছে এর সামান্যতম আভাসও থাকে না। তিনি এর জন্য চেষ্টাও করেন না। এটি তার কাছে আক্ষরিক অর্থেই একটি ওহী, নতুন, অপ্রত্যাশিত এবং সন্দেহাতীত কিছুর প্রভাব; যা তার অতীত অভিজ্ঞতা বা বর্তমান মানসিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত নয়। কোরআন বলে: আর এভাবেই আমরা আমাদের আদেশে তোমার কাছে ওহী নাযিল করেছি; তুমি জানতে না যে কিতাব কী, ঈমান কী; কিন্তু আমরা এটিকে এমন একটি আলো করেছি যার মাধ্যমে আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশি তাকে পথ দেখাই (৪২:৫২; ২৮:৮৬)।

এমনকি যখন নবুওয়াতের পদ আসে, তখনও তাকে অবাক করে দেয়। তিনি আশা করেননি যে তাকে ওহীর বাহন হিসেবে নির্বাচিত করা হবে। স্রষ্টা নবীর ভূমিকার জন্য একজন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেন কিন্তু যতক্ষণ না তাকে প্রকৃতপক্ষে ভূমিকা দেওয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞান থেকে তা সরিয়ে রাখেন। সেই ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হয় কারণ তার মধ্যে এমন ব্যতিক্রমী গুণাবলী রয়েছে যা তাকে নবুওয়াতের ভূমিকার জন্য উপযুক্ত করে তোলে। তবে, বছরের পর বছর ধরে তার চরিত্র এবং আচরণের বৈষম্যমূলক পরীক্ষা করা হয়, যা নির্বাচন এবং নবুওয়াতের প্রকৃত আহ্বানের মধ্যে মধ্যস্থতা করে। এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। তাকে কেবল তখনই দায়িত্ব দেওয়া হয় যখন সে যোগ্য প্রমাণিত হয়। মূসার ক্ষেত্রে, নবুওয়াতের আহ্বানের আগে দীর্ঘ প্রস্তুতির সময়কাল কোরআনে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: এবং (হে মূসা) আমরা ইতিমধ্যেই তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছি। যখন আমরা তোমার মাকে বার্তা পাঠিয়েছিলাম যে, তাকে নৌকায় তুলে সমুদ্রে নিক্ষেপ করো, তখন সমুদ্র তাকে তীরে নিক্ষেপ করবে, এবং আমার এবং তার শত্রু তাকে ধরে নিয়ে যাবে (এবং তাকে লালন-পালন করবে); এবং আমি

তোমাকে আমার পক্ষ থেকে ভালোবাসা দান করেছি, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে লালিত-পালিত হও।

যখন তোমার বোন এসে বলল, আমি কি তোমাকে এমন একজনকে দেখাবো যে (শিশুর যত্ন নেবে), তখন আমরা তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে তার চোখ আনন্দিত হয় এবং সে দুঃখ না করে। আর তুমি একজন মানুষকে হত্যা করেছিলে, আর আমরা তোমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলাম, আর তোমার ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য আমরা অন্যান্য সুযোগও দিয়েছিলাম। তারপর, বছরের পর বছর ধরে তুমি মাদীয়ানদের মধ্যে ছিলে। এত কিছুর পরেও তুমি আমার পরিমাপে এসেছিলে, হে মূসা! আর আমি তোমাকে আমার জন্য বেছে নিয়েছি (২০: ৩৭-৪১)।

ওয়াহির আসল প্রকৃতি বোঝার জন্য, একে স্পষ্টভাবে রহস্যময় অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা করা অপরিহার্য, যার সাথে এটি প্রায়শই বিভ্রান্ত হয়। কিছু পণ্ডিত নবীর প্রকাশকে রহস্যময় অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এটি একটি ভুল ধারণা। দুই ধরণের অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য মৌলিক। এটি কেবল ধরণের পার্থক্য, কেবল মাত্রার নয়। রহস্যময় অভিজ্ঞতা, যাই হোক না কেন, প্রতিটি মানুষের নাগালের মধ্যে থাকে, যদি সে নিজেকে কঠোর শৃঙ্খলার অধীনে রাখতে ইচ্ছুক হয়। এটি রহস্যময় ইন্দ্রিয়ের বিকাশ, অথবা কোয়েস্টলার যেমন এটিকে বলেছেন সমুদ্রীয় ইন্দ্রিয়ের, যা মানুষের অন্তর্নিহিত। নান্দনিক ইন্দ্রিয়ের মতো এটিও চাষ এবং বিকশিত হতে পারে। রহস্যময় অভিজ্ঞতা বিক্রয়-ক্ষোভ, মনন, বিচ্ছিন্নতা এবং ঔষধের মাধ্যমে প্ররোচিত হতে পারে। এটি একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যেখানে আবেগগত কারণটি প্রাধান্য পায়। রহস্যময়ের স্বরূপ হিসেবে আবদ্ধ থাকার কারণে, এর বাইরের জগতের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, অথবা এর সাক্ষ্য নেই। রহস্যময় ব্যক্তি এটিকে অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন। সেখানে তিনি এক আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করেন যা তার অসীম ব্যক্তিত্বকে অভিভূত করে এবং বিলীন করে দেয়। তিনি নিজেকে বাস্তবতার অসীম সমুদ্রে মিশে যাওয়া অনুভব করেন। রহস্যময় দাবি করেন যে তার অভিজ্ঞতা উচ্চমানের মূল্যের সাথে অভিযুক্ত, কিন্তু এটি গোপন এবং অসংলগ্ন থাকে।

রহস্যময় ব্যক্তি এমন কিছুর দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পেয়ে থাকতে পারে যা তিনি সত্য বলে সন্তুষ্ট, কিন্তু তিনি তার সহ-সত্তাদেরকে তা করতে পারেন না। সে তার অর্জিত জ্ঞান ও তার দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে না। মরমী ব্যক্তির বাস্তবতাকে সে যা বলে মনে করে তার সাথে যোগাযোগের অনুভূতি থাকতে পারে, কিন্তু তার অভিজ্ঞতা, যেভাবেই হোক না কেন, ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগত থাকে। ওহীর অভিজ্ঞতা ভিন্ন। এটি ব্যক্তিগত মনের উপর বাস্তবতার উদয় হওয়ার অভিজ্ঞতা। নবী নিজেকে কেবল ঐশ্বরিকতার সংস্পর্শে নয় বরং এর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে অনুভব করেন। এবং কোনও সন্দেহ নেই যে তাকে

আক্রমণ করে। তিনি নিশ্চিত যে তিনি এমন জ্ঞান পাচ্ছেন যা তাকে সমস্ত মানুষকে প্রদান করতে হবে। ওহী বা ওহীর উদ্দেশ্য হল যোগাযোগ করা। ওহীর উদ্দেশ্য একক ব্যক্তির, নবীর, আকাঙ্ক্ষা বা আকাঙ্ক্ষাকে সন্তুষ্ট করা বা কেবল তাকেই পথ দেখানো নয়, বরং তার মাধ্যমে, যারা এর মাধ্যমে লাভবান হতে চায় তাদের সকলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা।

ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত বার্তাটি সারা বিশ্বে প্রচারিত হবে কারণ এর বিষয়বস্তু বস্তুনিষ্ঠ। এই মৌলিক পার্থক্য ওয়াহীকে একচেটিয়াভাবে একটি শ্রেণীতে ফেলে এবং সকল ধরণের অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে অনেক দূরে রাখে। অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা অতীন্দ্রিয়দের মনকে সমৃদ্ধ করতে পারে; অন্যদিকে, প্রকাশ মানুষের জীবনে একটি শক্তিশালী খামির হিসেবে কাজ করে। এটি একটি জীবন্ত এবং গতিশীল শক্তি যা ইতিহাসের স্রোতকে একটি নতুন প্রবাহে রূপান্তরিত করে। ইসলামের উত্থান প্রকাশের শক্তির একটি আকর্ষণীয় উদাহরণ উপস্থাপন করে।

ওয়াহি এবং রহস্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। রহস্যবাদী তার ব্যক্তিত্বকে জলে লবণের দানার মতো গলে যাওয়া এবং দ্রবীভূত হওয়া অনুভব করে। সীমাবদ্ধ সত্তা অসীমের মধ্যে মিশে গেছে বলে মনে করা হয়। ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ সীমা থেকে মুক্তি রহস্যবাদীকে উল্লাস এবং মহিমার অনুভূতি দেয়। তিনি বাস্তব জগতের উপরে এমন একটি ধর্মে উন্নীত হন যেখানে "অবশ্যই" বা "অবশ্যই" নেই। যদি তিনি বাস্তব জগতে ফিরে আসেন, তবে তিনি স্মৃতিকাতরতায় ভুগছেন এবং জীবনের বোঝার নীচে আর্তনাদ করছেন। বিপরীতে, প্রকাশ মানব সত্তাকে সমৃদ্ধ এবং উজ্জীবিত করে। ওয়াহি কর্তৃক প্রদত্ত পুষ্টির উপর ভর করে, এটি বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলির সাথে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করে এবং পৃথিবীতে "স্বর্গরাজ্য" প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা করে। নবীর ওহী মানুষের মধ্যে এক নতুন জীবন সঞ্চার করে, যার ফলে নবীকরণিত বিশ্বাস এবং পুনরুজ্জীবিত শক্তি নিয়ে তারা ধ্বংস ও বিচ্ছিন্নতার শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে যায়। সংক্ষেপে, যেখানে মরমী আত্ম-বিলুপ্তির লক্ষ্য রাখেন, নবী তাঁর ওহীতে সজ্জিত হয়ে মানুষকে আত্ম-উপলব্ধি, আত্ম-বিকাশ এবং আত্ম-প্রত্যয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

ইকবাল, এই বিষয়ের উপর তাঁর দক্ষতাপূর্ণ আলোচনায়, একজন নবীর অভিজ্ঞতা এবং একজন মরমীর অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। প্রাসঙ্গিক অংশটি সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করার যোগ্য: "আরবের মুহাম্মদ সর্বোচ্চ স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন এবং ফিরে এসেছিলেন। আমি স্রষ্টার শপথ করছি যে আমি যদি সেই পর্যায়ে পৌঁছে যেতাম, তাহলে আমার আর কখনও ফিরে আসা উচিত ছিল না।" এগুলি একজন মহান মুসলিম সাধক, গাঙ্গোহের আব্দুল কুদ্দুসের কথা। সুফি সাহিত্যের সমগ্র পরিসরে, সম্ভবত এমন শব্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে যা একটি বাক্যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক এবং মরমী ধরণের চেতনার মধ্যে

মানসিক পার্থক্যের এত তীব্র উপলব্ধি প্রকাশ করে। রহস্যবাদী 'ঐক্যবদ্ধ অভিজ্ঞতার' বিশ্রাম থেকে ফিরে আসতে চান না; এবং যখন তিনি ফিরে আসেন, যেমনটি তাকে অবশ্যই করতে হবে, তখন তার প্রত্যাবর্তন মানবজাতির জন্য খুব বেশি অর্থবহ নয়। নবীর প্রত্যাবর্তন সৃজনশীল। তিনি ইতিহাসের শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং এর মাধ্যমে আদর্শের একটি নতুন জগৎ তৈরি করার লক্ষ্যে নিজেকে সময়ের সাথে যুক্ত করতে ফিরে আসেন। রহস্যবাদীর জন্য, 'ঐক্যবদ্ধ অভিজ্ঞতার' বিশ্রাম চূড়ান্ত কিছু; নবীর জন্য এটি তার ভিতরে, বিশ্ব-কম্পনকারী মনস্তাত্ত্বিক শক্তির জাগরণ, যা মানব জগৎকে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করার জন্য নির্ধারিত। তার ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে একটি জীবন্ত বিশ্ব-শক্তিতে রূপান্তরিত দেখার আকাঙ্ক্ষা নবীর মধ্যে সর্বোচ্চ। এইভাবে তার প্রত্যাবর্তন তার ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মূল্যের এক ধরণের বাস্তবসম্মত পরীক্ষা। তার সৃজনশীল ক্রিয়ায় নবীর ইচ্ছা নিজেকে এবং মূর্ত সত্যের জগৎ উভয়কেই বিচার করে যেখানে এটি নিজেকে বস্তুনিষ্ঠ করার চেষ্টা করে। তার সামনে অদৃশ্য উপাদান ভেদ করে, নবী নিজেকে নিজের জন্য আবিষ্কার করেন এবং ইতিহাসের চোখে নিজেকে উন্মোচন করেন। অতএব, নবীর ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মূল্য বিচার করার আরেকটি উপায় হল তিনি যে ধরণের পুরুষত্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বার্তার চেতনা থেকে উদ্ভূত সাংস্কৃতিক জগৎ পরীক্ষা করা। [৪]

ওয়াহির নির্দেশ অনুসারে সমগ্র মানবজাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার এবং ইতিহাসের গতিপথকে রূপ দেওয়ার জন্য একটি সর্বজনীন বিপ্লব আনার নবীর লক্ষ্য কোনও সহজ কাজ নয়। এই স্বর্গীয় দায়িত্বের বোঝার প্রসঙ্গে কোরআন উল্লেখ করে: আমি কি তোমার বক্ষকে প্রশস্ত করিনি এবং তোমার পিঠের উপর চাপিয়ে দেওয়া বোঝা হালকা করিনি? (৯৪:১-৩)।

নবী তাঁর প্রাপ্ত বার্তা ঘোষণা করেন এবং সত্যের তীব্র শক্তির মাধ্যমেই এটি তাদের মনে ডুবে যায় যাদের সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা এখনও মৃত হয়নি। নবী আমি, নিজের জীবন ও আচরণের উদাহরণ দিয়ে, তাদেরকে আরও পবিত্র, মহৎ এবং উচ্চতর জীবনযাপনের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত করি। এই ব্যক্তিরা নবীর চারপাশে সমবেত হন এবং ওহীর আলোকে তাদের জীবন গঠনের জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালান। নবী তাদের মধ্যে যে উজ্জ্বল এবং তীব্র বিশ্বাস (প্রত্যয়) জাগিয়ে তুলেছেন, তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা বিশ্বকে উচ্চতর মূল্যবোধের আবাসস্থল করে তোলার চেষ্টা করেন। তারা এমন একটি সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন যা মানুষকে আত্মপ্রকাশ এবং আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেয়, এমন একটি সমাজ যা স্বাধীন মানুষের জন্য উপযুক্ত যারা মানুষ হিসেবে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। এইভাবে তারা মহাবিশ্বের জন্য ঐশ্বরিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠে।

রহস্যময় অভিজ্ঞতা - তা যাই হোক না কেন - মানুষের কিছু অভ্যন্তরীণ প্রতিভার বিকাশের বাইরে আর কিছুই নয়, যেমন, ইচ্ছাশক্তি, যা প্রতিটি মানুষ তার ধর্ম, বিশ্বাস বা এমনকি কর্ম নির্বিশেষে বিকাশ করতে

পারে। এই কারণেই প্রতিটি ধর্ম, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীতে রহস্যবাদীরা পাওয়া যায়। একজন রহস্যময়ের দাবি যে তিনি অসীমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা বাস্তবতাকে যেমন আছে তেমন দেখেছেন, তা কেবল তার নিজস্ব কল্পনার অভিক্ষেপ। এই কারণেই বিভিন্ন রহস্যবাদীদের দ্বারা বাস্তবতার বর্ণনা একে অপরের থেকে ভিন্ন। যাই হোক, রহস্যবাদের সাথে দ্বীনের কোন সম্পর্ক নেই এবং কোরআনও এর সমর্থন করে না। এমনকি "তাসাউফ" (রহস্যবাদ) শব্দটিও ইসলামের পূর্ববর্তী সাহিত্যে - কোরআন বা হাদিসে স্থান পায় না। "ইকবালের মতে, এটি "ইসলামের মাটিতে একটি বিদেশী উদ্ভিদ।" ইসলামে রহস্যময় বা রহস্যময় কিছুই নেই। এটি একটি সরল এবং সরল জীবনব্যবস্থা যার লক্ষ্য এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেখানে স্থায়ী মূল্যবোধগুলি সুনির্দিষ্ট আকারে নিজেদের প্রকাশ করে।

## ৫. উপসংহার

উপরের আলোচনা আমাদের যে সিদ্ধান্তে নিয়ে গেছে তা এখন সংক্ষেপে বলা যেতে পারে:
১. জীব বা জড় সবকিছুই বিকাশের ক্ষমতা দিয়ে সমৃদ্ধ। এর বিকাশ প্রতিটি পদক্ষেপে, পরম সত্তা দ্বারা পরিচালিত হয়।

২. এটা ধরে নেওয়া উচিত নয় যে পথপ্রদর্শক শক্তি বাইরে থেকে জিনিসের উপর কাজ করে। এটি তাদের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত এবং তাদের ভিতর থেকে কাজ করে। এটা বলা আরও সঠিক হবে যে কোনও জিনিসের স্বভাব হল তার সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশের চেষ্টা করা এবং এইভাবে তার গন্তব্যে পৌঁছানো।

৩. স্বায়ত্তশাসিত সত্তার অধিকারী হওয়ার কারণে, মানুষ মহাবিশ্বে একটি বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত অবস্থান দখল করে। ঐশ্বরিক নির্দেশনা তাকে এমন আকারে দেওয়া হয় যা একটি মুক্ত যুক্তিবাদী সত্তার জন্য উপযুক্ত। এটি কোনওভাবেই মানুষের পছন্দ এবং কর্মের স্বাধীনতাকে হ্রাস করে না।" মানুষ যদি ইচ্ছা করে এবং প্রত্যাখ্যানের মূল্য দিতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তার আছে।

৪. মানুষের জন্য, ওহী বা ওহী হল ঐশ্বরিক নির্দেশনার বাহন। স্রষ্টা এমন একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করেন যিনি সত্যের রক্ষক হওয়ার যোগ্য। এই ব্যক্তি, যিনি স্রষ্টার কাছ থেকে ওহী গ্রহণ করেন, তিনি তা অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং বিশ্বস্ততার সাথে তার সহ-সত্তাদের কাছে তা পৌঁছে দেন। যারা নিজের ইচ্ছায় এটি গ্রহণ করেন, তারা নিজেদেরকে সেই পথ অনুসরণ করতে দেখেন যা তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে নিয়ে যায়। যারা এটি প্রত্যাখ্যান করেন, তাদের অবনতি ও অবক্ষয়ের নিম্নগামী পথ অনুসরণ করার শক্তি থাকে। আত্ম-পরিপূর্ণতা হল প্রথমটির পুরস্কার, অন্যদিকে একটি দুর্বল এবং বিকৃত আত্মা পরেরটির ভাগ্যে পড়ে। এটাই প্রতিফল আইন।

৫. ঐশ্বরিকভাবে প্রকাশিত ওহী - প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার বাক্য। এটি গ্রহীতার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, অনুভূতি এবং আকাঙ্ক্ষা দ্বারা দূষিত নয়। স্রষ্টা কর্তৃক বিশেষভাবে নির্বাচিত মাধ্যমটি এতটাই পরিশীলিত যে, এর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়, ওহীর বিশুদ্ধতা বা দীপ্তিতে কোনও হ্রাস ঘটে না। ওহী মানুষের বুদ্ধিকে অতিক্রম করে কিন্তু যুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক হয় না। বরং এটি এর পরিপূরক।

আমরা আশা করি যে নবুওয়াতের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কয়েকটি কথা এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলবে। সভ্যতার ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে, মানুষ এক ধরণের সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলে এবং একটি গোষ্ঠীর স্বাধীন আত্মসচেতন সদস্য হিসেবে কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু সে প্রায়শই তাকে প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করে এবং যে প্রলোভনে সে আচ্ছন্ন ছিল তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। স্বার্থপর লক্ষ্য অর্জনের ফলে গোষ্ঠীর সদস্যরা একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই দ্বন্দ্বগুলি সেই সমাজের জন্য একটি গুরুতর হুমকি হয়ে দাঁড়ায় যা স্থিতিশীল ছিল না। মানুষ, প্রায়শই, সঠিকের চেয়ে ভুলকে অগ্রাধিকার দেয়। আসন্ন বিপর্যয়, মানুষকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে এবং মানব সমাজকে মৌচাক বা উইপোকার উপনিবেশের মতো আবদ্ধ করে এড়ানো যেত। তবে, ভবিষ্যৎ বিধানের লক্ষ্য ছিল তার স্বাধীনতা বৃদ্ধি করা এবং এর পরিধি বৃদ্ধি করা, একে সম্পূর্ণরূপে নিভিয়ে দেওয়া নয়। স্বাধীনতা রক্ষা করার এবং একই সাথে এর অপব্যবহারের ঝুঁকি হ্রাস করার একমাত্র উপায় ছিল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সহজলভ্য করা। নবুওয়াত উভয় শর্তই পূরণ করেছিলেন।

সময়ে সময়ে স্রষ্টা এমন একজন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেছিলেন যার উপর ঐশ্বরিক ওহীর আস্থা রাখা যেত। প্রতিটি জাতির নিজস্ব নবী ছিলেন যিনি বলপ্রয়োগ ও প্ররোচনার উপর নির্ভর করে নয় বরং প্ররোচনার উপর নির্ভর করে তার জনগণকে ন্যায়ের পথে আহ্বান করেছিলেন। এই নির্দেশনা ছিল স্বাধীন মানুষদের জন্য যারা এটিকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারত।
হে পছন্দ। এমন কোন জাতি নেই যাদের মধ্যে আল্লাহ নবী হিসেবে উত্থাপিত হননি। অনেক আম্বিয়া আছেন, কিন্তু তাদের কাছে মূলত একই ওহী নাযিল করা হয়েছে। কোরআনে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে: নিশ্চয়ই, আমরা আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমনটি আমরা নূহ এবং তার পরবর্তী আম্বিয়াদের প্রতি ওহী করেছিলাম, এবং (যেমন) আমরা ইব্রাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং (তাদের) অন্যান্য বংশধরদের প্রতি ওহী করেছিলাম, এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন এবং সুলাইমানের প্রতিও; এবং আমরা দাউদকে যবুর দিয়েছিলাম; এবং এমন রাসূল যাদের সম্পর্কে আমরা আপনাকে পূর্বে বর্ণনা করেছি, এবং এমন রাসূল যাদের সম্পর্কে আমরা আপনাকে বর্ণনা করিনি, এবং স্রষ্টা মূসার সাথে কথা বলেছিলেন (ও তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন) (৪: ১৬৩-৬৪)।

কোরআনে অনেক আম্বিয়ার নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের ওহী ব্যাখ্যা করার এবং তার লোকদের এর আলোকে পরিচালিত করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নূহ, ইব্রাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, মূসা, হারুন, দাউদ, সোলায়মান এবং ঈসা এবং আরও কয়েকজনের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন স্পষ্টভাবে বলেছে যে অনেক আম্বিয়া আছেন যাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু তারাও ঐশ্বরিক ওহীর বাহক ছিলেন বলে তাদের সম্মান করা উচিত। কোরআনের উদ্দেশ্য হল ঐশ্বরিক ওহীর অপরিহার্য ঐক্যের উপর জোর দেওয়া যা বিভিন্ন যুগ এবং দেশের বিভিন্ন মানুষের কাছে প্রদত্ত হয়েছিল। অধিকন্তু, কোরআন মুসলিমদের আম্বিয়াদের মধ্যে অশুভ পার্থক্য করতে নিষেধ করে: মুমিনরা বলে: আমরা তাঁর কোনও রাসূলের মধ্যে কোনও পার্থক্য করি না (২: ২৮৫)।

নবুওয়াতের ব্যবস্থা মানবজাতির জন্য অমূল্য সেবা প্রদান করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মন অপরিণত ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের একজন ব্যক্তিগত পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল, যিনি তাদের ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং যিনি তাঁর জীবন্ত উদাহরণের মাধ্যমে তাদের জীবনকে সেই উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পারেন তা দেখাতে পারেন। আম্বিয়া নৈতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। এই কারণেই মানবজাতির কাছে দ্রুত পর পর নবীদের আগমন ঘটে। তবে এমন এক সময় এসেছিল যখন মানুষের মন পরিণতিতে পৌঁছেছিল এবং তার বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি জীবনের সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। নবুওয়াত এই ফলাফলের লক্ষ্যে ছিল এবং যখন এটি সম্পন্ন হয়েছিল তখন এই প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতার কোনও কারণ ছিল না। আম্বিয়ার গৌরবময় ধারাটি শেষ ওহীর বাহক মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে স্বাভাবিকভাবে শেষ হয়েছিল। নবুওয়াত তার উদ্দেশ্য পূরণ করেছিল এবং আর প্রয়োজন ছিল না। আধুনিক মানুষ, তার পরিণত মন নিয়ে, কোনও ব্যক্তিগত পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন নেই: তার ধারণা এবং নীতির আকারে সাধারণ নির্দেশনা প্রয়োজন যা সর্বকালের জন্য বৈধ। এই ধারণা এবং নীতিগুলি কোরআনে সর্বকালের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে, যা চূড়ান্ত ওহীকে ধারণ করে: আমরা কিতাব নাজিল করেছি এবং আমরাই এর অভিভাবক (১৫:৯)।

এছাড়াও, মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন ও চরিত্রে আদর্শ মানব জীবনের একটি নিখুঁত উদাহরণ রয়েছে। মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের সাথে মহৎ ধারণাগুলি, যেখানে তারা সুনির্দিষ্ট প্রকাশ পেয়েছিল, সত্যের সন্ধানকারী সমস্ত প্রকৃত সন্ধানকারীদের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট। নতুন ওহী আশা করার কোন যুক্তি আমাদের নেই এবং কোন অতীন্দ্রিয়বাদী বা সাধক নিজের কাছে নবুওয়াতকে অহংকার করতে পারেন না। এই বিষয়ে আপোষের কোন অবকাশ নেই। একজন অতীন্দ্রিয়বাদী বা অন্য কোন ব্যক্তির দাবি যে তিনি স্রষ্টার কাছ থেকে যোগাযোগ পান, নবুওয়াতের চূড়ান্ততায় বিশ্বাসের মূলেই ছিন্নভিন্ন।

নবুওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের স্বাধীনতার সেবা করা এবং সুরক্ষা করা, যখন তা ভেতর থেকে তার অবাধ স্বার্থপর আবেগ এবং বাইরে থেকে শাসক ও পুরোহিতদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল। নবুওয়াতের বিলুপ্তির উদ্দেশ্য হল মানব স্বাধীনতার পরিধি বিস্তৃত করা এবং মানুষকে তার জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সমস্ত প্রশ্নের বিচার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া। তার আর প্রথা ও ঐতিহ্যের দাস থাকা উচিত নয়। তার এখন নিজস্ব বিচার ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত, তার পথ তৈরি করা উচিত এবং তার জ্ঞানের আলোকে এবং কোরআনে বর্ণিত ঐশ্বরিক নির্দেশনার সাহায্যে তার ভাগ্য গঠন করা উচিত। মানুষ এখন স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সত্তা হিসেবে তার নিজের অবস্থানে এসেছে। পবিত্র কোরআনে সংরক্ষিত ঐশ্বরিক ওহী দ্বারা পরিচালিত তার যুক্তির নির্দেশ অনুসারে সে তার জীবনকে তার ইচ্ছামত গঠন করতে পারে।

## ৬. ওহীতে বিশ্বাস ছাড়াই স্রষ্টা বিশ্বাস

এই মুহূর্তে ঐশ্বরিক ওহীতে বিশ্বাসের পক্ষে কিছু বলা উপযুক্ত হবে। পশ্চিমের কিছু মহান চিন্তাবিদ স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করার সময়, এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে স্রষ্টা কর্তৃক নির্বাচিত কিছু মানুষকে তাঁর ওহীর প্রাপক করা হয়েছিল। তারা বিশ্বাস করেন যে মানবিক যুক্তি মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্দেশনা দিতে সক্ষম। তারা নিশ্চিত করে যে, মানুষ তার যুক্তির সাহায্যে বিশ্বের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। তার স্রষ্টার সরাসরি নির্দেশনার প্রয়োজন নেই। মানবতাবাদ, ওহী ছাড়া ধর্ম - যা, যাইহোক, জুলিয়ান হাক্সলির একটি সুপরিচিত বইয়ের শিরোনাম - তাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাস সম্পর্কে নতুন কিছু নেই। কোরআন আমাদের বলে যে এটি মুহাম্মদ (সা.) এর সময়ে প্রচলিত ছিল। যারা এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন তাদের সম্পর্কে কোরআন বলে: তাদের জিজ্ঞাসা করুন: পৃথিবী কার এবং কে? তুমি জানো, এর মধ্যে কি আছে? তারা বলবে, আল্লাহর। বলো, তাহলে কি তোমরা চিন্তা করবে না? তাদের জিজ্ঞাসা করো: বহু নক্ষত্রের রব এবং (সমগ্র বিশ্বজগতের উপর ক্ষমতার) মহিমান্বিত আরশের রব কে? তারা বলবে: স্রষ্টার। বলো, তাহলে কি তোমরা (তাঁর আইনের বিরুদ্ধে কিছু না করে) যত্ন নেবে না? তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো: কার হাতে সকল কিছুর রাজত্ব এবং যিনি (সকলকে) রক্ষা করেন কিন্তু (কারো দ্বারা) সুরক্ষিত নন, যদি তোমরা জানো? তারা বলবে: আল্লাহর। বলো, তাহলে তোমরা কীভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছ? বরং, আমরা তাদের কাছে (এই গ্রন্থে) সত্য নিয়ে এসেছি এবং তারা মিথ্যাবাদী (যখন তারা বলে যে তারা স্রষ্টা বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁর গ্রন্থে নয়) (২৩: ৮৪-৯০)।

ঐশী ওহীতে বিশ্বাস করা হল স্রষ্টা বিশ্বাসের অপরিহার্য পরিণাম। ওহীকে অস্বীকার করা দ্বীনের মূলে আঘাত করা। মানুষের যুক্তিকে ওহীর পদ দখলের অনুমতি দেওয়া মানে মানুষকে স্রষ্টার স্থান দখল করতে দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে, স্রষ্টা বিশ্বাস করা এবং তাঁর নির্দেশনা অস্বীকার করা অযৌক্তিক। ধরুন A বিশ্বাস করেন যে মহাবিশ্ব স্রষ্টা দ্বারা সৃষ্ট, এবং B নিশ্চিত করেন যে এটি প্রাকৃতিক কারণের ফল। যেহেতু এই

বিশ্বাসগুলির কোনও বাস্তব পরিণতি নেই, তাই কাকে নির্বাচিত করা হবে এবং কাকে প্রত্যাখ্যাত করা হবে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু ধরুন A বিশ্বাস করেন যে তার এমনভাবে আচরণ করা উচিত যাতে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ দ্বারা নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন না হয় এবং B বিশ্বাস করেন যে তিনি যে কোনওভাবে কাজ করতে স্বাধীন। এই ক্ষেত্রে, এটা স্পষ্ট যে তাদের মধ্যে পার্থক্য অন্যদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। A বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য, যখন কেউ B-কে বিশ্বাস করার ঝুঁকি নেবে না। প্রত্যাদেশে বিশ্বাস না থাকলে, স্রষ্টা বিশ্বাস করা একাডেমিক আগ্রহের বিষয়।

নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি দেখায় যে ওস্পেনস্কির একই মতামত রয়েছে: যদি প্রত্যাদেশের কোন ধারণা না থাকে, তাহলে কোন ধর্ম নেই। এবং ধর্মে সর্বদা এমন কিছু থাকে যা সাধারণ মন এবং সাধারণ চিন্তাভাবনা দ্বারা অজানা। এই কারণে, বৌদ্ধিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম কৃত্রিম ধর্ম তৈরির কোনও প্রচেষ্টা কখনও পরিচালিত করেনি, বা কখনও কোথাও পরিচালিত করতে পারে না।৫

তাই স্রষ্টা বিশ্বাস এবং তাঁর প্রত্যাদেশের প্রতি বিশ্বাস, দ্বীনের মৌলিক বিষয়। প্রত্যাদেশ প্রত্যাখ্যান দ্বীনকে দুর্বল করে দেয়, যার ফলে এটি মানব জীবনে একটি জীবন্ত শক্তি হিসাবে আর থাকে না। মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে কোরআনই চূড়ান্ত প্রত্যাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করে। তারা বিশ্বাস করে যে কোরআনই একমাত্র অবতীর্ণ গ্রন্থ যা কখনও বিকৃত করা হয়নি। এটিতে কোনও ছেদ বা বিক্ষেপের সম্মুখীন হয়নি এবং মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে প্রদত্ত স্রষ্টার বাণী এতে সংরক্ষিত আছে। এবং তাদের এই বিশ্বাস ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত।

### *তথ্যসূত্র*

১. এইচ.এ.এস. ফিশার, ইউরোপের ইতিহাস, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১.

২. গ্যালোওয়ে, ধর্মের দর্শন, পৃষ্ঠা ৫৮২।

৩. আয়াতটি ভুলভাবে অনুবাদ করা হয়েছে:

স্রষ্টা মানব আত্মাকে (বিবেক সহকারে) অনুপ্রাণিত করেছিলেন যে এর জন্য কী ভুল এবং এর জন্য কী সঠিক।

৪. ইকবাল, অপ. cit., p. ১১৮.

৫. P.D. Ouspensky, A New Model of the Universe, p. ৩৪.

# অধ্যায় ৫
# যুক্তি এবং ঈমান

**১. যুক্তি এবং ইহার সীমাবদ্ধতা**

প্রত্যাদেশের উৎস (ওয়াহি) হল অতীন্দ্রিয় বাস্তবতা, যা যুক্তির জ্ঞানের বাইরে, কিন্তু যেহেতু প্রত্যাদেশ তাদের পথ দেখানোর উদ্দেশ্য, তাই এটি স্বাভাবিকভাবেই এমন একটি ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যা তাদের কাছে বোধগম্য। অতএব, যুক্তি প্রত্যাদেশের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে পারে।

বাস্তবতার প্রতি যুক্তির নিজস্ব স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং সীমিত পরিমাণে হলেও তা উপলব্ধি করে। যুক্তির সবচেয়ে বড় অর্জন হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান এমন পদ্ধতি ব্যবহার করে যা পুরোপুরি বৈধ এবং তার সঠিক ক্ষেত্রের মধ্যে সত্য জ্ঞান প্রদান করে। যুক্তির অবশ্যই সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু সংশয়বাদীরা এটিকে একেবারেই অবিশ্বস্ত বলে ঘোষণা করে। এটি সত্য নয়। টেলিস্কোপ আমাদের এমন স্বর্গীয় বস্তু দেখতে সক্ষম করে যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। এর সাহায্যে প্রতিক্রিয়া জানানো অযৌক্তিক হবে কারণ এটি মহাবিশ্বের বাইরেরতম অঞ্চলে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করে না। একইভাবে, এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে যুক্তি আমাদের পরম জ্ঞান দিতে পারে না, তবুও এটি যে জ্ঞান অর্জন করে, তা যত ছোটই হোক না কেন, তা কার্যকর এবং মূল্যবান। "অল্প জ্ঞান একটি বিপজ্জনক জিনিস" এই পুরাতন প্রবাদটি আংশিকভাবে সত্য, যেমন ঐতিহ্যবাহী নীতিমালা। অল্প জ্ঞান কেবল তখনই বিপজ্জনক যখন আমরা এটিকে সম্পূর্ণ জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করি। জ্ঞানের প্রতিটি অংশ কার্যকর যদি আমরা বুদ্ধিমত্তা এবং পূর্ণ সচেতনতার সাথে এটি প্রয়োগ করি যে এটি বাস্তবতার একটি ভগ্নাংশ প্রকাশ করে। কিন্তু যদি মানবিক যুক্তিকে অবিশ্বাস্য নির্দেশিকা হিসেবে অবজ্ঞা করা এবং প্রত্যাখ্যান করা ভুল হয়, অথবা এর মূল্যকে অবমূল্যায়ন করা ভুল হয়, তাহলে এটিকে অতিরঞ্জিত করা এবং দাবি করাও সমানভাবে ভুল যে সমগ্র বাস্তবতা তার জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। বাস্তবতার মাত্র কয়েকটি দিক যুক্তির কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য এবং সেগুলি সম্পর্কে এটি সত্য এবং কার্যকর জ্ঞান সরবরাহ করে। তবে বাস্তবতার অসীম দিক রয়েছে এবং বাস্তবতার মূল অংশের মতো, যুক্তি সর্বদা অপ্রাপ্য বলে মনে হবে। যুক্তি তার নিজস্ব ক্ষেত্রের মধ্যে বৈধভাবে কাজ করতে পারে এবং এর বাইরে যাওয়ার মুহূর্তে নির্ভরযোগ্য হওয়া বন্ধ করে দেয়। জ্ঞানের প্রয়োজন যে আমাদের মানবিক যুক্তির ক্ষমতা এবং তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সঠিক অনুমান তৈরি করা উচিত।

এটি যা করতে পারে এবং যা করতে পারে না- আমরা যখন জানি তখনই এটিকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগাতে পারি, আধুনিক বিজ্ঞানের অসাধারণ এবং ক্রমবর্ধমান সাফল্যে বিস্মিত কিছু পণ্ডিত বিশ্বাস করেন

যে সেই সময় খুব বেশি দূরে নয় যখন বিজ্ঞান মহাবিশ্বের ধাঁধা সমাধান করে ফেলবে এবং মানুষ এবং বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে। তাদের কাছে মহাবিশ্ব একটি বিশাল যন্ত্র, যা অত্যন্ত জটিল হলেও, মানবিক যুক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বোঝা এবং কাজে লাগানো সম্ভব। এই অনুমানমূলক মনোভাব খুব কমই ন্যায্য এবং যদি শীঘ্রই সংশোধন না করা হয়, তবে আমাদের অনেক ক্ষতি করতে পারে। মহান বিজ্ঞানী সহ জ্ঞানী ব্যক্তিরা জানেন যে যুক্তি কখনও বাস্তবতা বুঝতে পারে না। সপ্তদশ শতাব্দীতে শেক্সপিয়ার যা লিখেছিলেন তা এখনও সত্য যখন বিজ্ঞান আপাতদৃষ্টিতে তার মধ্যম পর্যায়ে পৌঁছেছে: হোরাটিও, স্বর্গ ও পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে যা তোমার দর্শনে স্বপ্নে দেখা যায় না।

আজকের কিছু বিজ্ঞানীর মধ্যেও একই অনুভূতি প্রতিধ্বনিত হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার লিক অবজারভেটরির পরিচালক ডঃ আইটকেন মহাবিশ্বের গঠন নিয়ে আলোচনা করার সময় অকপটে স্বীকার করেছেন: "মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং এর চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে আমরা কার্যত কিছুই জানি না।"১ তাছাড়া, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে কোনও চূড়ান্ত তথ্য নেই। একটি নতুন তথ্য আবিষ্কারের সাথে সাথে, এমনকি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকেও পরিবর্তন করতে হতে পারে বা এমনকি বাদ দিতে হতে পারে। তাই, আমরা তাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি না এবং সমস্ত মানুষের জন্য বৈধ আচরণের দর্শনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরিবর্তনশীল বালির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা যেতে পারে না ডঃ ক্রোথার যথাযথভাবে মন্তব্য করেছেন: "যে কোনও বিষয়ে বিজ্ঞানের শেষ কথাটি সম্ভবত শেষ মানুষের উচ্চারণের জন্য ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।"২ তাহলে, যদি আমরা আচরণের সঠিক নীতিগুলির একটি সেট অর্জনের জন্য কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করি তবে এটি নিছক বোকামি হবে। যুক্তি বারবার সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে আটটি নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সামাজিক বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রায়শই বিপর্যয়ের দিকে পরিচালিত করেছে। প্রথমে রাজত্বের পরীক্ষা করা হয়েছিল, তারপরে সাম্রাজ্যবাদ এবং অবশেষে গণতন্ত্র, এবং আজ তাও পরীক্ষা করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরণের সরকার-পরীক্ষার জন্য মানুষ অনেক মূল্য দিয়েছে - রক্তপাত, আন্তঃসম্পর্কীয় যুদ্ধ, বিপ্লব, শ্রেণী সংগ্রাম, এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার শতাব্দী। মানুষ এখনও ন্যায়বিচার, সাম্য, স্বাধীনতা এবং শান্তির জন্য আকুল। দুই শতাব্দী ধরে মানুষ গণতন্ত্রের উপর তাদের বিশ্বাস স্থাপন করেছে কিন্তু এখন হতাশার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পরবর্তীতে আমরা গণতন্ত্র সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

## ২. যুক্তির কার্যকারিতা

মানুষ একটি সীমাবদ্ধ সত্তা এবং তাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই সীমিত। মানুষের যুক্তিও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে, এই ভিত্তিতে, আমরা এটিকে অবজ্ঞা করা এবং জীবনের সমস্যা সমাধানে এটি ব্যবহার করতে অস্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নই। যুক্তি যে নির্দেশনা দেয় তা কম মূল্যবান নয় কারণ এটি নিখুঁত নয়। যুক্তিই মানুষকে পশু স্তর থেকে অনেক উপরে তুলেছে; যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা পশু স্তরে বা

তার চেয়েও নীচে নেমে যাওয়া। মানুষ প্রাণীদের প্রধান ভিত্তি প্রবৃত্তির উপর পিছিয়ে পড়তে পারে না। মানুষ যখন যুক্তি বিকাশ করেছিল তখন প্রবৃত্তিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যুক্তির গৌরবময় সাফল্য মানুষকে তার ক্ষমতাকে অতিরঞ্জিত করতে পরিচালিত করেছিল: সে আশা করেছিল যে যুক্তি তাকে পরম জ্ঞান দেবে। যখন এই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি, তখন সে যুক্তির প্রতি মোহভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং যুক্তিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে অন্য চরমে চলে যায়। ধর্মীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও, রহস্যবাদী এবং গোড়ামীবাদী উভয়ই যুক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রহস্যবাদীরা রহস্যময় অভিজ্ঞতায় নির্দেশনা খোঁজেন এবং গোড়ামীবাদীরা কেবল শাস্ত্রের অক্ষরে অক্ষরে। তারা ভুলে যায় যে এই দুটি জিনিসই মানুষের কোনও কাজে লাগাতে হলে মানবিক যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হবে। তারা ভুলে যায় যে যুক্তি হল মানুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং এটিকে অস্বীকার করা তার মধ্যে সর্বোত্তমকে অস্বীকার করা। তারা ভুলে যায় যে কোরআন যুক্তির এই অবমূল্যায়নের পক্ষে সমর্থন করে না। বরং, এটি আমাদের আমাদের যুক্তিসঙ্গত শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করে।

যুক্তি এবং মানব জীবনে এর স্থান সম্পর্কে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি সাবধানতার সাথে বিবেচনার দাবি রাখে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই দৃষ্টিভঙ্গি হল দীর্ঘ বিবর্তন প্রক্রিয়া মানুষের আবির্ভাবের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছিল, যা কোরআন "নতুন সৃষ্টি" হিসাবে চিহ্নিত করেছে (২৩: ১৪)। এই পর্যায়েই "তিনি তার মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকে দিলেন" (৩২:৯), এবং তাকে "দেখা, শ্রবণ এবং উপলব্ধি করার" ক্ষমতা দান করলেন (৩২:৯)। মানুষকে এমন একটি মন (ফুয়াদ) দান করা হয়েছিল যা তাকে চিন্তা করতে এবং বুদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞানের একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম করেছিল। মানুষ যদি ঐশ্বরিক উপহারের সেরা মূল্য দিতে এবং ব্যবহার করতে অস্বীকার করে তবে সে প্রকৃতপক্ষে একজন অকৃতজ্ঞ প্রাণী হবে। যুক্তি ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত কাঁচা মাংসকে জ্ঞানে রূপান্তরিত করে। কোরআন যথাযথভাবে মানব জীবনে যুক্তিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্পণ করেছে: আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী হল বধির, বোবা, যারা তাদের বুদ্ধি ব্যবহার করে বোঝার জন্য নয় (৮:২২)।

এটি মানুষের অবক্ষয়ের একটি চিত্রিত বর্ণনা যখন সে তার বিবেকের সেবায় চাপ দেয় না। কোরআন আমাদের বলে, এই ধরনের একজন মানুষ এই পৃথিবীতে কেবল একটি মূল্যহীন এবং নিকৃষ্ট জীবনযাপন করে না বরং নিজেকে উচ্চতর স্তরে বসবাসের জন্যও অযোগ্য করে তোলে যেখানে মৃত্যুর পর সে প্রবেশ করে: সভ্য ও যাযাবর উভয় গোত্রের মধ্যে অনেক মানুষ এমন জীবনযাপন করে যা স্পষ্ট করে যে তারা জাহান্নামের জন্য নির্ধারিত (৭:১৭৯)।

এটা তাই, কারণ, যেমন কোরআন বলে: তাদের হৃদয় আছে যা দিয়ে তারা বুঝতে পারে না এবং তাদের চোখ আছে যা দিয়ে তারা দেখতে পায় না এবং তাদের কান আছে যা দিয়ে তারা শুনতে পায় না; এরা গবাদি পশুর মতো - বরং আরও খারাপ; তারা গাফেল (৭:১৭৯)।

ফুরকান শিরোনামের অধ্যায়ে বিষয়টি আবারও জোর দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে সম্বোধন করা হয়েছে: তুমি কি মনে করো যে তাদের অধিকাংশই শোনে অথবা বোধশক্তি রাখে? তারা গবাদি পশুর মতো - বরং তারা আরও বেশি পথভ্রষ্ট (২৫:৪৪)।

জাহান্নামের বাসিন্দারা অনুশোচনায় ভরা কারণ তাদের বোধশক্তি ছিল কিন্তু তারা তা কোন কাজে ব্যবহার করত না: আমরা যদি শুনতাম বা বোধশক্তি থাকতাম, তাহলে আমরা অগ্নিকুণ্ডবাসীদের মধ্যে থাকতাম না (৬৭:১০)।

ইয়াসিন শিরোনামের অধ্যায়ে, তাদের বোধশক্তি ব্যবহারের দায়িত্ব পালনে তাদের পাপপূর্ণ অবহেলার কথা আবারও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে: এবং তবুও শয়তান তোমাদের এক বিরাট দলকে বিভ্রান্ত করেছে। যদি তোমাদের বোধশক্তি থাকে। এটাই সেই জাহান্নাম যার দ্বারা তোমাদের হুমকি দেওয়া হয়েছিল (যদি তোমরা তোমাদের বোধশক্তি ব্যবহার না করো এবং তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করো) (৩৬:৬২-৬৩)।

অতএব, এটা স্পষ্ট যে ইসলাম যুক্তির শত্রু নয় এবং এটিকে "আধ্যাত্মিক" অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হিসাবে বিবেচনা করে না। "ধর্মনিরপেক্ষ" এবং "আধ্যাত্মিক" উভয় ক্ষেত্রেই কোরআন যুক্তিকে যে ভূমিকা প্রদান করে তা বিবেচনা করা সার্থক হবে।

### ৩. যুক্তি ও বিশ্বাস (ঈমান) - কোরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি

কোরআনে, মানবিক যুক্তি বারবার প্রশংসা করা হয়েছে। যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, মানুষের মধ্যে যুক্তির জন্মকে "নতুন সৃষ্টি" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশও প্রশ্নাতীত ও সমালোচনাহীনভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। মানুষকে এটি নিয়ে চিন্তাভাবনা, চিন্তাভাবনা এবং তার যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। "তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা করবে না?" (৪:৮২)। যারা চিন্তাভাবনাকে বিরক্তিকর মনে করে তাদের বর্ণনা এই শব্দগুলিতে দেওয়া হয়েছে: এরা সেইসব লোক যাদেরকে (তাদের নিজস্ব কৃতকর্মের ফলে) জীবনের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করেছে, তাদের বধির করে দিয়েছে এবং তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছে। তাহলে কি তারা কোরআন নিয়ে ধ্যান করবে না, নাকি তাদের হৃদয়ে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে (৪৭: ২৩-২৪)।

কোরআন মানুষের যুক্তি এবং বোধগম্যতার প্রতি আবেদন করে। এর শিক্ষা এমন একটি ভাষায় রচিত যা স্পষ্ট এবং বোধগম্য। "এইভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর আয়াতগুলি স্পষ্ট করে বলেন যাতে তোমরা চিন্তা করতে পারো" (২: ২১৯)। মানুষের জন্য যে মহান সত্যটি উপলব্ধি করা উচিত তা হল, সে তার ভাগ্যের স্থপতি, তাই সে এই পৃথিবীতে যা আছে এবং পরকালে যা হবে তা কেবল তার নিজের কর্মের উপর নির্ভর করে। ভালো কাজ অবশ্যই তাকে উন্নত করে এবং খারাপ কাজ অনিবার্যভাবে তাকে অধঃপতিত করে। তার কল্যাণ এবং দুর্দশা তার নিজের কর্মের ফল। সে তার দায়িত্ব অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। কোরআন জোর দিয়ে বলে যে যুদ্ধে সাফল্যও যুক্তির সঠিক ব্যবহারের উপর নির্ভর করে।

এটি সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে সাহসে উদ্বুদ্ধ এবং উদ্যমে উদ্বুদ্ধ সেনাবাহিনী অবশ্যই জয়ী হবে। কোরআন দাবি করে যে বিজয় তাদের ভাগ্যে আসে যারা বিপদের উপস্থিতিতে শান্ত এবং সংহত থাকে এবং যাদের চিন্তাভাবনা আবেগ দ্বারা আবৃত থাকে না। এই ধরনের একশ জন বিশ্বাসীকে হাজার হাজার অবিশ্বাসীর সাথে তুলনা করা হয় যারা আবেগ দ্বারা প্রভাবিত, কারণ তারা, যেমন কোরআনে বলা হয়েছে, "বুদ্ধিহীন জাতি" (৮: ৬৫)।

এটা স্পষ্ট যে কোরআন মানুষের জীবনে যুক্তিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্পণ করে। নবীকে মানুষের কাছ থেকে অন্ধ আনুগত্য দাবি করার জন্য নয় বরং তাদেরকে চিন্তাভাবনা ও চিন্তাভাবনা করার জন্য উৎসাহিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিম্নলিখিত আয়াতটি সন্দেহের কোনও অবকাশ রাখে না যে কোরআন স্বাধীন চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করে এবং অনুমোদন করে: বলুন, আমি তোমাদের একটি জিনিসের জন্য উপদেশ দিচ্ছি। আর সেই একটি জিনিস কী? তা হল "তোমরা আল্লাহর জন্য দু'জন এবং এককভাবে জাগ্রত হও। তারপর চিন্তা করো" (৩৪: ৪৬)।

কোরআন আশা করে যে মানুষ চিন্তা করবে এবং তার বোধগম্যতা ব্যবহার করবে। যদি সে এটি করে, তাহলে সে নিশ্চিতভাবে সঠিক পথে চলবে। মনে রাখার বিষয় হল যে সাফল্যের পথ, অর্থাৎ অস্তিত্বের উচ্চতর স্তরের যোগ্যতা, তা কেবল যুক্তি এবং ওহীর সম্মিলিত সাহায্যেই আবিষ্কার এবং অনুসরণ করা যেতে পারে। নির্দেশনার এই উৎসগুলি একে অপরের পরিপূরক। যদি এগুলিকে তাদের সঠিক পরিধির মধ্যে রাখা হয়, তবে তাদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব থাকবে না। অতএব, রাসূলকে বলতে বলা হয়েছে: এটি আমার পথ। আল্লাহর পথে চলার জন্য তোমাদের প্রতি আমার আহ্বান যুক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির উপর ভিত্তি করে - আমার এবং আমার অনুসারীদের উভয়ের জন্যই (১২:১০৮)।

কোরআন ইসলামের বিরোধীদের তাদের যুক্তির সমর্থনে যুক্তি উপস্থাপনের জন্য চ্যালেঞ্জ জানায়: তাদের বলুন, (হে রাসূল) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে তোমাদের প্রমাণ আন (২:১১১)। তাদের যখন এমন বিষয় নিয়ে তর্ক করা হয় যার বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই: তাহলে, তোমরা কেন এমন বিষয় নিয়ে তর্ক করছো যার বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই? (৩:৬৬)।

যাদের সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে তর্ক করা কোন ফলপ্রসূ ফলাফল দেয় না। কোরআন আমাদেরকে এই ধরনের অলাভজনক বিতর্ক এড়িয়ে চলতে বলে: তাদের পিছনে ছুটবেন না যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। নিঃসন্দেহে, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, এই সকলেরই জিজ্ঞাসা করা হবে (১৭:৩৬)।

কোরআন সঠিক জ্ঞানের মূল্যের উপর জোর দেয় এবং তা গ্রহণ এবং তার উপর আমল করার পরামর্শ দেয়। বাকি সবকিছুকে কেবল অনুমান বলে উড়িয়ে দেওয়া হয় যা কর্মের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য নির্দেশিকা হতে অনেক দূরে। যেমন কোরআন বলে: "অনুমান কখনও সত্যের স্থান দখল করতে পারে না" (৫৩:২৮)। যুক্তিবাদী প্রাণী হিসেবে, আমাদের কর্তব্য হল সঠিক জ্ঞান অর্জন না করা পর্যন্ত থামানো নয়। কেবল "অনুমান" নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা মানে আমাদের যুক্তিবাদিতাকে নিন্দা করা বা ত্যাগ করা, এবং এর উপর আমল করা মানে আত্ম-সিদ্ধির ঝুঁকি নেওয়া।

কোরআন জানার প্রক্রিয়ার একটি রূপরেখা দেয়, যতক্ষণ না এটি তার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত, যা বৈজ্ঞানিক এবং নীতিগত উভয়ই। প্রক্রিয়াটি ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ দ্বারা শুরু হয়, যা জ্ঞানের কাঁচামাল সরবরাহ করে। পরবর্তী পর্যায় হল মন যখন নিজেকে সেই উপাদানের সাথে সম্পৃক্ত করে যা এটিতে পৌঁছায়। এটি হল ইন্দ্রিয়গত জ্ঞানের পর্যায়। ইন্দ্রিয়গত তথ্যকে বাহ্যিক বস্তু এবং ঘটনাবলীর দিকে নির্দেশ করা হয় এবং তাদের বস্তুনিষ্ঠ অর্থ উপলব্ধি করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, বিমূর্ততা এবং সাধারণীকরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, উপাদানটিকে বিভিন্ন মাত্রার সাধারণ জ্ঞানে রূপান্তরিত করা হয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল বোধগম্যতা যেখানে নতুন জ্ঞানকে সমগ্র মানব জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে স্থাপন এবং দেখা হয় এবং মানব জীবনের জন্য এর অর্থ মূল্যায়ন করা হয়। কোরআন মানুষকে নবীর কথার অর্থের এই গভীর বোধগম্যতার লক্ষ্যে লক্ষ্য রাখার জন্য উৎসাহিত করে, যখনই তিনি তাদের সাথে কথা বলেন। যারা এই প্রচেষ্টা করতে ব্যর্থ হন এবং প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ে থেমে যান, অপূর্ণ জ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকেন তাদের নিন্দা করে: এবং তুমি হয়তো তাদেরকে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবে, কিন্তু তারা দেখতে পাবে না (৭:১৯৮)।

এরা এমন লোক ছিল যারা নবীর দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে ছিল এবং তাঁর কথা শুনছিল বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু তাদের মন তাঁর কথার অর্থ বুঝতে এবং তাদের জীবনের সাথে অর্থপূর্ণভাবে সম্পর্কিত করার কোনও প্রচেষ্টা করছিল না। কোরআন "নযর" এবং "বাসর" এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য করে। "নাজার" বলতে কিছু দৃশ্য উদ্দীপনা নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করার বিষয়টি বোঝায়। "বাসর" হল অন্তর্দৃষ্টি, দৃশ্য উদ্দীপনা কেবল লক্ষণ হিসেবে যে জিনিসের মূল অর্থ উপলব্ধি করা। একই পার্থক্য অন্যান্য ইন্দ্রিয়, যেমন শ্রবণ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য: এবং তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা তোমার কথা শোনে, কিন্তু তুমি কি বধিরদের শোনাবে যদিও তাদের কোন ইন্দ্রিয় নেই (১০:৪২)।

কোরআন যা বোঝাচ্ছে তা হল যে, যে ব্যক্তির মন কুসংস্কার এবং পূর্ব ধারণায় আচ্ছন্ন, সে সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না, যদিও তা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এটি উপলব্ধি করার জন্য, তাকে একটি মুক্ত এবং নিরপেক্ষ মন নিয়ে এর কাছে যেতে হবে, তার উপর তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে এবং তার প্রকৃত জ্ঞান এবং খাঁটি অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিতভাবে এটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। বাস্তবে, কোরআন তাদের ওহীর প্রতি একটি অপোস্টেরিওরি পদ্ধতির সুপারিশ করে। ইঙ্গিতের মাধ্যমে, পূর্ব-অনুশীলনমূলক পদ্ধতি পছন্দ করা হয়নি। এই প্রশ্নের উপর কোরআনের অবস্থান এইভাবে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে: আপনার মন থেকে সমস্ত পূর্ব-ধারণামূলক ভুল ধারণা দূর করুন। ওহীর প্রতি গভীর মনোযোগ দিন এবং এর উপর পূর্ণ আস্থা (ঈমান) রাখুন। ওহীকে মানব অভিজ্ঞতার সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে সম্পর্কিত করুন। আপনার যুক্তি যতদূর সম্ভব ভবিষ্যতের দিকে আপনার আবিষ্কারগুলিকে প্রক্ষেপণ করুন। আপনার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করুন যে অভিজ্ঞতা এখনও আপনার অভিজ্ঞতা হয়নি। এবং, আপনার সামনে উন্মোচিত নতুন দৃশ্য এবং প্রশস্ত দিগন্তে, আপনার ভাগ্যের তারাগুলি সনাক্ত করুন এবং জীবনের সমস্যাগুলির সাথে নিজেকে মোকাবিলা করুন। যদি আপনি সঠিক মনের সাথে ওহীর কাছে যান, আপনার কাছে যে শক্তিগুলি রয়েছে - যুক্তি, আশা এবং দান - তার পূর্ণ ব্যবহার করে, আপনি এতে নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং এর দ্বারা পরিচালিত হয়ে, আপনার জন্য অপেক্ষা করছে এমন গৌরবময় গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আপনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং আপনার নিজস্ব ইচ্ছায়, নির্দেশিত পথটি বেছে নিতে হবে। স্রষ্টা যদি চাইতেন তবে আপনাকে ভালো হতে বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু এই ধরনের ভালোর কোন মূল্য থাকত না। শুধুমাত্র আপনার নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনি যে ভালোর অর্জন করেন তারই মূল্য থাকে। তুমি স্বাধীনভাবে নির্বাচন করতে পারো, আর যদি তুমি তোমার ক্ষমতা সঠিকভাবে ব্যবহার করো, তাহলে তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

সংক্ষেপে, কোরআন মানুষকে যে উপদেশ দেয় তা হলো এটি। অসংখ্য আয়াতে এটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যখন নবী (সা.) চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে মানুষ তার কথার প্রতি মনোযোগ দেয় না এবং সেগুলি

বোঝার চেষ্টা করে না, তখন তাকে এইভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল: আল্লাহ যদি পৃথিবীর সকল মানুষ (তাঁর উপর) ঈমান আনত? তুমি কি (মুহাম্মদ) মানুষকে ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত বাধ্য করবে? (১০:৯৯)।

কোরআন এবং অন্যান্য অবতীর্ণ গ্রন্থ বোঝার জন্য, এর ভাষা আয়ত্ত করা যথেষ্ট নয়। একজন মানুষ আরবি ভাষায় দক্ষ হতে পারে কিন্তু কোরআনের অর্থ তাকে এড়িয়ে যেতে পারে। তার উচিত পূর্ব-ধারণা, ধারণা, পক্ষপাত এবং পক্ষপাত থেকে মুক্ত একটি গ্রহণশীল মন নিয়ে গ্রন্থের কাছে যাওয়া। তাকে মানব জীবন এবং সেই মহাবিশ্ব সম্পর্কে গুরুতর হতে হবে যেখানে আমরা জীবিত থাকা উচিত, এবং একটি উদ্দেশ্যমূলক মহাজাগতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের তীব্র চেতনা থাকা উচিত। জীবনযাত্রার পথে বাধা সৃষ্টিকারী বাধাগুলি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এবং তার অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টিকারী বাধাগুলি এড়াতে তাকে উদ্বিগ্ন থাকা উচিত। কোরআন অনুসারে, এগুলিই হল গ্রন্থ বোঝার জন্য অপরিহার্য পূর্বশর্ত। যারা এইভাবে এর কাছে যান না তাদের কাছে এটি একটি সিল করা গ্রন্থ হিসাবে রয়ে গেছে। কোরআনে বর্ণিত আম্বিয়া - নবীদের - গল্পগুলিতে আমাদের বলা হয়েছে যে যারা উপলব্ধিশীল এবং জীবিত ছিলেন না তারা যখন তাদের (আম্বিয়ার) আবেগপূর্ণ উপদেশ শুনেছিলেন তখন কেবল বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অকপটে স্বীকার করেছিলেন যে তারা তাদের কথাগুলি অবোধ্য বলে মনে করেছিলেন: হে শুআইব! আপনি যা বলছেন তা আমরা খুব বেশি বুঝতে পারি না (১১: ৯১)।

নবী (মুহাম্মদ - সা.) প্রায়শই এমন লোকদের সাথে দেখা করতেন যারা তাঁর কথার প্রতি সম্পূর্ণরূপে অসহায় ছিলেন, আবার কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে বিশ্বাস করতেন এবং শুনতে প্রস্তুত ছিলেন। পূর্ববর্তীটির সাথে আচরণ করার সময়, তিনি মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে পড়েন এবং হতাশ বোধ করতেন। কোরআন তাকে ধৈর্যশীল, ক্ষমাশীল এবং সহনশীল হতে পরামর্শ দেয়। তাদের উপর তার মতামত চাপিয়ে দেওয়ার প্রলোভনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে: যদি তারা এই বার্তায় বিশ্বাস না করে তবে সম্ভবত তুমি দুঃখে নিজেকে হত্যা করবে (১৮:৬)।

নবীকে আশ্বস্ত করা হয় যে যদি তিনি সত্য দৃষ্টিভঙ্গি, সহজ ভাষায়, মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন, তবে তিনি তার লক্ষ্য পূরণ করেছেন। তার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি আশা করা যায় না। মানুষের দ্বারা এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা তার দায়িত্ব নয়। তার দায়িত্ব কেবল তাদের বলা যে কোনটি সঠিক পথ এবং কোনটি ভুল এবং কোনটি অনুসরণ করার পরিণতি সম্পর্কে তাদের অবহিত করা। তারা স্বাধীন। নিজের জন্য বেছে নেওয়ার জন্য। স্রষ্টা মানুষকে তাঁর নির্দেশনা গ্রহণ করতে বাধ্য করতে চান না। তিনি মানুষকে বোধগম্যতা, বিচার এবং স্বাধীন পছন্দের অধিকার দিয়েছেন। মানুষ যদি এই ক্ষমতা ব্যবহার করে তবে সে ওহী বুঝতে পারে এবং এতে প্রদত্ত নির্দেশনা থেকে উপকৃত হতে পারে। তাকে তার পছন্দের পরিণতি ভোগ করতে হবে, তা সে আনন্দদায়ক হোক বা অপ্রীতিকর।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ওহী এবং যুক্তির মধ্যে কোনও বিরোধ নেই: বরং তারা একে অপরের পরিপূরক। ওহীতে ঈমান এবং যুক্তি একসাথে জীবনকে সমৃদ্ধ করে এবং ফলপ্রসূ করে, যদি প্রতিটি তার নিজস্ব ক্ষেত্রের সাথে থাকে। ঈমান যুক্তিকে শক্তি দেয় এবং যুক্তি ঈমানকে বাস্তবতার দিকে পরিচালিত করে। উভয়টি ছাড়া জীবন দরিদ্র হয়ে যেত। ঈমান ছাড়া যুক্তি একটি সুগঠিত যন্ত্রের মতো যা মোটরের সাথে সংযুক্ত নয়, অন্যদিকে যুক্তি ছাড়া ঈমান কেবল একটি অন্ধ শক্তি। মানব ইতিহাসের গৌরবময় সময়গুলি একটি শক্তিশালী ঈমান এবং একটি সক্রিয় যুক্তি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। অধ্যাপক হোয়াইটহেড যথার্থই মন্তব্য করেছেন: বিশ্বাসের যুগ হল যুক্তিবাদের যুগ। [৩]

**৪. অলৌকিক ঘটনা**

অলৌকিক ঘটনার বিষয়বস্তু অসুবিধায় ভরা এবং তবুও এটি ধর্মের প্রতিটি ছাত্রের মনোযোগকে চ্যালেঞ্জ করে। এই ধরনের একজন শিক্ষার্থীকে অলৌকিক ঘটনার প্রতি তার মনোভাব সংজ্ঞায়িত করতে এবং ধর্ম এবং অলৌকিক ঘটনার মধ্যে সম্পর্কের ধারণা ব্যাখ্যা করতে বলা হয়। এখানে সে একটি দ্বিধাগ্রস্ততার মুখোমুখি হয়। একদিকে, আধুনিক মানুষ অলৌকিক ঘটনাগুলিকে বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব বলে মনে করে। তার সামনে একমাত্র পথ খোলা আছে, সেগুলোকে ঘোর কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া। বিজ্ঞানীর কাছে প্রকৃতি একটি বদ্ধ ব্যবস্থা এবং এতে অতিপ্রাকৃতের যেকোনো অনুপ্রবেশ অকল্পনীয়। অন্যদিকে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে ধর্মের সাথে অলৌকিক বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। প্রাচীনকালের নবীদের সাধারণত অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হত, এতটাই যে একজন নবীকে তার শিক্ষার মূল্য দিয়ে নয় বরং তার কাজের অলৌকিকতার দ্বারা বিচার করা হত।

ধর্মের ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, ইসলাম অন্তত এই ধরনের কুসংস্কারকে সমর্থন করে না। কোরআন যুক্তির প্রতি আবেদন জানায়। এর ঘোষিত লক্ষ্য হল মানুষকে যুক্তিবাদী এবং স্পষ্টদর্শী করে তোলা, তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন করা নয়। কোরআন মানুষের মনোযোগ প্রকৃতির ঘটনা এবং ইতিহাসের তথ্যের দিকে নির্দেশ করে, কারণ এগুলি স্রষ্টার শক্তি এবং তাঁর প্রজ্ঞা প্রকাশ করে। মানুষকে আকাশের মহিমা, পৃথিবীর সৌন্দর্য, ভোরের সতেজতা, সূর্যাস্তের গৌরব এবং মরুভূমির খোলা জায়গাগুলির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের ভয়ঙ্কর শক্তি দেখার এবং প্রতিফলনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: "এগুলো কি অসাধারণ নয়? তুমি আর কি চাও?" প্রকৃতির ঘটনাবলী, একই সাথে সুন্দর এবং রহস্যময়, মানুষের বিস্ময়বোধকে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করতে পারে। তবে, ইসলামের নবীকে যাদের সাথে মোকাবিলা করতে হয়েছিল তারা কুসংস্কারে ডুবে ছিল। তারা অলৌকিকতার আকাঙ্ক্ষায় আচ্ছন্ন ছিল। তারা কেবল বিশ্বাস করত না যে প্রকৃতির আইন লঙ্ঘন করা যেতে পারে বরং এই ধরনের লঙ্ঘনকেই একটি বিবৃতির সত্যতার জন্য একমাত্র প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করত। বিবৃতির যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি যাচাই করে এবং যদি এর

পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ থাকে তবে তা গ্রহণ করার পরিবর্তে, তারা জিজ্ঞাসা করেছিল যে যিনি এটি তৈরি করেছেন তিনি কি আশ্চর্য কাজ করতে পারেন? সত্যের প্রতি যাদের মনোভাব এত অযৌক্তিক ছিল তাদের মোকাবেলা করা এবং তাদের মন জয় করা সহজ ছিল না।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে নবী যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। মৃদু প্ররোচনার মাধ্যমে তিনি কল্পনার কল্পনা থেকে তাদের মনোযোগ জীবন ও ইতিহাসের বাস্তব তথ্যের দিকে ফিরিয়ে আনুন। তিনি তাদেরকে প্রকৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে এবং উভয়কেই বোঝার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করার জন্য উৎসাহিত করলেন। আন্তরিকতার সাথে তাদের আশ্বস্ত করুন যে তিনি অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা দাবি করেননি বরং তিনি যুক্তিসঙ্গত যুক্তির উপর তার যুক্তি স্থাপন করেছেন এবং তাঁর শিক্ষার উপকারী প্রভাবগুলিকে তেল দিয়েছেন। তাঁর বিরোধীদের এই সহজ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হওয়ার আশা করা যায় না। তারা জবাবে বলেছিল যে তিনি যদি একজন সত্যিকারের নবী হতেন তবে তিনি অবশ্যই অলৌকিক কাজ করতেন; তা করতে তাঁর অক্ষমতা প্রমাণ করে যে তাঁর নবুওয়াতের কোনও বৈধ দাবি নেই। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন ছিল। নবী যদি একজন ভণ্ড হতেন, তবে তিনি সহজেই তাদের কুসংস্কারবাদী মনে কাজ করতে পারতেন। তাঁর চরিত্রের সততা প্রমাণ করার জন্য একটি মাত্র উদাহরণই যথেষ্ট। তাঁর প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর পরপরই সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। অস্বাভাবিক অন্ধকার দেখে লোকেরা ভীত হয়ে পড়েছিল এবং তারা বিনীতভাবে নবীকে পরামর্শ দিয়েছিল যে তাঁর পুত্রের মৃত্যুর ধাক্কায় প্রকৃতি বিচলিত বলে মনে হচ্ছে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছাড়াই, তিনি তাদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা এবং তার ব্যক্তিগত বিষয়ে এর কোনও প্রভাব নেই। প্রকৃতি মানুষের উপর যে কোন বিপদ-আপদ আসুক না কেন, তার প্রতি কোন চিন্তা না করেই তার নিজস্ব গতিতে চলতে থাকে। কেবল তার মতো একজন মানুষই মানুষকে পুরোপুরিভাবে বোঝানোর সুযোগ নিতে অস্বীকার করতে পারতেন যে তিনি একজন অলৌকিক কর্মী এবং তাই একজন সত্যিকারের নবী। এই ঘটনা নবীর অপরিহার্য সততা এবং নীতিনিষ্ঠার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। তাৎক্ষণিক লাভের কোনও সম্ভাবনাই তাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবিশ্বাসীদের সাথে আপোষে আসতে প্ররোচিত করতে পারেনি।

নবী মানুষকে সংস্কার করার এবং তাদের সামনে যে সত্য উপস্থাপন করেছিলেন তা গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করার আবেগে আচ্ছন্ন ছিলেন। তাদের জেদী দাবি যে তিনি তাদের বোঝানোর জন্য অলৌকিক কাজ করবেন, তাকে হতাশ করে তুলেছিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, কোরআন তাকে দৃঢ় থাকতে এবং হতাশার পথ ছেড়ে না দেওয়ার পরামর্শ দেয়। কখনও কখনও, তিনি হয়তো ভাবতেন যে, যদি তার অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা থাকত, তাহলে তিনি দ্রুত মানুষকে তার শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং সঠিক পথে চলতে রাজি করাতে পারতেন। কোরআন এত দূরবর্তী চিন্তাকেও উত্তরহীন রাখেনি: যদি তাদের (সত্যের প্রতি) বিতৃষ্ণা তোমার কাছে কষ্টকর হয়, তাহলে যদি তুমি পারো, তাহলে পৃথিবীতে নেমে আসার

পথ অথবা আকাশে সিঁড়ি খুঁজে বের করো, যাতে তুমি তাদের কাছে একটি নিদর্শন নিয়ে আসতে পারো (সকলকে বোঝানোর জন্য)। আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে তিনি তাদের সকলকে হিদায়াতের দিকে একত্রিত করতে পারতেন; তাই তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না (৬:৩৫)।

স্রষ্টা চান মানুষ সত্যকে বুঝতে এবং বুঝতে পারে এবং গোঁড়ামি ও অযৌক্তিকভাবে নয়: যারা তাদের বুদ্ধি ব্যবহার করে না, তাদের কাছে বিষয়টি বিভ্রান্তিকর থেকে যায় (১০:১০০)।

কোরআন মানুষকে তার শিক্ষার প্রতি তাদের মন প্রয়োগ করতে, এর অর্থ এবং যুক্তি উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে আহ্বান জানায়। যদি তারা আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে কোরআন তাদের মনকে প্রভাবিত করার অযৌক্তিক পদ্ধতির কাছে নত হতে অস্বীকার করে। সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য যেকোনো ধরণের জোরজবরদস্তি, যতই ভালো উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, তারা যদি স্বাধীনভাবে ভুল পথ বেছে নেয়, তবে তা তাদের ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কারো উপর মহত্ত্ব চাপানো যেতে পারে কিন্তু কারো উপর কল্যাণ চাপানো যাবে না। কোরআন যা করে তা হল, বারবার সতর্ক করে যে, যদি চিন্তা-চেতনাকে দীর্ঘ সময় ধরে দমন করা হয়, তাহলে তারা শেষ পর্যন্ত চিন্তার স্পন্দন জাগানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। এতে বলা হয়েছে: যারা সত্যকে (বুঝতে না পেরে) অস্বীকার করে চলে, তুমি তাদের (তাদের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে) সতর্ক করো বা না করো, তাদের জন্য সবই সমান। তারা সত্য গ্রহণ করবে না। (তাদের একগুঁয়েমির ফলে, আল্লাহর আইন) তাদের শ্রবণশক্তি এবং হৃদয়কে মোহর মেরে দিয়েছে এবং তাদের চোখের উপর পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি (কারণ তারা যুক্তি দেখতে পায়নি) (২: ৬-৭)।

যারা যুক্তির অধিকারী ছিল এবং সত্য জ্ঞান অর্জন এবং ওহীর বোধগম্যতা অর্জনের জন্য তা ব্যবহার করেনি, তাদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম মানুষ হিসেবে নিন্দা করা হয়েছে এবং তাদের উপর অবজ্ঞা বর্ষণ করা হয়েছে: এবং আমরা এই কোরআনে মানুষের জন্য (বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য) সকল ধরণের উপমা ব্যবহার করেছি, কিন্তু এত কিছুর পরেও, যদি আপনি তাদের সামনে কোরানের একটি আয়াত রাখেন, তাহলে যারা অবিশ্বাসী তারা অবশ্যই বলবে: তোমরা তো কেবল অহংকারী। এভাবে আল্লাহ তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন যারা বুঝতে চেষ্টা করে না (৩০: ৫৮-৫৯)। রাসূল পুনরায়: এবং আমরা আমাদের রাসূলদেরকে সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবেই প্রেরণ করি না (যারা ভুল পথে চলে)। কিন্তু যারা সত্যকে অস্বীকার করে তারা মিথ্যা কথার মাধ্যমে সত্যকে খণ্ডন করার জন্য বিতর্ক করে, এবং তারা আমার ওহী এবং তাদের সতর্ক করা বিষয়গুলিকে ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে। আর তার চেয়ে বড় অন্যায় আর কে করবে যাকে আল্লাহর আইন স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে, সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার হাত যা আগে পাঠিয়েছে তা ভুলে যায়? (আমাদের শাস্তির বিধান এভাবেই) তাদের অন্তরের উপর পর্দা

চাপিয়ে দেয়, যাতে তারা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে ভারী বোঝা থাকে (তাদের একগুঁয়েমির ফল হল) তুমি তাদেরকে সঠিক পথে ডাকলেও তারা তা কখনও গ্রহণ করবে না (১৮: ৫৬-৫৭)।

আবারও, নিজের সমর্থনে, কোরআন প্রাকৃতিক ঘটনা এবং ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এটি যাচাইযোগ্য ভিত্তি এবং ঐতিহাসিক প্রমাণের ভিত্তিতে তার শিক্ষাকে ন্যায্যতা দেয়। কোরআন মানুষকে আশ্বস্ত করে যে তার সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ অর্জন করা সম্ভব কারণ সে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহানুভূতিশীল মহাবিশ্বে বাস করে, যা একজন জ্ঞানী এবং করুণাময় শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অলৌকিক ঘটনাগুলি কোরআনের ধারাবাহিক যুক্তিসঙ্গত চেতনার পরিপন্থী। যারা অলৌকিক ঘটনা দাবি করে তাদের মাঝে মাঝে হাস্যরস করা হয় তবে প্রায়শই স্পষ্ট ভাষায় তিরস্কার করা হয়।

তবে এখানে যে দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে তা এই কারণে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে যে কোরআন পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের দ্বারা সম্পাদিত অনেক অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করে। এই অলৌকিক ঘটনাগুলির বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা রয়েছে। কিছু পণ্ডিত রূপক ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। অন্যরা মনে করেন যে রূপক ভাষা এবং প্রাণবন্ত চিত্রাবলী একটি সাধারণ সত্যকে তুলে ধরার জন্য কাজ করেছে। আরেকটি যুক্তিসঙ্গত তত্ত্ব হল যে পূর্ববর্তী যুগের লোকদের বর্ণনা করার সময় কোরআনকে সেই অস্বাভাবিক ঘটনাগুলির কথা উল্লেখ করতে হয়েছিল যার মানসিক বাস্তবতা ছিল। তবে, এটি এমন একটি প্রশ্ন যা মানুষের মানসিক বিকাশে আগ্রহী পণ্ডিতদের উদ্বিগ্ন করে। এর সাথে দ্বীনের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করি যে এগুলি রূপকভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।*

এই মুহূর্তে আমরা সাবধানতার সাথে বলতে আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। প্রাচীন বইগুলিতে "অলৌকিক ঘটনা" হিসাবে বর্ণিত ঘটনাগুলিকে বিশ্বাসঘাতক মানুষের অচেতন বানোয়াট বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। মানুষের মনের এমন ক্ষমতা থাকতে পারে যা বিজ্ঞান সন্দেহ করে না। বর্তমান সময়ের কিছু বিজ্ঞানী তাদের পূর্বসূরীদের মতো এতটা সন্দেহবাদী নন। একটি নতুন বিজ্ঞান, প্যারাসাইকোলজি, আবির্ভূত হয়েছে এবং এই মুহূর্তে তীব্রভাবে সক্রিয় বলে মনে হচ্ছে। কয়েকজন বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী এই ক্ষেত্রে কাজ করছেন এবং ইতিমধ্যেই প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন এবং এমন তথ্য আবিষ্কার করেছেন যার মুখোমুখি গোঁড়া সংশয়বাদ প্রাচীনদের বিশ্বাসঘাতকতার মতোই অযৌক্তিক বলে মনে হয়। টেলিপ্যাথি, অলৌকিকতা, অলৌকিকতা এবং মনো-গতিশীল ঘটনা পরীক্ষামূলকভাবে অধ্যয়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে আমরা কেবল এটুকু বলতে পারি যে মনের অতিপ্রাকৃত শক্তি থাকতে পারে। আমরা এই শিক্ষাটি শিখছি যে বৌদ্ধিক অহংকার সত্যের সন্ধানে একটি বাধা। গুপ্তচরবৃত্তির অনুসন্ধানের ফলাফল যাই হোক না কেন, মহাবিশ্বের প্রতি প্রকৃত কোরআনের প্রতিক্রিয়া অপরিবর্তিত থাকবে। অলৌকিকতার প্রশ্নটি বিজ্ঞানীদের

আগ্রহের বিষয় হতে পারে কিন্তু দ্বীনের সাথে কোন সম্পর্কযুক্ত অনুসন্ধানের সাথে এর কোন গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নেই। কোরআন মানুষের মধ্যে মহাবিশ্বের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের চেতনা জাগ্রত করতে চায়। এর মূল জোর যুক্তি এবং জ্ঞানের উপর। এর উদ্দেশ্য হল একটি স্বাধীন, স্বাবলম্বী এবং যুক্তিবাদী ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করা, যা স্রষ্টার অপরিবর্তনীয় আইন অনুসারে মহাবিশ্বে কাজ করার অনুভূতি দ্বারা সজীব। অতএব, অলৌকিক ঘটনা, যদি সেগুলি প্রকৃতির অদ্ভুততা বা স্রষ্টার অপরিবর্তনীয় আইনের কোনও পরিবর্তনকে বোঝায়, তবে সেই কাজে তার কোনও স্থান থাকতে পারে না।

আমরা এই আলোচনাটি ইকবালের নিম্নলিখিত উপযুক্ত উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি যা ইসলাম সম্পর্কে তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং উপলব্ধিযোগ্য উপলব্ধির স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে: ইসলামের জন্ম... হল প্ররোচনামূলক বুদ্ধির জন্ম। ইসলামে ভবিষ্যদ্বাণী তার নিজস্ব বিলুপ্তির প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কারের মাধ্যমে তার পরিপূর্ণতা অর্জন করে। এর মধ্যে এই তীব্র ধারণা জড়িত যে জীবনকে চিরকাল নেতৃত্বের রেখায় আটকে রাখা যাবে না; পূর্ণ আত্মসচেতনতা অর্জনের জন্য মানুষকে অবশেষে তার নিজস্ব সম্পদের উপরই নিক্ষেপ করতে হবে। ইসলামে পুরোহিতত্ব এবং বংশগত রাজত্বের বিলুপ্তি, কোরআনে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার প্রতি অবিরাম আবেদন এবং মানব জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রকৃতি ও ইতিহাসের উপর এটি যে জোর দেয়, তা সবই চূড়ান্ততার একই ধারণার বিভিন্ন দিক। [৪]

**৫. কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি**

আমাদের প্রথম কাজ হল আমাদের সকল বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার সাহায্যে কোরআনের প্রকৃত অর্থ বোঝা। এরপর আমরা এর শিক্ষার মূল্য মূল্যায়ন করতে পারি। আমরা কীভাবে কোরআন শিক্ষার সত্যতা এবং উপযোগিতা পরীক্ষা করব? কোরআন নিজেই আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করে। এটি তিনটি উপায় প্রস্তাব করে কিভাবে এটি পরীক্ষা করা যেতে পারে এবং এই পরীক্ষার ফলাফল মেনে চলার প্রস্তাব দেয়। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রস্তাবিত পরীক্ষাগুলি যুক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য। কোথাও অতিপ্রাকৃতের আহ্বান করা হয়নি। আবেদনটি সর্বদা মানুষের যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার প্রতি।

পরীক্ষাগুলো বিবেচনা করার আগে, আসুন আমরা কোরআনের শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করি। কোরআন মানুষকে স্রষ্টা বিশ্বাস করতে, তাঁর আইন অনুসরণ করতে, নিজের উপর বিশ্বাস করতে, তার সহকর্মীদের ভালোবাসতে এবং সেবা করতে, সৎকর্ম করতে যাতে তার মধ্যে সর্বোত্তম বিকাশ ও প্রকাশ করতে পারে এবং অবশেষে বিশ্বাস করতে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে বলে। এই সমস্ত বিষয় যুক্তির আলোকে পরীক্ষা করার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এই শিক্ষায় কি এমন কিছু আছে যা যুক্তির বিরুদ্ধে? নিঃসন্দেহে স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং পরকালের বাস্তবতা নিয়ে সন্দেহ করা সম্ভব। কিন্তু তারপরে, অস্তিত্বের বিষয়েও সন্দেহ করা সম্ভব।

জগতের অস্তিত্ব। বস্তুনিষ্ঠ জগতের অস্তিত্বের কোন চূড়ান্ত প্রমাণ নেই এবং কিছু দার্শনিক, সম্পূর্ণ গুরুত্বের সাথে, যুক্তি দিয়েছেন যে এই ধরণের জগতে বিশ্বাস করা অযৌক্তিক। আমরা যা নিশ্চিত করতে পারি তা হল প্রকৃত ক্ষণিকের সংবেদন। দার্শনিক যুক্তি সত্ত্বেও, বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতার প্রতি আমাদের বিশ্বাস অটল থাকে।

জীবন দার্শনিকদের জালের দিকে খুব কম মনোযোগ দেয়। মনে রাখার বিষয় হল যে অতি-যুক্তিগত বাস্তবতাগুলি কম বাস্তব নয় কারণ এগুলি যৌক্তিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। যুক্তিসঙ্গত পরীক্ষা প্রয়োগ করার সময় এটি জিজ্ঞাসা করা অনুমোদিত যে শিক্ষায় এমন কিছু আছে কি যা যুক্তির বিপরীতে এবং মানব জ্ঞানের সেই অংশের সাথে যা সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার দাবি করে। এর প্রতিটি উপাদানকে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে কিনা এই প্রশ্নটি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ, শিক্ষা, যদি এটি তার প্রকৃতির সাথে সত্য হতে হয়, তবে যুক্তির বাইরের বাস্তবতার উল্লেখ এড়াতে পারে না। এই ক্ষেত্রে, যুক্তিসঙ্গত পরীক্ষাটি নির্ধারণের রূপ নেবে যে শিক্ষাটি যুক্তির সাথে সরাসরি সংঘাতে আছে কিনা এবং এটি মানবতার স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যায় কিনা।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কোরআন যুক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং মানুষের মধ্যে সর্বোত্তমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে: (হে মুহাম্মদ! অবিশ্বাসীদের বলুন): আমি তোমাদের বলি না (যে) আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার আছে, আর আমার কাছে অদৃশ্য জ্ঞান আছে, আর আমি তোমাদেরও বলি না: দেখো আমি মালেক। আমি কেবল সেই জিনিসেরই অনুসরণ করি যা আমার কাছে ওহী করা হয়। বলো: অন্ধ এবং দর্শনশীল কি সমান? তাহলে কি তোমরা চিন্তা করবে না? (৬: ৫০; ১১: ২৪)।

দ্বিতীয়ত, কোরআন মানুষকে ইতিহাসের আলোকে বিচার করার জন্য আহ্বান জানায়। এটি তাদেরকে জাতির উত্থান-পতন নিয়ে চিন্তা করতে বলে। এটি তাদের আশ্বস্ত করে যে যদি তারা কোন জাতির পতনের কারণ অনুসন্ধান করে, তাহলে তারা দেখতে পাবে যে লোকেরা তাদের যুগের নবীর দ্বারা তাদের কাছে প্রদত্ত সঠিক আচরণ এবং স্থায়ী মূল্যবোধের নীতি লঙ্ঘন করেছে। সঠিক বিশ্বাস এবং সঠিক আচরণ একটি জাতিকে ক্ষমতায় উঠতে সক্ষম করে, এবং ভুল বিশ্বাস এবং কর্ম তার পতনের দিকে পরিচালিত করে। বারবার কোরআনের শিক্ষা, যা পূর্ববর্তী আম্বিয়ার শিক্ষাকে সমর্থন করে, পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং এটিকে উত্তম জীবনের জন্য একটি বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রমাণিত করা হয়েছিল। যারা এটি প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং ভুল পথ অনুসরণ করেছিল তারা অনিবার্যভাবে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছিল এবং এক ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হয়েছিল।

কোরআন মানুষকে ইতিহাসের তথ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেয় যাতে যে জাতিগুলি সমৃদ্ধ ও সমৃদ্ধ হয়েছিল এবং যারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে পার্থক্য আবিষ্কার করা যায়। তাদের কাছে এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হবে যে পরবর্তীরা মিথ্যা ও ক্ষতিকারক বিশ্বাসকে লালন করত এবং তাদের আচরণ স্রষ্টার চিরন্তন আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না: কিন্তু তারা সেই জ্ঞানকে অস্বীকার করে যা তারা অতিক্রম করতে পারেনি এবং যার চূড়ান্ত ফলাফল তাদের কাছে আসেনি। তাদের পূর্ববর্তীরাও তাই অস্বীকার করেছিল। তারপর দেখুন অন্যায়কারীদের পরিণতি কী হয়েছিল (১০: ৩৯)।

অবশেষে আমরা বাস্তবসম্মত পরীক্ষায় আসি। অবিশ্বাসীদের বারবার এই পরীক্ষাটি প্রয়োগ করার এবং কোরআনের সত্যতা এবং মূল্য সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। একটি গাছকে তার ফলের গুণমান এবং মানুষের জীবন ও আচরণের উপর এর প্রভাব দ্বারা বিচার করা হয়। যে সকল বিশ্বাসী এই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের জীবন পরিচালনা করেছিলেন, তারা মানুষের কাছে এর মূল্যের অকাট্য প্রমাণ দিয়েছিলেন। তাদের চরিত্র রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। পূর্বে তারা ছিল নীচ, স্বার্থপর, ঝগড়াটে, সংকীর্ণমনা এবং স্বার্থপর, কেবল ক্ষুদ্র লাভের জন্য চিন্তাশীল। পরবর্তীতে, তারা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ঐক্যবদ্ধ ছিল, একে অপরের সাথে প্রেম ও স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, তাদের শত্রুদের প্রতি সদয় এবং ন্যায়পরায়ণ ছিল এবং তাদের উচ্চ আদর্শ অনুসারে জীবনযাপন করেছিল। কোরআন এক নতুন ধরণের আত্মমর্যাদাশীল, আত্মনির্ভরশীল, নিজের মূল্য সম্পর্কে সচেতন এবং এটিকে উন্নত করতে আগ্রহী এবং পৃথিবীতে একটি উন্নততর সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত ছিল। এই ব্যক্তিরা তাদের জীবন ও কর্মের মাধ্যমে কোরআনের মূল্যের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, যার চেতনা তারা ধারণ করেছিলেন। নবী সম্পূর্ণরূপে ন্যায্য ছিলেন, এই ব্যক্তিদেরকে তিনি যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তার সত্যতার জীবন্ত সাক্ষ্য হিসাবে নির্দেশ করেছিলেন। মানুষের জীবনে ঈমানের আশ্চর্যজনক প্রভাব ছিল এর সত্যতা এবং মূল্যবোধের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ: বলুন: হে আমার সম্প্রদায়! নিজের মতো করে কাজ করো। আমিও কাজ করছি, এভাবেই তোমরা জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার জন্য সুখকর পরিণতি হবে। দেখো! অন্যায়কারীরা সফল হবে না (৬: ১৩৬)।

এগুলোই এমন পরীক্ষা যা কোরআন প্রয়োগ করতে চায়। এমনকি তিক্ত সমালোচকদেরও স্বীকার করতে হবে যে পরীক্ষাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ব্যবহারিক এবং উস্কানিমূলক।

বারবার কোরআন মানুষকে চিন্তাভাবনা এবং কঠোর চিন্তা করার জন্য উৎসাহিত করে। যে ব্যক্তি তার বিবেক ব্যবহার করে তাকে প্রশংসার পাত্র করে: অন্ধ ব্যক্তি দর্শনকারীর সমান নয়, অন্ধকার আলোর সমান নয়, ছায়া সূর্যের দীপ্তির সমান নয়; জীবিত ব্যক্তি মৃতের সমান নয় (৩৫: ১৯-২২)।

যারা সঠিক চিন্তা করে তারা জ্ঞানের আলো খুঁজে পেতে পারে এবং সাফল্যের পথ আবিষ্কার করতে পারে: যারা জানে তারা কি, যারা জানে না তাদের সাথে কি? কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহণ করবে (৩৯:৯)।

আবার: যারা আমাদের জন্য প্রচেষ্টা করে, আমরা তাদের আমাদের পথ দেখাই এবং আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাথে আছেন , যারা সৎকর্মের ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন করে (২৯:৬৯)।

কোরআনের মতে, মুমিনরা (মো'মিনিন) হলেন: যারা যখন তাদের রবের আয়াত তাদের সামনে পেশ করা হয়, তখন তারা বধির ও অন্ধ হয়ে পড়ে না (২৫:৭৩)। এটাই ঈমান! এমনকি স্রষ্টার আয়াতও বধির ও অন্ধ হয়ে গ্রহণ না করা।

***তথ্যসূত্র***

১. দ্য গ্রেট ডিজাইন, পৃষ্ঠা ৩৫।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫২।

৩. ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠনে ইকবাল কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২

৪. ইকবাল, উপাধি, পৃষ্ঠা। ১২০.

# অধ্যায় ৬
# দ্বীনে যুক্তির ভূমিকা

**১.যুক্তি এবং আবেগ**

মানব ইতিহাস জুড়ে যুক্তি এবং আবেগের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। একটি পূর্ণ, সমৃদ্ধ এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের জন্য উভয়ই প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা অত্যন্ত কঠিন সমস্যা। যুক্তি বিচক্ষণতা এবং সতর্কতার পরামর্শ দেয় যখন আবেগ মানুষকে সাহস এবং ঝুঁকি নিতে উৎসাহিত করে। যুক্তি বলে, "লাফ দেওয়ার আগে দেখুন", অন্যদিকে আবেগ চিৎকার করে বলে: "লাফ দাও এবং ভাগ্যের উপর আস্থা রাখো। দেখার জন্য সময় নষ্ট করো না।" "বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, "বাচ্চিক উপাদান ছাড়া জীবন আগ্রহহীন হত; এর সাথে এটি বিপজ্জনক।" [১]

চিন্তার ইতিহাসে, যুক্তির যুগ প্রায়শই যুক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। যুক্তির শক্তির উপর অতিরিক্ত আস্থার পরে যুক্তির প্রতি মোহভঙ্গ হয়েছে। আঠারো শতক ছিল যুক্তির শ্রেষ্ঠত্বের যুগ। আমরা আজ যুক্তির বিরুদ্ধে সহিংস প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করছি। দীর্ঘ সময় ধরে প্রশ্নাতীত শ্রেষ্ঠত্বের পর, বিভিন্ন মহল থেকে এর কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। রোমান্টিক পুনরুজ্জীবনের কবিরা আবেগের অন্তর্নিহিত মূল্যের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং সমস্ত আবেগের অবাধ প্রকাশে গর্ব করেছিলেন। রহস্যবাদীরা যুক্তির চেয়ে আবেগকে মানুষের জন্য আরও ভালো এবং নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক বলে দাবি করার ক্ষেত্রে সোচ্চার ছিলেন। দার্শনিকরা যুক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদে পিছিয়ে ছিলেন না। শোপেনহাওয়ার মহাবিশ্বের মধ্য দিয়ে কাজ করা অন্ধদের মহিমান্বিত করেছিলেন এবং যুক্তিকে তার হাতে থাকা একটি নিছক জিনিস হিসাবে অবজ্ঞার সাথে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বার্গসন অন্তর্দৃষ্টির উপর তার বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং দৃঢ়ভাবে যুক্তির বিরুদ্ধে মুখ ফিরিয়েছিলেন। তারা যুক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য জীববিজ্ঞানীদের সাহায্য চেয়েছিলেন।

ফ্রয়েডের নেতৃত্বে মনোবিজ্ঞানীরা এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন যে মানুষ একটি যুক্তিসঙ্গত সত্তা এবং যুক্তির আলোকে তার জীবন পরিচালনা করে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে অযৌক্তিক অবচেতন প্রধান ভূমিকা পালন করে, যখন যুক্তি কেবল একজন নিছক দাসের নম্র অবস্থান গ্রহণ করে। অচেতন আকাঙ্ক্ষার অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য বুদ্ধিকে কল্পিত কারণ আবিষ্কার করতে বাধ্য করা হয়। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, বিভিন্ন দিক থেকে সহিংস আক্রমণের শিকার হয়ে যুক্তি তার সিংহাসনে টলতে শুরু করে। মানুষ যুক্তির প্রতি মোহভঙ্গ হয়ে পড়েছিল এবং মানব প্রকৃতির অযৌক্তিক উপাদান, যেমন ইচ্ছাশক্তি, আবেগ, প্রবৃত্তি, অন্তর্দৃষ্টি এবং রহস্যময় অভিজ্ঞতার দিকে নির্দেশনা খুঁজছিল। এখনই সময়

এসেছে যখন আমরা বুঝতে পারি যে প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি পরিবর্তিত হয়েছে এবং আমাদের যুক্তি এবং আবেগের মধ্যে ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে হবে। বার্ট্রান্ড রাসেল বিজ্ঞতার সাথে মন্তব্য করেছেন: "এটি এমন কোনও দ্বন্দ্ব নয় যেখানে আমাদের সম্পূর্ণরূপে কোনও পক্ষের পক্ষে থাকা উচিত।" [২]

যুক্তির কারণকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে যুক্তিবাদীরা যে পরম শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থান তাকে দিয়েছিলেন তা আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। যে সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল তাতে প্রচুর সত্যতা রয়েছে। অধ্যাপক জোয়াডের মন্তব্যগুলি সাবধানতার সাথে বিবেচনার দাবি রাখে: যুক্তি কেবল ইচ্ছার হাতিয়ার বা দাসী হিসাবে প্রদর্শিত হয়। এর কাজ হল আমরা অজ্ঞানভাবে নিজেদের জন্য যে লক্ষ্যগুলি নির্ধারণ করি তা সুরক্ষিত করা, আমরা সহজাতভাবে যা করতে চাই তার জন্য অজুহাত আবিষ্কার করে এবং আমরা সহজাতভাবে যা বিশ্বাস করতে চাই তার যুক্তি। .. যুক্তি হলো এমন শক্তি যার মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে প্রতারিত করে বিশ্বাস করি যে আমরা যা সত্য ভাবতে চাই তা আসলে সত্য। [৩]

অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন: "মানুষের চিন্তা তার আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে যেমন ক্ষুধার্ত কুকুরের পা তার নাকের অনুসরণ করে।" [৪]

কোরআনেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন মানুষ নীচ কামনার আধিপত্যে থাকে, তখন সে কীভাবে নিজেকে প্রতারিত করে: তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নীচ কামনাকে তার উপাস্য হিসেবে বেছে নেয়? তাহলে কি তুমি তার উপর রক্ষক হবে? অথবা তুমি কি মনে করো যে তাদের অধিকাংশই শোনে অথবা বোঝে? (২৫: ৪৩-৪৪)।

এরা সেইসব লোক যারা নীচ কামনার দ্বারা তাদের বিবেককে বিকৃত হতে দিয়েছে: তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নীচ কামনাকে তার উপাস্য বানিয়ে নেয়। ফলস্বরূপ আল্লাহর প্রতিফল আইন তাকে তার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বিপথগামী করে, তার শ্রবণশক্তি ও হৃদয়কে মোহর মেরে দেয় এবং তার দৃষ্টিশক্তির উপর আবরণ ফেলে দেয় (৪৫:২৩)।

এটা অস্বীকার করা যায় না যে যুক্তি প্রায়শই স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা এবং নীচ আবেগের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে। এই ক্ষেত্রে, যুক্তি মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার পরিবর্তে আরও বিপথগামী করে, যতক্ষণ না তার উপর বিপর্যয় আসে। কোরআন বলে: (তাদের ভাগ্য) তাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং জনশূন্য) বাসস্থান থেকে তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে... কারণ তারা তাদের নীচ আবেগের অনুসরণ করেছিল, যদিও তারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল (২৯:৩৮)।

এটা স্পষ্ট যে, যখন যুক্তি, আবেগ দ্বারা আবৃত থাকে, তখন তা সাহায্য নয়, বরং যোগ্য লক্ষ্য অর্জনে বাধা। এটি কেবল তখনই সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে যখন এটি সঠিকভাবে কাজ করে। তবে, এটি যুক্তির দোষ নয় যে এটি কখনও কখনও আমাদের বিপথগামী করে। দোষ আমাদের, যুক্তিকে আমাদের আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হতে দেওয়া। একটি সুনিয়ন্ত্রিত মনে, যুক্তি সঠিকভাবে কাজ করে এবং সঠিক নির্দেশনা দেয়। একটি পরিপক্ক এবং দৃঢ় চরিত্রে, সমস্ত আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষা একটি সুরেলা সমগ্রে মিশে যায় এবং যুক্তির ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থায় সংগঠিত হয়। এই ধরণের চরিত্রে, যুক্তি একটি নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা পালন করে কিন্তু দমনকারী ভূমিকা পালন করে না।

আবেগ এবং ইন্দ্রিয়গত আকাঙ্ক্ষা দমন করা হয় না বরং কেবল তাদের সঠিক স্থানে স্থাপন করা হয়। অন্যদিকে, একটি দুর্বল বা বেপরোয়া চরিত্র যুক্তি দ্বারা টিকে থাকে না এবং তাই, যুক্তি এতে আবেগের অধীনস্থ ব্যক্তির গৌণ ভূমিকা পালন করে। অধিকন্তু, যদি যুক্তির পূর্ণ ভূমিকা থাকতে হয়, তবে এটিকে মনের অন্যান্য শক্তির মতো প্রশিক্ষিত এবং বিকশিত করতে হবে। যুক্তি যে ভূমিকা প্রদান করে সেই অনুযায়ী কাজ করে। প্রশ্নটি কেবল এটিকে যথাযথ ভূমিকা প্রদানের। অন্যথায়, যুক্তির সাথে কোনও ভুল নেই।

আমরা স্বীকার করি যে যুক্তি এবং আবেগের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। তবে, প্রতিকার একটি বা অন্যটিকে দমন করার মধ্যে নয়, বরং উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার মধ্যে নিহিত। যুক্তি এবং আবেগ উভয়ই মূল্যবান উপাদান। উভয়ের নির্মূল বা দুর্বলতা একটি ছিন্ন ব্যক্তিত্ব ছেড়ে দেবে। আমাদের উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রবর্তনের এবং মানুষের সর্বোত্তম স্বার্থের সেবায় তাদের তালিকাভুক্ত করার একটি উপায় আবিষ্কার করতে হবে। এই আবিষ্কারটি যুক্তির মাধ্যমেই হতে হবে। আবেগ অন্ধ এবং নিজেকে আটকাতে বা পরিচালনা করতে পারে না। যুক্তি নিজেকে পরীক্ষা করতে পারে এবং নিজস্ব সীমাবদ্ধতা আবিষ্কার করতে পারে। আবেগ, যদি নিজের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তা যুক্তিকে দমন করার প্রবণতা রাখে, কিন্তু যুক্তি জীবনে আবেগের ন্যায্য স্থানকে স্বীকৃতি দেয় এবং এর প্রাপ্য সন্তুষ্টি সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে না।

রাসেল নিঃসন্দেহে যুক্তি বা আবেগের সাথে সম্পূর্ণভাবে পক্ষপাত করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা তার সাথে একমত, এই সংকল্পের সাথে যে আবেগের সাথে সম্পূর্ণভাবে পক্ষপাত করা যুক্তির সাথে সম্পূর্ণভাবে পক্ষপাত করার চেয়ে অনেক খারাপ। কোরআন আবেগের দাসদের সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলে:এবং যদি তারা তোমার উত্তর না দেয়, তাহলে জেনে রেখো যে তারা যা অনুসরণ করে তা তাদের আবেগ। এবং যে আল্লাহর নির্দেশনা ছাড়াই তার আবেগ অনুসরণ করে তার চেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে (২৮: ৫০)।

**২.যুক্তি এবং ওহী (প্রত্যাদেশ)**

বিজ্ঞানীরা জোর দিয়ে বলেন যে এই রহস্যময় মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমরা যা কিছু জ্ঞান অর্জন করেছি তা যুক্তির কাছে ঋণী। এই জ্ঞান হয়তো অপ্রতুল, অপ্রতুল এবং অপর্যাপ্ত; তবুও এটি মূল্যবান এবং অপরিহার্য। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান যুক্তিকে তার সেরা হিসেবে প্রকাশ করে। ধীরে ধীরে এবং বেদনাদায়কভাবে বিজ্ঞান আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে, আমাদের জিজ্ঞাসা করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে যে জ্ঞানের অন্য কোন উপায় আছে কি না, অন্তত জীবনের লক্ষ্য এবং এটি কীভাবে সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা যেতে পারে সে সম্পর্কে জ্ঞান।

যুক্তি আমাদের যে পরামর্শ দেয় তা তার হাতে থাকা জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে। যদি জ্ঞান অপর্যাপ্ত হয়, তবে পরামর্শটি অবশ্যই অস্থায়ী, যেন যুক্তি বলে: "এটি চেষ্টা করে দেখুন এটি কাজ করে কিনা। যদি তা না হয়, তবে আমি বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করব এবং অন্য কিছু পরামর্শ দেব।" যুক্তি তখনই সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারে যখন সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য তার সামনে রাখা হয়। যখন এই তথ্যগুলি সব পাওয়া যায় না তখন এটি অসহায়। বস্তুজগৎ এবং মানবদেহের ক্ষেত্রে, আজ আমাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান রয়েছে। মানুষের দেহ সম্পর্কে উত্থাপিত অনেক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য যুক্তির উপর নির্ভর করা যেতে পারে। কিন্তু মানুষের একটি বাস্তব স্বত্বও রয়েছে এবং এটি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান করুণভাবে অপর্যাপ্ত। প্রকৃত স্বত্ব বিজ্ঞানীর পরিমাণগত চিকিৎসার জন্য সংবেদনশীল নয়। এর নির্দেশনা কেবল শাশ্বত সত্যের আলোকে দেওয়া যেতে পারে যা যুক্তিকে অতিক্রম করে। যুক্তি পরম বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারে না এবং মানুষের সত্ত্বা কেবল পরম বাস্তবতা বা স্রষ্টার নির্দেশনার মাধ্যমেই নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে। তাই মানুষের জন্য ঐশ্বরিক নির্দেশনা খোঁজার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যা ছাড়া সে পৃথিবীতে আবদ্ধ থাকবে। ভৌত জগতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে, আমাদের সর্বদা যুক্তির পরামর্শে কাজ করা উচিত; যা প্রত্যাখ্যান করা বিপর্যয়ের কারণ হবে। কিন্তু যখন আমরা আমাদের ভাগ্য পূরণের আকাঙ্ক্ষা করি, তখন আমাদের কেবল যুক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা আমাদের জন্য অযৌক্তিক হবে। আমাদের ঐশ্বরিক নির্দেশনার বাহন প্রত্যাদেশের সাহায্য নেওয়া উচিত। প্রত্যাদেশের আলোতে কাজ করা যুক্তি আমাদের সত্য পথে পরিচালিত করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, প্রত্যাদেশ যুক্তিকে পরিপূরক করে। এইভাবে আমরা জীবনের সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকব এবং যদি আমরা স্রষ্টার দেওয়া শক্তি এবং তিনি আমাদের যে আলো (প্রত্যাদেশের) দিয়েছেন তা ব্যবহার করতে অস্বীকার করি তবে আমরা স্রষ্টার প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতার দোষে দোষী হব।

আমরা এখন প্রশ্নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করতে পারি। ব্যবহারিক জীবনে, যুক্তি আমাদের দুটি উপায়ে সাহায্য করে। প্রথমত, এটি আমাদের বলে যে আমরা কোন জিনিসগুলি কামনা করি তা ভাল

এবং দরকারী এবং কোনটি খারাপ এবং ক্ষতিকারক। এটি স্বার্থের মানদণ্ড দিয়ে জিনিসপত্র বিচার করে। যে জিনিসগুলি আত্ম-সংরক্ষণ এবং জীবনের উন্নতিতে অবদান রাখে সেগুলিকে ভালো হিসেবে শংসাপত্রিত করা হয়, অন্যদিকে যে জিনিসগুলি জীবনের জন্য ক্ষতিকারক এবং মানুষের জীবনের আনন্দকে হ্রাস করে এবং তার বিকাশের ক্ষমতাকে ব্যাহত করে সেগুলিকে অবাঞ্ছিত বা ভালো বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু যুক্তি কেবল জিনিসগুলির উপর তার রায় ঘোষণা করে না। এটি ভাল বলে বিবেচিত জিনিসগুলির পক্ষে তার ওজন নিক্ষেপ করে এবং মানুষকে সেগুলি বেছে নিতে প্ররোচিত করে, যদিও তার প্রবণতা এবং ক্ষুধা ক্ষতিকারক জিনিসগুলির পক্ষে থাকে। যখন পছন্দটি দরকারী এবং ক্ষতিকারক জিনিসের মধ্যে হয়, তখন একজন মানুষ যুক্তি দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিরা খুব কমই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়। বিজ্ঞান আমাদের কাছে বস্তুগত জিনিসের বৈশিষ্ট্য এবং মানুষের স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান রেখেছে। এই জ্ঞানের ভিত্তিতে, যুক্তি কোন জিনিসগুলি কাম্য এবং কোনটি অবাঞ্ছিত সে সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ করে তোলে। অন্য কথায়, মানুষের শারীরিক স্বভাবের ক্ষেত্রে আমরা খুব কমই সন্দেহের মধ্যে থাকি যে কোন জিনিসগুলি উপকারী এবং কোনটি নয়। কিন্তু, যেমনটি আমরা দেখেছি, মানুষের একটি বাস্তব স্বত্বও রয়েছে এবং এই স্বত্ব সম্পর্কে আমাদের কেবল অসম্পূর্ণ এবং খণ্ডিত জ্ঞান রয়েছে। আমরা প্রকৃত স্বত্ব বুঝতে পারি না, কারণ এটি মানুষের যুক্তিকে অতিক্রম করে। প্রকৃত স্বত্বের প্রকৃতি আমাদের কাছে অজানা। এমনকি এটি জানা অসম্ভবও হতে পারে। মূল্য অভিজ্ঞতা এবং নৈতিক প্রচেষ্টার চেতনায় আমরা এর ক্ষণস্থায়ী ঝলক পাই। আমরা নিশ্চিতভাবে এটি সম্পর্কে যা বলতে পারি তা হল এটি মুক্ত, এর বিকাশের জন্য সীমাহীন ক্ষমতা রয়েছে এবং আত্ম-প্রকাশ এবং আত্ম-বিকাশের তাড়না এর মধ্যে অন্তর্নিহিত।

আমরা আমাদের হাড়ের মধ্যে অনুভব করি যে আমাদের মধ্যে একটি মহান ভাগ্য অপেক্ষা করছে যা আমাদের সত্তার মূল গঠন করে। কিন্তু যখন আমাদের যুক্তি আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যের একটি স্পষ্ট ধারণা স্থাপনের চেষ্টা করে, তখন তা বিভ্রান্ত এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আমরা কেবল এটুকুই বলতে পারি যে আমরা লক্ষ্য অর্জন করতে পারি যদি আমরা চিরন্তন সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জীবনযাপন করি। এই সত্যগুলি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লুকিয়ে থাকে এবং আমাদের যুক্তিকে অতিক্রম করে। আমাদেরকে তাদের আকর্ষণীয় আভাস পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে আমাদের যুক্তি, অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, সেই আলোর জন্য আকুল, যা জীবনের সর্বোচ্চ প্রান্তকে আলোকিত করবে। এই আলো আমাদের কাছে প্রত্যাদেশ দ্বারা প্রদান করা হয়েছে যার উৎস স্রষ্টা, যিনি কোরআনের ভাষায়, "পৃথিবী ও আকাশের আলো" (২৪:৩৫)।

এখন পর্যন্ত, আমরা ভালো এবং মন্দের মধ্যে পছন্দের প্রশ্নটি নিয়ে উদ্বিগ্ন। যাইহোক, আমাদের প্রায়শই দুটি জিনিসের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হয়, অন্যটির জন্য একটি ভালোকে ত্যাগ করতে বলা হয়। এই

কঠিন পছন্দে যুক্তি আমাদের কতটা সাহায্য করতে পারে? আসুন একটি বা দুটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করি। এমন একটি পরিস্থিতি আমাদের মুখোমুখি হতে পারে যেখানে আমরা আমাদের জীবন বা আমাদের সম্পদ উভয়ই বাঁচাতে পারি। যুক্তি আমাদের জীবন বেছে নিতে এবং সম্পদের ক্ষতির কাছে নতি স্বীকার করতে বলে। আবার এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যেখানে আমরা কেবল জীবনের বিনিময়ে আমাদের সম্মান রক্ষা করতে পারি। যুক্তি আমাদের বলে, যদিও আগের ঘটনার মতো দ্বিধাহীনভাবে নয়, জীবনের চেয়ে আমাদের সম্মান রক্ষা করতে। এটি কীভাবে তা করে? স্পষ্টতই এটি মূল্যবোধের একটি স্বীকৃত স্কেলকে বোঝায়। মূল্যবোধের স্কেল আমাদের দুটি পণ্যের মধ্যে কোনটি উচ্চতর এবং কোনটি নিম্নতর তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। যুক্তি তখন আমাদের উচ্চতরের জন্য নিম্নকে ত্যাগ করার পরামর্শ দেয়।

উল্লেখ্য, এখানে যে বিষয়টা লক্ষ্য করা যায়, স্কেলের শীর্ষে থাকা মূল্যবোধগুলি যুক্তির মাধ্যমে আবিষ্কার করা যায় না। এই জ্ঞানের পূর্বাভাস হল মানব সত্তা তার ক্রমাগত বিকাশের সময় কোন উচ্চতায় উঠতে পারে তার জ্ঞান। এখানে আবারও উদঘাটন শৈলীর উপর যুক্তি করতে সাহায্য করে। সর্বোচ্চ মূল্য কেবলমাত্র আত্মার ভাগ্যের উল্লেখ করেই নির্ধারণ করা যেতে পারে। যুক্তি দ্বারা নির্মিত মূল্যবোধের স্কেল কার্যকর, কিন্তু এটি অসম্পূর্ণ। উদঘাটন এর সীমা বৃদ্ধি করে এটি সম্পূর্ণ করে।

অবশেষে, বিজ্ঞান আমাদের লক্ষ্য অর্জনের উপায় সম্পর্কে দরকারী জ্ঞান প্রদান করে। তবে, আমাদের নিজেদের জন্য কী লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি সম্পর্কে এটি নীরব। আমাদের লক্ষ্যগুলি অনুসরণ করা উচিত যা আমাদের চাহিদা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করতে পারে। শারীরিক সত্তার চাহিদা স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় এবং সহজেই পূরণ করা যায়। খাদ্য এবং জল ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নিবারণ করে। যুক্তি আমাদের খাদ্য এবং জল সুরক্ষিত করতে সাহায্য করতে পারে। প্রকৃত সত্তার চাহিদাগুলি যতটা জোরালো হতে পারে কিন্তু কেবল অস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। যুক্তির যথাযথ আলোকে, কীভাবে সেগুলি পূরণ করা যেতে পারে তা দেখা সহজ নয়। এখানেও যুক্তিকে ওহীর উপর নির্ভর করতে বাধ্য করা হয়।

উপরের আলোচনার মধ্য দিয়ে শারীরিক সত্তা এবং বাস্তব সত্তার মধ্যে পার্থক্যটি কোরআনের আলোকে আরও স্পষ্ট করা প্রয়োজন। দেহ এবং আত্মা, পদার্থ এবং আত্মার মধ্যে পার্থক্য, বেশিরভাগ ধর্মের শিক্ষার মূল বিষয়, কোরআন এই দ্বিবিভাজনকে সমর্থন করে না। কোরআনের দৃষ্টিতে, মানুষ দুটি স্বতন্ত্র সত্তা - আত্মা এবং দেহ দ্বারা গঠিত নয়। সে একক অবিভাজ্য সত্তা। যদি আমরা তার উপর বিজ্ঞানের বিভাগগুলি প্রয়োগ করি, তাহলে সে একটি ভৌত জীব বলে মনে হয়, কিন্তু "মূল্য" বিভাগগুলি প্রয়োগ করলে সে নিজেকে একটি মুক্ত সত্তা হিসেবে প্রকাশ করে। এটি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা গোল্ডস্টাইন এবং জে.এফ. ব্রাউন দ্বারা বিকশিত জীব তত্ত্বের সাথে আলাদা নয়। কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি উচ্চতর সত্তার বাস্তবতা বজায়

রাখার ক্ষেত্রে উপরোক্ত তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মনে হবে যে মানুষের আসল সত্তা বস্তুবাদ গ্রহণ করে যা ছাড়া এটি সময় এবং স্থানের ভৌত জগতে কাজ করতে পারে না।

**৩. প্রত্যাদেশ এবং মূল্যবোধ**

এটা অস্বীকার করা যায় না যে জীবনের সঠিক আচরণ এবং সত্তার নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের জন্য পরম মূল্যবোধের জ্ঞান অপরিহার্য। কিন্তু যুক্তি, জ্ঞানের প্রধান হাতিয়ার "possess" আমাদের কেবল আপেক্ষিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বলে। এটি এমনকি এই প্রশ্নের একটি সুনির্দিষ্ট উত্তরও দিতে পারে না যে পরম মূল্যবোধ আছে কিনা এবং যদি থাকে, তাহলে কীভাবে সেগুলি জানা যেতে পারে। এটি মূল্যবোধকে ব্যক্তিগতভাবে সংজ্ঞায়িত করে, শুধুমাত্র বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত। এটি মূল্যবোধের একটি বস্তুনিষ্ঠ ব্যবস্থার নীরব অস্বীকারের সমান, যা সর্বদা সকল পুরুষের জন্য বৈধ। এটা সহজেই দেখা যায় যে এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বীনের মূলকে কেটে ফেলে। দ্বীন বস্তুনিষ্ঠ, পরম মূল্যবোধ এবং একটি বস্তুনিষ্ঠ, পরম নৈতিক মানদণ্ডে বিশ্বাস জড়িত। যুক্তি, তার সতর্ক পরীক্ষামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রমাগত নতুন জ্ঞানের আলোকে তার মূল্যবোধের স্কেল এবং তার নৈতিক মানকে সংশোধন এবং পুনর্গঠন করছে। তাই, চিন্তাশীল পুরুষরা যুক্তি ব্যতীত অন্য কোনও নির্ভরযোগ্য মূল্যবোধের উৎসের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। এই বিষয়ে মার্টিন বুবারের কথা উদ্ধৃত করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই: পরম মূল্যবোধ... অবশ্যই, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য কেবল ব্যক্তিগত বৈধতা থাকতে পারে না। ডন জুয়ান সর্বাধিক সংখ্যক নারীকে প্রলুব্ধ করার মধ্যে পরম এবং ব্যক্তিগত মূল্য খুঁজে পান এবং স্বৈরশাসক এটিকে সর্বাধিক সম্ভাব্য ক্ষমতা সঞ্চয়ের মধ্যে দেখেন। 'পরম বৈধতা কেবল সার্বজনীন মূল্যবোধ এবং রূপের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, যে অস্তিত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বীকৃতি দেয় এবং স্বীকার করে। [৫]

র‍্যাশডাল একই কথা বলেন: মূল্যবোধের একটি পরম মান আছে, যা সমস্ত যুক্তিবাদী প্রাণীর জন্য একই, তা হল নীতিশাস্ত্র। [৬]

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে, র‍্যাশডাল যুক্তি দেন যে বিতর্কিত বিষয় হল একটি বস্তুনিষ্ঠভাবে বৈধ নৈতিক আইনের অস্তিত্ব নয় বরং কেবল তার অস্তিত্বের ধরণ: আমরা বলি যে নৈতিক আইনের একটি বাস্তব অস্তিত্ব আছে, পরম নৈতিকতা বলে কিছু আছে, নৈতিক বিচারে একেবারে সত্য বা মিথ্যা কিছু আছে, আমরা বা যেকোনো সময়ে যেকোনো সংখ্যক মানুষ আসলে তা ভাবি বা না ভাবি। এই ধরনের বিশ্বাস স্পষ্টভাবে নীতিশাস্ত্র বলতে আমরা যা বুঝি তার সাথে জড়িত। এই ধরনের নিঃশর্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে বৈধ নৈতিক আইন, বা আদর্শের ধারণা নিঃসন্দেহে একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্য হিসাবে বিদ্যমান। আমাদের সামনে প্রশ্ন হল এটি তাত্ত্বিকভাবে ন্যায্যতা প্রদান করতে সক্ষম কিনা। তাহলে আমাদের এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে যে এই ধরনের আদর্শ কোথায় বিদ্যমান এবং এর সাথে আমাদের কোন ধরণের অস্তিত্বের সম্পর্ক

স্থাপন করতে হবে। অবশ্যই, এটি সম্পূর্ণরূপে এবং সম্পূর্ণরূপে কোনও ব্যক্তির মানব চেতনাতেই পাওয়া যায় না। মানুষ আসলে নৈতিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে ভিন্নভাবে চিন্তা করে এবং এমন অনুমান করার কোনও অভিজ্ঞতাগত কারণ নেই যে তারা কখনও অন্যথা করবে। তাহলে নৈতিক আদর্শ আসলে কোথায় এবং কীভাবে বিদ্যমান? [৭]

নৈতিক মান অবশ্যই একটি সর্বজনীন এবং পরম মূল্যবোধের ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া উচিত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে, রাশডাল আমাদের বলেন যে এই ধরণের ব্যবস্থার উৎস ঐশ্বরিক মন ছাড়া অন্য কোথাও থাকতে পারে না: একটি পরম নৈতিক আইন বা নৈতিক আদর্শ বস্তুগত জিনিসগুলিতে থাকতে পারে না। এবং এটি (আমরা দেখেছি) এই বা সেই ব্যক্তির মনে বিদ্যমান নয়। একটি নৈতিক আদর্শ কোথাও এবং কোনওভাবেই একটি মনের মধ্যে থাকতে পারে না; একটি পরম নৈতিক আদর্শ কেবল এমন একটি মনেই থাকতে পারে যা থেকে সমস্ত বাস্তবতা উদ্ভূত হয়। আমাদের নৈতিক আদর্শ কেবলমাত্র ততক্ষণ পর্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ বৈধতা দাবি করতে পারে যতক্ষণ না এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে স্রষ্টার মনে চিরস্থায়ীভাবে বিদ্যমান একটি নৈতিক আদর্শের প্রকাশ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। [৮]

এই কারণে, ব্রাইটম্যান বলেন: "যদি আমাদের একজন স্রষ্টা থাকতে হয়, তাহলে আমাদের এমন একটি সত্তা থাকতে হবে যা মূল্যের একটি বিশ্বাসযোগ্য উৎস।" [৯]

বার্গসন এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেন যে মানব বুদ্ধির পক্ষে বাস্তবতায় পৌঁছানো সম্ভব কিনা এবং একটি নেতিবাচক উত্তর দেন: বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে নয়, অথবা অন্তত শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে, (মানুষ) তা করতে পারে: বুদ্ধিমত্তা বিপরীত দিকে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি; এটি একটি নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য সরবরাহ করা হয়েছিল এবং যখন এটি একটি উচ্চতর স্তরে অনুমান করার চেষ্টা করে তখন এটি আমাদের সর্বাধিক সম্ভাবনা কল্পনা করতে সক্ষম করে; এটি কোনও বাস্তবতা অর্জন করে না। [১০]

আমাদের সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত পদার্থবিদ আইনস্টাইন অকপটে স্বীকার করেছেন যে বিজ্ঞান কখনই আমাদের "আধ্যাত্মিক" নির্দেশনা দিতে পারে না। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, কেবলমাত্র সেইসব মানুষই আমাদের "আধ্যাত্মিক" ক্ষেত্রে নির্দেশনা দিতে পারে যাদের কাছে ওহীর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে: অন্যদিকে, বিজ্ঞানের প্রতিনিধিরা প্রায়শই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তিতে মূল্যবোধ এবং লক্ষ্য সম্পর্কে মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন এবং এইভাবে ধর্মের বিরোধিতা করেছেন। এই দ্বন্দ্বগুলি মারাত্মক ত্রুটি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বিজ্ঞান লক্ষ্য তৈরি করতে পারে না, এমনকি মানুষের মধ্যেও সেগুলি স্থাপন করতে পারে না; বিজ্ঞান সর্বাধিক কিছু লক্ষ্য অর্জনের উপায় সরবরাহ করতে পারে কিন্তু লক্ষ্যগুলি নিজেই উচ্চ নৈতিক আদর্শের অধিকারী ব্যক্তিত্বদের দ্বারা কল্পনা করা হয়। [১১]

জোয়াদও একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন, যিনি "ওহী" শব্দটিকে "ওহী" শব্দটির চেয়ে পছন্দ করেন। কোরআনে যে বিস্তৃত অর্থে এটি ব্যবহার করা হয়েছে তা মনে রাখলে অন্তর্দৃষ্টিকে ওয়াহীর অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তবে, এটি লক্ষ করা উচিত যে, অন্তর্দৃষ্টি আম্বিয়াকে প্রদত্ত ওহীর সমার্থক নয়; উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিমাণগত নয়, বরং গুণগত। জোয়াড বলেন: (অন্তর্দৃষ্টি) তার নিজস্ব কর্তৃত্ব এবং এর সাথে তার গ্যারান্টি বহন করে নিজস্ব সত্যতা। আমরা যে সত্যগুলি স্বজ্ঞাতভাবে জানি, সেগুলির জন্য কোনও যুক্তিই যুক্তির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৌঁছানো যায় না বলেই তা প্রমাণ করা যায় না। নিঃসন্দেহে যুক্তি পরবর্তীতে তাদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের জন্য তালিকাভুক্ত হতে পারে। [১২]

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি দেখায় যে, অধ্যাপক ক্যাসিরারও সর্বোচ্চ মূল্যবোধ উপলব্ধি করার ক্ষমতা যুক্তিকে কৃতিত্ব দেন না: (গ্রীক দর্শনে) যুক্তির শক্তিকে মানুষের সর্বোচ্চ শক্তি হিসেবে প্রশংসা করা হয়েছিল। কিন্তু মানুষ যা কখনও জানতে পারেনি, যতক্ষণ না সে একটি বিশেষ ঐশ্বরিক প্রকাশ দ্বারা আলোকিত হয়, তা হল যুক্তি নিজেই বিশ্বের সবচেয়ে প্রশ্নবিদ্ধ এবং অস্পষ্ট জিনিসগুলির মধ্যে একটি। [১৩]

সংক্ষেপে, যদিও বাস্তবতার জগতে যুক্তির কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না, লক্ষ্যের ক্ষেত্র অবশ্যই তার এখতিয়ারের বাইরে। সর্বোচ্চ মূল্যবোধ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল প্রকাশ।

মূল্যবোধ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান নিয়ে সজ্জিত, আমরা চাইলে, মহাবিশ্বের অপরিবর্তনীয় নৈতিক শৃঙ্খলার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে এবং কাজ করতে পারি। জ্ঞান কেবল একটি মূল্যকে মূল্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এর মধ্যে থাকা মূল্যের মাত্রার একটি ন্যায্য অনুমান জড়িত, যাতে এটি অন্যান্য মূল্যবোধের সাথে তুলনা করা যায়। এমন একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে যেখানে আমাদের দুটি মূল্যবোধের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হয়, আমরা তখন তাৎক্ষণিকভাবে উচ্চতরটি বেছে নিতে পারি এবং উচ্চতরটির জন্য নিম্নতর মূল্য ত্যাগ করতে পারি। উচ্চতরটি নিশ্চিত করার জন্য নিম্নতর মূল্যের স্বেচ্ছাসেবী ত্যাগের মাধ্যমে চরিত্র শক্তিশালী হয়।

যখন একজন মানুষকে জীবন এবং অর্থের মধ্যে একটি বেছে নিতে হয়, তখন সে অর্থ ত্যাগ করতে এবং তার জীবন বাঁচাতে দ্বিধা করে না। এখানে প্রবৃত্তি তার পছন্দকে সমর্থন করে; কিন্তু একই ব্যক্তি জীবন এবং সম্মানের মধ্যে একটি বেছে নিতে বাধ্য হতে পারে। এটি একটি নিষ্ঠুর পছন্দ এবং মানুষ দুটি অত্যন্ত মূল্যবান জিনিসের যেকোনো একটির ক্ষতির সাথে নিজেকে সামঞ্জস্য করতে পারে না। যুক্তি তাকে জীবনের মূল্যে সম্মান বাঁচানোর পরামর্শ দেবে, তবে যুক্তিসঙ্গত যুক্তি দ্বারা সে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী নাও হতে পারে। সে এমনকি সঠিক পছন্দ করতে পারে তবে ভুল কারণে। সে সম্মান বেছে নিতে পারে, কারণ

সে জীবনের চেয়ে সম্মানকে বেশি মূল্যবান বলে নয়, বরং কারণ সে সামাজিক অস্বীকৃতির ভয় পায় এবং সামাজিকভাবে বহিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

সে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তের সাথে থাকা পরিপূর্ণতার অনুভূতি হারিয়েছে। উচ্চতর মূল্য নির্বাচন করা হল দৃঢ় বিশ্বাস বা ঈমানের একটি কাজ; প্রত্যাদেশ এবং পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস। জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, আমরা হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে পারব না যে দুটি মূল্যের মধ্যে কোনটি উচ্চতর। যুক্তি বিচার স্থগিত রাখার পরামর্শ দিতে পারে। আমরা বিচার স্থগিত রাখতে পারি কিন্তু আমরা কর্ম স্থগিত রাখতে পারি না এবং যখন আমরা কাজ করি, তখন আমরা ইতিমধ্যেই পছন্দটি করে ফেলেছি। আমাদের স্বেচ্ছাচারী ভিত্তিতে বা ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। যখন যুক্তির আলো পড়ে যায়, তখন আমাদের নিজেদেরকে প্রত্যাদেশের আলো দ্বারা পরিচালিত হতে দেওয়া উচিত। প্রত্যাদেশ আমাদের মানব ব্যক্তিত্বের লক্ষ্য সম্পর্কে বলে, যা, সেগুলি অর্জনের চেষ্টা করে, মৃত্যুর পরেও উচ্চতর স্তরে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নিজেকে যোগ্য করে তোলে। সংক্ষেপে, চূড়ান্ত মূল্যবোধ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ।

### ৪. অপরিহার্য ঈমান

আমরা আশা করি ঈমানের প্রয়োজনীয়তা এবং যুক্তির সাথে এর জৈবিক সম্পর্কের উপর কয়েকটি কথা এই মুহূর্তে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ঈমান ছাড়া মানুষ হাল ছাড়া নৌকার মতো, যা লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে বেড়ায় এবং প্রতিটি ঝোড়ো হাওয়ার করুণায়; এর সাহায্যে, সে ধাপে ধাপে আত্ম-সিদ্ধি এবং আত্ম-উপলব্ধির লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। "কোন কিছুতে ঈমান?" এই প্রশ্নের উত্তর হতে পারে, স্রষ্টার উপর ঈমান যিনি মহাবিশ্বকে টিকিয়ে রাখেন, যিনি তাঁর অসীম দিকগুলির কিছু প্রকাশ করেন; মানব সত্তার বাস্তবতা এবং বিকাশের জন্য এর সীমাহীন ক্ষমতায় ঈমান; মানব প্রচেষ্টা এবং মহাজাগতিক প্রক্রিয়া উভয়ের লক্ষ্য নির্ধারণকারী পরম মূল্যবোধে ঈমান; এবং পরিশেষে একটি উদ্দেশ্যমূলক মহাবিশ্বে ঈমান।

মানব সত্তা এবং মহাবিশ্বের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাশডালের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমাদের সাবধানে চিন্তা করা উচিত: মহাবিশ্বের অবশ্যই একটি উদ্দেশ্য বা যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্য থাকতে হবে, এমন একটি উদ্দেশ্য যা একটি নিখুঁত কারণ ভাল বলে ঘোষণা করবে। [১৪]

আত্মা সম্পর্কে তিনি বলেন: আত্মা একটি স্থায়ী বাস্তবতা; এটি আধ্যাত্মিক যতদূর পর্যন্ত এর নিজস্ব একটি স্থায়ী জীবন রয়েছে, বস্তুগত জীবের পরিবর্তনের সাথে এটি (যে কোনও উপায়েই) সংযুক্ত, তার সাথে অভিন্ন নয়; এবং মানুষের ক্রিয়াকলাপগুলি প্রকৃতপক্ষে আত্মার প্রকৃতি বা চরিত্র থেকে উদ্ভূত হয় এবং প্রকাশ করে কারণ সহজ কারণ, শুধুমাত্র যদি আমরা ধরে নিই যে মানুষের বর্তমান জীবনের একটি লক্ষ্য

আছে যা আংশিকভাবে এর বাইরেও নিহিত রয়েছে। বর্তমান প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সীমা যতদূর সম্ভব, যতদূর পর্যন্ত বর্তমান মানব পর্যবেক্ষণের জন্য সেই ব্যবস্থাটি সহজলভ্য, আমরা কি মানব জীবনের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত অর্থ এবং ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে পারি যেমনটি আমরা দেখি; এবং এ পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাকৃতিক এবং বুদ্ধিমান। এই ধরণের বিশ্ব-শেষের রূপ হল এখানে বসবাসকারী পৃথক আত্মাদের জন্য অমরত্বের বিশ্বাস। [১৫]

মূলত, কোরআনে একই দৃষ্টিভঙ্গি সহজ এবং সরাসরি ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। কোরআন আমাদের আশ্বস্ত করে যে স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টির একটি অর্থ রয়েছে। "তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে "সত্য এবং উদ্দেশ্যের জন্য" (৪৫:২২), যাতে "প্রত্যেক প্রাণী তার উপার্জনের প্রতিদান পায়" (৪৫:২২)। আমাদের সেই ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের প্রতিফল বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে "যে তার নীচ কামনাকে তার উপাস্য বানিয়েছে" এবং ফলস্বরূপ, "তার জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও পথ হারিয়েছে" (৪৫:২৩)। এই বিপথগামী ব্যক্তি প্রকৃত সত্তাকে দৈহিক দেহের সাথে তুলনা করে এবং কেবল দেহের চাহিদার প্রতি মনোযোগ দেয়। তার মতো মানুষই বলে: "বিদ্যমান জগতের আমাদের জীবন ছাড়া আর কিছুই নেই।" "আমরা বেঁচে থাকি এবং মরে যাই এবং সময় ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না" (৪৫:২৪)। কিন্তু কোরআন জোর দিয়ে বলে যে, "তাদের এসবের কিছুই জানা নেই; তারা কেবল অনুমান করে" (৪৫:২৪)।

নবীকে "তাদের ইচ্ছামত তাদের কাছ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কেবল এই পৃথিবীর জীবন" (৫৩:২৯)। তাদের মন বর্তমান অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে বন্দী এবং অস্তিত্বের বিশাল এবং সীমাহীন স্থানগুলি তাদের দৃষ্টি থেকে দূরে রাখা হয়েছে।

দ্বীন, সেইসাথে নৈতিক জীবন, কেবলমাত্র সেই সত্তার পক্ষে সম্ভব যার একটি স্থায়ী সত্তা রয়েছে। মূল্য সেই ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, এবং পরম মূল্যবোধের একটি ব্যবস্থার অর্থ কেবল একটি বাস্তব সত্তার সাথে সম্পর্কিত। একটি স্থায়ী সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হল পরম মূল্যবোধকে অস্বীকার করা এবং পরম মূল্যবোধকে অস্বীকার করা, নৈতিক মানকেও অস্বীকার করা। একটি নীতিগত কোড মূল্যবোধের একটি ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরি। পরম মূল্যবোধের অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের মাধ্যমে একটি নৈতিক জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। পরম মূল্যবোধের বিষয়ে, জ্ঞানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস হল ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ। ওহীর উপর গভীরভাবে চিন্তা করার মাধ্যমে, আমরা সৃষ্টির অর্থ ও উদ্দেশ্য, মানুষের সত্তার মূল্য, এর সম্ভাবনা এবং ভাগ্য বুঝতে আশা করতে পারি। আমাদের নিম্নলিখিত আত্মা-আন্দোলনকারী আয়াতটি হৃদয়ে স্থাপন করা উচিত: দেখুন! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে, বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে

এবং শুয়ে আল্লাহর আইন মনে রাখে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির উপর চিন্তা করে বলে: হে আমাদের রব! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করোনি (৩: ১৮৯)।

ওহী মূল্যবোধের জগতে আমাদের পথ আলোকিত করে। তবে, আমরা কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমে, কেবল যুক্তির মাধ্যমেও ওহী বুঝতে পারি না। এই উদ্দেশ্যে যা প্রয়োজন তা হল উভয়ের একটি সুখী মিশ্রণ। বিশ্বাসের সাথে যুক্ত যুক্তি আমাদের ওহীর অভ্যন্তরীণ চেতনার দিকে নিয়ে যায়। কোরআন এমন লোকদের কথা বলে যারা ওহীর অর্থ উপলব্ধি করেছেন, "প্রকৃত বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষ" (৫: ১০০)। তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী কারণ অযৌক্তিক বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই (৬৫:১০)। যতদূর কোরআনের কথা, ঈমান এবং যুক্তির মধ্যে কোন প্রকৃত দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। এটি তাদের কথা বলে যারা "জ্ঞান এবং ঈমান উভয়ের অধিকারী" (৩০:৫৬)। তারা হলেন যমজ নক্ষত্র যা মানুষের পথকে আলোকিত করে। তবে, পশ্চিমে, বিশ্বাস এবং যুক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব ইতিহাসের একটি ধারা। বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে যুদ্ধ (হোয়াইটের বিখ্যাত বইয়ের শিরোনাম) কয়েক শতাব্দী ধরে তার রক্তাক্ত পথ ধরে চলে আসছে। সম্প্রতি পশ্চিমা জনগণের উপর সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে যে যুক্তি এবং বিশ্বাস, পরস্পরবিরোধী নয়, একে অপরের প্রয়োজন এবং পাশাপাশি একে অপরকে টিকিয়ে রাখে। লক এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন: যে ব্যক্তি ওহীর পথ তৈরি করার জন্য যুক্তি কেড়ে নেয়, সে উভয়ের আলো নিভিয়ে দেয়। [১৬]

এটি মূলত কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি যা অনেক আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে এবং নবীর স্পষ্ট ঘোষণা দ্বারা শক্তিশালী করা হয়েছে। এখন এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে ওহীর উদ্দেশ্য যুক্তিকে দমন করা এবং অন্ধ বিশ্বাসকে এটিকে প্রতিস্থাপন করতে উৎসাহিত করা নয়। কোরআন কোথাও অন্ধ বিশ্বাসকে মহিমান্বিত করে না। যুক্তি, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে নিন্দা করা তো দূরের কথা, কোরআন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করে ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত চূড়ান্ত সত্যকে বোঝার এবং উপলব্ধি করার উপর জোর দেয়। ওহী যুক্তিকে পরিপক্কতায় পৌঁছাতে সাহায্য করে। এই পর্যায়ে পৌঁছে মানুষের মন কেবল জানেই না বরং দেখেও। এখানে দেখার অর্থ মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্টতা: যারা স্রষ্টার আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যখন শয়তানের কাছ থেকে একটি পরিবেষ্টিত প্রলোভন তাদের কাছে আসে, তারা ঐশ্বরিক নির্দেশনা স্মরণ করে এবং দেখো (সত্য) (৭: ২০১)।

অনেকে যুক্তির মাধ্যমে সত্য জানতে পারে কিন্তু যখন ঈমানের চোখে প্রতিচ্ছবি যুক্তির চোখে প্রতিচ্ছবিতে প্রতিচ্ছবি আরোপ করা হয় তখন তারা সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা "দেখে"। সত্যের এই স্পষ্ট উপলব্ধি মানুষকে শান্তি এবং চিরন্তন সুখের দিকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। এটি মানুষকে তার শরীরের চাহিদা এবং তার বাস্তব সত্তার চাহিদার মধ্যে একটি সুখী ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

ইসলামী জীবনধারার লক্ষ্য হল তার সকল দিকের মানব ব্যক্তিত্বের বিকাশ। মুমিন যখন এই উপলব্ধি করে, তখন নিজেকে স্রষ্টার হাতে সমর্পণ করে এবং তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা কামনা করে। কোরআন এই চুক্তির কথা উল্লেখ করে বলে: নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন এবং তাদের সম্পদ কিনে নিয়েছেন (৯:১১১)। যারা এই পৃথিবীতে সৎকর্ম করে তাদের জন্য (এখানে) উত্তম প্রতিদান রয়েছে এবং পরকাল আরও উত্তম হবে (১৬:৩০)।

মানুষের মনে কোরআন ঈমান স্থাপন করতে চায়—জীবনে এবং জীবনের পুনর্নবীকরণে ঈমান মৃত্যুর পর।

### *তথ্যসূত্র*


১.বার্ট্রান্ড রাসেল, পশ্চিমা দর্শনের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৩৪।

২.প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৩৪।

৩.সি.ই.এম. জোয়াড, নীতি ও রাজনীতির দর্শনের নির্দেশিকা, পৃষ্ঠা ২৩৯।

৪.সি.ই.এম. জোয়াড, অবক্ষয়, পৃষ্ঠা ৩৬।

৫.মার্টিন বুবার, বিটুইন ম্যান অ্যান্ড ম্যান, পৃষ্ঠা ১০৮।

৬.হেস্টিংস র‍্যাশডাল, দ্য থিওরি অফ গুড অ্যান্ড ইভিল, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৬।

৭.প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ২১১।

৮.প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ২১২।

৯.ই.এস. ব্রাইটম্যান, আ ফিলোসফি অফ রিলিজিয়ন, পৃষ্ঠা ২১১।

১০.এইচ. বার্গসন, দ্য টু সোর্স অফ রিলিজিয়ন অ্যান্ড মোরালিটি, পৃষ্ঠা। ২০১.

১১. আলবার্ট আইনস্টাইন, আউট অফ মাই লেটার ইয়ার্স, পৃষ্ঠা ২৫; ১২৪.

১২. সি.ই.এম. জোয়াড, দার্শনিক দিকসমূহ আধুনিক বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ২১৫.

১৩. ই. ক্যাসিরার, অ্যান এসে অন ম্যান পৃষ্ঠা ৯.

১৪. এইচ. র‍্যাশডাল, ওপি. সিট., পৃষ্ঠা ১৬.

১৫. প্রাগুক্ত., পৃষ্ঠা ২০৫; ২১৫-১৬.

১৬. জন লক, প্রবন্ধ বই, চতুর্থ (XIX, ৪), ব্রাইটম্যান কর্তৃক উদ্ধৃত, ওপি. সিট., পৃষ্ঠা ১০৪.

# অধ্যায় ৭
## ঐশ্বরিক আইনের কার্যকারিতা

**১. চুড়ান্ত শাসক হিসেবে একজন স্রষ্টা**

মানুষ তার মানসিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন উপায়ে স্রষ্টাকে কল্পনা করেছে। আদিম মানুষের স্রষ্টা সম্পর্কে স্থূল নৃতাত্ত্বিক ধারণা আজকের ধর্মীয় চিন্তাবিদদের বিমূর্ত ধারণার সরাসরি বিপরীত। তবে, আমরা এই ভিত্তিতে যুক্তি দিতে পারি না যে স্রষ্টা মানুষের মনের মধ্যে একটি নিছক ধারণা হিসাবে বিদ্যমান। আমাদের বিশ্ব ধারণাও একই রকম পরিবর্তন প্রদর্শন করেছে। বর্বররা বিশ্বকে কৌতুকপূর্ণ আত্মাদের খেলার মাঠ হিসাবে দেখেছিল, অন্যদিকে আধুনিক পদার্থবিদরা এটিকে বিভিন্ন উপায়ে গোষ্ঠীবদ্ধ ক্ষণস্থায়ী ঘটনার অসীমতায় বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্বের অসংখ্য ধারণা এই চরমগুলির মধ্যে হস্তক্ষেপ করে। তবুও কেউ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে না যে পৃথিবী কেবল একটি ব্যক্তিগত ধারণা হিসাবে বিদ্যমান। উভয় ক্ষেত্রেই, আমরা একটি বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতার ধারণা প্রত্যক্ষ করছি। তার জ্ঞান এবং মানসিক শক্তির ধীরে ধীরে বিকাশের সাথে, মানুষ তার ধারণাগুলিকে বাহ্যিক বাস্তবতার সাথে ঘনিষ্ঠ সঙ্গতিতে নিয়ে আসে। স্রষ্টার সাথে তার সাক্ষাৎ সরাসরি এবং তাৎক্ষণিক। সে সহজাতভাবে বিশ্বাস করে যে উভয়ই তার থেকে স্বাধীনভাবে বিদ্যমান। কিন্তু প্রথমে স্রষ্টা সম্পর্কে তার ধারণা বিশ্ব সম্পর্কে তার ধারণার মতোই অসম্পূর্ণ এবং অপূর্ণ। সে কখনও স্রষ্টা বা বিশ্বের একটি সম্পূর্ণ নিখুঁত ধারণায় পৌঁছাতে পারে না, এবং তবুও এই দিকে তার প্রচেষ্টা কখনও থামে না এবং সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক হয় না। স্রষ্টার ক্ষেত্রে, প্রকাশিত বাক্য আমাদের এমন একটি ধারণা গঠনে সাহায্য করে যা আমাদের বৌদ্ধিক এবং নৈতিক জীবনের চাহিদা পূরণ করে। আমরা যদি প্রথমে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করি যা অতীতে সাধারণত গৃহীত হত এবং এখনও আমাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে রঙ দেয়, তাহলে এই ধারণাটি আমাদের স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে।

যুগ যুগ ধরে মানুষ রাজতান্ত্রিক সরকারের অধীনে বাস করত। অন্য কোনও ধরণের রাজনৈতিক সংগঠন না জেনে, তারা স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করত যে রাজতন্ত্রের একমাত্র বিকল্প হল নৈরাজ্য এবং অনাচার। রাজারা সাধারণত অত্যাচারী, নিপীড়ক এবং কৌতুকপ্রবণ ছিলেন। যদি কোনও রাজা তার নিপীড়িত প্রজাদের ক্রোধের শিকার হন, তবে তার স্থান সাধারণত একজন অত্যাচারী দ্বারা দখল করা হত যিনি আরও খারাপ হতে পারেন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে লালিত-পালিত মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাকে ইচ্ছাকৃততা এবং কৌতুকের সাথে যুক্ত করত। স্রষ্টাকে সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করে, তারা আরও বিশ্বাস করত যে তিনি যে কোনও পার্থিব রাজার চেয়ে বেশি ইচ্ছাকৃত এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং তাঁর কর্মকাণ্ড একজন স্বৈরশাসকের মতোই জবাবদিহির অযোগ্য। সংক্ষেপে, স্রষ্টাকে একজন মহিমান্বিত রাজা হিসেবে

গণ্য করা হত, অথবা বরং একজন মহিমান্বিত একনায়ক হিসেবে। তিনি পার্থিব স্বৈরশাসকদের থেকে কেবল অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রেই ভিন্ন ছিলেন, অন্য কোনও ক্ষেত্রেই নয়। অপরিণত মনের মানুষ ক্ষমতা দ্বারা প্রভাবিত হন, বিশেষ করে যখন তা ক্ষণিকের ইচ্ছা পূরণের জন্য ব্যবহার করা হয়। তারা মনে করে যে স্রষ্টা ভালো বা মন্দ যে কাউকে ধ্বংস করেন, তাঁর পরম ক্ষমতা প্রদর্শনের চেয়ে ভালো আর কোনও কারণ নেই। এই ধরনের লোকদের প্রধান ব্যস্ততা ছিল স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করা যেমন তারা কল্পনা করেছিলেন, তবুও তারা এমন কোনও কর্ম পরিকল্পনার কথা ভাবতে পারেনি যা সর্বদা একজন সম্পূর্ণ কৌতুকপূর্ণ সত্তাকে সন্তুষ্ট করতে সফল হবে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে মানুষ অসহায় বোধ করেছিল। তারা যুক্তির মাধ্যমে এমন একটি জীবনযাত্রা আবিষ্কার করতে হতাশ হয়েছিল যা স্রষ্টার ইচ্ছা অনুসারে হবে, কারণ তারা বিশ্বাস করত যে স্রষ্টা স্বেচ্ছাচারীভাবে কাজ করেন এবং যুক্তির তাঁর কর্মের উপর কোনও প্রভাব নেই।

নিঃসন্দেহে মানুষ এমন একজন স্রষ্টাকে ভয় করত কিন্তু তারা তাকে ভালোবাসতে এবং শ্রদ্ধা করতে পারত না। স্রষ্টার এই ধারণাটি জীবনের একটি উন্নততর পথ অনুসন্ধান করার জন্য বা তারা যে পৃথিবীতে বাস করত তা বোঝার জন্য কোনও উৎসাহ দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে, অন্য কোনও জীবনযাত্রার চেয়ে ভালো আর কোনও জীবনধারা হতে পারে না - কারণ একই কাজ একসময় স্রষ্টাকে খুশি করতে পারে এবং অন্য সময়ে তাঁর ক্রোধের কারণ হতে পারে। তারা দেখেছিল যে হঠাৎ করেই কোনও কল্পনা একজন স্বৈরশাসককে এমন একজন ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে এবং যিনি অবাধ্য ছিলেন তাকে পুরস্কৃত করতে প্ররোচিত করতে পারে। এমন একটি পৃথিবীকে বোঝার চেষ্টা করারও প্রশ্নই ওঠে না যা স্বেচ্ছাচারী উপায়ে অস্তিত্বে আনা হয়েছিল। এর কোনও আইন বা শৃঙ্খলা, কোনও ছন্দ বা যুক্তি থাকতে পারে না। সর্বোপরি, এটি হতাশজনক ঘটনার দৃশ্য হবে যা পূর্বাভাস বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

স্রষ্টা একজন পরম স্বৈরশাসক এই ধারণার প্রভাব এই রকম। এই ধারণা বর্বরদের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। জ্ঞান এবং মানসিক শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে, তার চারপাশের ঘটনাগুলির সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতা তৈরি হতে পারে।

মানুষও মুগ্ধ হতে পারে না। ধীরে ধীরে তিনি বাহ্যিক জগতের প্রাকৃতিক ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলি অনুসন্ধান এবং আবিষ্কার করেন। অনেক পরে, তিনি মনের অভ্যন্তরীণ জগতের দিকে মনোযোগ দেন এবং এই প্রক্রিয়ায়, অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সামঞ্জস্যগুলি আবিষ্কার করেন। তবে, মানুষ ধর্মের ক্ষেত্রে অনেক বেশি রক্ষণশীল। স্রষ্টার পুরাতন ধারণা, একটি ক্ষীণ আকারে, এখনও ধর্মীয় মানুষের মনে রয়ে গেছে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্পষ্ট করে তোলে। ধর্মকে মুক্ত করার কাজ হল আমাদের মন থেকে এই ধারণাটি সরিয়ে ফেলা এবং ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ (কোরআন) দ্বারা উপস্থাপিত

ধারণাটি গ্রহণ করা। তবে, এই নতুন ধারণাটি উপলব্ধি করার জন্য, ঐশ্বরিক ইচ্ছার কয়েকটি দিক সম্পর্কে কিছু চিন্তা করা প্রয়োজন। স্রষ্টার ইচ্ছার অসীম দিক রয়েছে, তবে এর মধ্যে তিনটি নৈতিক সত্তা হিসেবে আমাদের কাছে বিশেষ আগ্রহের বিষয়। আমাদের যা বলতে হবে তা সম্পূর্ণরূপে কোরআনের উপর ভিত্তি করে তৈরি যেখানে ঐশ্বরিক ইচ্ছা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর কাজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা কেবল কোরআনে বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করব যে স্রষ্টার ইচ্ছা নিজেই কীভাবে কাজ করে এবং সৃষ্ট জগতের দুটি প্রধান অংশের সাথে সম্পর্কিত।

**২. কোরআন অনুসারে ঐশ্বরিক ইচ্ছা**

প্রথমত, ঐশ্বরিক ইচ্ছা যেমন আছে তেমনই বিবেচিত হবে, অন্য কথায়, বিশুদ্ধ ইচ্ছা হিসেবে। ঐশ্বরিক ইচ্ছা সম্পর্কে আমরা কি এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারি যে এটি আমাদের নিজেদের মধ্যে যে ইচ্ছা অনুভব করে তার থেকে আমূল আলাদা হতে হবে? উত্তর হল, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে, আমরা কোরআনের সাহায্যে এটিকে চিহ্নিত করতে পারি। ঐশ্বরিক ইচ্ছা সম্পর্কে আমরা প্রথমেই যা লক্ষ্য করি তা হল এটি সম্পূর্ণ স্বাধীন, বাইরে থেকে কোনও বাধার অধীন নয়। আবার, এটি অবিরাম এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সক্রিয়, উদ্দীপনা বা তার কার্যকলাপের জন্য কোনও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল নয়। এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এটি কেবল এটিকে গঠন এবং পুনর্বিন্যাস করার জন্য নিজেকে সীমাবদ্ধ করে এমন কোনও পূর্ব-বিদ্যমান উপাদানের উপর কাজ করে না। এর কার্যকলাপ মূলত সৃজনশীল। প্রকৃতপক্ষে, এটি সৃজনশীল শক্তির উৎস। একটি ঝর্ণাধারা হিসেবে, এটি সৃজনশীল শক্তিতে সদা উচ্ছ্বসিত। প্রতিটি মুহূর্তেই তার ইচ্ছায় অস্তিত্বে বসন্ত তৈরি হয়:

কিন্তু তাঁর আদেশ, যখন তিনি কোন জিনিসের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি কেবল তাকে বলেন: হও, এবং তা হয়ে যায় (৩৬: ৮২)। আবার:আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন (১৪: ২৭)। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন (২২: ১৪)।

স্রষ্টার ইচ্ছা এই অর্থেও স্বাধীন যে এটি আইনের ঊর্ধ্বে। এটি নিজেই একটি আইন। এটি কোনও বাহ্যিক মানদণ্ড দ্বারা বিচার করা যায় না। অবশ্যই, আইন এটি থেকে প্রবাহিত হয় এবং এর সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু এটিকে অক্ষত রাখে। তাই প্রশ্ন, কেন এবং কেন, ঐশ্বরিক ইচ্ছা সম্পর্কে বৈধভাবে জিজ্ঞাসা করা যাবে না। এটি নিজের বাইরের কারও কাছে জবাবদিহি করে না: তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না, তবে তাদের (মহাবিশ্বের সবকিছু) জিজ্ঞাসা করা হবে (২১: ২৩)।

বিশুদ্ধ ইচ্ছার ক্ষেত্র হল পরম স্বাধীনতার ক্ষেত্র। আইনের অধীনে আনা মানে স্রষ্টার সৃজনশীল স্বাধীনতা এবং সর্বশক্তিমানতা কেড়ে নেওয়া এবং তাঁকে একজন সৃষ্ট সত্তার মর্যাদায় নামিয়ে আনা। তাঁর সৃজনশীল

কার্যকলাপের প্রকৃতির দিকে ফিরে গেলে আমরা দেখতে পাই যে এটি আত্মপ্রকাশের মধ্যেই নিহিত। সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক ইচ্ছা আসলে নিজেকে প্রকাশ করছে। তার সত্তার অসীম আধার থেকে, স্রষ্টার ইচ্ছা অবিরামভাবে অসংখ্য রূপকে প্রকাশ এবং টিকিয়ে রাখছে যা বাস্তবতাকে কিছুটা পরিমাণে ভাগ করে নিচ্ছে এবং কিছুটা পরিমাণে আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করছে যা তাদের উৎসকে চিহ্নিত করে। সৃষ্টিকে আত্মপ্রকাশের একটি ক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করে, আমরা অনেক প্রশ্ন থেকে মুক্তি পাই যা পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মনকে ব্যথিত করেছিল যেমন: সৃষ্টিতে স্রষ্টার উদ্দেশ্য কী ছিল? কী তাঁকে সৃষ্টি করতে প্ররোচিত করেছিল? ইত্যাদি। নিজেকে প্রকাশ করা অহংকার প্রকৃতির, এবং স্রষ্টা যেহেতু পরম অহংকার, তাই তাঁর ক্ষেত্রে, আত্মপ্রকাশের প্রতিটি ক্রিয়া একই সাথে সৃষ্টির একটি ক্রিয়া। আত্মপ্রকাশের কারণ এবং ন্যায্যতা সংশ্লিষ্ট সত্তার মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে, বাইরে নয়। ঐশ্বরিক ইচ্ছাকে একটি নৈর্ব্যক্তিক শক্তি হিসেবে দেখা ভুল। ইচ্ছাশক্তি কেবল কিছু অহংকারের একটি দিক হিসেবেই বিদ্যমান থাকতে পারে। ঐশ্বরিক ইচ্ছাশক্তি আসলে স্রষ্টা তাঁর সত্তার অসীম সম্পদ প্রকাশে নিযুক্ত।

সৃষ্টির পর, ঐশ্বরিক ইচ্ছাশক্তি সরে যায় না এবং সৃষ্ট জগৎকে নিজের জন্য পরিবর্তন করতে দেয় না। আঠারো শতকের পুরোহিতরা এই ধরণের কিছু দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে ছিলেন। তবে, এটি স্রষ্টা এবং বিশ্বের মধ্যে সম্পর্কের ভুল ধারণা থেকে উদ্ভূত। এই সম্পর্কটি কোনওভাবেই যান্ত্রিক যন্ত্রের উৎপাদক এবং তার পণ্যের মধ্যে সম্পর্কের অনুরূপ নয়। প্রথমত, ঐশ্বরিক ইচ্ছাশক্তির কার্যকলাপ বিরতিহীন নয়: এটি অবিরাম। দ্বিতীয়ত, ইচ্ছাশক্তি কেবল বিশ্ব সৃষ্টি করে না বরং এটিকে টিকিয়ে রাখে এবং লালন-পালন করে।

এগুলি বিচ্ছিন্ন কার্যকলাপ নয় বরং একই যৌগিক, অবিচ্ছেদ্য কার্যকলাপের দিক। এইভাবে কল্পনা করা হলে, ঐশ্বরিক ইচ্ছাশক্তিকে জৈবিক এবং প্রাণবন্তভাবে সেই জগতের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয় যা আক্ষরিক অর্থেই স্রষ্টার মধ্যে বিদ্যমান এবং বাস করে, যিনি সমস্ত সত্তার উৎস এবং সমস্ত জীবনের উৎস। অতএব, পৃথিবী এবং এর মধ্যে থাকা সমস্ত জিনিস ভিন্ন। অস্তিত্বের প্রতিটি মুহূর্তে ইচ্ছাশক্তির সাথে সরাসরি এবং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। পৃথিবীতে দুটি ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী রয়েছে: নৈর্ব্যক্তিক জড় বস্তু এবং সচেতন এবং স্ব-নির্ধারক অহংকার। ঐশ্বরিক ইচ্ছাশক্তি দুটি শ্রেণীর প্রাণীর সাথে বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত, কারণ প্রত্যেকেরই আলাদা ধরণের সমর্থন প্রয়োজন। কোরআন এই সম্পর্কগুলিকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। ইকবালের মধ্যে, আমরা খালক এবং আমরের মধ্যে কোরআনের পার্থক্যের একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাই। তার নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি এই বিষয়টির উপর মূল্যবান আলোকপাত করে: 'আমর' শব্দের অর্থ বোঝার জন্য, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কোরআন 'আমর' এবং 'খালক' এর মধ্যে যে পার্থক্য তুলে ধরেছে। প্রিংল-প্যাটিসন দুঃখ প্রকাশ করেন যে ইংরেজি ভাষায় কেবল একটি শব্দ রয়েছে - 'সৃষ্টি' - একদিকে স্রষ্টা এবং সম্প্রসারণের মহাবিশ্বের সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্য এবং অন্যদিকে স্রষ্টা এবং

মানুষের অহংকারের সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্য। তবে, আরবি ভাষা এই দিক থেকে আরও ভাগ্যবান। এর দুটি শব্দ আছে - 'খালক' এবং 'আমর' - স্রষ্টার সৃজনশীল কার্যকলাপ আমাদের কাছে যে দুটি উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করে তা প্রকাশ করার জন্য। 'খালক' হল সৃষ্টি এবং 'আমর' হল নির্দেশনা। ১

আসুন আমরা এই সম্পর্কগুলিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখি:

**(ক) ঐশ্বরিক ইচ্ছা এবং অলৌকিক জগৎ**

ঐশ্বরিক ইচ্ছার উপর প্রকৃতির নির্ভরতা পরম এবং শর্তহীন। প্রকৃতি জুড়ে নিয়তিবাদ বিরাজ করে। প্রতিটি ভৌত বস্তুকে কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যা তার গতিবিধি এবং অন্যান্য বস্তুর সাথে তার সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করে। তদুপরি, সমস্ত বস্তুগত জিনিস অদম্য প্রাকৃতিক আইনের দৃঢ় মুঠোয় আটকে আছে। এই আইনগুলি ঐশ্বরিক ইচ্ছা থেকে প্রবাহিত হয় এবং প্রকৃতিতে আমরা যে অপরিবর্তনীয় শৃঙ্খলা পাই তার নীচে অবস্থিত। এটি একটি সুশৃঙ্খল জগৎ কারণ ঐশ্বরিক ইচ্ছা এতে একটি নিয়ন্ত্রণকারী এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করে। প্রাকৃতিক আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে পারে না কিছুই। সবকিছুর আচরণ আইন দ্বারা কঠোরভাবে নির্ধারিত হয়। অবাধ্যতা অসম্ভব। এই আইনগুলি পূর্বনির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়। এটি এমন একটি জগৎ যেখানে স্বাধীনতার কোন অর্থ নেই। এটি এমন একটি পৃথিবী যা একটি নিঃশর্ত "অবশ্যই" দ্বারা শাসিত। সবকিছুই তার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং এটিকে পরিচালিত আইনের আনুগত্য করে আচরণ করে। নিজের উপর ছেড়ে দিলে, জলকে নীচের দিকে প্রবাহিত হতে হবে এবং উষ্ণ বায়ু উপরে উঠতে হবে। গ্রহগুলিকে তাদের নির্ধারিত কক্ষপথে চলতে হবে এবং মেঘগুলিকে হালকা ঘনত্বের বায়ুমণ্ডলীয় অঞ্চলগুলি সন্ধান করতে হবে। আইনের আধিপত্য এমনকি বজ্রপাত এবং ভূমিকম্পের মতো আপাতদৃষ্টিতে আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক এবং বিপর্যয়কর ঘটনাগুলিতেও বিস্তৃত। কোরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে আমাদের দৃষ্টি আইনের শাসন এবং প্রকৃতির দ্বারা প্রদর্শিত শৃঙ্খলার দিকে আকর্ষণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক ঘটনার নিয়মিততা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এই নিয়মিততা হল ঐশ্বরিক ইচ্ছার প্রতিফলন যা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বা অসঙ্গতির কোনও চিহ্ন থেকে মুক্ত। এবং আল্লাহর কাছে সিজদা করে (তাঁর আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করে) যা কিছু আসমানে আছে এবং যা কিছু জমিনে আছে জীবন্ত প্রাণী (১৬: ৪৯)।

অতএব, কোরআনের ভাষায়, আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোনও বস্তু নেই যা তাঁর ইচ্ছা এবং তাঁর নির্ধারিত আইনের অধীন নয়।

মানুষ তার যুক্তি ব্যবহার করে প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করতে পারে এবং এই জ্ঞানে সজ্জিত হয়ে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে। একটি আইনসম্মত এবং সুশৃঙ্খল পৃথিবী হল মানুষের মতো একজন যুক্তিবাদী সত্তার জন্য তার ভূমিকা পালন করার এবং তার লক্ষ্য

অর্জনের জন্য উপযুক্ত পর্যায়। মানুষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে জীবনযাপন করতে পারে এবং কেবল এমন একটি পৃথিবীতেই তার আত্মতৃপ্তি অর্জন করতে পারে যা সে বুঝতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। নিম্নলিখিত আয়াতটি আমাদের বলে যে পৃথিবী একটি মুক্ত যুক্তিবাদী সত্তার জন্য উপযুক্ত স্থান: এবং তিনি রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে আপনার সেবা করার জন্য সীমাবদ্ধ করেছেন, এবং তারাগুলি তাঁর আদেশের অধীনস্থ করা হয়েছে (১৬:১২)।

প্রকৃতির উপর বিজয় তাই কোনও কল্পনা নয় বরং মানুষের জন্য একটি অর্জনযোগ্য লক্ষ্য। সে পৃথিবীকে বুঝতে পারে কারণ এর দ্বারা প্রদর্শিত শৃঙ্খলা বোধগম্য এবং একই কারণে সে এটিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের দ্বারা গৃহীত মহান অগ্রগতি এই সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে পৃথিবী মানুষের যুক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য। তিনি যখন অবিরামভাবে বিশ্ব অন্বেষণ করেন এবং এর প্রকৃতি অনুসন্ধান করেন, তখন তিনি এর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মের লুকানো দিকগুলি আলোকিত করেন। প্রকৃতির কোনও অংশই যুক্তির অধীন নয় বলে প্রমাণিত হয়নি। বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক অগ্রগতি প্রকৃতির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি এবং প্রসারিত করেছে। মহাকাশে প্রবেশ, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে অনুসন্ধান এবং পারমাণবিক বিভাজনের আবিষ্কার হল দুর্দান্ত সাফল্য যার জন্য মানুষ যথাযথভাবে গর্ব করতে পারে। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় হল যে ক্ষুদ্রতম কণা এবং সেইসাথে বিশাল আকারের স্বর্গীয় বস্তুগুলিও স্থির নিয়মের অধীন এবং এই নিয়মগুলি আবিষ্কার করে মানুষ তাদের আচরণ নির্ভুলতার সাথে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম। নিঃসন্দেহে, আধুনিক পদার্থবিদরা, যেমন নীলস বোর, সন্দেহ করেন যে পরমাণুর হৃদয় অনিশ্চয়তার দুর্গ হতে পারে। এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে লাফ দেওয়ার সময় ইলেকট্রনের আচরণ এখনও অপ্রত্যাশিত এবং কোনও আইনের অধীন বলে মনে হয় না।
তবুও, এটিকে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া তাড়াহুড়ো হবে। পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার অগ্রগতি এবং আরও উন্নত যন্ত্র আবিষ্কারের সাথে সাথে, ইলেকট্রনের আচরণের উপর নির্ভরশীল আইনগুলি আবিষ্কৃত হতে পারে এবং অনির্দিষ্টতা তার শেষ দুর্গ থেকে বিতাড়িত হতে পারে। যাই হোক, মানুষ, তার ব্যবহারিক জীবনে, মোলার বস্তুগুলির সাথে মোকাবিলা করতে হয়, এবং কেউ এখনও সন্দেহ করে না যে তারা অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক আইনের অধীন। যখন পদার্থবিদরা সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন যে অনির্দিষ্টতা পরমাণুর মূলে অবস্থিত, তখন মানুষের উপর এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব তার সমস্ত প্রভাবের মধ্যে বিবেচনা করা হবে। এই মুহূর্তে, আমরা কেবল এই অনুমানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি যে স্বাধীনতা মহাবিশ্বের মূলে থাকলেও, পদার্থ গঠনের সময় এটি দীর্ঘস্থায়ী সময়ের মধ্যে প্রবেশ করে, কেবল মানুষের আবির্ভাবের সাথে সাথে আবার প্রস্ফুটিত হয়।

**(খ) ঐশ্বরিক ইচ্ছা এবং মানুষ**

মানুষের ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক ইচ্ছা কীভাবে কাজ করে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে, আমাদের মানুষের দ্বৈত প্রকৃতিকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। দেহ ধারণের কারণে, মানুষ ভৌত জগতের একটি অংশ। তাই, সে অন্য যেকোনো ভৌত বস্তুর মতোই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। জন্ম ও মৃত্যু প্রাকৃতিক ঘটনা, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং এগুলি প্রকৃতির নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সে একটি অহংকার বা স্বত্বা দ্বারাও সমৃদ্ধ, এবং স্বাধীনতা হল এর জীবনের নিঃশ্বাস। পছন্দের স্বাধীনতা আত্মার মধ্যে অন্তর্নিহিত। বিকল্পগুলি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা তার। ঐশ্বরিক ইচ্ছা মানুষকে এমন একটি স্বাধীনতা প্রদান করেছে যা একটি যুক্তিসঙ্গত দায়িত্বশীল সত্তা হিসেবে তার চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট। অবশ্যই, এই স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এটি একটি সীমাবদ্ধ সত্তার জন্যও তাই হতে হবে: কিন্তু যতদূর তার কর্ম নির্ধারিত হয়, কোনও বাহ্যিক সংস্থা দ্বারা নয়, এমনকি তার সত্তার একটি অংশ দ্বারাও নয়, বরং তার সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদ্য সত্তা দ্বারা (যা মূলত যুক্তিসঙ্গত), সে স্বাধীনভাবে কাজ করছে এবং নিজেকে প্রকাশ করছে। এটি সেই স্বাধীনতা যা মানুষের দাবি করার অধিকার রয়েছে এবং যা ঐশ্বরিক ইচ্ছা তাকে দিয়েছে। এটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি। সে কেবল এমন একটি সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশে তার পূর্ণ মর্যাদায় উঠতে পারে যেখানে তার অধিকারের স্বাধীনতার উপর কোনও বাধা নেই। তবে এই পরিবেশের অর্জন এখনও মানবতার হাতছাড়া। ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন, কেউ কেউ প্রায় অসম্ভব বলবেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা তৈরি করার চেষ্টা করে আসছে যা উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে। সে বিভিন্ন ধরণের সরকার এবং বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সংগঠন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছে। অনুসন্ধান এখনও চলছে, তবে আমরা সত্যিকার অর্থে স্বাধীন সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্থিতিশীল এবং প্রগতিশীল সমাজের বিস্তৃত রূপরেখা বুঝতে পারি। এই অনুসন্ধানে আমরা যুগ যুগ ধরে ঐশ্বরিক নির্দেশনার পথপ্রদর্শক এবং সহায়ক হাতকেও বুঝতে পারি।

ভৌতিক জগতে, ঐশ্বরিক ইচ্ছা একটি সীমাবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসেবে কাজ করে। কোরআনের "খালক" শব্দটি ইচ্ছার কাজের এই দিকটিকে বোঝায়। অন্যদিকে, স্বায়ত্তশাসিত অহংকারের জগতে, এটি নির্দেশনার কাজ করে। এটি তাদের জন্য কী সর্বোত্তম তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাদের স্বাধীন ছেড়ে দেয়, তবে তাদের ডান বা ভুল দিকে মোড় নেওয়ার সমান সুযোগ সহ অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে দেওয়া হয় না। তাদের কোন দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত তার একটি ইঙ্গিত তাদের দেওয়া হয়েছে। তবে তারা যেভাবে ইচ্ছা হেদায়েত গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে স্বাধীন। কোরআন এই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছে: সত্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। অতএব যে ইচ্ছা তা গ্রহণ করুক, আর যে ইচ্ছা তা প্রত্যাখ্যান করুক (১৮:২৯)।

যাইহোক, মানুষ স্বাধীন হলেও প্রতিফল আইনের অধীন। প্রতিটি কর্মই কর্তাকে আঘাত করে। সঠিক কর্মের এমন পরিণতি রয়েছে যা মানুষের জন্য উপকারী এবং তার আত্মাকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে। ভুল

কর্ম সর্বদা তাকে দুর্বল ও অপমানিত করে। সঠিক কর্ম আত্ম-সিদ্ধির লক্ষ্যে তার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে, অন্যদিকে ভুল কর্ম তাকে নিম্ন স্তরে টেনে নিয়ে যায়। সুতরাং, মানুষ ভুল পথে কাজ করার জন্য স্বাধীন কিন্তু সে অন্যায়ের শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে না। যদি কেউ ভুল বেছে নেয় তবে তাকে তার পরিণতি ভোগ করতে হবে। স্রষ্টার অন্যান্য আইনের মতো আইনও তার কাজ করার ক্ষেত্রে অবিচল, এবং মানুষ তার নিজের কর্মের ফলাফল এড়াতে পারে না। যেমন কোরআন বলে: সত্যিই, তোমার রবের পাকড়াও কঠোর (৮৫:১২)।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ অসংখ্য সম্ভাবনার মুখোমুখি হয়, যার প্রতিটিই কোরআনের পরিভাষায় "তাকদীর"। তার স্বাধীনতা কেবল তার সামনে খোলা সম্ভাবনার সংখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সে যেকোনো একটি বেছে নিতে স্বাধীন, কিন্তু সে তার সীমার বাইরে যেতে পারে না। সে নিজেও সম্ভাবনার পরিধি বাড়াতে পারে না। সে নির্ধারিত সীমার মধ্যে স্বাধীনতা উপভোগ করে কিন্তু এর বাইরে নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, মানুষকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং যে ভাগ্যের অধীন হওয়ার কথা, তার মধ্যে স্পষ্ট দ্বন্দ্ব অদৃশ্য হয়ে যায়। ভাগ্যকে এই অর্থে বোঝা উচিত নয় যে মানুষের প্রতিটি কাজ পূর্বনির্ধারিত এবং পূর্বনির্ধারিত। কোরআন এই বিশ্বাসকে সমর্থন করে না যে মানুষ কী হয় - একজন সাধু বা খলনায়ক - তার স্বাধীন পছন্দের উপর নির্ভর করে না বরং একজন নৈর্ব্যক্তিক অদম্য ব্যক্তির আদেশের উপর নির্ভর করে।

কোরআনের মাপকাঠিতে ভাগ্য, নিয়তি প্রয়োজনীয়তার (অথবা সাধারণভাবে বলা হয় মৃত্যু) সমার্থক শব্দ নয়; এটি কেবল তার ক্ষমতার পরিধি এবং নাগাল নির্দেশ করে। এটি নির্দেশ করে যে সে কোন দিকে যেতে পারে। সে যতদূর যেতে পারে তা তার নিয়তির দ্বারা নির্ধারিত হয়; সে কতদূর যেতে পারবে তা কেবল তার নিজের উপর নির্ভর করে। স্রষ্টা মানুষকে তার লক্ষ্য কী হওয়া উচিত তা নির্দেশ করেন না; তিনি কেবল তাকে তার নিজের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টায় সাহায্যকারী হাত দেন। ইকবাল এই সম্পর্ককে অপূর্ব সৌন্দর্যের একটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন। আমরা এর কয়েকটি লাইনের অনুবাদ দিচ্ছি: অহংকারের নিয়তির রহস্য এই শব্দগুলিতে উন্মোচিত হয়েছে 'যদি তুমি পরিবর্তন হও, তোমার সাথে তার সম্পর্কও পরিবর্তিত হয়।

যদি তুমি ধুলোর মতো অনুভব করো, তাহলে তা তোমাকে বাতাসের কাছে নিক্ষেপ করে। তুমি কি পাথর হতে চাও? এটি তোমাকে কাচের পাত্রে ছুঁড়ে মারে। তুমি কি শিশিরের বিন্দু? তুমি কি নীচে পড়ার জন্য নির্ধারিত। তুমি কি সমুদ্র হয়ে যাবে? স্থায়ীত্বই তোমার নিয়তি।' [২]

অতএব, আমরা দেখতে পাই যে মুক্ত অহংকারের ক্ষেত্রে, ঐশ্বরিক ইচ্ছা একটি নির্দেশিকা সংস্থা, একটি পথপ্রদর্শক শক্তি হিসেবে কাজ করে। কোরআন ঐশ্বরিক ইচ্ছার এই কাজটিকে "আমর" হিসেবে চিহ্নিত

করেছে। যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি যে এই নির্দেশনা আমাদের জন্য কোন আকারে উপলব্ধ করা হয়েছে, তাহলে কোরআন উত্তর দেয় যে এটি ওহীতে দেওয়া হয়েছে: এটি আল্লাহর "আমর" যা তিনি তোমাদের কাছে অবতীর্ণ করেছেন (৬৫:৫)।

ভৌত জগৎ অনমনীয় আইনের অধীন যা "খালক" এর দিক থেকে ঐশ্বরিক ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে; "আমর" হল নৈতিক আইনের উৎস যার অর্থ রয়েছে এবং শুধুমাত্র একটি স্বাধীন আত্মার উপর বাধ্যতামূলক। "আমর" এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে কাজ করে, মানুষ মূল্যবোধ তৈরি করে এবং সেগুলিকে আত্মসাৎ করে। যখন সে মারা যায়, তখন মানুষ তার পার্থিব জীবনে উপলব্ধ মূল্যবোধগুলিকে ত্যাগ করে না। এগুলি বহন করা হয় এবং আত্মার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ থেকে যায়, এটিকে কাজ করার জন্য উপযুক্ত করে তোলে। অস্তিত্বের যে ভিন্ন স্তরে এটি প্রবেশ করেছে। মূল্যবোধগুলি অবিনশ্বর। স্রষ্টা কেবল তাদের রক্ষা করেন না এবং রক্ষা করেন না বরং তাদের বৃদ্ধি করেন সেই অহংকারকে কাজে লাগান যা তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে তৈরি করেছে।

### ৩. স্রষ্টার বিষয়ে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

এভাবে এটা স্পষ্ট যে স্রষ্টা, যেমনটি কোরআনে কল্পনা করা হয়েছে, একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা ইচ্ছাকৃত স্বৈরাচারী শাসক থেকে অনেক আলাদা। অবশ্যই, স্রষ্টা সর্বশক্তিমান এবং তাঁর ইচ্ছা, তার সৃজনশীল কার্যকলাপে, কোনও বাহ্যিক আইন বা নিয়মের অধীন বা সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর ইচ্ছা কোনও অন্ধ শক্তি নয়, ভয়ঙ্কর এবং অপ্রতিরোধ্য, যা মহাবিশ্বের উপর ছড়িয়ে পড়ে, তার ঝড়ো গতিতে সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। এটি একজন সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানী, করুণাময় এবং দানশীল সত্তার ইচ্ছা। তাই, এটি প্রজ্ঞা এবং মঙ্গল, করুণা এবং দানশীলতার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। সংক্ষেপে, ঐশ্বরিক ইচ্ছার অস্তিত্ব নেই এবং বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে। এটি ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্বের একটি দিক। স্রষ্টার জন্য "ব্যক্তিত্ব" শব্দটি প্রয়োগ করা অহংকার বলে মনে হতে পারে তবে অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যে অনন্য ঐক্যের জন্য উপযুক্ত অন্য কোনও শব্দ নেই যা স্রষ্টা। এই ঐক্য অতিপ্রাকৃত এবং আমাদের সীমাবদ্ধ মনের কাছে বোধগম্য নয়, তবে এর অসীম দিকগুলির কয়েকটি আমাদের ইন্দ্রিয় এবং যুক্তির কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য।

সংক্ষেপে, তিনটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র রয়েছে যার প্রতিটিতে স্রষ্টার ইচ্ছা ভিন্নভাবে কাজ করে। "আমর" এর ক্ষেত্রে, এটি কোনও আইনের অধীন নয়: এটি নিজেই একটি আইন। তিনি যে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, সেখানে তাঁর ইচ্ছা অপরিবর্তনীয় আইনের আকার ধারণ করে যার অধীনে সমস্ত ভৌত প্রাণী থাকে। এই আইনগুলিকে - প্রকৃতির আইনগুলিকে - কোরআনের পরিভাষায় "কালিমাত উল্লাহ" বলা হয় এবং যেমনটি ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে, অপরিবর্তনীয়। "আল্লাহর কালেমাতে কোনও পরিবর্তন নেই" (১০: ৬৪)। এই আইনগুলির অপরিবর্তনীয়তা এবং অপরিবর্তনীয়তাই বিজ্ঞানের সমগ্র ভবন এবং ভৌত জগতের ক্ষেত্রে

আমরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করি তা প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সত্তা হিসেবে মানুষের ক্ষেত্রে, তার সত্তার বিকাশকে নিয়ন্ত্রণকারী আইনও রয়েছে, তবে মানুষ সেগুলি মানতে বা তাদের বিরুদ্ধে যেতে স্বাধীন। এই ক্ষেত্রে, মানুষের ইচ্ছা কাজ করে। এখানে উদ্যোগ মানুষের উপর নির্ভর করে এবং ইকবালের ভাষায়, "যখন আমার জন্য একাধিক কর্মপন্থা খোলা থাকে তখন স্রষ্টা নিজেই অনুভব করতে, বিচার করতে এবং আমার জন্য বেছে নিতে পারেন না। ব্যক্তিগত উদ্যোগে সক্ষম একটি সীমিত অহংকারের উত্থানের অনুমতি দিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছার স্বাধীনতাকে সীমিত করেছেন।"[৩]

অতএব ইসলামে ভাগ্যবাদের কোনও স্থান নেই। মানুষ নিজের জন্য যে পথ পছন্দ করে তা বেছে নিতে স্বাধীন। এই বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা হয়ে গেলে, তার স্বাধীনতা শেষ হয়ে যায়। ফলাফল গৃহীত পথের সাথে সম্পর্কিত। সে একটি পছন্দ করতে এবং অন্যটির ফলাফল আনতে স্বাধীন নয়। তার প্রতিটি কর্ম স্রষ্টার অপরিবর্তনীয় আইন অনুসারে একটি নির্দিষ্ট ফলাফল বহন করে। এটি হল প্রতিদানের আইন যা সমগ্র মহাবিশ্বে, মানুষের জগৎ সহ, অবিচলভাবে কাজ করে। পরবর্তী ক্ষেত্রে, ফলাফল তার বর্তমান জীবনে বা পরকালে বেরিয়ে আসতে পারে।

অবশেষে, পৃথিবী স্রষ্টা দ্বারা সৃষ্ট যিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ। অতএব, এটি শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্য, উদ্দেশ্য এবং দয়া প্রদর্শন করে। এটি মূল্যবোধের আবাসস্থল। এটি যুক্তির জন্য উপযুক্ত। এটি মানুষকে অগ্রগতি এবং বিকাশের সুযোগ প্রদান করে। এমন একটি পৃথিবীতে, মানুষ জ্ঞানের ক্ষুধা নিবারন করতে এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারে। সে তার বৌদ্ধিক ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করে এবং ওহীর দিকনির্দেশনা অনুসন্ধান করে তার ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে। যুক্তি এবং ওহীর মধ্যে যেকোনো দ্বন্দ্ব থাকতে পারে বলে ধরে নেওয়া একটি গুরুতর ভুল হবে - তারা পরিপূরক। উভয়ের উপর অতিরিক্ত জোর মানুষকে বিপথে নিয়ে যাবে। প্রায়শই বিজ্ঞান এবং একটি অনুর্বর ধর্মতত্ত্বের মারাত্মক মতবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে কিন্তু বিজ্ঞান এবং দ্বীনের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। এই বিষয়ে ওস্পেনস্কির মন্তব্যগুলি সাবধানতার সাথে বিবেচনা করার যোগ্য: যে ধর্ম বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে এবং যে বিজ্ঞান ধর্মের বিরোধিতা করে উভয়ই সমানভাবে মিথ্যা। [৪]*

(*ধর্ম সর্বদা বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে, এবং বিপরীতভাবে। এটি দ্বীন যা বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে না এবং বিজ্ঞানও এর বিরোধিতা করে না।) সর্বদা বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে, এবং বিপরীতভাবে। এটি দ্বীন যা বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে না এবং বিজ্ঞানও এর বিরোধিতা করে না।) মানুষ যদি নিজেকে স্রষ্টা এবং বিশ্বের সাথে একটি অর্থপূর্ণ সম্পর্কে আনতে চায় তবে বিজ্ঞান এবং দ্বীন উভয়ের সাহায্যের প্রয়োজন।

### *তথ্যসূত্র*

১. ইকবাল, ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন পৃষ্ঠা। ৯৭

২. ইকবাল, জাভেদ নামা (ফার্সি), পৃ. ১২৩।

৩. ইকবাল, পুনর্গঠন, পৃ. ৯৫; ১০৩।

৪. পি.ডি. ওস্পেনস্কি টার্টিয়াম অর্গানাম, পৃ. ২০৮।

# অধ্যায় ৮
# প্রতিফল আইন (Law of Requital)

## ১. প্রতিফল আইন (Law of Requital) কী?

বর্বরদের জন্য, এবং শিশুর জন্য, পৃথিবী হল আকস্মিক ঘটনার দৃশ্য, যার কোনটিই অন্যটির সাথে বোধগম্য সম্পর্কের মধ্যে থাকে না। বুদ্ধির বিকাশের সাথে সাথে, উভয়ই তাদের চারপাশের জগতে শৃঙ্খলার উপস্থিতি সম্পর্কে জাগ্রত হয়। তারা প্রথমেই লক্ষ্য করে নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার ক্রম—উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎ চমকানোর পরে বজ্রপাত হয় এবং আগুনের সংস্পর্শে আসার পরেই আগুন জ্বলে ওঠে। অপরিবর্তনীয় ক্রম সম্পর্কে জ্ঞান তাদের বিশ্বের সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। তারা ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কে সচেতন হয়। তারা ঘটনার কারণগুলি জানতে চায়, কারণ এই জ্ঞান তাদের প্রভাবগুলি পূর্বাভাস দিতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম করে। তারা বুঝতে পারে যে তারা নিজেরাই পৃথিবীতে পরিবর্তন আনার কারণ হিসেবে কাজ করে। তাদের সমস্ত কর্মের পরিণতি রয়েছে এই জ্ঞান তাদের ক্ষমতার পাশাপাশি দায়িত্বের অনুভূতিও দেয়। তারা বুঝতে পারে যে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে, তারা তাদের কর্মের পরিণতিও বেছে নিচ্ছে। যদি পরিণতি অপ্রীতিকর হয় এবং মানুষ তা এড়াতে চায়, তবে সে কেবল সেই কর্ম থেকে বিরত থেকে তা করতে পারে যা এর দিকে পরিচালিত করে। প্রতিফল আইন বলে যে মানুষের প্রতিটি কর্মের পরিণতি রয়েছে এবং কর্তা তা পছন্দ করুক বা না করুক তাকে তা বহন করতে হবে। তবে কর্মের বাহ্যিক প্রভাবের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল কর্তা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর এর প্রভাব। তবে, সমস্ত কর্মই ব্যক্তিত্বকে পরিবর্তন করে না। অসাবধানতাবশত বা অসাবধানতাবশত সম্পাদিত একটি কর্ম মানুষের নিজের উপর খুব কম প্রভাব ফেলে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বা উচ্চ মাত্রার অহং-সম্পর্কিত কর্ম ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যক্তিত্বকে আরও ভালো বা খারাপের জন্য পরিবর্তন করে। এটি নৈতিক তন্তুকে শক্তিশালী বা দুর্বল করে। এটি আত্ম-সিদ্ধির দিকে তার অগ্রগতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায় অথবা বাধাগ্রস্ত করে। কোরআন মানুষের কর্মের মধ্যে এই পার্থক্যটি নির্ধারণ করেছে এবং মানুষের নৈতিক জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিফল আইন বিশেষভাবে মানুষের স্বেচ্ছাসেবী কর্মের ফলে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। এর অর্থ হল এই ধরনের কর্মের ফলাফল অনিবার্যভাবে মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বা হ্রাস করে।

## ২. মানুষ এবং প্রতিফল (প্রতিদান) আইন

ধীরে ধীরে মানুষ বুঝতে পারে যে সে এমন একটি পৃথিবীতে বাস করে যা কৌতুকপূর্ণ আত্মার করুণায় নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা প্রদর্শনকারী পৃথিবীতে বাস করে। সে কেবল সেই আইনগুলি আবিষ্কার করেই

নিজেকে বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে যা সেখানে ঘটনা এবং প্রক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে এই কাজের প্রতি নিজেকে নিবেদিত করেছিল এবং ধীরে ধীরে এবং ধৈর্য সহকারে সেই জ্ঞান অর্জন করেছিল যা তাকে বিশ্বের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে সক্ষম করেছিল। এরপর সে নিজের দিকে এবং তার নিজের আচরণের দিকে মনোযোগ দেয়। এখানেও, সে আইনের শাসন আবিষ্কার করে। সে দেখতে পায় যে সে কাজ করার এবং বেছে নেওয়ার জন্য স্বাধীন কিন্তু আইনের শাসনের জন্য তাকে যে স্বাধীনতা উপভোগ করেছিল তার জন্য মূল্য দিতে হয়েছিল। তাকে তার কর্মের পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিল। সে তার নিজের কর্মের ফলাফল অস্বীকার করতে পারত না। সে হয়তো হঠাৎ করেই কোন আবেগের কাছে নতি স্বীকার করে ক্ষণিকের তৃপ্তি লাভ করতে পারত, কিন্তু পরবর্তীতে অনুশোচনা এবং অনুতাপ নিশ্চিতভাবেই তার মনকে আক্রমণ করে তাকে অসুখী করে তুলত। সে শাস্তির আইনকে শাস্তির বাইরে লঙ্ঘন করতে পারত না। এই আইনটি যেকোনো প্রাকৃতিক আইনের মতোই স্থির এবং অদম্য। তবে, প্রাকৃতিক আইনের বিপরীতে যা ভৌত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। আমরা এখন এই প্রতিটি ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা বিবেচনা করব।

১. বিশ্বের ঘটনাগুলির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের মধ্যে, কার্যকারণ সম্পর্ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে দুটি ঘটনা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, পূর্ববর্তী ঘটনা বা কারণের পরেই ফলস্বরূপ ঘটনা বা প্রভাব আসে। কারণ এবং প্রভাব আপেক্ষিক পদ। প্রতিটিকে কেবল অন্যটির পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। আমরা এমন ক্ষেত্রে উদ্বিগ্ন নই যেখানে উভয় ঘটনাই ভৌত। এগুলি ভৌত বিজ্ঞানের আওতাধীন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে মানুষও পৃথিবীতে কার্যকারক হিসেবে কাজ করে এবং তার কর্মও প্রভাব তৈরি করে।

দীনের দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষের কর্ম এবং তার প্রভাবকে প্রতিফল আইনের উদাহরণ হিসেবে দেখা হয়। প্রভাব হল মানুষ তার কর্মের মাধ্যমে যা অর্জন করে, সে তা পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ করুক বা শাস্তি হিসেবে অপছন্দ করুক। যদি কেউ আগুনে হাত দেয় তবে তা পুড়ে যায়; যদি সে এটি জলে ডুবিয়ে দেয় তবে তা ভিজে যায়। যদি সে ভুল করে কাজ করে, তবে তার পরিণতি তার জন্য ক্ষতিকর। তাকে কষ্ট ভোগ করতে হয় কারণ সে নিজের উপর বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এটি তার নিজের কাজ এবং সে অন্যদের দোষ দিতে পারে না। শিশুটি বড় হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত শিখে যায় যে দৈহিক ক্ষেত্রে প্রতিফল আইন কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে এটিকে সম্মান করে সে শারীরিক আঘাত এবং যন্ত্রণা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

২. সামাজিক ক্ষেত্রে, প্রতিফল আইন নাগরিক আইনের আকারে কাজ করে। আইন-শৃঙ্খলা ছাড়া সমাজ চলতে পারে না। সমাজের অখণ্ডতার জন্য হুমকিস্বরূপ কর্মকাণ্ডকে শাস্তি দিতে হয়। পুরুষরা প্রায়শই

অসামাজিকভাবে কাজ করে। স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে, তারা প্রায়শই এমনভাবে কাজ করে যা তাদের গোষ্ঠীকে ব্যাহত করে। তাদের কেবল এই জ্ঞানের মাধ্যমেই তাদের দমন করা যেতে পারে যে তাদের ভুল কাজগুলি তাদের উপর অত্যন্ত অপ্রীতিকর পরিণতি ডেকে আনবে। একজন মানুষ তার সহকর্মীর উপর আঘাত করতে পারে বা তার সম্পত্তি লুট করতে পারে, কিন্তু সে জানে যে পরে তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে অথবা ভারী জরিমানা দিতে হবে। শাস্তি ভোগের সম্ভাবনা তাকে সমাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করা থেকে বিরত রাখে। একটি সুসংগঠিত সমাজে মানুষ সাধারণত আইন মেনে চলে কারণ তারা দেখে যে আইন লঙ্ঘনকারী প্রত্যেকেই সর্বদা শাস্তি পায়। তবে, আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে একটি সুশাসিত রাষ্ট্রেও, কিছু অপরাধী শাস্তি থেকে মুক্ত থাকে এবং কিছু নিরপরাধ মানুষকে অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মানব আইন নিখুঁত নয় এবং প্রতিটি সমাজে, ন্যায়বিচার প্রশাসনে গুরুতর ত্রুটি রয়েছে। ধূর্ত মানুষ, বিশেষ করে যদি তারা ধনী হয়, প্রায়শই তাদের প্রাপ্য শাস্তি এড়াতে কোনও উপায় খুঁজে পেতে পারে। এই কারণেই প্রতিটি সমাজেরই কিছু অপরাধী থাকে। একমাত্র প্রতিকার হল ন্যায়বিচার প্রশাসনের যন্ত্রপাতিকে নিখুঁত করা। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রতিফল আইন কার্যকর, যদিও এর কার্যকারিতা ত্রুটিমুক্ত নয়।

৩. নৈতিক ক্ষেত্রে, প্রতিফল আইনকে তার বিশুদ্ধতম রূপে দেখা যায়। এখানে এটি মানুষের কর্ম এবং তার ব্যক্তিত্বের পরবর্তী পরিবর্তনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংযোগের দিকে ইঙ্গিত করে। মানুষের কর্ম, বিশ্ব এবং সমাজে প্রভাব তৈরি করার পাশাপাশি, তার মধ্যেও প্রভাব তৈরি করে, তার নিজেকে ভালো বা খারাপের জন্য পরিবর্তন করে। বাহ্যিক কারণগুলি একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর কোনও প্রভাব ফেলে না। মানুষ কারাগারে বন্দী থাকলেও মুক্ত থাকতে পারে। অন্যদিকে, বাহ্যিকভাবে মুক্ত হলেও, তার ব্যক্তিত্ব সংকীর্ণ এবং বাধাগ্রস্ত হতে পারে। মানুষের ব্যক্তিত্ব তার কর্মের নৈতিক স্বরের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। নৈতিক আইনের প্রতিটি লঙ্ঘন তাকে তার যথাযথ ভূমিকা পালনের ক্ষমতায় দুর্বল করে দেয়। 'প্রতিফল আইনের কার্যকারিতা অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় এই ক্ষেত্রে অনেক বেশি সূক্ষ্ম। একজন মানুষ হঠাৎ করেই ভুল মোড় নিতে পারে এবং তুচ্ছ অপরাধ করতে পারে, সে তার ব্যক্তিত্বের ধীরে ধীরে ক্ষতি করছে তা না জেনেও। একদিন, যখন সে বুঝতে পারবে যে তার ব্যক্তিত্বের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় ঘটছে, তখন সে হতবাক হয়ে যাবে। যদিও সূক্ষ্ম, এই ক্ষেত্রে প্রতিফল আইনের কার্যকারিতা অবিরাম। প্রতিটি কাজই ব্যক্তিত্বের উপর তার ভাল বা খারাপ প্রভাব ফেলে। একসময় এর প্রভাব এতটাই সামান্য হতে পারে যে তা অনুধাবন করা কঠিন, কিন্তু যদি মানুষ ভুলভাবে কাজ করতে থাকে, তাহলে ক্রমবর্ধমান প্রভাব তার ব্যক্তিত্বকে রূপান্তরিত করতে পারে। খারাপ কাজের সংক্রমণ শুরুতে নগণ্য হতে পারে কিন্তু এটি ছলনাপূর্ণভাবে কাজ করে এবং ধীরে ধীরে নিজেকে দুর্বল করে তোলে। যে ব্যক্তি নৈতিকভাবে সংবেদনশীল সে এই প্রভাবটি বুঝতে পারে এবং সময়মতো নিজেকে পরীক্ষা করতে পারে এবং অপূরণীয় ক্ষতি হওয়ার আগে তার পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে পারে।

### ৩. প্রতিফল আইনের কার্যকারিতা

আমাদের সমস্ত কর্ম প্রতিফল আইনের অধীন নয়। অনিচ্ছাকৃত কাজ এবং যা অসাবধানতাবশত বা সামান্য অহংকার-সম্পর্কিতভাবে করা হয় তা নৈতিকভাবে নিরপেক্ষ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত কাজ, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের আসল সত্ত্বা প্রকাশ করি এবং যা আমাদের নিজস্ব বলে স্বীকার করতে পারি, তা অনিবার্যভাবে সঠিক হলে পুরস্কৃত হয় এবং ভুল হলে শাস্তি পায়। মহাবিশ্বের নৈতিক শৃঙ্খলা এই আইনের উপর ভিত্তি করে। আমরা কেবল আমাদের প্রাপ্যটুকুই দাবি করতে পারি। কেবলমাত্র সৎকর্মই আমাদের প্রতিদান পাওয়ার অধিকারী। কোরআন এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে: আর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই, যাতে তিনি (তাঁর প্রতিদানের আইন অনুসারে) যারা আ'মাল-উস-সায়্যিাহ করে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেন এবং যারা আ'মাল-উল-হাসানাহ করে তাদের সৎকর্মের প্রতিদান দেন (৫৩:৩১)।

স্রষ্টা মানুষকে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছেন কিন্তু তিনি মানুষকে দেখেন যে সে কীভাবে স্বাধীনতা ব্যবহার করে: আর তিনিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যাতে তিনি তোমাদের সুযোগ করে দেন যে তোমাদের মধ্যে কে আচরণে সর্বোত্তম তা দেখান (১১:৭)।

কোরআন ঘোষণা করে যে, আল্লাহ কেবল মানুষের প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডই "দেখেন" না, বরং তার অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য এবং গোপন উদ্দেশ্য এবং তাঁর বিচারকদেরও "দেখেন"।

মানুষের এই বিস্তৃত ভিত্তি হলো: তোমাদের মধ্যে যে তার কথা গোপন করে, আর যে উচ্চস্বরে বলে, আর যে রাতে লুকিয়ে থাকে এবং যে দিনের বেলায় প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে, তারা সকলেই তাঁর সমান। তার সামনে এবং পিছনে উভয় দিক থেকে তার পশ্চাদ্ধাবনকারী রয়েছে, যারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে পাহারা দেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা (প্রথমে) তাদের নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন করে (১৩: ১০-১১)।

মানুষ যা চায়, তাকে নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তা অর্জন করতে হবে। যদি তা তাকে বিনামূল্যে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়, তবে তা তার ব্যক্তিত্বের কোন উপকারে আসবে না। সে চেষ্টার ভান করে স্রষ্টাকে প্রতারিত করার আশা করতে পারে না। তাকে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে: তোমাদের উপর রক্ষক নিযুক্ত আছেন, যারা সম্মানিত সংবাদদাতা (৮২: ৯-১০)। আর আবার বলা হয়েছে: আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমরা জানি তার মন তার কাছে কী ফিসফিসায় করে; এবং আমরা তার ঘাড়ের ধমনী থেকেও তার নিকটবর্তী (৫০: ১৬)।

কোরআন মানুষকে আশ্বস্ত করে যে, তার কর্মকাণ্ড হ্রদের পৃষ্ঠে ঢেউয়ের মতো নয়, যা একের পর এক চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। বরং, তারা তার ব্যক্তিত্বের উপর অমোচনীয় ছাপ রেখে যায়। সেগুলি তার জন্য রক্ষিত খাতার ডেবিট বা ক্রেডিট পাশে লিপিবদ্ধ করা হয়: এবং প্রতিটি মানুষের উপর আমরা তার আমলনামা তার গলায় বেঁধে রেখেছি; এবং বিচারের সময় আমরা তাকে একটি খোলা খাতা বের করব (১৭:১৩)।

মানুষ সেই সমস্ত কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী যার সাথে তার আত্মা জড়িত ছিল। যদি কাজটি ভুল হয়, তবে তার কর্মের প্রয়োজনীয় ফলাফল "শাস্তি" গ্রহণ করা ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। অজুহাত দেখানো তার জন্য কাজে আসবে না, যে সে অযত্নে বিমূর্তভাবে বা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেছে। তার নিজের হৃদয় তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে: ওহ, কিন্তু মানুষ নিজের বিরুদ্ধে একজন স্পষ্ট সাক্ষী, যদিও সে তার অজুহাত পেশ করে (৭৫:১৪)।

প্রতিফল আইন অবিচলভাবে কাজ করে। কর্ম এবং তাদের ফলাফলের মধ্যে একটি প্রয়োজনীয় সংযোগ রয়েছে। ভালো কাজের জন্য অবশ্যই পুরস্কৃত হতে হবে এবং ভুল কাজের জন্য অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। তবে, সামাজিক জীবনে, সামাজিকভাবে অনুমোদিত একটি কাজ এবং এর পুরস্কারের মধ্যে সম্পর্ক বাহ্যিক এবং আনুষঙ্গিক। আসুন আমরা এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করি। একজন মানুষ এই ধারণা নিয়ে কাজ করার জন্য উদ্যোগ নেয় যে কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পরে তাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে। সে কাজটি করতে পারে কিন্তু পুরস্কার নাও পেতে পারে। তার নিয়োগকর্তা মারা যেতে পারেন, দেউলিয়া হয়ে যেতে পারেন বা অবিশ্বাসী প্রমাণিত হতে পারেন। অন্যদিকে, নৈতিক কর্ম এবং এর প্রভাবের মধ্যে সংযোগ অভ্যন্তরীণ এবং প্রয়োজনীয়। এর প্রভাব কর্তা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর পড়ে। যদি প্রভাব ভালো হয়, তাহলে কর্তা আত্ম-উপলব্ধির লক্ষ্যে এগিয়ে যান; যদি এটি খারাপ হয় তবে তাকে অবশ্যই পিছনে ফেলে দেওয়া হয়। প্রতিটি নৈতিক কাজ মানুষের ব্যক্তিত্বে ফলস্বরূপ পরিবর্তন আনে। এই পরিবর্তনগুলি বৃহত্তর সংহতকরণ বা ব্যাঘাতের দিকে হতে পারে। এগুলি "আধ্যাত্মিক" স্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক হতে পারে বা নাও হতে পারে। "আধ্যাত্মিক" স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা শারীরিক স্বাস্থ্যের চেয়ে আলাদা। ধরুন একজন মানুষ কোনওভাবে নিজেকে কিছু অর্থের মালিকানা পান এবং মাখন এবং ডিম কিনতে ব্যয় করেন। এই পুষ্টিকর খাদ্যের উপর তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। সে সৎভাবে অর্থ উপার্জন করেছে নাকি চুরি করেছে, তার স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাবের কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু তার "আধ্যাত্মিক" স্বাস্থ্য ভিন্ন বিষয়। যদি অর্থ চুরি হয়ে থাকে, এমনকি যদি সে তা ভালোভাবে ব্যবহার করে থাকে, তাহলেও তার ক্ষতি হবে। অতএব, আমাদের কর্মের শারীরিক প্রভাব এবং তাদের নৈতিক প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য

করতে হবে। নৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিফল আইন কেবলমাত্র নৈতিক প্রভাব, মানুষের ব্যক্তিত্বের উন্নতি বা অবনতির কথাই বোঝায়।

**উপরোক্ত আলোচনা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছে:**

ক. মানুষের স্বেচ্ছাসেবী কর্ম সরাসরি তার ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে।
খ. একটি মহৎ লক্ষ্যের প্রতি উৎসর্গ ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিকে পরিচালিত করে।
গ. পরম মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা বা অস্বীকার আত্মার বিচ্ছিন্নতার দিকে পরিচালিত করে।
ঘ. মানুষ তার কর্মের জন্য দায়ী এবং তার পরিণতি মেনে নিতে হবে।
ঙ. মানুষ অন্য কারো উপর দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে না।

কোরআন এই শেষ বিষয়টির উপর জোর দিয়েছে: যে কেউ অন্যায় করে, সে কেবল নিজের বিরুদ্ধেই করে (৪:১১১)। আবার: যে কেউ সঠিক পথে চলে, সে কেবল নিজের (মঙ্গলের) জন্যই সঠিক পথে চলে, আর যে ভুল করে, সে কেবল নিজের ক্ষতির জন্যই ভুল করে। কোন ভারগ্রস্ত ব্যক্তি অন্যের বোঝা বহন করতে পারে না (১৭:১৫)।

নিম্নলিখিত আয়াতে আবারও মানুষের নিজের কর্মের দায়িত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে: প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল নিজের জন্য উপার্জন করে, এবং যে কেউ বোঝা বহন করে সে অন্যের বোঝা বহন করবে না (৬:১৬৫)।

নিম্নলিখিত আয়াতটি এই বিষয়টিতে কোন সন্দেহ রাখে না যে মানুষ কেবল নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। কোনও বাহ্যিক সাহায্য তার কোনও কাজে আসবে না: কোনও ব্যক্তি অন্যের কোনও উপকারে আসবে না, না তার কাছ থেকে সুপারিশ গৃহীত হবে, না তার কাছ থেকে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করা হবে, না তাদের সাহায্য করা হবে (২:৪৮)।

কেবল ব্যক্তিরাই প্রতিফল আইনের অধীন নয়: জাতিগুলিকেও যদি তারা ভুল পথে পড়ে তবে তাদের কষ্ট ভোগ করতে হয়। যাইহোক, যদি কোনও জাতি ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে তার প্রভাব অনুভব করতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। জাতিগুলোর ক্ষেত্রে আইন ধীরে ধীরে কাজ করতে পারে, কিন্তু তাই এক বা একাধিক জাতিকে তাদের ভুল কর্মের পরিণতি ভোগ করতে হবে। (বিষয়টি পরবর্তী অধ্যায়ে স্পষ্ট করা হবে)।

পরিশেষে, কোন কাজগুলো সঠিক এবং কোনগুলো ভুল, এই প্রশ্নের উত্তর আংশিকভাবে যুক্তি এবং আংশিকভাবে ওহীর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। ওহী সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করে এবং ব্যাপকভাবে সঠিক ও ভুল কর্মের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। ওহীর আলোকে কাজ করা মানুষের যুক্তি সঠিক পথ মিস করতে পারে না। ওহীর আলোকে কাজ করে এবং ফলাফল পরীক্ষা করে আবারও ওহী পরীক্ষা করা যেতে পারে। কোরআন এই বাস্তবসম্মত পরীক্ষার মাধ্যমে বিচার করার প্রস্তাব দেয়।

(হে মুহাম্মদ) বলুন! হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের শক্তি (এবং পরিকল্পনা) অনুসারে কাজ করো। দেখো! আমিও (আমার মতে) কাজ করছি। এভাবে তোমরা জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার জন্য সুখী পরিণতি হবে। দেখো! অন্যায়কারীরা সফল হবে না (৬: ১৩৬)।

প্রতিফল আইন সম্পর্কে কোরআনের ধারণা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে যা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি যে এই আইন কঠোরভাবে ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তি করে। বিবেচনার বিষয় হলো, "ক্ষমা" নাকি "দয়া" এর কোন স্থান আছে? উত্তরটি "না" এবং "হ্যাঁ" উভয়ই। যদি আমি অন্য কারো সাথে কিছু অন্যায় করি, তাহলে সে আমাকে ক্ষমা করতে পারে, অর্থাৎ আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও নিতে পারে: কিন্তু যদি আমি নিজের সাথে অন্যায় করি, তাহলে কেউ আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না। একইভাবে, করুণা হল একটি আবেগগত প্রতিক্রিয়া যা স্পষ্টতই আইন ও ন্যায়বিচারের কাজে কোন স্থান খুঁজে পায় না। তবুও, "ক্ষমা" এবং "দয়া" এর জন্য একটি স্থান আছে যা নিম্নলিখিত উদাহরণ থেকে দেখা যাবে। তুমি আগুনে তোমার আঙুল রাখলে তা পুড়ে যাবে। এবং তোমাকে এর পরিণতি ভোগ করতে হবে - যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণা যা এর অনিবার্য ফলাফল। কেউ তোমাকে ক্ষমা করার বা তোমার উপর করুণা নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সেই একই স্রষ্টা যিনি আইন তৈরি করেছেন যে আগুন জ্বলে এবং ব্যথা তার অনিবার্য ফলাফল, তিনি আরেকটি আইন তৈরি করেছেন। এটি হল যে একটি নির্দিষ্ট ঔষধ ব্যথা উপশম করার এবং জ্বলনের ধ্বংসাত্মক ফলাফল মুছে ফেলার বৈশিষ্ট্য রাখে। স্রষ্টার এই আইনের আশ্রয় নিলে আপনার পূর্ববর্তী কর্মের যন্ত্রণাদায়ক ফলাফল দূর হবে। এই দ্বিতীয় আইনের বিধান হল স্রষ্টার "করুণা", এবং এই আইনের আনুগত্য আমাদের অন্যায় কাজের "ক্ষমা" প্রদান করে। এই আইনটিও পূর্ববর্তী আইনের মতোই সর্বজনীন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে কাজ করে না। আবেগের প্রতিও এর কোনও আকর্ষণ নেই।

এটি "ক্ষমা" এবং "করুণা" সম্পর্কে কোরআনের ধারণা।

# অধ্যায় ৯
# পরিত্রাণ

**১. ধর্ম এবং পরিত্রাণ**

মানুষের প্রতিটি কার্যকলাপই কোন না কোন লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হয়। লক্ষ্য স্পষ্টভাবে প্রণয়ন করা যেতে পারে অথবা কেবল অস্পষ্টভাবে অনুভূত হতে পারে, তবে মানুষের দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত এক ধরণের লক্ষ্য তাকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয়। মানুষের কার্যকলাপ তখনই বোধগম্য হয় যখন আমরা জানি যে সে কোন লক্ষ্য খুঁজছে।

ধর্মীয় কার্যকলাপও লক্ষ্য-নির্দেশিত। এর লক্ষ্য এমন কিছু লক্ষ্য অর্জন করা যা, সঠিক বা ভুল, মানুষের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে বলে বিশ্বাস করা হয়। মানবজাতির বেশিরভাগ উচ্চতর ধর্মই মুক্তিকে ধর্মীয় প্রচেষ্টার চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করে। বিশ্বাস করা হয় যে ধর্মের উদ্দেশ্য হল মানুষকে মুক্তি অর্জনে সহায়তা করা। পরিত্রাণ লাভের উপায় সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু তারা মনে করে যে এটিই একমাত্র লক্ষ্য যা একজন জ্ঞানী মানুষ কামনা করতে পারে। অনেক ধর্মে এর অপরিহার্য ভূমিকার কারণে, পরিত্রাণের ধারণাটি ঘনিষ্ঠভাবে দেখা এবং এর অন্তর্নিহিত অনুমান পরীক্ষা করা মূল্যবান হবে। পরিত্রাণের অর্থ আত্মার পরিত্রাণ, অথবা অন্য কথায়, পাপ এবং তার পরিণতি থেকে মুক্তি। যে ধারণার উপর ভিত্তি করে এই ধারণাটি তৈরি করা হয়েছে তা হল জন্মের সময়ও মানুষের আত্মা পাপ দ্বারা কলঙ্কিত। এই দাগটি একটি ধার্মিক ধর্মীয় জীবনযাপনের মাধ্যমে মুছে ফেলা যেতে পারে। এটা স্পষ্ট যে পরিত্রাণের মতবাদ আদি পাপে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে। বলা হয়, নবজাতকের আত্মা ইতিমধ্যেই মন্দ দ্বারা সংক্রামিত এবং ধর্মীয় বিশ্বাস এবং কর্ম দ্বারা এটিকে নিয়ন্ত্রণ না করা হলে সংক্রমণ বৃদ্ধি পাবে এবং ছড়িয়ে পড়বে। মানুষ পাপের ছায়ায় জন্মগ্রহণ করে। কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের আনুগত্য করেই সে এটি দূর করতে পারে। বেশিরভাগ ধর্মের অনুসারীরা পাপের ধারণায় আচ্ছন্ন এবং জীবনের তাদের প্রধান লক্ষ্য হল তাদের আত্মার উপর এর দখল শিথিল করা। পাপের উৎস এবং তা নির্মূল করার উপায় সম্পর্কে প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

হিন্দুধর্মে, মুক্তি বা পরিত্রাণকে অবগবান বা মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি হিসাবে কল্পনা করা হয়। কর্মের মতবাদ এই প্রশ্নের একটি যুক্তিসঙ্গত উত্তর দেয় যে কেন একজন মানুষ মুখে রূপার চামচ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং অন্যজন দুঃখের জীবনযাপনের জন্য নিয়তিপ্রাপ্ত। কারণ পূর্বজন্মে প্রথমজন পুণ্যের সাথে জীবনযাপন করেছিলেন যখন দ্বিতীয়জন পাপ করেছিলেন যার প্রায়শ্চিত্ত তাকে বর্তমান জীবনে করতে হবে। যদি উদ্দেশ্য হয় মানুষের মনে পুণ্যের প্রতি ভালোবাসা এবং মন্দের প্রতি ঘৃণা জাগানো, তবে

মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের চক্রের মধ্য দিয়ে এটি কীভাবে অর্জন করা যায় তা দেখা কঠিন। পূর্বজন্মের কোনও স্মৃতি মানুষের মনে থাকে না, এবং তাই সে সচেতনভাবে তার বর্তমান দুঃখকে পূর্বজন্মে কৃত মন্দ কাজের সাথে সম্পর্কিত করতে পারে না। নিঃসন্দেহে, কিছু উদাহরণ মানুষের পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতা স্মরণ করার কথা লিপিবদ্ধ আছে। তবে, প্রকৃত স্মরণের চেয়ে এগুলিকে পরমানেশিয়ার ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা নিরাপদ। হিন্দুরা প্রাথমিক গ্রীকদের কাছ থেকে ধার করা ধারণা (মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের চক্র) সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি এবং বর্তমান হিন্দুরা তা বাতিল করে দিচ্ছে।

বৈদান্তিক দর্শন একই ধারণাকে কিছুটা ভিন্ন আকারে উপস্থাপন করে। এটি মূলত একটি সর্বেশ্বরবাদী বিশ্বাস। ব্যক্তি আত্মা বা জীবাত্মার উৎস মহাজাগতিক আত্মা বা পরমাত্মার মধ্যে রয়েছে। এটি কোনও অনির্দিষ্ট কারণের কারণে তার উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আত্মা একাকী এবং অসুখী, এবং তার উৎসের সাথে পুনর্মিলনের জন্য তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করে। এটি কেবল পদার্থের জগৎ থেকে পালিয়ে গিয়ে এবং বেদে বর্ণিত কঠোর নিয়মানুবর্তিতার কাছে আত্মসমর্পণ করেই অর্জন করা যেতে পারে। জীবাত্মার মুক্তির নিহিত রয়েছে অসীম পরমাত্মার সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার মধ্যে।

বৌদ্ধধর্ম মানব জীবনের প্রতি আরও হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। মানুষের জীবন বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে সুখের ঝলক দেখেই তা উপশম হয়। জীবন থেকে কষ্ট অবিচ্ছেদ্য। বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে মানুষের দুঃখের উৎস হল আকাঙ্ক্ষা। কিছু আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত। অন্যরা হয়তো সন্তুষ্ট হতে পারে, কিন্তু তাদের জায়গায় নতুন আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। আকাঙ্ক্ষা আমাদের এই জীবনে অস্থির রাখে এবং মৃত্যু ও পুনর্জন্মের চক্রে আবদ্ধ করে। পরিত্রাণ পেতে হলে, আমাদের হৃদয় থেকে আকাঙ্ক্ষা নির্মূল করতে হবে। জীবনে শান্তি ও সুখ অপ্রাপ্য। যখন আকাঙ্ক্ষা মূলোৎপাটন করা হয়, তখন আমাদের সামনে মুক্তি বা নির্বাণের পথ উন্মুক্ত থাকে। যে নিজের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা নিভিয়ে দেয়নি, তার পুনর্জন্ম, সারা জীবন ব্যথা ও দুর্দশা ভোগ করতে হবে।

অস্তিত্ব একটি মন্দ এবং আমরা কেবল অস্তিত্ব ত্যাগ করেই এর জোয়াল ত্যাগ করতে পারি। অতএব, জ্ঞানী ব্যক্তি ধ্বংস, অস্তিত্বহীনতার লক্ষ্য রাখেন। নির্বাণ ইতিবাচক সুখের অবস্থা নয় বরং অনুভূতির অনুপস্থিতি এবং অতএব, ব্যথার অনুপস্থিতি দ্বারা চিহ্নিত একটি নেতিবাচক অবস্থা।

খ্রিস্টধর্ম তার অনুসারীদের মধ্যে "আদি পাপ" এর মতবাদকে প্ররোচিত করে। আদম ও হবা স্রষ্টার প্রতি অবাধ্যতার জন্য দোষী ছিলেন এবং স্বর্গ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। প্রতিটি মানুষ আদি পাপের কলঙ্কিত আত্মা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কেবল খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে এবং তপস্যা ও কঠোর শাসনের জীবনযাপন করেই সে এই কলঙ্ক মুছে ফেলতে পারে। পরিত্রাণের অর্থ হল পাপের মাধ্যমে মানুষ যে আনন্দের অবস্থা হারিয়ে

ফেলেছিল তা পুনরুদ্ধার করা। মানুষ সাহসী অভিযান এবং গৌরবময় অর্জনের মাধ্যমে নয় বরং আত্মত্যাগ এবং জগতের কাজে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতির মাধ্যমে তার পরিত্রাণ লাভ করে। আদর্শ হল আত্ম-সিদ্ধি নয় বরং আত্মত্যাগ। মধ্যযুগে গির্জার শিক্ষাও এমনই ছিল।

ইহুদিরাও পাপ এবং তার পরিণতির ধারণায় আচ্ছন্ন ছিল। তারা নরকের আতঙ্কে বাস করত, যেখানে তারা বিশ্বাস করত, তাদের পাপের জন্য এবং তাদের পূর্বপুরুষদের পাপের জন্য তারা কষ্ট পাবে। তারা ভেবেছিল যে তারা কেবল একটি জটিল আচার-অনুষ্ঠানের সময়ানুবর্তিতা পালনের মাধ্যমেই এই শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে। সেই মুক্তির অর্থ ছিল নরকের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়া।

এটা স্পষ্ট যে এই সমস্ত বিশ্বাসে, পরিত্রাণের নেতিবাচক দিকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মুক্তি কোন ইতিবাচক অর্জন, নতুন মূল্যবোধ অর্জন হিসেবে কল্পনা করা হয় না, বরং জন্ম থেকেই মানুষের সাথে লেগে থাকা মন্দ থেকে মুক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলামে, "মুক্তির" ইতিবাচক দিকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ইসলাম দাবি করে যে মানুষকে ভবিষ্যতের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত, নতুন মূল্যবোধের উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার নতুন স্তর অর্জনের জন্য তার প্রচেষ্টাকে ঝুঁকে দেওয়া উচিত। ইসলাম অতীতের প্রতি মানুষের ব্যস্ততাকে নিরুৎসাহিত করে: পরিবর্তে এটি ভবিষ্যতের আশা জাগিয়ে তোলে। এই জীবনে মানুষের লক্ষ্য হারানো স্বর্গ ফিরে পাওয়া উচিত নয়। তাকে নিজের জন্য একটি নতুন স্বর্গ তৈরি করতে উৎসাহিত করা হয়েছে যেখানে তার সমস্ত ক্ষমতা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাবে। এটি সে করতে পারে, পৃথিবী থেকে সরে এসে অতীতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নয়, বরং বর্তমানের প্রতি সম্পূর্ণরূপে জীবিত হয়ে এবং এই জীবনের সুযোগগুলিকে পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে। ইসলামের উদ্দেশ্য হল মানুষকে জীবনের প্রতি পুনর্নির্মাণ করা, যাতে সে তার মধ্যে অন্তর্নিহিত বিশাল সম্ভাবনার প্রতি জেগে উঠতে পারে। তার "মুক্তি" নিহিত রয়েছে তার জন্য উন্মুক্ত সম্ভাবনাগুলি আবিষ্কার করার মধ্যে এবং এমন একটি বেছে নেওয়ার মধ্যে যা সবচেয়ে ফলপ্রসূ প্রমাণিত হতে পারে। ইসলাম দূরদর্শী মনোভাব এবং এই বিশ্বাসকে সমর্থন করে যে মানুষ তার "পরিত্রাণ" অর্জন করতে পারে তার আত্মাকে ধ্বংস করে বা সংকুচিত করে নয় বরং এমন পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে এটি তার পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হতে পারে।

**২. কোরআনে পরিত্রাণের ধারণা**

বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং হিন্দু পরিত্রাণের মতবাদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। প্রতিটিতে, পাপ থেকে মুক্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে, মন্দ থেকে উদ্ধারের উপর। প্রতিটিতে, উদ্দেশ্য হল নির্দোষতা এবং আনন্দের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে আসা। যেহেতু পাপকে জীবন থেকে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করা হয় এবং অলৌকিক জগৎকে মন্দের আবাসস্থল বলে বিশ্বাস করা হয়, তাই এটি অনুসরণ করে যে মুক্তি কেবল জগৎ ত্যাগ

করার মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে। বৌদ্ধ ধর্মে এই মতবাদ তার বিশুদ্ধতম রূপে দেখা যায়। খ্রিস্টধর্ম এবং হিন্দুধর্মে এটি কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে।

এটা স্বীকার করতেই হবে যে মানব ইতিহাসের কিছু নির্দিষ্ট সময়ে, এই মতবাদ বিপুল সংখ্যক মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল এবং এমনকি শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের উপরও এর প্রভাব ফেলেছিল। এটা সত্য যে এই সময়কালে, মানুষ তীব্র হতাশার সম্মুখীন হয়েছিল এবং জীবনের প্রতি মোহভঙ্গ হয়েছিল।

এই পৃথিবীতে আশা করার মতো কিছুই না থাকায়, তারা তাদের আশাকে কেন্দ্রীভূত করেছিল অন্য জগতের উপর যেখানে তারা এই পৃথিবীতে যা কিছু অর্জন করে তা হারিয়ে ফেলতে পারে। এই মতবাদ হতাশা এবং পরাজয়ের ফসল। এটি স্পষ্টতই সুস্থ এবং স্বাভাবিক মানুষের কাছে ঘৃণ্য। এটি যুক্তি, অভিজ্ঞতা এবং মানবজাতির অগ্রগতির সরাসরি বিপরীত। আশাকে হত্যা করা যায় না - এটি মানুষের হৃদয়ে নতুন করে ফুটে ওঠে। মানুষ যখন তার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস ফিরে পায়, তখন সে এই ধরনের হতাশাজনক মতবাদ থেকে আতঙ্কে পিছু হটে। সে পদার্থের জগৎকে বিভিন্ন ফলপ্রসূ কার্যকলাপের ক্ষেত্র হিসেবে দেখতে থাকে। সে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে যে পৃথিবীর সাথে সামান্যতম সংস্পর্শে তার আত্মা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই মতবাদটি আরও ইঙ্গিত করে যে পৃথিবীর কোনও উদ্দেশ্য বা নকশা নেই। যদি পূর্ণ উত্তপ্তভাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এটি জীবন এবং অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষার জন্য সর্বোত্তম প্রমাণিত হবে। যদি কখনও এটি প্রধান ধর্ম হয়ে ওঠে, তাহলে মানবতা স্থবিরতা এবং ক্ষয়ের দিকে ধাবিত হবে। মানুষের সমস্ত স্বাস্থ্য প্রবৃত্তি এই ধরণের অনুর্বর ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এমন একজন স্রষ্টা বিশ্বাস করা যিনি এমন একটি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যা পরিত্যাগ করা উচিত, স্রষ্টা এবং মানুষ উভয়ের জন্যই অবমাননাকর।

কোরআনের মুক্তির ধারণাটি ভিন্ন ধরণের, এবং এই ব্যাখ্যার সময় এটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি মানুষের গঠনমূলক এবং প্রগতিশীল শক্তিতে অর্জিত হয়েছে। প্রথমত, পদার্থের জগৎকে এমন একটি উদ্দেশ্যের মূর্ত প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা মানুষের সত্তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিম্নলিখিত আয়াতটি উল্লেখ করা উচিত: এবং আমরা আকাশমণ্ডল, পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সবকিছু খেলাধুলায় সৃষ্টি করিনি (২১:১৬)।

এটি এমন একটি জগৎ যা মানুষের শারীরিক এবং মানবিক উভয় চাহিদার জন্য দায়ী। এটি এমন একটি জগৎ যা মানুষ, যদি সে চায়, "তার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার কাছাকাছি" গঠন করতে পারে। এটি এমন একটি জগৎ যা তার সত্তার বিকাশ এবং পরিপূর্ণতার জন্য পূর্ণ সুযোগ প্রদান করে। পৃথিবীতে ফলপ্রসূ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকতে পারে জেনেও, উদ্দেশ্যের দুর্বলতার জন্য তার কোন অজুহাত নেই।

তাছাড়া, কোরআনে, মুক্তির ইতিবাচক বিষয়বস্তুর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এটিকে যন্ত্রণার অস্বীকার এবং মন্দ থেকে মুক্তি হিসাবে কল্পনা করা হয়নি। এটি পরিপূর্ণতার অর্থ, উপলব্ধির অনুভূতি এবং সম্প্রসারণের রোমাঞ্চের মধ্যে রয়েছে। মানুষ অনেক সম্ভাবনা দিয়ে সমৃদ্ধ। এই সম্ভাবনাগুলি বিকাশের মাধ্যমে সে তার পূর্ণ উচ্চতায় পৌঁছায় এবং তার জন্য অপেক্ষা করছে আরও উচ্চতর স্তরের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে। মানুষকে অবশ্যই আবিষ্কার করতে হবে যে তার আত্মা কোন দিকে বিকাশ করতে পারে এবং তারপরে তাকে শারীরিক এবং সামাজিক উভয় অবস্থা তৈরি করতে হবে, যা বিকাশের পক্ষে সহায়ক। এই জীবনে তার প্রধান কাজ হল প্রকৃতির শক্তিগুলিকে জয় করে এবং মানবজাতির বিকাশের জন্য সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে তার আত্মাকে বিকাশ করা: যে ব্যক্তি তার আত্মাকে বৃদ্ধি করে সে প্রকৃতপক্ষে সফল, এবং যে ব্যক্তি এটিকে বাধা দেয় সে প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থ (৯১: ৯-১০)।

### ৩. জীবন: একটি সংগ্রাম

জীবন হল তার প্রতিকূল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে একটি অবিরাম সংগ্রাম - এর প্রতিকূল শক্তি - এমন শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যারা সফলভাবে বিরোধিতা না করলে এটি ধ্বংস করে দেবে। বাহ্যিক পরিবেশে তাপমাত্রার ব্যাপক তারতম্য দেখা যায়। কখনও কখনও এটি মানুষের জন্য খুব ঠান্ডা, কখনও কখনও এটি খুব গরম। শরীরের হোমিওস্ট্যাটিক প্রক্রিয়াগুলি সাধারণত শরীরের তাপমাত্রাকে স্বাভাবিক স্তরে রাখে। এগুলি ছাড়া, মানবদেহ পুড়ে যাবে বা হিমায়িত হয়ে মারা যাবে। আবার, শরীর বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিকারক জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় যা এটিকে ধ্বংস করার প্রবণতা রাখে। যতক্ষণ মানুষ বেঁচে থাকে, ততক্ষণ সে এই ধ্বংসাত্মক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়। সংগ্রাম কেবল মৃত্যুর সাথেই শেষ হয়। তবে, কেবল শারীরিক স্তরেই নয় যে সংগ্রামটি পরিচালিত হয়। নৈতিক স্তরেও, তাকে ধ্বংসাত্মক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় যা তার আত্মাকে ভেঙে ফেলবে এবং ব্যাহত করবে। এখানে সমস্যাটি আরও কঠিন এবং জটিল, কারণ আত্মাকে বহির্বিশ্বের ধ্বংসাত্মক শক্তির সাথে লড়াই করতে হয় এবং সেই সাথে মানুষের মধ্যে উত্থিত হীন পশুত্বের আবেগের সাথেও লড়াই করতে হয় যা প্রতিরোধ না করা হলে। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সাহায্যের জন্য চারপাশে তাকায় কারণ শত্রুকে দূরে রাখা তার পক্ষে প্রায়শই কঠিন হয়ে পড়ে। কোরআনের ঐশ্বরিক নির্দেশনা মানুষকে নৈতিক সংগ্রামে কার্যকর সাহায্য প্রদান করে। এই সাহায্য একটি নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুসারে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচির প্রথম অংশটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং প্রতিরোধমূলক হতে পারে। এটি মানুষকে ধ্বংসাত্মক শক্তির প্রকাশ্য এবং প্রতারণামূলক উভয় আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। কোরআনে এই সাহায্যের রূপকে মাগফিরাহ বলা হয়েছে। গাফরুন অর্থ "ঢেকে রাখা" এবং মিগফার, যা এর থেকে উদ্ভূত হয়েছে তার অর্থ হল শিরস্ত্রাণ যা শত্রুর আঘাত থেকে যোদ্ধার মাথাকে রক্ষা করে। কোরআন ধ্বংসাত্মক শক্তির আঘাত থেকে মানুষের আত্মাকে একইভাবে কার্যকরভাবে রক্ষা করে। মানুষ যখন নিজেকে ধ্বংসাত্মক শক্তির ভয়াবহ সারির মুখোমুখি দেখতে পায় তখন সে বুয়া

হয়ে যায়। সে দুর্বল হতে শুরু করে এবং হতাশার দিকে ঠেলে দেয়। ঐশ্বরিক কর্মসূচি তার নৈতিক শক্তির ভাণ্ডার পূরণ করে এবং বিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করে তাকে যুদ্ধের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধা দেয়।

তার হৃদয়ে এই ধারণা জাগে যে, হক্ব, যদিও এই মুহূর্তে দুর্বল, অবশেষে বাতিলের উপর জয়লাভ করবে। অনেকে বাতিলের শক্তির বিরুদ্ধে অসহায় বোধ করতে পারে কিন্তু যখন ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ তার হৃদয়ে ঈমান ও সাহস সঞ্চার করে, তখন সে নতুন আত্মবিশ্বাস ও আশা নিয়ে ময়দানে প্রবেশ করে। এইভাবেই প্রোগ্রামের প্রথম অংশ তাকে সাহায্য করে। দ্বিতীয় অংশ, কোরআনের পরিভাষায় তওবা, নিরাময়কারী। অনেকে হয়তো বাতিলের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং ভুল পথে চলে গেছে। তবুও, কোরআন বলে, তাদের পরিস্থিতি আশাহীন নয়। তওবা তাদের জন্য একটি নিশ্চিত প্রতিকার প্রদান করে। তওবা মূল "তা'বা" থেকে উদ্ভূত যার অর্থ ফিরে আসা। অতএব, তওবা অর্থ নিরর্থক অনুশোচনা বা নিরর্থক অনুশোচনা নয়। এর অর্থ হল যখন মানুষ বুঝতে পারে যে সে ভুল পথে চলেছে, তখন তার থামার এবং তার পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করার সাহস থাকা উচিত। এই অর্থে তওবা মানে হৃদয় অনুসন্ধান, পরিস্থিতির পুনর্মূল্যায়ন এবং সে যে নীতি অনুসরণ করছে তার পুনর্মূল্যায়ন। ধরুন, একজন মানুষ হঠাৎ বুঝতে পারে যে সে যে পথ অনুসরণ করছে তা তাকে তার আসল লক্ষ্য থেকে আরও দূরে নিয়ে যাচ্ছে। যদি সে জ্ঞানী হয়, তাহলে সে কেবল বসে থাকবে না এবং নিজেকে অবাধ শোকের কাছে সমর্পণ করবে না। এটি দৃঢ়ভাবে তার শুরুর বিন্দুতে ফিরে যাবে এবং যখন সে সেখানে পৌঁছাবে, তখন সে যথাযথ বিবেচনার পর একটি নতুন পথ বেছে নেবে।

নৈতিক স্তরে তওবাও একই রকম বুদ্ধিমান আচরণের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু তওবাতে ঐশ্বরিক সাহায্যের একটি উপাদান রয়েছে। যে ব্যক্তি তার ভুল বুঝতে পেরেছে এবং তা সংশোধন করতে আগ্রহী, তাকে তার নিজস্ব সম্পদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় না। ঐশ্বরিক নির্দেশনার আকারে তাকে অবাধ ঐশ্বরিক সাহায্য দেওয়া হয় যা কখনও ভুল করে না। অন্যথায়, তার সময় নষ্ট করার অনুভূতি এবং তার পরবর্তী প্রচেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে অনিশ্চয়তার অনুভূতি তার উপর ভারী হবে এবং সঠিক পথে ফিরে আসার তার প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করবে। তওবার সাথে যুক্ত ঐশ্বরিক সাহায্য তাকে সতেজ এবং পুনরুজ্জীবিত করে যাতে সে পুনরায় দ্বিগুণ শক্তির সাথে কাজ করে। সংক্ষেপে, মাগফিরাহ একজন মানুষকে শারের আঘাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে, কিন্তু যখন সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তখন তাওবা ক্ষতি মেরামত করতে সাহায্য করে। এটা প্রয়োজন যে তাওবা অনুশোচনার একটি নিষ্ক্রিয় কাজ নয়; এটি হারানো অবস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য ইতিবাচক প্রচেষ্টা, আশা এবং আত্মবিশ্বাস থেকে শক্তির পুনরুত্থান। তাওবা কেবল ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে সরে আসা নয়; এটি তার পরিণতি বাতিল করা। কোরআন বলে। দেখো, সৎকর্ম মন্দ কাজ বাতিল করে দেয় (১১:১১৪)

এইভাবে তাওবা মানুষের গঠনমূলক শক্তিকে শক্তিশালী করে এবং তাদের ধ্বংসাত্মক কাজের কারণে সৃষ্ট নিজের ক্ষতি মেরামত করতে সক্ষম করে। কোরআন মানুষকে আশ্বস্ত করে যে, যদি সে বড় বড় বিষয়ে নিজেকে শারের কাছে সমর্পণ না করে, তবে তার ক্ষুদ্র ত্রুটিগুলি তার লক্ষ্যে অগ্রগতিতে বাধা হতে পারবে না।

আর যদি তোমরা সেইসব মহৎ কাজ থেকে বিরত থাকো যা তোমাদের নিষিদ্ধ, তাহলে আমরা তোমাদের ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদেরকে একটি মহৎ দরজায় প্রবেশ করাবো (৪:৩২)

যেহেতু তোমাদের মহৎ কাজের গঠনমূলক ফলাফল তোমাদের ভুলত্রুটির ধ্বংসাত্মক পরিণতির চেয়েও বেশি।

**৪. উপসংহার**

আমরা তখন থেকে পরিত্রাণের দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করেছি। দেখা যাবে যে কোরআনে বর্ণিত পরিত্রাণের ধারণাটি কিছু মহলে পলায়নের নেতিবাচক এবং অনুর্বর ধারণার বিপরীতে একটি ইতিবাচক অর্জন। পরেরটি মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণা এবং পৃথিবীর সাথে তার সম্পর্কের ভুল ধারণা থেকে উদ্ভূত। এটি মানুষকে বিকৃত জগতে কলঙ্কিত আত্মার প্রতিবন্ধকতার সাথে অশান্তিতে ফেলে দেয়, যা যুদ্ধ ত্যাগ করে তা থেকে পালিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় দেয়। কেন এত নিরর্থক পর্যায় তৈরি করা?

ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য পৃথিবীতে চলছে, যার উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যের অনুরূপ যার জন্য আত্মাকে দান করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে, তার বিরুদ্ধে প্রতিকূলতা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে বাধাগুলি তাকে হতাশ করার জন্য নয়, বরং তার মধ্যে সর্বোত্তমকে ডাকতে আগ্রহী। এগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে মানুষ তার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে এবং তার অদম্য মনোবলকে তার সমস্ত মহিমায় প্রকাশ করতে পারে। মানুষ বাধা অতিক্রম করার সময় তার ক্ষমতা বিকাশ করে। হতাশা তাকে তার ব্যক্তিত্ব পুনর্গঠন করতে বাধ্য করে। তিরস্কার এবং বাধা তাকে শক্ত এবং শক্ত করে এবং তাদের মুখোমুখি হয়ে সে একটি পরিণত ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। তাই আমরা দেখতে পাই যে পৃথিবীও মাঝে মাঝে কঠোর এবং নির্দয় বলে মনে হয়, শেষ পর্যন্ত এটি মানুষের শত্রু নয় বরং তার মিত্র হয়ে ওঠে।

নিশ্চিতভাবেই মানুষ প্রায়শই বিপথগামী হয়। স্বাধীন সত্তা হিসেবে, এটি তার বিশেষাধিকার। যখন সে ভুল করে, তখন তাকে এর মূল্য দিতে হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় সে বুঝতে পারে যে তার কর্মের জন্য সে সম্পূর্ণরূপে দায়ী এবং সে যে স্বাধীনতা উপভোগ করে তা বাস্তব এবং মায়াময় নয়। ভুল করা মানুষের কাজ, এবং মানুষের বারবার ভুল করা স্বাভাবিক। যদি সে ভুল করে, তবে তার স্বভাব কলঙ্কিত হয়, কিন্তু

দাগ দূর করা যেতে পারে। যদি সে তার ভুল বুঝতে পারে এবং আন্তরিকভাবে তার ভুলের জন্য সংশোধন করার চেষ্টা করে, তবে সে তার ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে পারে। এটিই সেই সত্য যা কোরআনে স্পষ্টভাবে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। কোরআন আশার সুসমাচার। এটি মানুষকে হতাশার পথ ছেড়ে দিতে নিষেধ করে। একজন মানুষ বছরের পর বছর ধরে ভুল জীবনযাপন করতে পারে কিন্তু যদি সে দৃঢ়তার সাথে সঠিক দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সঠিক পথে চলতে থাকে, তাহলে সে তা করবে না।

আত্ম-উপলব্ধির পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। সঠিক কর্ম ভুল কর্মকে বাতিল করে দেয়। যে ব্যক্তি রক্ষা পায় সে এমন নয় যে কখনও ভুল করেনি, যা অসম্ভব, বরং যার সঠিক কর্ম তার ভুল কর্মের চেয়েও বেশি। কোরআন বলে: তাহলে যাদের পাল্লা ভারী, তারাই সফল। আর যাদের পাল্লা হালকা, তারাই সফল যারা নিজেদেরকে হারায় (২৩: ১০২-১০৩)।

নিজের আত্মাকে বাঁচানো বা হারানোর অর্থ আসলে কী? এই বাক্যাংশগুলি কেবল তখনই বোধগম্য হয় যখন মানুষের আত্মার লক্ষ্য-অনুসন্ধানমূলক কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত হয়। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে গভীর তাড়না হল আত্ম-বিকাশ এবং আত্ম-উপলব্ধির জন্য। যখন সে এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রগতি করে, তখন সে খুশি বোধ করে এবং জানে যে সে অস্তিত্বের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য নিজেকে যোগ্য করে তোলার পথে রয়েছে। কারণ আত্মা কার্যকলাপের মধ্যে এবং এর মাধ্যমে বাস করে, এবং এর স্বাভাবিক কার্যকলাপ সর্বদা ঊর্ধ্বমুখী। নিষ্ক্রিয়তা হল আত্মার মৃত্যু, এবং নিম্নগামী গতিও তাই। যখন মানুষের সত্ত্বা লক্ষ্যের দিকে অবিচলভাবে অগ্রসর হয়, তখন মাঝে মাঝে বিচ্যুতি এবং পশ্চাদপসরণের সাথে এটি হতে পারে, কিন্তু এটি ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়, যতক্ষণ না এটি নিজেকে জান্নাত বা স্বর্গের প্রতীক হিসাবে এমন একটি অবস্থায় খুঁজে পায়। যে চিত্রকল্পের মাধ্যমে এটিকে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে যে এটি এমন একটি স্থান যা ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্তি প্রদান করে। এটি কোনও স্থান নয় বরং মনের একটি অবস্থা, পরিপূর্ণতার অনুভূতি এবং উচ্চ আকাঙ্ক্ষার অনুভূতিতে ভরপুর একটি অবস্থা। এটি পর্বতারোহীর সেই অনুভূতির অনুরূপ যা তিনি ক্লান্তিকরভাবে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওঠার এবং পাথর এড়িয়ে যাওয়ার পরে অবশেষে উচ্চ শিখরে পৌঁছান। উচ্চতর শিখরগুলি তার দৃষ্টিতে সাঁতার কাটে এবং তাকে নতুন বিজয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। তার জন্য এটি অবিলম্বে একটি যাত্রার সমাপ্তি এবং আরেকটির সূচনা। সফল কর্ম সাফল্যে তার আনন্দ অ্যাডভেঞ্চারের জন্য নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কারের উত্তেজনার রোমাঞ্চের সাথে মিশে যায়। যারা মানব স্তরে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন এবং আরও উচ্চতর স্তরে আরোহণের জন্য প্রস্তুত তাদের মনের অবস্থাও এমন।

এর ঠিক বিপরীত মনের অবস্থাকে জাহান্নাম বলা হয়েছে। এটি হিব্রু শব্দ "গেহেন্না" এর আরবি রূপ। মূলত "গেহেন্না" বলতে বোঝাত হান্নমের উপত্যকা, যেখানে বাল ও মোলোকের উদ্দেশ্যে মানুষের বলিদান করা

হত। ১ "জাহান্নাম" অস্তিত্বের সেই অবস্থার প্রতীক যেখানে আত্মার উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপ স্থবির হয়ে পড়ে।

ক্রমাগত এবং অবিরাম অন্যায় কাজের ফলে দুর্বল এবং দুর্বল হয়ে পড়ে, আত্মা উন্নতির এবং উচ্চতর অস্তিত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অগ্রগতির জন্য তার আকাঙ্ক্ষা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং উদ্বিগ্ন আত্মা অনুশোচনা এবং অনুশোচনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। এটি স্বেচ্ছায় ভালোর সাধনায় অংশগ্রহণের অধিকার ত্যাগ করেছে। যদি এটি কখনও মুক্ত আত্মার মিলনে পুনরায় যোগদানের আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে, তবে হতাশা এবং নিষ্ক্রিয়তার আবরণ থেকে এটিকে বের করে আনার জন্য আকাঙ্ক্ষা এতটাই দুর্বল যে এটিকে আশার সাথে তাকানোর কিছু নেই। কবি রবার্ট ফ্রস্টের ভাষায়, এর আছে: গর্বের সাথে পিছনে তাকানোর কিছু নেই এবং আশার সাথে দেখার কিছু নেই।

কোরআনে বলা হয়েছে: যখনই তারা তাদের যন্ত্রণার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে, তখনই তাদেরকে জান্নাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে (২২:২২)। জান্নাতের বাসিন্দাদের এই হতাশার আভাস থেকে রেহাই দেওয়া হবে: তারা এর সামান্যতম শব্দও শুনতে পাবে না (২১:১০২)।

তারা তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে, অস্তিত্বের মাপকাঠিতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে এবং আত্ম-তৃপ্তির আনন্দ পরীক্ষা করবে। তাদের আত্ম-বিকাশের প্রক্রিয়াটি অবিরাম এবং সীমাহীন হবে। যখন তারা একটি উচ্চ স্তরে পৌঁছাবে, তখন আরও উচ্চতর স্তরের দৃষ্টি তাদেরকে নতুন প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। তাদের জন্য বিজয়ের পুরস্কার সু-অর্জিত বিশ্রাম নয় বরং কর্মের জন্য বৃহত্তর উৎসাহ এবং তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য একটি নতুন দৃশ্য হবে।

কোরআন মানুষের উন্নতির জন্য স্বর্গ ও নরকের চিত্রটি এমনই উপস্থাপন করে। কোরআন কর্তৃক সমর্থিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, মুক্তি "মন্দ" থেকে মুক্তি নয়; নিজেদের মধ্যে বা পৃথিবীতে মন্দ। মুক্তি অর্জন হল অস্তিত্বের উচ্চতর স্তরে প্রবেশের জন্য নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করা। পুরষ্কার এবং শাস্তি ভুলভাবে বাহ্যিক উৎস থেকে আসা বলে ধারণা করা হয়। এগুলো হলো আমরা যা করি এবং চিন্তা করি তার স্বাভাবিক পরিণতি এবং আমাদের আত্মার সমৃদ্ধি বা দরিদ্রতার মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করে। স্বর্গ এবং নরক আমাদের বাইরে, বাইরের কোথাও বিদ্যমান নয়। এগুলি হলো আত্মার অবস্থা। নরক হলো সেই অবস্থা যেখানে আত্মা তার অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। স্বর্গ হলো সেই অবস্থা যেখানে আত্মার বিকাশের পথ উন্মুক্ত থাকে। আকাঙ্ক্ষা বন্ধ করা মানে নরকে যাওয়া, আকাঙ্ক্ষা করতে সক্ষম হওয়া মানে স্বর্গে থাকা।

অতএব, ইসলামে সুপারিশ এবং মুক্তির কোন স্থান নেই। আমরা যা হয়ে উঠি, আমরা আমাদের নিজস্ব কর্মের মাধ্যমেই হয়ে উঠি। আমরা অন্য কারো বোঝা বহন করতে পারি না এবং কেউ আমাদের বহন করা বোঝা থেকে মুক্তি দিতে পারে না। পাপের ধারণাটিকেও এমনভাবে সংস্কার করতে হবে যাতে এটিকে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায়। পাপকে জন্ম থেকেই আত্মার সাথে লেগে থাকা মন্দের কলঙ্ক হিসেবে কল্পনা করা উচিত নয়, এটি আমাদের পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকার বা আমাদের পূর্বজন্মের ফল। পাপ হলো আমাদের নিজের ভুলের উপর আমাদের নিজের উপর যে খারাপ প্রভাব পড়ে। এটি আমাদের নিজস্ব সঠিক কর্ম দ্বারা মুছে ফেলা যেতে পারে, অন্য কারো কর্ম দ্বারা নয়। যদি আমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে, অমনোযোগীভাবে অথবা এমনকি চোখ খোলা রেখেও অন্যায় করে থাকি, তাহলে আমরা এই প্রতিকার আমাদের হাতে রয়েছে এই প্রতিফলন থেকে সান্ত্বনা পেতে পারি।

পরিশেষে আমরা "অন্যায়" - আ'মাল-উস-সায়্যিয়া - কে এমন একটি কর্ম হিসাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি যা নফসকে দুর্বল করে, তার স্বাধীনতাকে খর্ব করে, তার স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে এবং বিকাশের জন্য তার আকাঙ্ক্ষাকে দুর্বল করে। অক্ষম ক্রোধ, অসহায় শোক বা আত্ম-ক্ষোভের মাধ্যমে এর প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখানোর কোনও লাভ হয় না। সঠিক প্রতিক্রিয়া হল আমাদের ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের জন্য দৃঢ় প্রচেষ্টা করা এবং দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে সঠিক পথ অনুসরণ করা। আমাদের এটাও মনে রাখা উচিত যে আমাদের চূড়ান্ত সাফল্য আমাদের পাপহীনতার উপর নয় বরং ভুলের উপর আমাদের সঠিক কর্মের প্রাধান্যের উপর নির্ভর করে। "পাপের অনুভূতি" হল অসুখের অন্যতম প্রধান উৎস। কোরআন দ্বারা প্রদত্ত দুর্বল আত্মার প্রতি সুস্থ মনোভাব দুঃখ এবং উদ্দেশ্যের দুর্বলতার বিরুদ্ধে নিশ্চিত সুরক্ষা। এটি যোগ করা যেতে পারে যে জান্নাত এবং জাহান্নাম মৃত্যুর পরেও আটকে থাকে না; তারা এই জীবনে নিজেদের প্রকাশ করে এবং পরেও অব্যাহত থাকে। পরবর্তী অধ্যায়ে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করা হবে।

### *তথ্যসূত্র*

১. আরবি অভিধান, মুহিত-উল-মুহিত

# অধ্যায় ১০

## বেঁচে থাকা বা জীবন যাপন: ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত

**১. জীবনের প্রতি মানুষের আবেগ**

অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত। সে আবেগের সাথে জীবনকে আঁকড়ে ধরে এবং বিলুপ্তির সম্ভাবনা থেকে আতঙ্কিত হয়। সে সবকিছুর উপরে জীবনকে মূল্যবান বলে মনে করে এবং এর সংরক্ষণ এবং দীর্ঘায়িতকরণের জন্য এমনকি যন্ত্রণা ও দুর্দশার ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ মূল্য দিতে ইচ্ছুক। শতাব্দী ধরে, সে অক্লান্তভাবে জীবনের অমৃত খুঁজছে যা তাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য তার জীবনকে দীর্ঘায়িত করতে সক্ষম করতে পারে। হতাশা তাকে কেবল আরও বেশি প্রচেষ্টা করতে অনুপ্রাণিত করেছে। জীবনের প্রতি মানুষের আবেগের কোন সীমা নেই। সে বেঁচে থাকতে চায়, যাই হোক না কেন। অবশেষে মানুষ বুঝতে পারল, এবং এই উপলব্ধি তার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল যে, মৃত্যু অনিবার্য এবং তার পার্থিব জীবন, আজ হোক কাল হোক, শেষ হতেই হবে। সে বুঝতে পারল মৃত্যু এড়ানোর তার প্রচেষ্টার নিরর্থকতা, তবুও জীবনের আকাঙ্ক্ষা তার দূরবর্তী পূর্বপুরুষের বুকে যতটা তীব্রভাবে জ্বলছিল, ততটাই তীব্রভাবে জ্বলছিল। আমাদের বলা হয়েছে যে, শয়তান আদমের অমরত্বের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগিয়ে তাকে পুণ্যের পথ থেকে বিচ্যুত করেছিল। সে আদমকে আশ্বস্ত করেছিল যে নিষিদ্ধ ফলটি আস্বাদন করার মুহূর্তে সে অমর হয়ে যাবে। আদম প্রলোভন প্রতিরোধ করতে পারেনি। কোরআনে গল্পটি রূপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: কিন্তু শয়তান তাকে ফিসফিসিয়ে বলল, "হে আদম! আমি কি তোমাকে অমরত্ব এবং শক্তির এমন একটি বৃক্ষ দেখাবো যা কখনও নষ্ট হয় না?" এবং (আদম এবং তার স্ত্রী) তা খেয়ে ফেলল, যাতে তাদের "লজ্জা" তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল এবং তারা জান্নাতের কিছু পাতা নিজেদের উপর স্তূপ করে লুকিয়ে থাকতে শুরু করল। এবং আদম রবের অবাধ্য হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল (২০: ১২০-২১)।

আদম সাধারণভাবে মানুষকে চিত্রিত করেছেন, শয়তান (শয়তান) অপমান ও ধ্বংসের শক্তিকে চিত্রিত করেছেন। এইসব দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে মানুষ প্রায়শই অমরত্বের সংক্ষিপ্ত পথ খুঁজেছে এবং সেই পথ ত্যাগ করেছে যা দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর হলেও তাকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যায়।

মানুষ এই জ্ঞানের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল যে মৃত্যু দুটি ভিন্ন উপায়ে অনিবার্য। কিছু কঠোর এবং অভিজ্ঞতাবাদী মানুষ তাদের সমস্ত আশা এই সংক্ষিপ্ত পার্থিব জীবনের উপর কেন্দ্রীভূত করেছিল এবং মৃত্যুর বাইরে তাকাতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল জীবনের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা, প্রতিটি মুহূর্তকে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করা, তাদের চূড়ান্ত ভাগ্যের চিন্তায় অস্থির না হয়ে। প্রতিটি মুহূর্ত

ছিল আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতায় পূর্ণ এবং মৃত্যু নিকটবর্তী এই চিন্তা তাদের জীবনে আনন্দকে তীব্রতর করেছিল। তারা বর্তমানে বাস করত এবং ভবিষ্যতের দিকে তাদের চিন্তাভাবনা ঘুরিয়ে দিতে অস্বীকার করত, যা তারা বিশ্বাস করত, কখনও তাদের হতে পারে না।

তবে, বেশিরভাগ মানুষের জন্য অমরত্বের মোহ আগের মতোই শক্তিশালী ছিল। মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়ার তাদের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে তারা মৃত্যুর পরেও কীভাবে জীবন সম্ভব হতে পারে তা নিয়ে অনুমান করতে শুরু করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের বিশ্বাসকে সম্মিলিতভাবে বেঁচে থাকার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন - যদিও তারা ব্যক্তিগতভাবে মারা যেতে পারে, তবুও তারা তাদের সন্তানদের এবং তাদের সন্তানদের জীবনে কোনওভাবে বেঁচে থাকতে পারে। তাদের পার্থিব জীবন শেষ হতে পারে কিন্তু তারা তাদের সন্তানদের কাছে যে জীবন সঞ্চার করেছিল তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থায়ী হতে পারে। এই বিশ্বাস তাদের সান্ত্বনা প্রদান করেছিল। এটি মানুষের তার বংশধরদের প্রতি গর্বের একটি কারণ। কোরআন তার জন্মদাতাদের মধ্যে মানুষ যে আনন্দ অনুভব করে তার কথা উল্লেখ করে: মানবজাতির জন্য সুশোভিত করা হয়েছে স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে আসা আনন্দ এবং সোনা ও রূপার স্তূপ, চিহ্নের ঘোড়া, গবাদি পশু এবং কৃষিকাজের প্রতি ভালোবাসা। এটাই এই পৃথিবীর জীবনের আরাম, কিন্তু আল্লাহ: তাঁর কাছে আরও উত্তম আবাসস্থল (৩:১৩)।

এটা স্পষ্ট যে এটি সেই অমরত্ব নয় যা মানুষ আসলে কামনা করে। সে যা চায় তা হল তার শরীরের একটি অংশ সংরক্ষণ নয় বরং তার ব্যক্তিত্বের ধারাবাহিকতা। সম্মিলিতভাবে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে, "আমি" অদৃশ্য হয়ে যায়। একজন মানুষ তার সন্তানদের কাছে যে জীবন মশাল সঞ্চার করেছে তা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহন করা যেতে পারে, কিন্তু যে "আমি" সে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান বলে মনে করত এবং স্থায়ী করতে চেয়েছিল, তা মৃত্যুর মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। মানুষ সামষ্টিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য নয় বরং তার ব্যক্তিগত সত্তার অমরত্বের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। এটিকে সে তার অধিকার হিসেবে দাবি করতে পারে না, এবং উচ্চতর সত্তার কাছ থেকে উপহার হিসেবেও গ্রহণ করতে পারে না। কেবল তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মানুষ তার অহংকারের জন্য অমরত্ব অর্জন করতে পারে। সে মৃত্যুকে জয় করতে পারে, তবে কেবল নিজেকে সেই মাত্রায় বিকশিত করে যেখানে সে মৃত্যুর ধাক্কা সহ্য করতে পারে। যেমন কোরআন বলে: তিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যাতে প্রমাণ করা যায় যে তোমাদের মধ্যে কে আচরণে সর্বোত্তম ৬৭:২।

উপরে উদ্ধৃত আয়াতটি একটি মহান সত্যকে ধারণ করে। এটিকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার জন্য, আমাদের অবশ্যই এর সমস্ত দিক বিবেচনা করতে হবে। মৃত্যু একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। এটি একটি শারীরিক পরিবর্তন যা মানবদেহকে অতিক্রম করে। পিতামাতার জীবন কোষের মিলনের মাধ্যমে দেহের উৎপত্তি

হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর ধরে এটি পরিপক্কতা এবং অনুশীলনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত হতে থাকে। চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর পর, এটি ক্ষয় এবং ক্ষয় হতে শুরু করে। বিভাজনের প্রক্রিয়াটি মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয়। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে কি যা দেহের বিলুপ্তির পরেও বেঁচে থাকে। এর উত্তর হল, দেহের ম্যাট্রিক্সে বেড়ে ওঠা এবং বিকশিত সত্তা এটি থেকে বেঁচে থাকতে পারে এবং দেহের বিভাজনের পরে, একটি নতুন কর্মজীবন শুরু করতে পারে। আমরা, কোনওভাবেই, এই পরামর্শ দিই না যে তার সমস্ত সত্তার ক্ষেত্রে সত্য। আমরা স্বীকার করি যে কিছু খ্যাতিমান দার্শনিক এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন যে সত্তা তার প্রকৃতি অবিনশ্বর।

ম্যাকট্যাগার্ট, শুধুমাত্র একটির কথা উল্লেখ করার জন্য, তার লেখায় এই দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছেন এবং এমন যুক্তি দিয়ে এটিকে সমর্থন করেছেন যা দার্শনিক মহলে মনোযোগের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত নই কারণ এটি মানব সত্তার ভাগ্য সম্পর্কে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ম্যাকট্যাগার্টের অবস্থানের প্রতি এই মনোভাব গ্রহণ করার সময়, আমরা দুটি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছি। প্রথমত, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আত্মার পূর্ব-অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত, যার পক্ষে বিন্দুমাত্র প্রমাণ নেই: দ্বিতীয়ত, এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সাথে সাথে, আত্মা যা করে তা থেকে তার অস্তিত্বের উপর জোর দেওয়া হয়। আত্মার ভাগ্যের জন্য নৈতিক কার্যকলাপ আর গুরুত্বপূর্ণ থাকে না।

মনে হয়, আত্মা অমরত্বের নিশ্চয়তা পায়, এই পৃথিবীতে যে ধরণের জীবন, সৎ বা দুষ্ট, তা নির্বিশেষে। কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি হল যে অমরত্বকে হালকাভাবে নেওয়া যায় না। এটি এমন পুরস্কার যা আত্মা সঠিক আচরণ এবং তার সম্ভাবনা উপলব্ধি করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। আত্মা পুরস্কার জিততে পারে অথবা হারাতে পারে। বিষয়টি তার প্রচেষ্টার গুণমান এবং তীব্রতার উপর নির্ভর করে এবং অন্য কোনও বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। যে আত্মা সঠিক ধরণের জীবনযাপন করেছে, তার জন্য মৃত্যুর কোনও ভয় নেই। কোরআন এই বিষয়টি স্পষ্ট করে। "মহা ভয়াবহতা তাদের শোক করবে না" (২১: ১০৩)। ইচ্ছার সঠিক অভিমুখ এবং সঠিক কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আত্মা অমরত্ব অর্জন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অধ্যাপক গ্যালোওয়ের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ভিন্ন নয়, যেমনটি নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে দেখা যাচ্ছে।

মানুষের আদলে গঠিত প্রতিটি প্রাণী, যতই নিষ্ঠুর বা অনুন্নত হোক না কেন, অমরত্বের জন্য নির্ধারিত, আমরা নিশ্চিত করার চেয়েও বেশি কিছু। এটি করার জন্য আমাদের যতটুকু ঐশ্বরিক অর্থনীতি আছে তার চেয়েও গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন হবে। আমরা লটজের সাথে একমত, "যদি প্রতিটি সৃষ্ট জিনিস চলতে থাকবে যদি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা পৃথিবীর অর্থের সাথে সম্পর্কিত হয়: যে সমস্ত কিছুরই অনুমোদিত স্থান ছিল কেবল বিশ্বের গতিপথের একটি ক্ষণস্থায়ী পর্যায়ে।" [১]

লটজের অবস্থান মূলত আমাদের নিজস্ব অবস্থানের মতোই। যে সত্তা, পরম মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে, মহাবিশ্বের অর্থ এবং উদ্দেশ্যের সাথে প্রাণবন্তভাবে নিজেকে যুক্ত করেছে, সে মৃত্যুকে একটি উচ্চতর স্থানে স্থানান্তর হিসাবে পাবে।

**২. জীবন এবং মৃত্যু**

কোরআন জোর দিয়ে বলে যে মৃত্যু চূড়ান্ত পরিণতি নয় বরং বিভিন্ন ধরণের জীবনের প্রবেশদ্বার: আমরা তোমাদের মধ্যে মৃত্যুকে পরিমাপ করি। যাতে আমরা তোমাদের রূপান্তরিত করতে পারি এবং তোমাদের এমন কিছু করতে পারি যা তোমরা জানো না। আর তুমি তো প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে জানো। তাহলে আমরা কেন চিন্তা করি না? (৫৬: ৬১-৬৩)

প্রকৃত সত্তা, দেহের অংশ না হওয়ায়, ভৌত আইনের অধীন নয়। ভৌত জগতে কাজ করার জন্য এটি শরীরের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু দেহের ধ্বংসের পরেও এটি বিদ্যমান থাকতে পারে, এর যন্ত্র: আর তারা বলে, যখন আমরা হাড় ও ধূলিকণায় পরিণত হব, তখন কি আমরা সত্যিই নতুন সৃষ্টিতে পুনরুত্থিত হব? বলো: তোমরা পাথর, লোহা অথবা তোমাদের অন্তরে (পুনরুজ্জীবিত হওয়ার জন্য) আরও অসম্ভব পদার্থ হও। কিন্তু তারা বলবে: কে আমাদের ফিরিয়ে আনবে? বলো: যিনি তোমাদের প্রথমবারের মতো অস্তিত্বে এনেছেন (১৭: ৪৯-৫১)।

আমরা এই আয়াতের ব্যাখ্যা এইভাবে করি যে, সত্তা ভৌত শক্তির ফসল নয় এবং প্রাকৃতিক আইনের অধীন নয়। এর অস্তিত্ব ঐশ্বরিক আমরের কাছে ঋণী এবং তার দ্বারা পরিচালিত হয়। পরকালে, যেমন এই জীবনে, এটি দ্বারা টিকে থাকে এবং পরিচালিত হয় কারণ এটি বিবর্তন প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে। তাই, বিবর্তনের মাধ্যমে এটি যে স্তরে পৌঁছেছে সেখানে অস্তিত্ব এবং কাজ করার জন্য উপযুক্ত বা অযোগ্য হতে পারে।

নিঃসন্দেহে অনেক দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেন যে আত্মা দেহের বিলুপ্তির পরেও বেঁচে থাকতে পারে। তাদের যুক্তি এইভাবে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। অহংকারের পরিচয় স্মৃতির উপর নির্ভর করে এবং স্মৃতি স্নায়বিক টিস্যুর একটি কাজ।

যখন স্নায়বিক টিস্যু ধ্বংস হয়ে যায়, তখন স্মৃতির অস্তিত্ব বন্ধ হয়ে যায় এবং অহংও অদৃশ্য হয়ে যায়। আমরা আহ্বান জানাই যে মৃত্যুর পরের জীবনকে আত্মার বিবর্তনীয় অগ্রগতির সাথে সম্পর্কিত করে বোধগম্য করে তোলা হোক। অহং তার উৎপত্তিস্থলে আসে এবং শরীরের উপর নির্ভর করে বিকাশ লাভ

করে। তবে, এটি বিকাশের সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যেখানে এটি নিজেই চলতে পারে। একইভাবে, ইমাগো সেই ক্রিসালিসকে পরিত্যাগ করে যেখানে এটি বিকশিত হয়েছিল এবং একটি স্বাধীন কর্মজীবন শুরু করে। এটা সবই নির্ভর করে অহংকার দ্বারা অর্জিত বিকাশের মাত্রার উপর: আর তোমার জীবনে এমন কী ঘটেছে যে তুমি স্রষ্টার কাছ থেকে (আরও) ভারী কিছু আশা করো না, যখন তিনি তোমাকে ধীরে ধীরে আরোহণের মাধ্যমে বিকশিত করেছেন? (৭১: ১৩-১৪)

"ধীরে ধীরে আরোহণ" হল উপরের আয়াতের মূল শব্দ। আত্মা স্থির থাকে না বরং বিকাশের উচ্চতর পর্যায়ে ওঠার জন্য বোঝানো হয়। যখন এটি বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন এর অর্থ হবে যে এটি বিশ্বের অর্থের সাথে সম্পর্কিত এবং তাই, বিশ্ব এটিকে অতিরিক্তভাবে ফেলে দিতে পারে না।

### ৩. ইচ্ছা এবং কর্ম

আত্মার বিকাশের জন্য এবং তাই, এর বেঁচে থাকার জন্যও ইচ্ছা এবং কর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইচ্ছা এবং কর্ম আসলে একই প্রক্রিয়ার দিক। কর্ম "ইচ্ছা বাস্তবায়িত" এবং ইচ্ছা হল সুপ্ত কর্ম। এটি সত্যিই বলা হয়েছে "কোন ইচ্ছা নেই, কোন কর্ম নেই", কিন্তু বিপরীতটিও সত্য "কোন কর্ম নেই, কোন ইচ্ছা নেই"। এই অর্থে শুধুমাত্র একটি মুক্ত আত্মার "ইচ্ছা" থাকে এবং কেবলমাত্র এমন একজন ব্যক্তিই এমন কর্ম সম্পাদন করতে পারে যা বেঁচে থাকার সাথে প্রাসঙ্গিক। প্রাণীরা সহজাত প্রবৃত্তির বাধ্যবাধকতার অধীনে এবং তাদের কর্মের ফলাফলের পূর্বদর্শিতা ছাড়াই কাজ করে।

অতএব, আমরা যেমনটা বুঝি, তাদের ইচ্ছাশক্তির কৃতিত্ব দেওয়া যায় না। একইভাবে, প্রাণীর কার্যকলাপ কর্ম নয়। কর্ম হলো এমন কিছু যা একটি স্বাধীন সত্তা ইচ্ছাকৃতভাবে বেছে নিয়েছে এবং স্বেচ্ছায় সম্পাদিত হয়েছে। স্বাধীন সত্তা কর্মের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে এবং এর জন্য নিজেকে দায়ী করে। স্বাধীনতা এবং দায়িত্ব ছাড়া, এই সীমাবদ্ধ অর্থে কর্ম সম্ভব নয়। "ইচ্ছা এবং কর্ম" সম্পর্কে এই তথ্যগুলি বেঁচে থাকার প্রশ্নের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। মানুষ একটি দীর্ঘ বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ার ফসল। এই প্রক্রিয়াটি কোনও পর্যায়ে থামে না, বরং অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে থাকে। একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে, মানুষ এতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠে এবং তার স্বাধীন ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে, বিবর্তন প্রক্রিয়ার গতি এবং দিক উভয়ই নির্ধারণ করে। এই প্রক্রিয়া যা পৃথিবীতে অগণিত যুগ ধরে কাজ করে আসছে তা এখন অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত এবং অর্থপূর্ণ কিছুতে রূপান্তরিত হয়েছে। এটি তার উপাদানের উপর, অর্থাৎ মানবতার উপরও আরও নির্ভরশীল হয়ে ওঠে যার মাধ্যমে এটি কাজ করে। আদিম জীবগুলি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা গঠিত এবং আকৃতি লাভ করেছিল, যাতে বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য উপযুক্ত হয়। এটি একটি দীর্ঘ এবং বেদনাদায়ক প্রক্রিয়া ছিল যেখানে অযোগ্যদের নির্মমভাবে আগাছা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছিল এবং অযোগ্যদের বিকাশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

মানুষ এখন প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভর করতে পারে না যে তাকে পরবর্তী পর্যায়ের জন্য উপযুক্ত করে তুলবে। তাকে সেই উচ্চতর স্তরে যেতে হবে যেখানে তাকে প্রবেশ করতে হবে। প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা বা এমনকি এলোমেলো কার্যকলাপের দ্বারাও তার সত্ত্বা পরিবর্তিত হয় না। এটি কেবল তার নৈতিক কার্যকলাপ, তার স্বাধীনভাবে নির্বাচিত এবং স্বেচ্ছায় সম্পাদিত কর্ম দ্বারা পরিবর্তিত হয়। যদি, সঠিক কর্মের মাধ্যমে, সে নিজেকে "ধীরে ধীরে আরোহণের" পরবর্তী পর্যায়ের জন্য উপযুক্ত করে তোলে, তবে সে জান্নাত বা স্বর্গে প্রবেশ করে, কারণ অস্তিত্বের প্রতিটি স্তর অবশ্যই নিম্ন স্তর থেকে আসা ব্যক্তির কাছে মনে হবে। অন্যদিকে, একজন অযোগ্য ব্যক্তি, এমন ভালো জিনিস দেখে যন্ত্রণা এবং দুঃখ অনুভব করে যা সে উপভোগ করতে পারে না, এমন সুযোগগুলি সে ব্যবহার করতে পারে না, তার নাগালের বাইরে একটি গৌরবময় জীবন দেখে। সে নরকে আছে। যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, স্বর্গ এবং নরক স্থান নয় বরং মনের অবস্থা। তবে, মনের অবস্থা ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় এটি একটি উপযুক্ত শব্দ নয়। স্বর্গ (জান্নাত) হলো ভবিষ্যতের জন্য উজ্জ্বল আবাসের সাথে মিলিত ফল। নরক (জাহান্নাম) হলো হতাশার অভিজ্ঞতা যা অনুশোচনা এবং অনুশোচনায় মিশে থাকে। যে ব্যক্তি তার আত্মাকে দুর্বল হতে দেয়, স্থবির হয়ে পড়ে এবং বিকৃত হয়ে যায়। সে জীবন এবং মৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে। সে বেঁচে থাকে না কারণ জীবন ঊর্ধ্বমুখী গতিতে চলে যা সে সক্ষম নয়: সে মরতে পারে না কারণ অনুশোচনা এবং হতাশাগ্রস্ত আকাঙ্ক্ষা তাকে জীবনের উপর তার দখল ত্যাগ করতে বাধা দেয়। অস্তিত্বের আনন্দ এবং অস্তিত্বহীনতার অনুভূতিহীনতা উভয়ই তাকে বঞ্চিত করা হয়। কোরআন তার সম্পর্কে বলে, "যেখানে সে মরে না, বাঁচে না" (৮৭:১৩) সে যা করতে পারে তা হল অনুশোচনা প্রকাশ করা যা তার প্রাণশক্তিকে কুঁচকে দেয়, "আহা! আমি যদি আমার জীবনের জন্য আগে থেকে কিছু পাঠিয়ে থাকতাম" (৮৯ : ২৪)। অন্যদিকে, জান্নাতের বাসিন্দারা তাদের সুখের প্রকাশ করবে। "আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কোথাও আমরা মরবো না" (৩৭:৫৭-৫৮)। তারা মৃত্যুর পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং তারা জানে যে তাদের আর একই পরীক্ষায় পড়তে হবে না। তাদের দৃষ্টি আত্ম-বিকাশের নতুন দৃশ্যের দিকে নিবদ্ধ এবং তাদের দিকে পরিচালিত পথটি "তাদের সামনে এবং তাদের ডানদিকে চলমান" ঐশ্বরিক আলো দ্বারা আলোকিত হয় (৫৭:১২)। বস্তুবাদীরা মনে করেন: "এই পৃথিবীতে জীবন ছাড়া আর কিছুই নেই। আমরা বেঁচে থাকি এবং মরে যাই এবং সময় ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না" (৪৫:২৪)। তবে কোরআন আমাদের বলে যে আমরা মাটির স্তরের অনেক উপরে উঠতে পারি এবং "আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা থেকে বেরিয়ে যেতে পারি" (৫৫:৩৩), যদি আমরা আমাদের মধ্যে সুপ্ত শক্তিগুলি বিকাশ করি। এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি একে অপরের সরাসরি বিপরীত: যারা খারাপ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমরা তাদের বিশ্বাসী এবং সৎকর্মশীলদের মতো করে দেব, তাদের জীবন ও মৃত্যুতে সমান! তারা কতটা খারাপ বিচার করে (৪৫: ২১)।

মোমিন ভালোর সন্ধানে অক্লান্ত থাকেন এবং চিরন্তন সত্যের উপর তার চোখ নিবদ্ধ রাখেন, মৃত্যুকে ভয় পান না। তিনি আনন্দের সাথে এটিকে স্বাগত জানান কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি মৃত্যুর ছায়া পেরিয়ে আরও পরিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ জীবনে প্রবেশ করবেন। কবি ইকবাল বলেছেন: আমি আপনাকে বলি কোন চিহ্ন দ্বারা আপনি প্রকৃত মোমিনকে চিনতে পারবেন। মৃত্যুর ভয়াবহ ভূত যখন কাছে আসে, তখন তিনি হাসিমুখে এটিকে স্বাগত জানান। (আরমুগান-এ-হিজাজ, পৃষ্ঠা ১৬৫)।

কারণ, তার কাছে মৃত্যু জীবনের শেষ নয় বরং আরও মহিমান্বিত জীবনের দ্বারপ্রান্ত। মোমিন মৃত্যুকে একটি পরীক্ষা হিসেবে দেখেন যা তাকে উচ্চতর জীবনে প্রবেশ করতে চলেছে তার যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ দেয়। ইহুদিরা দাবি করেছিল যে ইহুদি জাতির প্রতিটি সদস্য জান্নাতের জন্য পূর্বনির্ধারিত ছিল। সেক্ষেত্রে, কোরআন বলে, তাদের মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া উচিত, কারণ তাদের ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না: যদি আল্লাহর কাছে পরকালের আবাস (বাকি) মানবজাতি ছাড়া তোমাদের জন্য হয়, তাহলে যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করো (২: ৯৪)।

কোরআন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখে না যে জান্নাত কোন নির্দিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত নয় বরং কোরআনে বর্ণিত কল্যাণের সন্ধানে অবিচল থাকা এবং সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গকারী সকলের জন্য উন্মুক্ত।

**৪. অমরত্ব এবং অনন্তকাল**

তবে এটা মনে রাখা উচিত যে, অমরত্ব বলতে চিরকাল বোঝায় না। অনন্তকাল একমাত্র স্রষ্টার। অমরত্বের একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রণয়ন করাও আমাদের ক্ষমতার বাইরে। এটি অস্তিত্বের এমন পর্যায়গুলিকে বোঝায় যা মানুষের গণনার বাইরে। আমরা যা বলতে পারি এবং আমাদের যা জানা দরকার তা হল জীবনের কোন শেষ নেই। যখন আমরা একটি উচ্চতর স্তরে পৌঁছাই, তখন আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত হয়। জীবনের স্বভাব হলো অবিরাম এগিয়ে যাওয়া। যে সত্তার মধ্যে গতিশীলতা বাধাপ্রাপ্ত বা আটকে থাকে, সে নরকের আযাব ভোগ করে।*

(* এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে, "মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকা" এবং "অমরত্ব" এর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যদিও বেঁচে থাকা প্রতিটি মানুষের জন্য যারা আত্ম-সচেতনতা অর্জন করেছে, অমরত্ব কেবল তাদের জন্য যারা তাদের সত্তাকে বিকশিত করেছে এবং এভাবে মৃত্যুর পরে জীবনের উচ্চতর স্তরের জন্য নিজেদের যোগ্য করে তুলেছে।)

এই মুহূর্তে, আমাদের নিজেদেরকে একটি ভুল ধারণা থেকে রক্ষা করা উচিত। নিঃসন্দেহে, আমরা পরকালে একটি ভাল জীবনের ফসল কাটাবো, তবে উচ্চতর মূল্যবোধের উপলব্ধির দিকে পরিচালিত কর্মগুলি এই জীবনেও প্রতিদান পায়। কোরআনের শিক্ষা কেবল পার্থিব নয়: এটি এই জগতকেও যথাযথ গুরুত্ব দেয়। সৎকর্ম জীবনকে উন্নত করে এবং আমাদেরকে অকৃত্রিম সুখের উপহার দেয়। উপলব্ধিকৃত মূল্যবোধের পূর্ণ ফলন কেবল পরকালেই সম্ভব হতে পারে তবে আমরা এই জীবনেও স্বর্গের আনন্দের পূর্বাভাস পেতে পারি। অবশ্যই, জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য বা ব্যর্থতা তখনই জানা যায় যখন সেই জীবন তার গতিপথে চলে যায়। জীবনের যেকোনো পর্যায়ে, পরবর্তী পদক্ষেপ সঠিক বা ভুল দিকে হতে পারে। জীবনের ভারসাম্য তখনই সম্ভব যখন এটি শেষ হয়। তবুও, এই জীবনে একজন ভালো মানুষের কাছ থেকে পুরষ্কার আটকে রাখা হয় না। তার ভালো কাজ তাকে শান্তি ও সুখ এনে দেয়। ভালো কাজ কেবল কর্তাকেই উপকৃত করে না। এর উপকারী প্রভাব বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত হয় এবং এটিকে একটি উন্নত স্থান, মঙ্গল, সৌন্দর্য এবং সত্যের আবাসস্থলে পরিণত করতে সাহায্য করে। ভালো মানুষ তার সহকর্মীদের সেবা করার মাধ্যমে নিজেকে উপলব্ধি করে। তাই, সে এমন একটি সামাজিক পরিবেশ তৈরিতে তার অবদান রাখে যেখানে সত্য ও ন্যায়বিচার বিরাজ করে এবং যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব উপায়ে নিজেকে প্রকাশ এবং বিকাশের অধিকার উপভোগ করে। এমন একটি সামাজিক পরিবেশ তৈরি করা সর্বদা ইসলামের লক্ষ্য। কিছু ধর্মীয় ব্যক্তি প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিদের মুক্তির সাথে উদ্বিগ্ন, আবার অন্যরা মানব সমাজের স্থিতিশীলতা এবং দক্ষতা নিয়ে ব্যস্ত। ইসলাম এমন একটি সামাজিক পরিবেশ তৈরি করতে চায় যেখানে মানব ব্যক্তিত্ব স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এবং তার পূর্ণ মর্যাদায় বিকশিত হতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়ে, আমরা সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবে ইসলামের মূল্য মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব।

### *তথ্যসূত্র*

১. দ্য গ্রেট ডিজাইন, পৃষ্ঠা ৩৫।

২. ঐ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫২।

৩. ইকবালের উদ্ধৃতি, দ্য রিকন্সট্রাকশন অফ রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম, পৃষ্ঠা ২।

৪. ইকবাল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১২০।

# অধ্যায় ১১
## মানব ব্যক্তিত্বের বিকাশ

**১. রবুবিয়্যাতের আইন**

যুগের পরিক্রমায়, এই ধারণাটি ধীরে ধীরে মানুষের মনে জাগ্রত হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে স্ফটিকিত হয়েছিল যে পৃথিবী কেবল পরিবর্তিত হচ্ছে না, বরং পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তনগুলি এলোমেলো নয়; বা অনিয়মিত নয়। তারা একটি দিক নির্দেশ করে। পরিবর্তনের মাধ্যমে, পৃথিবী তার আসল প্রকৃতি উন্মোচিত করছে: এই প্রক্রিয়ায়, এর মধ্যে যা অন্তর্নিহিত তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং যা লুকানো আছে তা আলোকিত হয়। উদ্দেশ্য একটি সোনালী সুতোর মতো—একটি বাঁধাই দড়ির মতো—বিশ্বজুড়ে। বিশ্বের পরিবর্তনের প্রগতিশীল দিকটি কিছু প্রাথমিক গ্রীক চিন্তাবিদদের নজর এড়ায়নি। গ্রীকরা ছিল একটি অস্বাভাবিক প্রতিভাবান জাতি এবং তাদের উর্বর কল্পনা, ঐতিহ্য এবং রীতিনীতি দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয়ে, মন এবং পদার্থের রাজ্যগুলি অন্বেষণ করেছিল। তাদের অস্থির মন সর্বদা নতুন তত্ত্ব গঠন করছিল এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা বিবর্তনীয় তত্ত্বের প্রত্যাশা করেছিল, যেমন তারা এই যুগের অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রত্যাশা করেছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের কৃতিত্ব হলো, স্পষ্ট প্রমাণ যোগ করে এটি একটি অস্পষ্ট অনুমানকে, যা ছিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের স্তরে, অথবা প্রায় প্রকৃতির একটি নিয়মে উন্নীত করেছে। পদার্থবিদ্যা একটি উন্নয়নশীল এবং সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের একটি চিত্র দেখায়। জীববিজ্ঞানীরা প্রোটোজোয়া এবং প্রোটোফাইটা থেকে হোমো সেপিয়েন্স পর্যন্ত জীবনের বিবর্তনকে সূক্ষ্ম, অলঙ্কৃত বিশদে বর্ণনা করেন। এটা সত্য যে ল্যামার্ক ব্যতীত জীববিজ্ঞানীরা উদ্দেশ্যের ধারণাটিকে বিজ্ঞানের জন্য অপরিচিত বলে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ উদ্দেশ্য তাদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ধারণাগত কাঠামোর সাথে খাপ খায় না।

কিন্তু যারা পৃথিবীকে নির্দোষ মনে দেখেন, তাদের জন্য উদ্দেশ্য হল পর্যবেক্ষণের একটি সত্য: বিজ্ঞানের চোখের পলকই আমাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করতে বাধা দিতে পারে। তবুও, এটি প্রকৃতির মুখে বড় লেখা। আমরা যখন কোনও জিনিসের শেষ জানি তখনই বুঝতে পারি। আমাদের চারপাশের কোনও কিছুই একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে যেমন থাকে তেমন থাকে না, এটি সর্বদা পরিবর্তিত হয় এবং যা আছে তার থেকে আলাদা কিছু হয়ে ওঠে। একটি নিয়ম হিসাবে, আমরা কোনও জিনিসের প্রতি তার আগের চেয়ে অনেক কম আগ্রহী হই, যা এটি হতে চলেছে। ধরুন, হাঁটতে হাঁটতে আমরা এমন একজন মানুষের সাথে দেখা করি যে দ্রুত দৌড়াচ্ছে। আমরা তার কার্যকলাপ বুঝতে পারি না, বরং তার উদ্দেশ্য এবং সে যে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা সম্পর্কে জানার মাধ্যমে। ভৌত জগৎ যখন বিকশিত হচ্ছে, তখন তা একটি উদ্দেশ্য অর্জন করছে। যদিও ভৌত জগৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন নয়, তবুও, এক অর্থে, এটি তার উদ্দেশ্য যা

এর মূল্য বৃদ্ধি করে এবং নতুন বৈশিষ্ট্য দিয়ে এটিকে সমৃদ্ধ করে। উদ্দেশ্যটি ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়। আমরা বলতে পারি যে পৃথিবী সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এবং অর্জন করার জন্য নির্ধারিত, যা স্রষ্টা তাঁর জ্ঞানে তার জন্য নির্ধারণ করেছেন।

এটি বাইরের মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি স্বাধীন আত্মসম্মান থাকা সত্ত্বেও, সে কেবল স্বাধীন পছন্দ এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বিকাশ করতে পারে এবং তার নিজস্ব লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। মানুষকে বিকাশ করতে বাধ্য করা যায় না; তাকে নিজেকে বিকাশ করতে হবে। যেহেতু মানুষ বৃদ্ধি পায়, তাই তাকে কোরআনে একটি উদ্ভিদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং একটি তরুণ অঙ্কুর উৎপন্ন করে। ক্ষুদ্র কাণ্ডটি প্রচুর পরিমাণে এবং উচ্চতায় বৃদ্ধি পায়। এটি পূর্ণ বয়স্ক গাছে পরিণত হয় যা ফল দেয়। এটি তার ধরণের পুনরুত্পাদন করে তার উদ্দেশ্য পূরণ করেছে। মানুষ নিষিক্ত ডিম্বাণুতে তার উৎপত্তি লাভ করে। জন্মের পর, সে আকার এবং শক্তিতে বৃদ্ধি পায়, যতক্ষণ না সে পরিপক্কতা লাভ করে এবং প্রজননের জন্য প্রস্তুত হয়। এই উপমাটি এর বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় না। মানুষ যখন সন্তান জন্ম দেয়, তখন তার উদ্দেশ্য পূরণ করে না। তার ভাগ্য উদ্ভিদের থেকে অনেক আলাদা। সে তার বংশ রক্ষার জন্য কেবল একটি উপকরণ নয়। নিঃসন্দেহে, তার দেহ যখন সন্তান জন্ম দেয় তখন তার উদ্দেশ্য পূরণ করে, কিন্তু তার একটি স্বত্ব থাকে এবং স্বত্ব তার মতো জন্ম দেয় না। এটি প্রজনন করে না। কোরআনে ঐশ্বরিক সত্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "তিনি জন্ম দেন না এবং তিনি জন্মগ্রহণ করেনও না।

(১১২:৩)। এটি মানব সত্তার ক্ষেত্রেও সত্য, যা ঐশ্বরিক সত্তার চেয়ে অসীমভাবে নিম্নতর, ভৌত বস্তু বা প্রাণীর তুলনায় এর সাথে বেশি মিল রয়েছে। সত্তার কার্যকলাপ সৃজনশীল, প্রজননমূলক নয়।

এটি মূল্যবোধ তৈরি করে এবং মূল্যবোধগুলি তার প্রকৃতিকে সমৃদ্ধ ও প্রসারিত করে এবং অস্তিত্বের মাপকাঠিতে উন্নীত করে। প্রকৃতির বিবর্তন স্রষ্টার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে এগিয়ে গেলেও, মানুষ তার নিজস্ব বিবর্তনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। মানুষ তার নিজস্ব স্বাধীন পছন্দ এবং ইচ্ছাকৃত স্বেচ্ছাসেবী প্রচেষ্টার ফলে বিকশিত হয়। অতএব, তার সত্তার বিবর্তন প্রকৃতির জন্য প্রাপ্ত আইন থেকে পৃথক আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। সেও ঐশ্বরিক সাহায্য এবং নির্দেশনা ছাড়াই মুক্ত হতে পারে না, তবে এগুলি তাকে এমন আকারে দেওয়া হয় যা তার সত্তার অখণ্ডতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বা তার স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে না। তাকে ঐশ্বরিক নির্দেশনা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়। দ্বীন আচরণের নীতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা তাকে তার লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে, তবে সেগুলি কেবল তখনই তা করবে যখন সেগুলি স্বাধীনভাবে গৃহীত এবং কার্যকর করা হবে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে উন্নয়নই পৃথিবীর নিয়ম। কোরআনের ভাষায় এটি হল রবুবিয়াতের আইন। এই আইনে বলা হয়েছে যে স্রষ্টা মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যে থাকা সবকিছুকে এগিয়ে নিয়ে যান। এক স্তর থেকে আরেক স্তরে। স্রষ্টা সবকিছুকে এগিয়ে নিয়ে যান, তার সুপ্ত ক্ষমতাগুলিকে বাস্তবায়িত করেন। এটি একটি গতিশীল মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যে সবচেয়ে গতিশীল সত্তা হল মানুষ। এই ধরনের মহাবিশ্বে, অস্তিত্বের স্পষ্টতই বিভিন্ন স্তর থাকবে। রবুবিয়্যাতের আইন অস্তিত্বের প্রতিটি স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সর্বত্র অক্ষত থাকে। আইন হল মহাবিশ্বের চাদর-নোঙর, এর মধ্যে থাকা সবকিছু তার ক্ষমতার পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হবে তার গ্যারান্টি: একমাত্র সম্ভাব্য ব্যতিক্রম হল মানুষ যে, তার নিজের ইচ্ছায়, এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে এবং আরোহণের পরিবর্তে অবতরণ করার, আকাশে উড়ার পরিবর্তে পৃথিবীতে হামাগুড়ি দেওয়ার পছন্দ করে তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করতে পারে (৭: ১৭৬)।

**২. আত্ম-বিকাশের গতিপথ**

বহির্বিশ্বে প্রমাণিত বিবর্তন প্রক্রিয়া মানুষের মধ্যে আত্ম-বিকাশের রূপ ধারণ করে। কোন কোন পরিস্থিতিতে আত্ম-বিকাশ বাধা ছাড়াই মসৃণভাবে এগিয়ে যায়? সাধারণভাবে উন্নয়নের প্রতিটি পর্যায়ে কিছু শর্ত সাধারণ, অন্যগুলি কেবল আত্ম-বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য - বিকাশের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ রূপ। আসুন প্রথমে সাধারণ বিষয়গুলি বিবেচনা করি। কোন কিছুই বিচ্ছিন্নভাবে অস্তিত্বশীল নয়। সবকিছুই অন্যান্য অনেক কিছুর সাথে সম্পর্কিত এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক কেবল সহাবস্থানের নয়, বরং সহযোগিতার। অতএব, বিকাশ বিভিন্ন কারণের উপস্থিতি এবং সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। একটি বাস্তব উদাহরণ নিতে গেলে, একটি বীজ একটি গাছে পরিণত হতে সক্ষম। তবে, এর বৃদ্ধির জন্য এটি মাটি, জল, খনিজ, বায়ু এবং সূর্যালোকের উপর নির্ভর করে। এই সমস্তগুলি কেবল উপস্থিত থাকা উচিত নয়, বরং তাদের একে অপরের সাথে এবং বীজের সাথেও সঠিক সম্পর্ক থাকতে হবে। যদি বীজটি একটি পাত্রে, অন্য পাত্রে মাটি এবং তৃতীয় পাত্রে জল রাখা হয়, তবে কিছুই ঘটবে না। কিন্তু যদি বীজটি এই জিনিসগুলির সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত হয় যে তারা একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে, তবে বীজটি শীঘ্রই অঙ্কুরিত হবে এবং বৃদ্ধি পাবে। মানবদেহও পরিবেশগত শক্তি এবং বস্তুর সাথে ঘনিষ্ঠ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়। বিশ্বের সমস্ত জিনিসই পরস্পর নির্ভরশীল; তাদের একে অপরের প্রয়োজন এবং একে অপরকে সাহায্য করে। এটি মানুষের আত্মার ক্ষেত্রে আরও সত্য। আত্মা কেবলমাত্র একটি সামাজিক পরিবেশে, অন্যান্য মুক্ত আত্মার সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত হতে পারে। এর জন্য এমন একটি সমাজের প্রয়োজন যেখানে অভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য এবং ঐক্য থাকবে। আত্মীয়স্বজনদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে এটি বৃদ্ধি পায়।

তাদের সহানুভূতি এবং সহযোগিতা এর বিকাশের জন্য অপরিহার্য। একটি মহৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত সামাজিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের অনুভূতি আত্মকে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। আত্ম-উপলব্ধি কেবলমাত্র সেই সমাজেই সম্ভব যেখানে ন্যায়বিচার এবং মানব ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে সমাজ, উচ্চ মূল্যবোধ অর্জনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। যে সমাজ আত্ম বিকাশের পক্ষে, সেই সমাজ যেখানে প্রতিটি মানুষ আনন্দের সাথে অন্যদের সাহায্য করে এবং কৃতজ্ঞতার সাথে তাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করে। মতবিরোধে ভরা সমাজে, শারীরিক আত্মের চাহিদা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই ধরনের সমাজে, প্রতিটি মানুষ নিজের এবং তার ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভাববে। তার মন অন্য মানুষের হাত থেকে তার জীবন, সম্পত্তি এবং সন্তানদের রক্ষা করার সমস্যায় নিমগ্ন থাকবে।

জৈবিক উদ্দেশ্য মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে এবং উচ্চতর জীবনের আকাঙ্ক্ষা পটভূমিতে নেমে যাবে। এই ধরণের সমাজে ভালোর সন্ধান সম্ভব নয়। মানুষের এমন একটি সমাজের প্রয়োজন যেখানে সমস্ত সদস্য একে অপরের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ এবং বন্ধুত্বের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে। এই মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাস হল স্রষ্টা বিশ্বাসের প্রথম অঙ্গীকার। কোরআন মানুষকে এমন একটি সমাজ গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করে যেখানে মানুষ এমন একটি সমাজ গঠন করে যা স্রষ্টা এমন একটি সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় যা অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা দ্বারা তৈরি হয় না: তোমরা সকলে স্রষ্টার রজ্জুকে শক্ত করে ধরে থাকো, এবং বিভক্ত হয়ো না বরং তোমাদের প্রতি স্রষ্টার অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন তোমরা শত্রু ছিলে এবং তিনি তোমাদের হৃদয়কে একত্রিত করেছিলেন যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই হয়ে উঠেছিলে (৩: ১০২)।

এত সুসংগঠিত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সমাজ হল কোরআনের উম্মাহ। "তিনি তোমাদের মধ্য থেকে এইভাবে একটি উম্মাহ—সম্প্রদায়—উত্থাপন করেছেন" (২: ১৪৩)। কোরআনের কর্পোরেট জীবনের উপর জোর দেওয়ার এবং সন্ন্যাসবাদের প্রতি অসম্মতির কারণ এটি। গ্যেটে একবার মন্তব্য করেছিলেন যে চরিত্র নির্জনতায় নয়, বরং জীবনের তাড়াহুড়োয় গঠিত হয়। সত্তা নির্জনে সংকুচিত হয় এবং সংকুচিত হয়, যখন এটি গোষ্ঠীগত কার্যকলাপে সক্রিয় এবং ক্রমাগত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৃদ্ধি এবং প্রসারিত হয়।

একটি সুষম, সুসংহত এবং সমন্বিত ব্যক্তিত্ব কেবল একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজেই গড়ে উঠতে পারে। মানুষের মন হল দ্বন্দ্বপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্র। সমাজও বিরোধের বীজ বহন করে কারণ এটি বিভিন্ন এবং প্রায়শই বিরোধী রুচি, আগ্রহ এবং লক্ষ্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত। সমাজে এক পক্ষকে দমন করে এবং অন্য পক্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে ফলস্বরূপ দ্বন্দ্বের সমাধান করা উচিত নয়। প্রকৃত সমাধান নিহিত রয়েছে পারস্পরিক সমন্বয়, একে অপরের সাথে পুনর্মিলন এবং এমন একটি কার্যকলাপ বা জীবনধারা আবিষ্কারের মধ্যে যা প্রতিদ্বন্দ্বীদের যুক্তিসঙ্গত সন্তুষ্টি প্রদান করে। ভারসাম্য এবং অনুপাত

ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি সমাজের বৈশিষ্ট্যও তৈরি করে। মানব ব্যক্তিত্ব কীভাবে অনুপাত অর্জন করতে পারে? উত্তর হল, এটি কেবলমাত্র ঐশ্বরিক গুণাবলী, আসমা-উল-হুসনা (সুন্দর নাম) কে তার মডেল হিসাবে গ্রহণ করেই তা করতে পারে।

ঐশ্বরিক গুণাবলী, পৃথকভাবে, প্রতিটি অন্তর্নিহিত মূল্যবান গুণের সর্বোচ্চ স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তারা সম্মিলিতভাবে সর্বোচ্চ ক্রম অনুপাতকে প্রতিফলিত করে। যদি আমরা মনে রাখি যে অনুপাত সৌন্দর্যের একটি অপরিহার্য শর্ত, এবং কেউ কেউ বলতে পারে যে অনুপাত নিজেই সৌন্দর্য, তাহলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে কেন হুসনা শব্দটি এই গুণাবলীর জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। এগুলি সুন্দর কারণ প্রতিটি অন্যদের সাথে সঠিক অনুপাত বহন করে, যাতে একটি সুষম সমগ্র গঠন করা যায়। তবে, হুসনাকে আরও বিস্তৃত অর্থে গ্রহণ করতে হবে। এটি কেবল শারীরিক সৌন্দর্যই নয়, বরং নৈতিক সৌন্দর্যকেও নির্দেশ করে। অনুপাত হল আত্মার পাশাপাশি সমাজে বিবাদ এবং দ্বন্দ্বের বিষের একমাত্র প্রতিষেধক।

দেহের সাথে আত্মার বিকাশের পথে কমপক্ষে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পরিবেশ থেকে পুষ্টি গ্রহণ এবং আত্মীকরণের মাধ্যমে দেহ বৃদ্ধি পায়। যত বেশি পুষ্টি পাবে, তার বৃদ্ধি তত ভালো হবে। বিদ্বেষপূর্ণভাবে, আত্ম গ্রহণের মাধ্যমে নয় বরং দান করার মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। উদারতা তার বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে এবং নীচতা এটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। স্ব-ধন-সম্পদ যত বেশি দান করে, ততই এটি সমৃদ্ধ হয়। যদি এই মৌলিক সত্যটি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা হয়, তাহলে মানুষ অভাবীদের সাহায্যে ছুটে যাবে। মালিকানার গর্ব দানশীলতার আনন্দকে স্থান দেবে। তারা নিজের জন্য কী রাখতে পারে তার চেয়ে তারা কী দিতে পারে তা নিয়ে বেশি চিন্তা করবে। অর্জনের প্রবৃত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং দেওয়ার প্রবণতা শক্তিশালী হবে। কোরআন এমন লোকদের প্রশংসা করে যারা নিজেদের স্বার্থের চেয়ে অন্যদের স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দেয়: তারা নিজেদের আগে অন্যদের পছন্দ করে যদিও তাদের মধ্যে দারিদ্র্য থাকে; এবং যে কেউ নিজের আত্মার লোভ থেকে রক্ষা পায়, তারাই উন্নতি লাভ করবে (৫৯:৯)।

আমরা যে উদারতার কথা বিবেচনা করছি তার সরাসরি বিপরীত প্রবণতা হল লোভ, যাকে কোরআনে শুহুন-নাফস বলা হয়েছে (৫৯:৯)। এটা স্বার্থপর, অধিকারী এবং অহংকারী। লোভী মানুষ তার নাগালের মধ্যে থাকা সমস্ত ভালো জিনিস আত্মসাৎ করতে চায় এবং অন্যদের চাহিদার প্রতি নির্মমভাবে উদাসীন। ধরুন, কিছু লোক একটি জলের কলের কাছে জড়ো হয়েছে। তারা জানে যে এক ঘন্টা বা তারও বেশি সময় পরে জলের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। প্রত্যেকেই তার কলসি ভর্তি করতে আগ্রহী। লোভী মানুষ ভিড়ের মধ্য দিয়ে কনুই দিয়ে হেঁটে যায়, কলের নিচ থেকে অন্যের কলসিটি অভদ্রভাবে ঠেলে দেয় এবং তার

জায়গায় নিজের কলসিটি রাখে। অন্যদের জল ছাড়া থাকতে হলে তার কোন মাথাব্যথা নেই। সে কেবল নিজের জন্য প্রচুর পরিমাণে জল সরবরাহের যত্ন নেয়।

লোভ মানুষের আত্মাকে মৃত করে দেয় এবং কোরআন আমাদের এই ছলনাময়ী রোগ থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেয়। এটি আমাদের সকল মানুষকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহিত করে, কেবল আমাদের আত্মীয়স্বজনদের নয়। কোরআন তার দৃষ্টিভঙ্গিতে বস্তুনিষ্ঠ এবং সর্বজনীন। এটি কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়ের নয়, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ কামনা করে। কোরআনের মতে, "মানুষ যেই হোক না কেন এবং যে দেশ, জাতি বা গোষ্ঠীরই হোক না কেন, কেবল সেই জিনিসই টিকে থাকে যা "মানুষের উপকার করে, সে যেই হোক না কেন এবং যে দেশ, জাতি বা গোষ্ঠীরই হোক না কেন।" নীচের উদ্ধৃত আয়াতটি আমাদের বিবেচনা করা উচিত: তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, এবং নদীগুলি তাদের (যথাযথ) পরিমাপ অনুসারে প্রবাহিত হয়, এবং বন্যা একটি ফোলা ফেনা বহন করে। এবং অলংকার এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ঢালার জন্য তারা আগুনে যে ধাতুগুলি গলায়, তা থেকেও অনুরূপ ময়লা উৎপন্ন হয়। এভাবে আল্লাহ সত্য এবং মিথ্যার উপমা তৈরি করেন। ফেনা সম্পর্কে, এটি আবর্জনা হিসাবে বেরিয়ে যায়, এবং যা মানবজাতির জন্য উপকারী, তা পৃথিবীতেই থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ দৃষ্টান্তগুলি বর্ণনা করেন (১৩: ১৭)।

"কেবলমাত্র তারাই টিকে থাকে যা সমস্ত মানবজাতির উপকারের জন্য এবং এর উপসংহার সহ, "কেবলমাত্র তারাই টিকে থাকে যারা সমস্ত মানবজাতির উপকার করে, এই প্রস্তাবটি আত্ম-বিকাশের মৌলিক নীতি। আইন "সবচেয়ে যোগ্যের বেঁচে থাকা" নয়, বরং "সবচেয়ে দানশীলের বেঁচে থাকা"। "অন্য কথায়, কোরআনের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসারে, কেবলমাত্র সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তিই বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। যারা কোরআনের প্রকৃত চেতনাকে আত্মস্থ করেছে, তারা স্বার্থপরতা পরিহার করবে এবং মানবতার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করবে। তারা প্রকৃত মুসলিম।

জাতীয়তাবাদ এবং উপনিবেশবাদ গত দুই বা তিন শতাব্দী ধরে পশ্চিমে প্রভাবশালী শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উভয়ই সংকীর্ণতা এবং সংকীর্ণ মনোভাব তৈরি করে। ইউরোপীয়রা কেবল তার নিজস্ব জাতি বা সাম্রাজ্যের কথা ভেবেছিল। তবে, পশ্চিমেও কিছু চিন্তাবিদ তাদের স্বদেশীদেরকে সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলের জন্য কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। আমরা রাশডালের নীতিশাস্ত্র বই থেকে একটি স্পষ্ট বাক্যাংশ উদ্ধৃত করছি: এটা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে আদর্শ হল আমি অন্যের জন্য কিছু তৈরি করব এবং তা করার মধ্যে আমার মঙ্গল খুঁজে পাব; যখন সে আমার মঙ্গলের জন্য কাজ করছে, এবং তা করার মধ্যে তার মঙ্গল খুঁজে পাব।

এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি স্পষ্টবাদী প্রতিরক্ষা রবার্ট ব্রিফোল্টের মেকিং অফ হিউম্যানিটি-তে পাওয়া যাবে: মানুষের বিকাশের অদ্ভুত উপায় এবং পরিস্থিতি মানসিকভাবে প্রয়োজন যে উন্নয়ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির মাধ্যমেই ঘটবে; প্রতিটি ব্যক্তির বিকাশের স্তর সেই জাগতিক বিকাশের ফলাফল (পৃষ্ঠা ২৬০)।

তিনি আরও বলেন: মানবতার গঠন! এটাই মানুষের বিবর্তনের বোঝা; এবং এটাই সেই দৃঢ়, সম্ভবত, কিছুটা কঠিন সত্য, যার 'নৈতিক আইন' অস্পষ্টভাবে সচেতন প্রকাশ। এটি পরার্থপরতার স্পন্দনশীল প্ররোচনা নয়, নিজের জন্য উদারতার কোনও অনুপ্রেরণা নয়, বরং এটিকে পরিচালিত অদম্য পরিস্থিতি দ্বারা মানুষের বিকাশের উপর চাপিয়ে দেওয়া প্রয়োজনীয়তার একটি ভারী বোঝা (পৃষ্ঠা ২৬১)।

অন্য জায়গায়, তিনি এই বিষয়টিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: প্রাকৃতিক মাত্রায়, সেই কর্মই ভালো যা মানব বিকাশের প্রক্রিয়ায় অবদান রাখে, সেই কর্মই মন্দ যা সেই প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে, বাধাগ্রস্ত করে, বিরোধিতা করে: সেই ব্যক্তি জীবনই উপযুক্ত যা সেই বিবর্তনের সরাসরি রেখায়, এটিই নিরর্থক যা তার অগ্রগতির ধারার বাইরে অবস্থিত; এটাই নিন্দিত যা স্রোতের বিরোধিতা করার চেষ্টা করে। এটাই নৈতিক মূল্যবোধের স্বাভাবিক, পরম এবং প্রকৃত মান। প্রকৃতি সবচেয়ে পবিত্র এবং দানশীল জীবনকে মূল্য দেয় না যা মানব বিকাশে কোনও অবদান রাখে না, যতটা একটি একক কাজ যা স্থায়ীভাবে জাতির বিবর্তনকে উৎসাহিত করে। প্রকৃতি যার মূল্যের একমাত্র পরিমাপ বিবেচনা করে - এটিকে স্থায়ী করে - তা হল উচ্চতর মানবতার নির্মাণের জন্য প্রদত্ত অবদান (পৃষ্ঠা ৩৫২)।

ব্যক্তির প্রকৃত স্বার্থ মানবজাতির স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বরং এর সাথে মিশে আছে। তারা একে অপরের বিরোধী নয় বরং অভিন্ন। অতএব, মানুষ মানবজাতির স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে নিজেকে উপলব্ধি করে। এটি সেই সত্য যা কোরআন ঘোষণা করে। এটি সমস্ত "মানবজাতিকে একটি সম্প্রদায়" হিসাবে বিবেচনা করে। (১০: ১৯)। এটি জাতি, বর্ণ, ধর্ম বা বর্ণের পার্থক্যকে স্বীকৃতি দেয় না। মানবজাতি একটি সম্পূর্ণ, একক, যদিও জটিল, তার জন্য সত্তা: তোমার সৃষ্টি এবং তোমার লালন-পালন কেবল একক সত্তার মতো (৩১: ২৮)।

কোরআন মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রস্থল কাবাকে "সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি স্থাপনা" হিসেবে উল্লেখ করেছে (৫:৯৭)। এটি বিশ্বাস করে যে ব্যক্তির মঙ্গল সমাজের মঙ্গলের উপর নির্ভর করে। মুসলিমদের মুসলিম সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য নয় বরং সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোরআন এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ রাখে না এবং অধ্যাপক হোয়াইটহেড এর সাথে সম্পূর্ণ একমত যখন তিনি বলেন: জীবনের পরিপূর্ণতা প্রশ্নবিদ্ধ ব্যক্তিত্বের বাইরের লক্ষ্যে নিহিত।২

ম্যাসন বলেন: মানুষ তার ব্যক্তিগত ক্ষমতায়, তার ইচ্ছা পূরণের সাথে সাথে তার ব্যক্তিত্বকে আত্ম-বিকাশ করে এবং বিশুদ্ধ আত্মায় তার উৎপত্তি সম্পর্কে তার অবচেতন জ্ঞানের আত্ম-সচেতন ব্যাখ্যা তার কার্যকলাপকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু, জাতিগতভাবে, মানুষের কেবল এমন কার্যকলাপে জড়িত থাকা উচিত যা সমস্ত ব্যক্তিত্বের স্ব-সৃজনশীলতার মাধ্যমে তাদের সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত সৃজনশীল স্বাধীনতাকে প্রসারিত করে। প্রথমটিকে ধরে রেখে মানুষ এই দ্বিতীয় আন্দোলন থেকে সরে যেতে পারে। অতএব, মানুষ ব্যক্তিগতভাবে নীতিবান এবং জাতিগতভাবে অনৈতিক হতে পারে। সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্ব দুটি নীতিকে একত্রিত করে।৩

মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা হল কোরআনের পুনরাবৃত্ত বিষয়বস্তু। মানুষের জন্য কোরআনের কর্মসূচির দুটি লক্ষ্য রয়েছে - ব্যক্তি এবং সমাজের সর্বোত্তম স্বার্থকে এগিয়ে নেওয়া। মানবজাতির কল্যাণের জন্য কাজ করার মাধ্যমে, মানুষ তার নিজের কল্যাণও অর্জন করে। পাশ্চাত্যের কিছু মহান চিন্তাবিদও এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। আমরা কান্টের উদ্ধৃতি উদ্ধৃত করছি: এমনভাবে কাজ করো যাতে তুমি নিজেকে এবং অন্য সকল মানুষের সাথে সমানভাবে আচরণ করো ; এমন একটি সমাজের সদস্য হিসেবে আচরণ করো যেখানে প্রত্যেকে অন্যের কল্যাণকে নিজের সাথে সমান মূল্যের বলে মনে করে এবং অন্যরা তাদের সাথেও এমন আচরণ করে, যেখানে প্রত্যেকেই লক্ষ্য এবং উপায় উভয়ই, যেখানে প্রত্যেকে অন্যের কল্যাণকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে নিজের কল্যাণ উপলব্ধি করে।৪

কোরআন আরও এক ধাপ এগিয়ে ঘোষণা করে যে "মুমিনরা নিজেদের চেয়ে অন্যদের পছন্দ করে যদিও তাদের মধ্যে অভাব রয়েছে" (৫৯:৯)। ধর্মের কোন সংক্ষিপ্তসার না থাকা মহান বিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলি একই অর্থে লেখেন: আমি বিশ্বাস করি যে মানুষের পুরো কর্তব্য এই শব্দগুলিতে সংক্ষেপিত করা যেতে পারে: নিজের মতো করে প্রতিবেশীর জন্যও আরও বেশি জীবন। এবং আমি বিশ্বাস করি যে মানুষ, যদিও বিভ্রান্তি, প্রচেষ্টা এবং যন্ত্রণা ছাড়াই নয়, এই কর্তব্য পালন করতে পারে এবং ধীরে ধীরে তার ভাগ্য অর্জন করতে পারে। যে ধর্ম এটিকে তার কেন্দ্রীয় কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করে এবং বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এটি ব্যাখ্যা করে, মানুষের জন্য উন্মুক্ত সম্ভাবনা এবং সে যে সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ তা উভয়ই একটি সত্য ধর্ম হবে, কারণ এটি জীবনের সাথে সাংঘর্ষিক; এটি জীবনের বিকাশকে উৎসাহিত করবে এবং সেই বৃদ্ধির সাথে সাথে নিজেই বৃদ্ধি পাবে। আমি জীবনের ধর্মে বিশ্বাস করি।৫

জুলিয়ান হাক্সলি, অবশ্যই, বিশ্বাস করেন না যে মানুষের ঐশ্বরিক প্রকাশের সাহায্যের প্রয়োজন। তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন যে কেবল যুক্তিই মানুষকে নিজের এবং মানবজাতির মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক উপলব্ধি করতে সক্ষম করতে পারে। এখানে, তিনি সমস্যাটিকে অতি সরলীকৃত করছেন। তিনি

দেখতে ব্যর্থ হন যে সত্যের কেবল বৌদ্ধিক উপলব্ধি যথেষ্ট নয়, কারণ এটা এই গ্যারান্টি দেয় না যে আমরা সর্বদা তার পরামর্শ দেওয়া কঠিন পথ অনুসরণ করব। যুক্তি আমাদেরকে সেই উচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে পারে যা জীবনের একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, কিন্তু প্রকাশিত বাক্য আমাদের সেখানে থাকার এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আমাদের জীবনকে সাজানোর শক্তি দেয়। ওভিডের বিখ্যাত লাইনটি এই বিষয়টির সাথে প্রাসঙ্গিক, "ভিডিও মেটিওরা প্রোহোক ডিটেরিওরা সিকোয়র!" (আমি আরও ভালো পথ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু খারাপ পথ অনুসরণ করি!)। যুক্তি সঠিক পথ নির্দেশ করতে পারে কিন্তু এটি আমাদের তা অনুসরণ করতে বাধ্য করার শক্তির অভাব রয়েছে। প্রকাশিত বাক্য যুক্তির পরিপূরক। এটি যুক্তি দ্বারা প্রদত্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে নিশ্চিত করে এবং প্রসারিত করে এবং আমাদের লক্ষ্যের দিকে কঠিন যাত্রায় আমাদের টিকিয়ে রাখে এবং পরিচালনা করে। প্রকাশিত বাক্য মানুষকে একটি পূর্ণাঙ্গ এবং সমৃদ্ধ জীবনের দিকে আহ্বান করে এবং শুধুমাত্র "যারা বেঁচে আছে" তাদের জন্যই (৩৬: ৭০)।

আমাদের মনে রাখা উচিত, জীবন শারীরিক অস্তিত্বের চেয়ে অনেক বেশি। এটি সামাজিক, নৈতিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশের একটি উচ্চতর পর্যায়ের দিকে একটি স্থির এবং অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি। মানুষ তার সহ-সত্তাদের একই কাজ করতে সাহায্য করে এই পর্যায়ে পৌঁছায়। মানুষ যদি সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে সমাজও তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, এবং উভয়ই কাঙ্ক্ষিত উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়। কোরআন বলে: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি তোমাদের জীবনদানকারী কাজের দিকে আহ্বান করেন (৮:২৪)।

সংক্ষেপে, মানুষ জৈবিকভাবে সমগ্র মানবজাতির সাথে সম্পর্কিত। তার গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ মানবতার স্বার্থের সাথে জড়িত। সে কেবল অন্য মানুষের সেবা করে এবং তাদের স্বার্থকে নিজের চেয়ে উপরে রেখে নিজেকে পূর্ণ করতে পারে। সে কেবল সাধারণ কল্যাণের জন্য কাজ করেই তার কল্যাণ উপলব্ধি করে। কোরআন স্পষ্টভাবে বলে: (মুমিনরা বলে): আমরা কেবল আল্লাহর জন্যই তোমাদের খাওয়াই। আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনও প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা কামনা করি না (৭৬:৯)।

মানুষ অন্য মানুষের সেবা করে আসলে নিজের উপকার করছে। তাই পুরস্কারের প্রশ্নই ওঠে না। যেমন কোরআন বলে , ইহসানের প্রতিদান কি ইহসান ছাড়া আর কিছু? (৫৫:৬০)। মানবজাতির সেবায় নিবেদিতপ্রাণ, বিশ্বাসীরা রবুবিয়াতের দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখে। তারা অন্যদের উন্নতিতে আন্তরিকভাবে আনন্দিত হয়: যারা আল্লাহর আইন অনুসারে (মানবজাতির কল্যাণের জন্য) তাদের সম্পদ ব্যয় করে এবং পরে যা ব্যয় করে তার পরে তিরস্কার ও কষ্ট দেয় না, তাদের প্রতিদান তাদের রবের কাছে রয়েছে এবং তাদের উপর কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না (২: ২৬২)।

তারা অন্যদের সেবা করতে পেরে খুশি, সম্পদ বা খ্যাতির আশায় নয়: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্ধারিত উদ্দেশ্যে তোমরা যা ব্যয় করো তা তিরস্কার ও আঘাত দিয়ে নষ্ট করো না, যেমন কেউ কেবল লোক দেখানোর জন্য তার সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে না (২: ২৬৪)।

তাই রাসূল (আল্লাহর রাসূল), যার লক্ষ্য ছিল মানুষকে রবুবিয়্যাতের দিকে আহ্বান করা। তিনি ঘোষণা করলেন: এবং আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার প্রতিদান কেবল সমস্ত জগতের রবের কাছে (২৬: ১০৯)।

এখন আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে, মানুষের পক্ষে কি সাধারণ কল্যাণের জন্য তার স্বার্থ ত্যাগ করা সত্যিই সম্ভব? নিঃসন্দেহে, মানুষ পরোপকারী এবং অহংকারী উভয় প্রবণতার অধিকারী। কিন্তু যে অহংকারী প্রবণতা মানুষকে সমস্ত ভালো জিনিস নিজের জন্য আত্মসাৎ করতে প্ররোচিত করে, তা সামাজিক প্রবণতার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। তাছাড়া, পার্থিব জ্ঞানও অহংকারী প্রবণতাকে সমর্থন করে। তাৎক্ষণিক ব্যক্তিগত লাভের শক্তিশালী আবেদনকে খুব কম লোকই প্রতিহত করতে পারে। অতীন্দ্রিয়বাদ মানুষের মধ্যে এমন ধারণাগুলি প্রবেশ করিয়ে পরোপকারী উদ্দেশ্যকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে যে শরীর সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন, সমস্ত ইন্দ্রিয়গত আনন্দ পাপপূর্ণ এবং পৃথিবী মন্দতায় পরিপূর্ণ। এটা বিশ্বাস করা হয় যে যদি মানুষ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয় যে শরীর তার "আধ্যাত্মিক" অগ্রগতির পথে বাধা, তাহলে সে এমন জিনিসের যত্ন নেওয়া বন্ধ করে দেবে যা তার চাহিদা পূরণ করে। তবে কোরআন এই ধরণের অন্যায়-জাগতিকতাকে অনুমোদন করে না। এটি শরীর এবং জগৎকে তাদের প্রাপ্য সম্মানের সাথে আচরণ করে। এটি আমাদের বলে যে পার্থিব জিনিসপত্র ধারণ করা এবং শারীরিক চাহিদা পূরণ করা পাপের কিছু নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে এই সত্যটি স্বীকার করে যে শরীরের মাধ্যমে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব: মানবজাতির জন্য সুন্দর হল নারী ও শিশুদের আনন্দ, সোনা ও রূপার সঞ্চিত ধন, এবং চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু এবং জমির প্রতি ভালোবাসা। এটাই পার্থিব জীবনের আরাম। আল্লাহ! তাঁর কাছেই উত্তম আবাসস্থল (৩: ১৩)।

কোরআন মানুষকে দুনিয়ার উত্তম জিনিস উপভোগ করতে উৎসাহিত করে: বলুন: আল্লাহর সাজসজ্জা যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য তৈরি করেছেন এবং তাঁর রিযিকের উত্তম জিনিস কে নিষিদ্ধ করেছে? (৭: ৩২)।

অতীন্দ্রিয়বাদ স্বার্থপরতার প্ররোচনাকে দমন করার পক্ষে যুক্তি দেয় যা পরোপকারী প্ররোচনার জন্য ক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখে। কোরআন এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে এবং আমাদেরকে শারীরিক সত্তার পাশাপাশি প্রকৃত সত্তার প্রতি ন্যায়বিচার করতে বলে। এই দুটি সত্তার স্বার্থ কীভাবে মিলিত হতে পারে এবং মানুষ কীভাবে উভয় জগতের সর্বোত্তম লাভ করতে পারে? এই প্রশ্নটি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

## *তথ্যসূত্র*

১. এইচ. র‍্যাশডাল, দ্য থিওরি অফ গুড অ্যান্ড ইভিল, খণ্ড ২, পৃ. ৭৭।

২. এ. এন. হোয়াইটহেড, অ্যাডভেঞ্চারস অফ আইডিয়াস, পৃ. ৩৭৩।

৩. জে. ডব্লিউ. টি. মা

# অধ্যায় ১২

## প্রভুর আদেশ (কোরআনের অর্থনীতি)

**১. প্রভুর আদেশ: এর প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য**

প্রাণীজগতে, বিবর্তন প্রাকৃতিক কারণের মাধ্যমে এগিয়ে যায়। এর লক্ষ্য প্রজাতির পরিপূর্ণতা এবং পরিণামে একটি উন্নততর প্রজাতির উৎপাদন। ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না; জাতিই সর্বাগ্রে। প্রজাতির কল্যাণের জন্য ব্যক্তিকে ব্যয় করতে দ্বিধা নেই। এটিই প্রাণীজগতের পর্যায়। তবে, মানব স্তরে, আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু জাতি থেকে ব্যক্তির দিকে সরে যায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উত্থান ঘটে এবং এর সাথে সাথে, বিবর্তন প্রক্রিয়া একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে—একটি আশ্চর্যজনকভাবে ভিন্ন পর্যায়ে। প্রাকৃতিক শক্তি যা এতদিন বিবর্তনের গতিপথ পরিচালনা করেছিল এখন পটভূমিতে চলে যায় এবং যুক্তিবাদী প্রাণীরা সচেতনভাবে এবং সক্রিয়ভাবে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। বিবর্তনের লক্ষ্যে একটি অনুরূপ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে যা এখন, পরিবেশের সাথে সুসংগতভাবে অভিযোজিত একটি প্রজাতির উৎপাদন নয়, বরং জীবনের উচ্চ স্তরে তার উত্থান পরিচালনা করতে সক্ষম একটি মুক্ত এবং স্বায়ত্তশাসিত আত্মার বিকাশ। প্রকৃতি প্রাণীটিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। মানুষকে সঠিক পথ আবিষ্কার করতে হবে এবং তার নিজস্ব সম্পদ দিয়ে তা অনুসরণ করতে হবে। সে মূলত যুক্তির উপর নির্ভর করে। তবে, সে শীঘ্রই জানতে পারে যে অস্তিত্বের অদৃশ্য সমুদ্র পেরিয়ে ভ্রমণ করার সময়, সে কেবল যুক্তির ঝিকিমিকি আলোর উপর নির্ভর করতে পারে না। হতাশায়, সে সাহায্যের জন্য স্রষ্টার দিকে ফিরে যায় যা তাকে রবুবিয়্যাতের আদেশে যোগদানের জন্য একটি আহ্বানের আকারে দেওয়া হয়। এই আদেশটি, স্বাভাবিকভাবেই, তাদের জন্য অর্থবহ হবে যাদের সঠিক পথে অনুসরণ করার আন্তরিক ইচ্ছা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। যারা এই আদেশে যোগদান করে তারা আত্ম-সিদ্ধির লক্ষ্যে দ্রুত এবং মসৃণ অগ্রগতির নিশ্চয়তা পায়। কোরআনের পরিভাষায় জান্নাত এটাই বোঝায়। মানুষ সমমনা ব্যক্তিদের সাথে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবে।

কোরআন এই আমন্ত্রণমূলক উদ্যোগের জন্য একটি টেকসই ব্যবহারিক কর্মসূচি নির্ধারণ করে। এই কর্মসূচি মূলত সামাজিক এবং সেই গোষ্ঠীর জন্য উদ্দিষ্ট যার সদস্যরা প্রতিযোগিতা করছে না বরং একে অপরের সাথে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করছে। কোরআন মানুষকে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে এবং একটি উচ্চ আদর্শ অর্জনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত এই ধরনের সহযোগিতামূলক গোষ্ঠীতে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছে। কেবলমাত্র এই গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবেই মানুষ রবুবিয়্যাতের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে এবং এর মাধ্যমে তার ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, তবে এগুলি কেবল একটি অনুকূল সামাজিক পরিবেশে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সঙ্গীদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হতে পারে। পারস্পরিক সহানুভূতি এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে একত্রিত এবং একটি উচ্চ আদর্শ

দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি গোষ্ঠীর সদস্যপদ আত্ম-বিকাশের গ্যারান্টি। রবুবিয়্যাত ব্যবস্থা এমন একটি গোষ্ঠী প্রদান করে এবং সমস্ত সংকীর্ণ ব্যক্তিগত লক্ষ্য ত্যাগ করে এবং সাধারণ লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করে মানুষকে এতে যোগদানের আহ্বান জানায়। এই ধরণের গোষ্ঠীতে, মানুষ অন্যদের সেবা করে এবং আনন্দের সাথে তাদের সাহায্য গ্রহণ করে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে। নিজস্ব স্বার্থের সাথে ব্যস্ততার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্ব সংকুচিত হয় এবং সংকুচিত হয়। এটি মানবজাতির বৃহত্তর স্বার্থের অধীনস্থ হয়ে প্রসারিত হয় এবং বিকশিত হয়। রবুবিয়্যাত ব্যবস্থার ব্যবহারিক কর্মসূচি কেবলমাত্র একটি গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি দ্বারা গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা কেবল একটি গোষ্ঠীতেই সম্ভব, কারণ একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির আত্মত্যাগ এবং অন্যদের সেবা করার কোন সুযোগ থাকে না। তার কর্মকাণ্ডের জন্য সময়সীমা আত্ম-বিকাশকে প্রভাবিত করার জন্য খুব কম। একটি গোষ্ঠীর সদস্যপদ কেবল এর জন্য সহায়ক, তবে সমস্ত গোষ্ঠী এই সুযোগ প্রদান করে না। কেবলমাত্র সেই গোষ্ঠীই সঠিক পরিবেশ প্রদান করে যা তার সদস্যদের স্বাধীনতার উপর কোন বাধা দেয় না, বা তাদের চিন্তাভাবনা ও কর্মের স্বাধীনতাকে কোনওভাবেই হুমকি দেয় না। এই ব্যক্তিগত সুযোগটি, শুরুতে, একটি স্বেচ্ছাসেবী কাজের জন্য সদস্যপদ উন্মুক্ত করে দিয়ে সুরক্ষিত হয়। ব্যক্তি গোষ্ঠীর সাথে একটি চুক্তি করে, নির্ধারিত অধিকারের বিনিময়ে নিজের উপর নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করে। এই সামাজিক চুক্তির ফলাফল হল রাষ্ট্র, যা সাধারণত মুসলমানদের কাছে খিলাফত নামে পরিচিত।

খিলাফত বা রাষ্ট্র হল উম্মাহর রাজনৈতিক ও নির্বাহী অঙ্গ, রাবুবিয়্যাতের ধারার কাঠামো। খিলাফতের মাধ্যমে উম্মাহ ঐশ্বরিক কর্মসূচি চালু করে এবং প্রতিটি সদস্যকে আত্ম-প্রকাশ এবং আত্ম-বিকাশের জন্য অনুকূল সুযোগ প্রদান করে। কোরআন অনুসারে, মানুষ স্রষ্টার সাথে একটি চুক্তিতে প্রবেশ করবে বলে আশা করা হয়। তাকে তার জীবন এবং সম্পদ তাঁর হাতে তুলে দিতে বলা হয়েছে জান্নাতের বিনিময়ে - যা পূর্ণ আত্ম-পরিপূর্ণতার অবস্থা। কোরআনের ভাষায়: নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীদের কাছ থেকে জান্নাতের জন্য তাদের জীবন এবং সম্পদ কিনে নিয়েছেন (৯: ১১)।

যেকোনো জাগতিক চুক্তির মতো, এই চুক্তিতে রয়েছে:
১. ক্রেতা - স্রষ্টা।
২. বিক্রেতা - বিশ্বাসী।
৩. বিক্রিত পণ্য - বিশ্বাসীর জীবন এবং সম্পদ।
৪. মূল্য - জান্নাত

এর মধ্যে, পণ্য হল একটি বাস্তব এবং সনাক্তযোগ্য পণ্য এবং বিক্রেতা হল একটি জীবন্ত সত্তা। অন্য দুটি স্রষ্টা এবং জান, বিমূর্ত এবং অস্পষ্ট। ক্রেতার সাথে কীভাবে একটি দর কষাকষি করা যেতে পারে এবং

দাম অনুপস্থিত, অথবা, সর্বোত্তমভাবে, কল্পনায় রয়ে গেছে। "আল্লাহর কাছে নিজের জীবন বিক্রি করা" একটি খালি বাক্যাংশ, একটি বিভ্রান্তিকর মরীচিকা। চুক্তিটি তখনই অর্থবহ হবে যখন এটি উপলব্ধি করা হবে যে স্রষ্টা এবং জান্নাত মানুষ এবং জীবনের চেয়েও বাস্তব - বরং বেশি বাস্তব। এটি কেবলমাত্র স্রষ্টা এবং জান্নাতকে জীবন্ত মানব অভিজ্ঞতার সাথে ঘনিষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে নিয়ে আসার মাধ্যমেই করা যেতে পারে। কোরআন ঠিক এটিই করে।

**২. জান্নাত**

কোরআনে জান্নাতকে যে রূপক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে তাতে বিভ্রান্ত হয়ে, অনেকে এটিকে মহাকাশে স্থান করে নিয়েছে এবং এটিকে একটি মহিমান্বিত পার্থিব উদ্যান হিসাবে কল্পনা করেছে। অন্যরা, এই জঘন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে অসন্তুষ্ট, প্রাসঙ্গিক আয়াতগুলির লুকানো অর্থের জন্য প্রলোভনমূলকভাবে অনুসন্ধান করেছে। আমাদের মনে হয় যে উভয়ই কোরআনের কিছু সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার জন্য দোষী, যা সঠিক ব্যাখ্যার সূত্র প্রদান করে। প্রথমে আমরা সংক্ষেপে আয়াতগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করব এবং তারপর কোরআনের প্রমাণাদি উদ্ধৃত করব। আমরা দেখেছি যে কোরআন মানব সত্তাকে একটি বিকাশমান সত্তা হিসেবে কল্পনা করে। সত্তা যখন জীবনের যাত্রা সফলভাবে সম্পন্ন করে, তখন মৃত্যু নতুন এবং আরও গৌরবময় সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। একটি যোগ্য কাজ সম্পন্ন হওয়ার আনন্দ নতুন সুযোগের প্রত্যাশায় উচ্ছ্বাসের সাথে মিশে যায়। তার পার্থিব কর্মজীবনে কিছু সম্ভাবনা উপলব্ধি করার পর, সত্তা এখনও কী বাস্তবায়িত হতে বাকি আছে তা সম্পর্কে সচেতন হয়। এই মনের অবস্থা, আনন্দ এবং কর্মের জন্য উৎসাহের মিশ্রণ, জান্নাতকে সঠিকভাবেই ধারণা করা হয়। আনন্দ বা সৌভাগ্য শব্দটি এই মনের কাঠামোর ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে, মানুষ অস্তিত্বের এই অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক অসম্পূর্ণ ধারণা পেতে পারে। এটি এই জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে একেবারেই আলাদা, এবং এটি শব্দে বর্ণনা করা যায় না কারণ তারা কেবল পরবর্তীটিই লক্ষ্য করতে পারে। তবে, একজন মানুষের মৃত্যুর সময় তার বিকশিত সত্তার জন্য যে আনন্দ অপেক্ষা করছে তার কিছু ধারণা থাকা অপরিহার্য। এটি কেবল প্রতীকের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। অস্তিত্বের উচ্চতর স্তর বর্ণনা করা যায় না, তবে এটি প্রতীকীভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এ কারণেই কোরআন জান্নাতের বিষয়ে রূপক ভাষা ব্যবহার করেছে: আল্লাহর প্রতি তাদের তাকওয়া পালনকারীদের জন্য জান্নাতের একটি উপমা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে: এর তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়; এর ফল স্থায়ী এবং এর ছায়া (১৩:৩৫; ৪৭:১৫)।

"অনুরূপতা" উপরের আয়াতের মূল শব্দ। এটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ। জান্নাতের আনন্দ এবং আরাম বর্ণনা করা হয়েছে এমন শব্দগুলির আক্ষরিক অর্থের উপর জোর দেওয়ার বিরুদ্ধে আমাদের

স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে। আমাদের এই উপদেশটি মেনে চলতে হবে যে এগুলি কেবল রূপক যা চেতনার অবস্থাকে ইঙ্গিত করে কিন্তু জান্নাত নামে পরিচিত তার সঠিক ধারণা প্রদান করে না।

প্রকৃতপক্ষে, জান্নাত বর্ণনা করা যায় না: এটি কেবল প্রতীকীভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। অস্তিত্বের উচ্চতর স্তরটি নিম্নতর স্তরের বাসিন্দাদের দ্বারা কল্পনা বা কল্পনা করা যায় না। কোরআন এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলেছে, যেমনটি নিম্নলিখিত আয়াতে দেখানো হয়েছে: কেউ জানে না যে তাদের কাজের প্রতিদান হিসেবে তাদের জন্য চোখের কী আনন্দ সংরক্ষিত আছে (৩২:১৭)।

কোরআনের আরেকটি আয়াত আমাদের জান্নাতের প্রকৃত ধারণার দিকে পরিচালিত করে। আমাদের বলা হয়েছে যে জান্নাতকে একটি কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয় বরং অস্তিত্বের সাথে সীমাবদ্ধ, যদি অস্তিত্ব ঐশ্বরিকতার সাথে একত্রে থাকে: জান্নাত আকাশ ও পৃথিবীর মতো প্রশস্ত (৩:১৩২.৫৭:২১)।

মনের অবস্থা হওয়ায়, জান্নাত পৃথিবীতে মানুষের কাছে অগম্য এবং দুর্গম নয়। স্রষ্টার ইচ্ছার (অর্থাৎ, তাঁর আইনের) সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপনকারী সৎ ব্যক্তি জান্নাতের পূর্বাভাস পায়। কোরআন তার শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপনের কথা "স্বর্গীয়" বলে উল্লেখ করেছে। আমরা এই জীবনে জান্নাতের ঝলক পাই এবং এই সত্যটি আমাদের কাছে জান্নাতকে বাস্তব করে তোলে। জান্নাত আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতার সাথে জড়িত এবং তাই এটি কেবল কল্পনার কল্পনা নয়।

প্রায়শই প্রশ্ন করা হয়: কোরআনে জান্নাতকে কেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাষায় চিত্রিত করা হয়েছে? দুটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখলে এর উত্তর দেওয়া কঠিন নয়। প্রথমত, আমাদের বর্তমানের সাথে এতটা ভিন্ন অস্তিত্বের অবস্থা কেবলমাত্র আমাদের পরিচিত বস্তু এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে অনুমান করা যেতে পারে। এর মধ্যে, কেবলমাত্র সেই অবস্থাগুলিই নির্বাচন করা হয়েছে যা উচ্চতর স্তরের সাথে কিছু, যদিও খুব সামান্য, সাদৃশ্যপূর্ণ। আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে ধার করা শব্দগুলি অন্য স্তরের ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, তবে কেবল ইঙ্গিত করার জন্য।

দ্বিতীয় বিবেচনা, যা মনে রাখা উচিত তা হল যে কোরআন (যদিও সমগ্র মানবজাতির জন্য) প্রাথমিকভাবে এমন একটি জাতির উদ্দেশ্যে সম্বোধন করা হয়েছিল যারা ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক কারণগুলির দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু জিনিসকে খুব বেশি মূল্য দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল। আরবদের বিমূর্ত চিন্তাভাবনা এবং আধিভৌতিক অনুমানের প্রতি খুব কমই আগ্রহ ছিল। কেবল উপলব্ধিযোগ্য বস্তুই তাদের কাছে বাস্তব ছিল। তাদের মধ্যে কোনও বস্তুকে দেবতা হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা ছিল না।

তারা কেবল সেইসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিত যা তাদের ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। দ্বিতীয়ত, তারা একটি অনুর্বর দেশে বাস করত। তাদের চারপাশে ছিল শুষ্ক মরুভূমির বিস্তৃত বিস্তৃতি - জীবন ছিল কঠিন, আরাম-আয়েশ খুব কম। সর্বোপরি, তারা শীতল ঝর্ণা, ফলে ভরা সবুজ ছায়াময় গাছ, প্রবাহমান স্রোত এবং দুধ ও মধুকে মূল্যবান মনে করত। এই পরিচিত এবং সুনির্দিষ্ট বস্তুর মাধ্যমে, কোরআন উচ্চতর স্তরে অস্তিত্বের সমৃদ্ধির অনুভূতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ ব্যবহার করার সময়, কোরআন মানুষকে সতর্ক করার সুযোগ হাতছাড়া করে না এই ইঙ্গিত দিয়ে যে শব্দগুলিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা উচিত নয়। এটি তাদের বলে যে তারা কেবল তাদের পছন্দের বাগানই পাবে না বরং আরও অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষিত কিছু পাবে। যখন পৌত্তলিকরা রাসূলুল্লাহকে তার জন্য একটি বাগান পাঠাতে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করতে বলেছিল, তখন কোরআন উত্তর দেয়, "ধন্য তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে সবকিছুর চেয়ে উত্তম - যার নীচে নদী প্রবাহিত - দেবেন এবং আপনাকে প্রাসাদ প্রদান করবেন" (২৫: ৮-১০)।

অধিকন্তু, আরবরা ছিল দরিদ্র জাতি এবং ধনী জাতি দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তারা স্বাভাবিকভাবেই তাদের সৌভাগ্যবান প্রতিবেশীদের সম্পদ এবং বিলাসিতা দেখে ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে দেখত। কোরআন তাদের আশ্বস্ত করেছিল যে যদি তারা ভালো হয়, তাহলে তারা এই সমস্ত জিনিস এবং আরও অনেক কিছু পাবে। এটা স্পষ্ট যে কোরআন অভদ্র সরল মানুষকে হাস্যরস করছে যাতে তারা সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে। তারা অন্য কোনও ধরণের আবেদনের প্রতি অপ্রতিরোধ্য ছিল।

প্রসঙ্গক্রমে, আমরা আরও লক্ষ্য করি যে কোরআন এই পৃথিবীর ভালো জিনিস উপভোগ করার মধ্যে কোনও ক্ষতি দেখে না। এটি মানুষকে ভালো জিনিসগুলিকে ঘৃণা করতে উৎসাহিত করে না, এবং এটি তপস্যা এবং আত্মত্যাগকে সমর্থন করে না: আর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে এবং তাঁর কর্মসূচি অনুসারে কাজ করে তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি অবশ্যই তাদের শক্তি দেবেন যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের শক্তি দিয়েছিলেন; এবং অবশ্যই তাদের জন্য তাদের দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবেন, যা তিনি তাদের জন্য অনুমোদিত করেছেন এবং অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ভয়কে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করবেন (২৪: ৫৫)।

উপরোক্ত আয়াতটি জাতির উত্থান ও পতনের প্রশ্ন উত্থাপন করে। একটি জাতি হঠাৎ করেই ক্ষমতা ও গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হয় এবং তারপর, অল্প বা দীর্ঘ সময়ের পরে, ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং আরেকটি শক্তিশালী জাতি তাদের স্থান দখল করে। এখানেও আমরা একটি অপরিবর্তনীয় আইন, জাতিগুলির বেঁচে থাকার আইনের কার্যকারিতা দেখতে পাই। এটি মূলত একটি নৈতিক আইন। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি জাতি, জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে তার সাফল্যের মাধ্যমে, মানবতার অগ্রগতিকে এগিয়ে নিতে

সাহায্য করে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি সমৃদ্ধ ও সমৃদ্ধ হতে থাকে। যে মুহূর্তে তার কার্যকলাপ মানবজাতির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি ক্ষয় এবং বিলুপ্তির জন্য নির্ধারিত হয়। আমরা মানব ইতিহাস জুড়ে এই আইন কার্যকর দেখতে পাই। সমস্ত জাতির জীবন এই আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। জাতিগুলির ভাগ্য নৈতিক মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে, নিষ্ঠুর শক্তির অধিকারের উপর নয়। লক্ষ্য করুন কোরআন এ সম্পর্কে কী বলে: আমরা (এইভাবে) তোমাদের তাদের জমি, তাদের ঘরবাড়ি এবং তাদের সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছিলাম, এবং এমন জমি যা তোমরা এখনও পদদলিত করোনি (৩৩:২৭)।

সেই জাতিই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হয় যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রবুবিয়াতের ধারায় যোগদান করেছে এবং পরম মূল্যবোধ লালন ও বিকাশের মাধ্যমে এবং স্বাধীন আত্মার বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে এর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এই জাতি, তার উত্তরাধিকারে প্রবেশ করার পর কোরআনের ভাষায় বলে: স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন এবং আমাদেরকে এই ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। . . . আমরা যেখানে ইচ্ছা জান্নাতে বসবাস করতে পারি। যারা কাজ করে তাদের পুরষ্কার এতই মহান (৩৯: ৭৪)।

এই আয়াতটি জান্নাতের প্রকৃত প্রকৃতি প্রকাশ করে এবং এই জীবন এবং পরকালের মধ্যে ধারাবাহিকতার উপর জোর দেয়। এটা স্পষ্ট যে জান্নাত অস্তিত্বের একটি অবস্থা এবং যদিও মৃত্যুর পরেই ভালোরা এতে প্রবেশ করে, তারা যখন তাদের জীবন ঐশ্বরিক ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন তারা এই জীবনেও এর পূর্বাভাস উপভোগ করতে পারে। এই জীবনে এটি যে আশা করা যায় তা দেখায় যে এটিকে একটি স্থান হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। এই অস্তিত্বের স্তরের বৈশিষ্ট্য হল, দৈহিক সত্তার মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করা হয়, যাতে প্রকৃত সত্তা বিকাশ এবং পরিপূর্ণতা লাভের জন্য স্বাধীন থাকে। আদমকে সম্বোধন করা নিম্নলিখিত আয়াতটি তার বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করে: তোমার জন্য (অনুমোদিত) যে তুমি সেখানে (জান্নাতে) ক্ষুধার্ত থাকবে না, উলঙ্গ থাকবে না; সেখানে তুমি তৃষ্ণার্ত থাকবে না এবং সূর্যের তাপে আক্রান্ত হবে না (২০: ১১৮-১১৯)।

সর্বোপরি, শরীরের খাদ্য, পোশাক এবং আশ্রয়ের প্রয়োজন। যখন এগুলি সরবরাহ করা হয় তখন মন উচ্চতর লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। তবে, কেবল এই জিনিসগুলিই সরবরাহ করা হবে না বরং অন্যান্য জিনিসও সরবরাহ করা হবে যা প্রয়োজনীয় নয়, তবুও জীবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং তাই, কাঙ্ক্ষিত: তাদের সেখানে সোনা ও মুক্তোর ব্রেসলেট দিয়ে সজ্জিত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক রেশমের হবে (২২: ২৩)। সোনার থালা এবং বাটি তাদের কাছে বহন করা হবে (৪৩: ৭১)। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ফল (৪৩: ৭৩)। তাদের উপর থাকবে মিহি সবুজ রেশম এবং ব্রোকেডের পোশাক (৭৬:২১)। এবং তারা যা পছন্দ করে পাখির মাংস (৫৬:২১)।

নিঃসন্দেহে, ভাষাটি রূপক, কিন্তু রূপক বলেই এটি পরিবেশন করে দ্বৈত উদ্দেশ্য। এই জীবনের প্রসঙ্গে, উপরে ব্যবহৃত শব্দগুলি এমন বস্তুগত বস্তুগুলিকে নির্দেশ করে যা আরবদের দ্বারা কাম্য এবং আবেগের সাথে আকাঙ্ক্ষিত ছিল। পরকালের প্রসঙ্গে, একই শব্দগুলি অস্তিত্বের উচ্চ স্তরের আনন্দের প্রতীক। এটি লক্ষ করা উচিত যে, কোরআনের শিক্ষা অনুসরণ করে আরবরা প্রকৃতপক্ষে এই জীবনে এবং পরকালে প্রতিশ্রুত সমস্ত জিনিসের প্রাচুর্য অর্জন করেছিল। তাদের স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এই পৃথিবীতে ভালো জিনিস উপভোগ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। জীবনের আনন্দ মানুষের সামনে উচ্চতর উদ্দেশ্য অর্জনের পথে বাধা নয়, যদি সে আনন্দে ডুবে না থাকে এবং তার আত্মা মুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন থাকে। প্রাথমিক মুসলিমরা এই শর্ত পূরণ করেছিল এবং বিজয় তাদের জন্য যে সম্পদ এনেছিল তার মাঝে তাদের আত্মা স্বাধীন ছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই, আরবরা নিজেদেরকে রত্নখচিত চুড়ি, সোনা ও রূপার পাত্র, রেশমী পোশাক, গদিযুক্ত ডিভান, অপূর্ব সৌন্দর্যের পাত্র, সিরিয়া, ইরাক ও মিশরের উর্বর ক্ষেত এবং ফলের বাগান, নদী এবং পাহাড়ের ধারের অধিকারী দেখতে পেল। তারা যদি মনে করত যে জান্নাত পৃথিবীতে নেমে এসেছে, তাহলে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই: কিন্তু এই জীবনের আনন্দ তাদের জন্য অপেক্ষা করা জান্নাতের অবর্ণনীয় আনন্দের আকাঙ্ক্ষাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। এই বিলাসবহুল ভোগের মাঝেও তারা সেই মানসিক প্রশান্তি উপভোগ করেছিল যা কোনও সম্রাট বা বিজয়ী অনুভব করেননি। কারণ এই সমস্ত ভালো জিনিসের উপভোগ তাদেরকে আত্ম-উন্নয়নের পথ থেকে বিচ্যুত করেনি এবং প্রকৃত সত্তার স্বার্থ তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাই সম্পদ তাদেরকে গর্বিত ও অহংকারী করেনি বরং বিনয়ী ও স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ করে তুলেছে: এবং তারা বলবে: আল্লাহর জন্য ধন্যবাদ যিনি আমাদের থেকে দুঃখ দূর করেছেন (৩৫: ৩৪)। তারা জান্নাতে রাজত্বকারী শান্তির পূর্বাভাস পেয়েছিল। সেখানে তারা কোন অসার কথা শুনবে না, কেবল শান্তি (১৯: ৬২)।

যে মনে ভালোবাসা এবং শান্তি বিরাজমান, সেখানে বিদ্বেষ এবং ক্রোধের অনুভূতি প্রবেশ করতে পারে না: এবং আমরা তাদের বুকের মধ্যে থাকা যেকোনো বিদ্বেষ দূর করব। মুখোমুখি (তারা শুয়ে থাকে) সোফায় (১৫:৪৭)।

তারা নিঃস্বার্থ সাহচর্যের আনন্দ উপভোগ করে এবং এমন একটি সমাজের সদস্য যারা একনিষ্ঠ নিষ্ঠার সাথে ভালো এবং সুন্দরের পিছনে ছুটতে থাকে। পার্থিব কর্মজীবন মানুষের আত্মার প্রকৃত বিকাশের সূচনা মাত্র। আত্ম-তৃপ্তির আনন্দকে স্বর্গীয় পানীয় দ্বারা প্রতীকী করা হয়েছে: নিশ্চয়ই, ধার্মিকরা কাফুরের (জলের) সাথে মিশ্রিত একটি পেয়ালা পান করবে, একটি ঝর্ণা যা থেকে স্রষ্টার বান্দারা পান করবে এবং তা প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত করবে (৭৬:৫-৬)।

এই ধরণের সমাজের একজন সদস্য আত্ম-উপলব্ধিতে অবিচল অগ্রগতি লাভ করে। যদি সে তার সহকর্মীদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হয়, তবে তার নিজের কাঁধে দায়িত্ব বর্তায়। কোরআন বলে: এটি মানুষের জন্য একটি সতর্কীকরণ। তোমাদের মধ্যে যারা এগিয়ে যেতে বা পিছিয়ে থাকতে চায় তাদের জন্য। প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের কর্মের জন্য বন্ধক থাকে (৭৪:৩৬-৩৮)।

যারা এগিয়ে যায় তাদের পথ "তাদের কপালের আলো" দ্বারা আলোকিত হয়, যা তাদের সাথে সাথে চলে। তারা আলোর জন্য কৃতজ্ঞ এবং এর আরও বেশি কামনা করে। "হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের আলোকে পরিপূর্ণ করে দাও" (৬৬:৮)। তারা সত্তার মাপকাঠিতে আরও উঁচুতে উঠতে থাকে। তাদের অগ্রগতি কোন কিছুর দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয় না, যেমন কোরআন স্পষ্টভাবে বলে: যারা তাদের রবের প্রতি কর্তব্য পালন করে, তাদের জন্য উচ্চতর ঘর রয়েছে যার উপরে (অন্যান্য) উঁচু ঘর নির্মিত, তাদের নীচ দিয়ে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা (৩৯:২০)। এটি সেই জান্নাত যা রবুবিয়্যাতের আদেশ তাদের জন্য নিশ্চিত করে যারা "আল্লাহর পথে তাদের জীবন এবং তাদের যা কিছু আছে তা বিক্রি করে।"

অতএব, জান্নাত কেবল একটি বিমূর্ত ধারণা নয়। বিশ্বাসীরা এটিকে বাস্তব এবং অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত বলে মনে করে। তারা এই জীবনের পূর্বাভাসের ভিত্তিতে এর ধারণা তৈরি করতে পারে। এটি এইভাবে জীবন্ত অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত।

**৩ আল্লাহ**

আমরা দেখেছি যে পূর্ববর্তী অংশে বর্ণিত চুক্তিটি স্রষ্টা এবং মানুষের মধ্যে। মানুষ তার জীবন এবং সম্পদ স্রষ্টার কাছে সমর্পণ করে এবং এর বিনিময়ে স্রষ্টা তাকে জান্নাত দান করেন। এই বিনিময় কীভাবে হতে পারে? স্রষ্টার সাথে কোথায় যোগাযোগ করা যায়? জীবন এবং সম্পদ কীভাবে তাঁর কাছে সমর্পণ করা যেতে পারে? স্রষ্টার সাথে যোগাযোগের প্রশ্নে, উত্তরটি সহজ। যখন আমরা কোরআনে তিনি যা অবতীর্ণ করেছেন তা পাঠ করি এবং বুঝতে পারি তখন স্রষ্টা আসলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। এভাবেই আমরা তাঁর সাথে যোগাযোগ করি।

পণ্য সরবরাহের প্রশ্নে, কেবলমাত্র রবুবিয়্যাতের আদেশের প্রেক্ষাপটে একটি সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া যেতে পারে। এই আদেশটি মানুষকে তার সমস্ত সম্ভাবনা বিকাশে এবং এমন একটি সুস্থ ও সমন্বিত ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছে যাতে সে মৃত্যুর ধাক্কা সহ্য করতে পারে এবং শারীরিক বিলোপ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। মানুষ এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে নির্জনে নয় বরং সমমনা ব্যক্তিদের সমাজে এবং পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে। এই সমাজ হল রবুবিয়্যাতের আদেশের মূর্ত প্রতীক। এটি চুক্তিভিত্তিকভাবে সংগঠিত এবং এর সদস্যপদ সকলের জন্য উন্মুক্ত যারা,

এতে প্রবেশ করা এবং এর লক্ষ্য ও আদর্শের সাথে নিজেকে যুক্ত করা। কেবলমাত্র দৃঢ় প্রত্যয়ে লালিত একটি সাহসী আদর্শই জীবনের অর্থ প্রদান করে। আদর্শের অভাবে, মানব জীবন দরিদ্র, নীচু, অপ্রস্তুত এবং অর্থহীন হয়ে পড়ে। আদর্শ যত উচ্চ, জীবন ততই উৎকৃষ্ট হয়। সুতরাং, যখন মানুষ তার সমাজের উচ্চ আদর্শকে ভাগ করে নেয় এবং সমাজ রবুবিয়্যাতের ধারার চেতনায় উদ্দীপিত হয়, তখন তার ব্যক্তিত্ব সমৃদ্ধ হয় এবং এর অগ্রগতি উদ্দীপিত হয়। এই ত্বরান্বিত বিকাশে, সে এমন একটি সুবিধা স্বীকার করে যে সে তার জীবন এবং তার সমস্ত কিছুর বিনিময়ে যেকোনো মূল্যে, এমনকি প্রয়োজনে, আদেশ - তার অগ্রগতির বাহন - বজায় রাখতে অনুপ্রাণিত হয়। তখনই চুক্তি হয় এবং চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়।

শেষ ওহীর বাহক মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন রবুবিয়্যাতের ধারাকে ধারণকারী সমাজের প্রধান। যারা তাদের জীবন ও সম্পদ তার হাতে তুলে দিয়েছিল, তারা আসলে এগুলো আল্লাহর কাছে বিক্রি করছিল, কোরআনের ভাষায়: নিশ্চয়ই যারা তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করে তারা কেবল আল্লাহর কাছেই আনুগত্যের শপথ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপরে (৪৮:১০)।

এটি সেই সমাজ যা রবুবিয়্যাতের আদেশের বাস্তব প্রকাশ করে এবং সেই সমাজের প্রধান, অর্থাৎ, স্রষ্টার "প্রতিনিধি", এই অর্থে যে তিনি তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্রষ্টার দায়িত্ব পালনের অসাধারণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন, উদাহরণস্বরূপ, তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় প্রদান এবং পৃথিবীতে তাঁর আইন প্রয়োগ করার। সুতরাং তারা অন্যদের সাথে এই ধরনের চুক্তি করার জন্য অনুমোদিত। কারণটি বোঝা কঠিন নয়: এই ধরণের সমাজের নেতা কেবল সেই ব্যক্তিই হতে পারেন যিনি নিজেকে স্রষ্টার কাছে সমর্পণ করেছেন এবং তাঁর ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বরিক ইচ্ছার সাথে একীভূত করেছেন। স্পষ্টতই, যে আয়াতে মানুষকে "আল্লাহর নামে ব্যয়" এবং "আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার" নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার অর্থ কেবল এই হতে পারে যে "জান্নাতের মূল্য" রবুবিয়াত সমাজের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতে হবে। সমাজ স্বাভাবিকভাবেই মানব জীবন ও ব্যক্তিত্বের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য তার হাতে থাকা সম্পদ ব্যবহার করবে।

রবুবিয়াত ধারা বিবর্তনের একটি নতুন প্রক্রিয়া শুরু করে - নৈতিক বিবর্তন। যে ব্যক্তি তার সামনে উন্মুক্ত সম্ভাবনাগুলিকে মূল্য দেয় সে বিবর্তনের এই প্রক্রিয়ার প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না। সে যে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে তার জন্য তার যা কিছু আছে তা ত্যাগ করতে খুব বেশি ইচ্ছুক হবে না। যারা রবুবিয়াত ধারায় যোগদান করে এবং আত্ম-উপলব্ধির সাধনায় নিজেদের উৎসর্গ করে, তারা এর অর্জনের জন্য কোনও মূল্যকে খুব বেশি মূল্য মনে করে না। তারা কেবল মঙ্গল কামনা করে, তা ইহকাল হোক বা পরকাল। তারা সঠিকভাবে প্রার্থনা করে: হে আমাদের রব! আমাদের এই পৃথিবীতে মঙ্গল দিন এবং পরকালেও মঙ্গল দিন (২: ২০১)।

**৪. জীবিকার সমস্যা**

প্রকৃত সত্তা হয়তো অবশেষে নিজে নিজে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তার পার্থিব জীবনে এটি কমবেশি সম্পূর্ণরূপে শরীরের উপর নির্ভরশীল। অতএব, শারীরিক চাহিদার মানুষের উপর পূর্ব দাবি রয়েছে। দেহ তখনই বেঁচে থাকতে পারে যখন তার মৌলিক চাহিদা পূরণে খুব বেশি সময় ব্যয় করা না হয়। ক্ষুধা এই জৈবিক চালিকাশক্তিগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা নিবারণের প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই দেখার থাকে না। যখন তার কাছে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য থাকে, তখনই মানুষ শিল্প, বিজ্ঞান এবং ধর্মের মতো উচ্চতর স্বার্থের দিকে মনোনিবেশ করে। ভালোর সন্ধানে জড়িত হওয়ার আগে, মানুষ এই নিশ্চয়তা দাবি করে যে সে এবং তার সন্তানরা খাদ্যের অভাবে অভুক্ত থাকবে না। কোরআন এই আশ্বাস দেয়: আমরা তোমাদের এবং তোমাদের সন্তানদের জন্য রিজিক দেব (৬: ১৫২)।

অতএব, রবুবিয়্যাতের আদেশ তার সদস্যদের জীবিকা নির্বাহের উপায় সরবরাহের জন্য নিজেকে দায়ী করে। মানুষের শারীরিক চাহিদা পূরণ, যদিও নিজেই একটি শেষ নয়, তা হল সেই ভয়াবহ বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে। এই চাহিদা পূরণ হয়ে গেলে, মন উচ্চতর সাধনায় লিপ্ত হতে স্বাধীন হয়। আত্ম-উপলব্ধির আদর্শ কেবল তাদের কাছেই আবেদনময় হতে পারে যাদের মন ক্ষুধার যন্ত্রণায় জর্জরিত নয়। অতএব, মানুষ সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কামনা করে। কিন্তু মানুষ কেবল বাঁচতে চায় না; সে ভালোভাবে বাঁচতে চায়। শারীরিক বেঁচে থাকার সমস্যাগুলি তার মন থেকে সরে যাওয়ার সাথে সাথেই সে জীবনকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করে এমন বিষয়গুলির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এটি তাকে ব্যক্তি থেকে সামগ্রিকভাবে বেঁচে থাকার দিকে নিয়ে যায়। সে কী ধরণের সামাজিক ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং কোন স্থায়ী মূল্যবোধগুলি এটিকে স্থায়ী করতে পারে তা কল্পনা করার চেষ্টা করে। এই কারণেই উচ্চতর বিষয়গুলি আলোচনা করার আগে কোরআনের সমাজ তার সকল সদস্যের জন্য জীবন ধারণের উপায় নিশ্চিত করাকে তার প্রথম কর্তব্য বলে মনে করে। যখন এই দায়িত্ব যুক্তিসঙ্গতভাবে পালন করা হয়, তখনই সমাজ তার সদস্যদের আত্ম-উন্নয়নের উদ্যোগে যাত্রা শুরু করার আহ্বান জানায়। তবে, রবুবিয়্যাত সমাজ বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না। এটি রবুবিয়্যাতকে তার নিজস্ব সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। এই ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তাদের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করবে। এর দৃষ্টিভঙ্গি সমগ্র মানবজাতিকে আলিঙ্গন করতে হবে। মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন এবং তার যে আনুগত্যই থাকুক না কেন, এর আগ্রহ থাকতে হবে।

ধরে রাখো। এটি বিশ্বাস করে যে প্রতিটি মানুষ অনন্য এবং এর নিজস্ব অবদান রয়েছে। তাই, এটিকে সমস্ত মানবজাতির জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে কোনও প্রতিভা হারিয়ে না যায়। এটিকে সমস্ত মানুষের জন্য অর্থনৈতিক সুরক্ষার লক্ষ্য অনুসরণ করতে হবে। এটি জীবনের সমৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য নিজেকে নিবেদিত করে এবং যদি এটি কেবল তার নিজস্ব সদস্যদের জন্য চিন্তা করে তবে

এটি নিজের প্রতি সত্য হবে না। এর কর্মসূচিতে "সমস্ত মানবজাতির রব" এর ঐশ্বরিক গুণাবলী প্রতিফলিত হওয়া উচিত (১১৪: ১)। এবং পৃথিবীতে কোনও দাবা (চলমান জিনিস) নেই তবে এর রিজিক আল্লাহর কাছে (১১.৬)।

"দাবা" শব্দটি (উপরে উদ্ধৃত আয়াতে এবং যার অর্থ "চলমান জিনিস") মানুষ এবং প্রাণী উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। রাবুবিয়্যাতের আদেশ সমস্ত জীবের চাহিদা পূরণের জন্য নিজেকে দায়ী করে কারণ এটি পৃথিবীতে দীন প্রতিষ্ঠার প্রধান সংস্থা, অথবা, অন্য কথায়, "স্বর্গরাজ্য" জীবনের বিকাশ এবং সম্প্রসারণ এবং আমরা যে মহাবিশ্বে বাস করি তার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য।

এটি আমাদের এমন একটি প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায় যা নিয়ে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে উত্তপ্ত বিতর্ক চলছে। যদি সমাজ তার সদস্যদের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে, তাহলে কি তাদের কাজ করার জন্য কোনও উৎসাহ থাকবে না? তারা কি অলস এবং স্বার্থপর হয়ে উঠবে না? তারা অলস হয়ে যাবে কারণ তারা এক পলকও কাজ না করে আরামে থাকতে পারে। তারা স্বার্থপরও হয়ে উঠবে, কারণ তাদের জন্য প্রদত্ত আরাম উপভোগ করতে সন্তুষ্ট থাকার কারণে, তারা তাদের চেয়ে কম ভাগ্যবানদের কথা খুব একটা ভাবে না। তাই এই ধরণের সমাজের সদস্যরা শারীরিকভাবে উন্নত হবে কিন্তু নৈতিকভাবে অধঃপতিত হবে। যারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থক তারা যুক্তি দেন যে একটি কমিউনিস্ট সমাজ মানুষকে কাজ করার প্রধান উৎসাহ থেকে বঞ্চিত না করে পারে না। মানুষ কাজকে বিরক্তিকর বলে মনে করে এবং নিজের উপর ছেড়ে দেয়) সে কাজ করার চেয়ে খেলাধুলা করতে পছন্দ করে। সে কাজ করে কারণ সে আরও আরাম এবং বিলাসিতা, অথবা আরও সম্পদ এবং ক্ষমতা চায়। একটি সমতাবাদী সমাজে যেখানে ব্যক্তি কেবল তার যা প্রয়োজন তা পায়, সে কাজ করুক বা না করুক, উৎপাদন অবশ্যই হ্রাস পাবে এবং বন্টনের জন্য কম থেকে কম পাওয়া যাবে।

সম্পদের সুষম বন্টন সত্ত্বেও, এই ধরণের সমাজ শীঘ্রই বা পরে ভেঙে পড়বে। অন্যদিকে, পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। প্রত্যেকেই কাজ করে কারণ সে জানে যে সে তার শ্রমের ফল ভোগ করবে। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং জনগণ পরিশ্রমী ও সমৃদ্ধ হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নায়করা সাধারণত এটাই বলে থাকেন।

পুঁজিবাদ অবশ্য ছবির অন্য দিকটি দেখতে ব্যর্থ হয়। ধনীদের আরও ধনী করার পাশাপাশি, এটি প্রায়শই দরিদ্রদের অনাহারের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। এই ব্যবস্থার "নবীগণ" দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এটি ঘোষণা করেছিলেন। ডিফো তার "দানশীলতাকে দান না করা এবং দানশীলতাকে কাজে লাগানো এবং দরিদ্রদের শ্রমদান" শীর্ষক পুস্তিকায় যুক্তি দিয়েছিলেন যে: যদি দরিদ্রদের স্বস্তি দেওয়া হয়, তাহলে তারা অলস

থাকবে, অথবা বিকল্পভাবে যদি তারা সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু করে, তাহলে বেসরকারি উৎপাদকও তাদের শ্রমের উৎস থেকে সমানভাবে বঞ্চিত হবে, যার উপসংহার আধুনিক পরিভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে যে, তাদের বাজারে ফেলে দেওয়া উচিত এবং যদি তারা সেখানে জায়গা না পায়, তাহলে তাদেরকে অনাহারে থাকতে দেওয়া উচিত। [১]

ম্যান্ডেভিল তার "মৌমাছির গল্প"-এ উপসংহারটি তুলে ধরেছিলেন যে: দরিদ্রদের সেবাযোগ্য হওয়ার জন্য তাদের উত্তেজিত করার মতো আর কিছুই নেই, কেবল তাদের চাহিদা, যা উপশম করা বিচক্ষণতা, নিরাময় করা বোকামি। সমাজকে সুখী করার জন্য দরিদ্রদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যককে হতভাগ্য করা প্রয়োজন। [২]

আরও স্পষ্ট ভাষায়, উইলিয়াম টাউনসেন্ড তার "দরিদ্র আইন সম্পর্কে গবেষণাপত্র"-এ ঘোষণা করেছেন যে: ক্ষুধা সবচেয়ে হিংস্র প্রাণীদেরও দমন করবে, এটি সবচেয়ে বিকৃত প্রাণীদেরও শালীনতা ও সভ্যতা, আনুগত্য এবং পরাধীনতা শেখাবে। সাধারণভাবে, কেবল ক্ষুধাই তাদের (দরিদ্রদের) শ্রমে প্ররোচিত করতে পারে। [৩]

এই দর্শন জনসাধারণের জন্য অবর্ণনীয় দুর্দশা ও দুর্দশা ডেকে এনেছে। এটি পরাধীন ও দুর্বল জাতির নির্মম শোষণের জন্য নৈতিক অনুমোদন প্রদান করে। হতাশায়, শ্রমিক এবং দুর্বল মানুষ বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছিল। সংগ্রাম এখনও জীবনের এক বিরাট ক্ষতি করেছে। যে ব্যবস্থায় দুর্বল এবং সরলরা প্রাচীরের সাথে লেগে যায় এবং নীতিহীনরা তাদের নিজস্ব পথ বেছে নেয়, সেখানে মুক্ত ও সৎ মানুষের বিকাশকে উৎসাহিত করার আশা করা যায় না।

কমিউনিস্টরা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উৎখাত করতে চায় এবং তার পরিবর্তে তারা একটি সর্বগ্রাসী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এর প্রতিকার রোগের চেয়েও খারাপ। নিঃসন্দেহে, একটি কমিউনিস্ট সমাজে প্রতিটি মানুষকে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় এবং তার মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করা হয়: কিন্তু তাকে একটি মুক্ত সমাজে একজন মুক্ত মানুষ বলা খুব কমই সম্ভব। তাকে বিশাল যন্ত্রের একটি নিছক কণার মর্যাদায় নামিয়ে আনা হয়েছে। সে একটি অত্যন্ত নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজের সদস্য, অথবা বরং একটি অংশ। কর্ম ও চিন্তাভাবনায় তাকে দলীয় নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠিত মান মেনে চলতে হবে। তাকে নিজের জন্য চিন্তা করার, বেছে নেওয়ার এবং বিচার করার অনুমতি নেই। রাবুবিয়াত সমাজে মানুষ তার জীবন স্রষ্টার কাছে বিক্রি করে। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে সে তার মন রাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করে। সে উপলব্ধি করে, মনে রাখে, কল্পনা করে এবং বিশ্বাস করে।

রাষ্ট্র তাকে যা করতে চায় তা-ই করে। সে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—তার সত্ত্বা—রাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করে দেয়। সে আর নিজের লক্ষ্য নয়; সে কেবল রাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জনের উপায়। সংক্ষেপে, সে একজন দাস বা দাসের চেয়েও নিম্ন স্তরে; একটি বুদ্ধিহীন যন্ত্রের মর্যাদায় পরিণত হয়। এই ধরনের সমাজে স্বাধীন আত্মার বিকাশ কীভাবে সম্ভব? কোরআনী সমাজে মানুষ একজন স্বেচ্ছাসেবক; কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে, একটি হাতিয়ার। এটি জীবন দর্শনের স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র যার উপর কমিউনিস্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত।

পশ্চিমে, গত দশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা অনেক চিন্তাশীল মানুষের কাছে আবেদন করেছে। কোরআনী সমাজের মতো কল্যাণ রাষ্ট্রও নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি। তবে, এই ধরনের রাষ্ট্র এখনও একটি আদর্শ হিসেবে রয়ে গেছে, সম্ভবত অর্জনযোগ্য কিন্তু এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। এমনকি যদি এটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবুও এর সদস্যরা কি তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত উৎসাহ পাবে? আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্রের মতো কোরআনের সমাজও মানুষকে যত্ন ও অভাবের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে চায়, কিন্তু কল্যাণ রাষ্ট্রের মতো নয়, এটি দুর্বল করে না বরং কাজ করার উৎসাহকে উদ্দীপিত করে। এটি মানুষের মনে এই ধারণা জাগিয়ে তোলে যে তার একমাত্র আদর্শ হল তার সমস্ত সুপ্ত শক্তির পূর্ণ বিকাশ এবং মানবজাতির নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমেই সে এই আদর্শ অর্জন করতে পারে। তাকে দান করতে হবে, নিতে হবে না। তাকে নিজের জন্য নয়, অন্যদের জন্য কাজ করতে হবে। সমস্ত মানুষের জীবনের সমৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে উজ্জীবিত করে, কারণ কেবল এইভাবেই সে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে। এই তাগিদ এতটাই প্রবল যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কাজ করার উৎসাহকে ব্যাহত করে না। এটা সত্য যে রুটি জীবনের লাঠি, কিন্তু এটাও সমানভাবে সত্য যে মানুষ কেবল রুটি দিয়ে বাঁচে না। প্রকৃত সুখ উপভোগ করতে হলে তার শারীরিক চাহিদা এবং তার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা উভয়ই পূরণ করতে হবে। অধ্যাপক হট্রের - - মন্তব্যটি সাবধানতার সাথে বিবেচনার দাবি রাখে: অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে একে অপরের থেকে আলাদা করে এমন উদ্দেশ্যগুলির প্রকৃতি যা মানুষকে কাজ করতে প্ররোচিত করে। [৪]

বাস্তবতা হল জীবনের বস্তুবাদী ধারণা অন্যদের উপকারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার প্রেরণা প্রদান করতে পারে না। এখানেই পুঁজিবাদী এবং কমিউনিস্ট ব্যবস্থা উভয়ই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। নিঃসন্দেহে পশ্চিমের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলি স্রষ্টা বিশ্বাস করে বলে দাবি করে, কিন্তু যেহেতু তারা সকলেই ধর্মনিরপেক্ষ, তাই তারা ব্যবহারিকভাবে যেকোনো কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের মতো "স্রষ্টা-হীন"। জীবনের বস্তুবাদী ধারণা মানুষকে পশুর স্তরের উপরে তুলতে পারে না যেখানে অন্যের কল্যাণের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার কোনও প্রণোদনা নেই: প্রাণীদের কোনও মূল্য নেই এবং তাই তারা পরার্থপরতার ধারণাটি ধারণ করতে অক্ষম। তাই জীবনের কমিউনিস্ট দর্শন কমিউনিস্ট সামাজিক ব্যবস্থার বিশাল কাঠামোর ভার বহন করার জন্য যথেষ্ট দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করতে পারে না। এটি কেবলমাত্র কোরআনের জীবন ধারণার উপর

ভিত্তি করে রবুবিয়াত ব্যবস্থায় সম্ভব, যার মতে আদর্শ হল মানুষের সত্তার বিকাশ, এবং সত্তা অন্যদের উপকারের জন্য যা করে এবং যা দান করে তার অনুপাতে বিকশিত হয়। এটি স্থায়ী মূল্যবোধগুলির মধ্যে একটি। কোরআনের স্থায়ী মূল্যবোধের সাথে মিশ্রিত সাম্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই আজকের বিশ্ব সমস্যার একমাত্র সমাধান। সংক্ষেপে, এটিই কোরআনের সামাজিক ব্যবস্থা। "বলশেভিজম প্লাস স্রষ্টা," ইকবাল স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসবেন্ডকে লিখেছিলেন, "ইসলামের সাথে প্রায় একই রকম।" [৫]

**৫ অতীন্দ্রিয় পথ**

এখানে মিস্টিক্যালিজমের লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করার জায়গা নয়। তবে, আমরা ইসলাম এবং মিস্টিক্যালিজম দ্বারা প্রচারিত জীবনযাত্রার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেই সন্তুষ্ট থাকব। মিস্টিক্যালি বিশ্বাস করেন যে তার আত্মা পদার্থের সংস্পর্শে দূষিত হয়েছে, তাই তিনি তাকে পবিত্র করার এবং পদার্থের মন্দ কবল থেকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্য অনুসরণ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি পৃথিবী থেকে সরে এসে, নির্জনে বসবাস করে এবং আত্ম-ক্ষোভ এবং আত্ম-ত্যাগ অনুশীলন করে এই কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি, বস্তু এবং আত্মার দ্বৈততার উপর ভিত্তি করে, যা ইসলামের কাছে বিজাতীয়। এমনকি, এর বাইরেও, ইসলাম লক্ষ্য এবং এটি অর্জনের পদ্ধতি উভয়কেই অস্বীকার করে। ইসলামের জন্য, মানুষের লক্ষ্য হল আত্ম-বিকাশ এবং এটি অর্জন করা উচিত পৃথিবীকে এড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমে নয় বরং এটি যে সুযোগগুলি প্রদান করে তার পূর্ণ ব্যবহার করে। ইসলাম এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে যে, মানুষ সমস্ত জীবনের সমৃদ্ধির মাধ্যমে তার জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে। মানুষকে কেবল নিজের জন্য নয় বরং সকল মানুষের কল্যাণের জন্য পণ্য উৎপাদন করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। কোরআন ঘোষণা করে যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে সে নির্জনে তার আত্মবিকাশ করছে, সে কেবল নিজেকেই প্রতারণা করছে: তুমি কি তাদের দেখোনি যারা মনে করে যে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হচ্ছে। বরং, কেবল আল্লাহর প্রদত্ত আইনের মাধ্যমেই ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে (৪:৪৯)।

এই ধারণাটি নিম্নলিখিত আয়াতে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: "ব্যক্তিত্বের বিকাশ" নিজের উপর আরোপ করো না। যে ব্যক্তি তাঁর আইন মেনে চলে, আল্লাহ তার সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন (৫৩:৩২)। আবার কোরআন জোর দিয়ে বলে: কেবলমাত্র তার ব্যক্তিত্ব, যে ব্যক্তি তার সম্পদ অন্যদের দান করে, তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় (৯২:১৮)।

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই তার আত্মবিকাশে সফল হয় যে প্রথমে যা পায় তার যোগ্য হয় এবং যা পায় তা সে অন্যদেরকে মুক্তভাবে দান করে। এটি দানশীলতার কাজ নয় বরং মুক্ত বুদ্ধিমান প্রাণীদের উপর আরোপিত একটি কর্তব্য। সন্ন্যাসবাদও ইসলামের সাথে বিজাতীয়। আবদ্ধ জীবন আত্মার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য অন্যদের সাথে সহযোগিতা করার

মাধ্যমেই মানুষ আত্ম-উন্নয়নে অগ্রগতি লাভ করে। কোরআন বলে: কিন্তু সন্ন্যাসবাদ, তারা (খ্রিস্টানরা) কেবল স্রষ্টার মঙ্গল কামনা করার জন্য এটি প্রতিষ্ঠা করেছিল; তবুও তারা এটিকে যথাযথ পালনের সাথে পালন করতে পারেনি (কারণ এটি করা সম্ভব নয়) (৫৭:২৭)।

নিজেকে উপলব্ধি করার সর্বোত্তম উপায় হল রবুবিয়াতের সদস্যপদ, যা পরম মূল্যবোধের অনুসরণ এবং সমগ্র মানবজাতির সেবায় নিবেদিত একটি সমাজ।

### *তথ্যসূত্র*


১. ই. এইচ. কার কর্তৃক উদ্ধৃত, দ্য নিউ সোসাইটি, পৃষ্ঠা ৪১-৪২।

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত।, পৃষ্ঠা ৬০।

৫. ৩০ জুলাই ১৯৩১ তারিখে লাহোরের দৈনিক সিভিল অ্যান্ড মিলিস্ট্রি গেজেটে প্রকাশিত চিঠি।

# অধ্যায় ১৩:
# প্রভুর আদেশ (রাবুবিয়াতের আদেশ) - এর লক্ষ্য এবং পরিধি
# (কোরআনের সামাজিক আদেশ)

## ১. সমাজের রাবুবিয়াতের আদেশ

রাবুবিয়াতের আদেশের মূর্ত প্রতীক হিসেবে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তিকে আত্ম-বিকাশের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করা। এর মৌলিক নীতি হলো ব্যক্তি হলো মূল্যবোধের কেন্দ্রবিন্দু এবং এই গোষ্ঠীটি এমনভাবে বিদ্যমান যাতে ব্যক্তি তার সামর্থ্যের পূর্ণ মাত্রায় নিজেকে বিকশিত ও প্রকাশ করতে পারে। এটি ব্যক্তিগত মূল্যের উপর প্রাথমিক জোর দেয়। এই নীতিগুলোর উপর ভিত্তি করে একটি সমাজ গঠিত হবে মুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা, প্রত্যেকে সকল জীবনের সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে তার জীবনকে সমৃদ্ধ করবে এবং প্রত্যেকে অন্যদেরকেও একই কাজ করতে সাহায্য করে এগিয়ে যাবে। এই সমাজকে বিচার করা উচিত সমস্ত মানব গোষ্ঠীর মুখোমুখি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য এটি যে সমাধানগুলি প্রদান করে তার দ্বারা। আমরা প্রথমে এটি যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে প্রচার করে তা বিবেচনা করব।

## ২. পুঁজিবাদ এবং রাবুবিয়াতের আদেশ

পুঁজিবাদ হল প্রাচীনতম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সময়ের সাথে সাথে এতে পবিত্রতার আবহ তৈরি হয়। মানুষ বিশ্বাস করত যে এটিই একমাত্র ব্যবস্থা যা "মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ"। অন্য কোনও ধরণের অর্থনৈতিক সংগঠনের অধীনে সমাজ উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে তা কল্পনাও করতে পারেনি। শিল্প ও বাণিজ্যিক বিপ্লবগুলি এটিকে একটি শক্তিশালী প্রেরণা দিয়েছে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে এটি তার শীর্ষে পৌঁছেছে। যখন পুঁজিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তখন এর ত্রুটিগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং আর উপেক্ষা করা যায় না। নিঃসন্দেহে, পুঁজিবাদের কিছু গুণ রয়েছে এবং সামাজিক বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে, এটি মানুষকে সভ্যতা তৈরি করতে এবং উচ্চতর জীবনযাত্রা অর্জনে সহায়তা করেছিল। এটি মানুষের মধ্যে কিছু সেরা গুণাবলীর কথা তুলে ধরে, যেমন উদ্যোগ, চাতুর্য, কল্পনাশক্তি এবং কঠোর পরিশ্রমের ক্ষমতা। কিন্তু এর দুর্বলতা, যা তার সমস্ত ভালো দিকগুলিকে ধুয়ে ফেলে, তা হল এটি উৎপাদনের একটি উপাদান, অর্থাৎ মূলধনকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয় - বরং এটি এটিকে সমস্ত কৃতিত্ব দেয় - এবং অন্যটির সাথে সমানভাবে - বরং আরও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যথা শ্রমের সাথে ন্যায়বিচার করতে ব্যর্থ হয়। ফলস্বরূপ উৎপাদিত সম্পদের সিংহভাগ সেই ব্যক্তির কাছে যায় যিনি মূলধন প্রদান করেন এবং শ্রমিককে কেবল সামান্য পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। পুঁজি অল্প কিছু লোকের দলে জমা হতে থাকে, অন্যদিকে দারিদ্র্য হলো জনসংখ্যার সিংহভাগ শ্রমিকদের ভাগ্য। জাতীয় সম্পদের এই অসম বন্টন, যা

পুঁজিবাদের একটি অপরিহার্য পরিণতি, কিছু সময়ের জন্য সহ্য করা হয়, কিন্তু, আজ হোক কাল হোক, এটি শ্রেণী সংগ্রামের জন্ম দেয় এবং সমাজের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে।

পুঁজিবাদ দুটি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম ধারণা হল, মানুষের অর্জিত সম্পত্তির উপর তার অলঙ্ঘনীয় অধিকার রয়েছে। দ্বিতীয়টি হল, সমাজ তখনই সমৃদ্ধ হতে পারে যখন এটি ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ না করে। পুঁজিপতি তার বিশ্বাসকে অবাধে ব্যবহার করার মতবাদের উপর স্থাপন করে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পবিত্র বলে মনে করে। সে যুক্তি দেয় যে সে তার নিজস্ব ক্ষমতা, দক্ষতা এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে যা অর্জন করেছে তা কেবল তার নিজস্ব হওয়া উচিত। কেউ এতে অংশ দাবি করতে পারে না। সে যদি চায়, তার একটি অংশ বা পুরোটা অন্যকে দিতে পারে কিন্তু কেউ তাকে তা করতে বাধ্য করতে পারে না। সে যদি নিজের কাছেই থাকে তবে সে কোনও অন্যায় করবে না। এই মনোভাব কোরাহে উদাহরণিত, যার গল্প কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। যখন তাকে তার বিশাল সম্পদের একটি অংশ অভাবী ও দরিদ্রদের জন্য দান করতে বলা হয়েছিল, তখন তিনি ঠিক আজকের পুঁজিপতির মতোই উত্তর দিয়েছিলেন। "আমি কেন করব? এটা আমার নিজস্ব সামর্থ্যের ফল" (২৮: ৭৮)। কোরআন আমাদের বলে যে মানুষ যদি বিশ্বাস করে যে তার সম্পদ কেবল তার নিজস্ব ক্ষমতা এবং প্রচেষ্টার জন্য দায়ী, তাহলে সে একটি গুরুতর ভুল করে:  এখন, যখন মানুষের উপর বিপদ আসে, তখন সে আমাদের কাছে ডাকে, এবং পরে, যখন আমরা তাকে আমাদের কাছ থেকে বরদান করি, তখন সে বলে: "কেবল আমার নিজস্ব ক্ষমতার মাধ্যমেই আমি তা পেয়েছি।" বরং, এটি একটি দুষ্টুমি (এরকম ভাবা) কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না (৩৯: ৪৯)।

ধনীপন্থীদের যুক্তির মূল ভুলটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা সম্পদের উৎপাদন নির্ভরশীল অবস্থার দিকে তাকাই। নীচে বর্ণিত চারটি কারণ সম্পদ উৎপাদনে অবদান রাখে:

১. মানুষের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা।

২. সে যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

৩. তার জন্য উপলব্ধ সুযোগ।

### ৪. শিল্প

এটা স্পষ্ট যে মানুষ কেবল চতুর্থ বিষয়ের জন্যই কৃতিত্ব নিতে পারে, অর্থাৎ, সে যে পরিশ্রম করে। তার প্রাকৃতিক সম্পদ স্রষ্টার দান। সে নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা অর্জন করেনি। সে যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পেয়েছে তার জন্য সে তার সম্প্রদায়ের কাছে ঋণী। সমাজও তাকে সম্পদ উৎপাদনের সুযোগ প্রদান করে। এর অর্থ হল মানুষ ন্যায়সঙ্গতভাবে তার উৎপাদিত সম্পদের সেই অংশই দাবি করতে পারে যা তার

শ্রমের ফল। সে যে কাজ করেছে তা তাকে উৎপাদিত সম্পদের অংশ হিসেবে দাবি করতে পারে, পুরো সম্পদের জন্য নয়। কোরআন স্পষ্টভাবে বলেছে:  মানুষ কেবল তাই পাবে যার জন্য সে চেষ্টা করে (৫৩: ৩৯)।

যদি এই নীতি গ্রহণ করা হয় এবং সৎ বিশ্বাসে তা বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে শ্রমিক এবং নিয়োগকর্তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং অভ্যন্তরীণ শান্তির জন্য একটি গুরুতর হুমকি দূর হবে।

পুঁজিপতি স্বেচ্ছায় তার লাভের সিংহভাগ সমাজের কল্যাণে ব্যয় করবে এবং শ্রমিকরা আরাম ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারবে। এই নীতিকে চ্যালেঞ্জ করা হয় এই কারণে যে মানুষের মধ্যে সহজাত পার্থক্য রয়েছে এবং সামর্থ্যের ক্ষেত্রে তাদের সমান বিবেচনা করা অন্যায্য। যাদের ক্ষমতা বেশি তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে জাতীয় সম্পদে অধিক অংশ দাবি করতে পারে। কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি হল, মানুষের ব্যক্তিগত মূল্য তার কোন কাজ করার প্রতিভার উপর নির্ভর করে না বরং সে আসলে কী করে তার উপর নির্ভর করে। স্রষ্টার দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান, তাদের মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন। অধিকন্তু, পুঁজিপতির যুক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ওজনদার ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করা হত যে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ কায়িক পরিশ্রমের চেয়ে মূল্যবান। আমরা এখন মূল্যবোধের বর্ণালীতে বিশ্বাস করি। যেকোনো ধরণের কাজ অন্য যেকোনো কাজের মতোই মূল্যবান, যদি মানুষ তাতে তার হৃদয় নিবেদন করে। কায়িক পরিশ্রমের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের মতোই মূল্য থাকতে পারে। এ ছাড়া, মানুষের মধ্যে পার্থক্য প্রত্যেককে তার অনন্য ব্যক্তিত্ব প্রদান করে। বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে যত ভিন্ন মানুষই হোক না কেন, ব্যক্তিগত মূল্যের ক্ষেত্রে তারা সমান হতে পারে, যদি প্রত্যেকে তার সামর্থ্যের সীমা পর্যন্ত বিবেকবানভাবে কাজ করে। তাই সমাজের স্বার্থে কিছু মানুষের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় বেশি ক্ষমতা থাকা উচিত। কোরআনের মতে, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমতার পার্থক্য শ্রম বিভাজনের উদ্দেশ্যে (৪৩: ৩২), এবং সমাজে বৈষম্য তৈরি এবং বিভিন্ন ধরণের মানুষের সাথে ভিন্ন আচরণ করার ভিত্তি তৈরি করা উচিত নয়। মানুষ অসম এই জ্ঞান আমাদের সমাজে সাধারণ জীবনযাত্রার মান উন্নত করার প্রচেষ্টাকে শিথিল করতে প্ররোচিত করতে দেওয়া উচিত নয়। রাবুবিয়্যাহ তরিকা প্রতিটি ব্যক্তির উন্নয়নের উপায় প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি প্রতিটি মানুষের তার বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাওয়ার অধিকারকে পবিত্র বলে মনে করে।

শ্রম বিভাজন সম্পদের সর্বাধিক উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য। এর অর্থ এই নয় যে যে ব্যক্তি কায়িক শ্রম করে সে শিল্প সংগঠিতকারী ব্যক্তির চেয়ে নিকৃষ্ট। নিঃসন্দেহে, একজন ব্যক্তির কাজ অন্য ব্যক্তির চেয়ে বেশি। কোরআন এই অবস্থান নিয়েছে যে যে ব্যক্তি বেশি উপার্জন করে তার সবকিছু নিজের কাছে রাখা উচিত নয়, বরং উদ্বৃত্ত তাদের দেওয়া উচিত যারা ক্ষমতা বা সুযোগের অভাবে তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। আদর্শ সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর নয় বরং পারস্পরিক সাহায্যের উপর জোর দেওয়া হবে। নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্টভাবে বলে: আর আল্লাহ তোমাদের কাউকে কাউকে অন্যের উপর জীবিকা

অর্জনের ক্ষমতার দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কিন্তু যাদের প্রাচুর্যের অধিকার আছে তারা তাদের অধীনস্থদেরকে তাদের রিযিক ফিরিয়ে দেয় না যাতে তারা তাদের সাথে সমানভাবে ভাগ করে নিতে পারে। তাহলে কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে? (১৬:৭১)।

"আল্লাহর আশীর্বাদ" বলতে সেইসব সুবিধা বোঝায় যা ব্যক্তি উপভোগ করে যা তার নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয়নি, যেমন তার সহজাত ক্ষমতা শিক্ষা এবং অন্যান্য সুযোগ। এই উপহারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তার সম্পদকে তার চেয়ে কম ভাগ্যবানদের সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করা উচিত। তার সম্পদকে স্রষ্টার দান হিসেবে বিবেচনা করা উচিত এবং স্রষ্টার প্রতি তার কৃতজ্ঞতা দানশীলতার মাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত। আমাদের সকলেরই একটি পরিবারের সদস্য হিসেবে বসবাস করা উচিত, এবং আমরা আসলে সেই, অর্থাৎ "স্রষ্টার সন্তান"। পিতা তার সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য করেন না। তিনি তাদের সকলকে একইভাবে ভালোবাসেন। কোরআন যেমন বলেছে, স্রষ্টা হলেন রাব্বুল আলামিন (১:১)। তিনি বিশ্বের প্রতিটি জীবের যত্ন নেন," গত দশকে বিকশিত হয়েছিল, কোরআন অনেক আগে থেকেই পূর্বাভাস দিয়েছিল।

এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রয়োজনীয় পরিণতি হল উৎপাদনের উপায়গুলি কোনও একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন হওয়া উচিত নয় বরং সকলের দ্বারা সাধারণভাবে ধারণ করা উচিত। কোরআন এই বিষয়টির উপর মূল্যবান আলোকপাত করে যা পরবর্তী অংশে দেখানো হবে।

### ৩. উৎপাদনের উপায়

উৎপাদনের উপায়গুলির মধ্যে ভূমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি দখলের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের একটি উর্বর উৎস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বেশিরভাগ যুদ্ধ জমি অধিগ্রহণের জন্য সংঘটিত হয়েছে। জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধের ফলে অন্তহীন মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে। কোরআন স্পষ্টভাবে বলে যে পৃথিবী স্রষ্টার এবং সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে কাজ করে।

ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা এভাবে বাতিল করা হয়েছে: এবং পৃথিবী (ভূমি) যা তিনি সমস্ত জীবের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন (৫৫:১০)

এটি মানুষের পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণীর জীবিকার উৎস: এবং আমরা এতে (ভূমিতে) তোমাদের জন্য এবং যাদের তোমরা জীবিকা প্রদান করো না তাদের জন্যও জীবিকার ব্যবস্থা করেছি (১৫:২০)।

বিষয়টি অন্য একটি আয়াতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে: এরপর তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং এর জল এবং এর চারণভূমি থেকে উৎপন্ন করেছেন। এবং তিনি পাহাড়গুলিকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন।

(এই সবকিছুই তিনি করেছেন) তোমাদের এবং তোমাদের গবাদি পশুর জন্য রিযিক হিসেবে (৭৯: ৩০-৩৩)।

অতএব এটা স্পষ্ট যে, পানি, বাতাস, তাপ এবং আলোর মতো ভূমিও সকল মানুষের জন্য স্রষ্টার দান। অতএব, একজন মানুষের জন্য এগুলোর উপর মালিকানা দাবি করা স্রষ্টার সাথে সমান দাবি করার সমান।

কোরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে: বলুন: তোমরা কি সত্যিই তাঁকে বিশ্বাস করো না যিনি দুই দীর্ঘ যুগে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সাথে সমকক্ষ দাবী করো? তিনি (এবং অন্য কেউ নয়) বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তিনি এর উপরে স্থিতিশীল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং এতে আশীর্বাদ করেছেন এবং চারটি সময়ে (বছরের ঋতুতে) এর খাদ্য পরিমাপ করেছেন যারা এর প্রয়োজনে থাকে (৪১: ৯-১০)।

মানুষের শ্রমের পরিমাণ যেমন উৎপাদিত সম্পদে তার ন্যায্য অংশ নির্ধারণ করে, তেমনি জমির উৎপাদনে তার অংশ তার শ্রমের সমানুপাতিক হবে। যদি বিভিন্ন অনুকূল কারণ না থাকত, তাহলে তার শ্রম বৃথা যেত। কোরআন নিম্নলিখিত আয়াতগুলিতে এটি নির্দেশ করে: এবং তুমি কি তা দেখেছ যা তুমি চাষ করো? তোমরা কি বীজ বপন করো, নাকি আমরা তা বৃদ্ধি করি? আমরা ইচ্ছা করলে অবশ্যই শুকিয়ে দিতে পারি, তারপর তোমরা বলতে থাকো না: দেখো! আমরা ঋণে ভারাক্রান্ত, বরং আমরা ফসল থেকে বঞ্চিত। আর তোমরা কি সেই পানি দেখেছো যা তোমরা পান করো? তোমরা কি বৃষ্টির মেঘ থেকে তা বর্ষণ করেছো, নাকি আমরাই বর্ষণকারী? আমরা ইচ্ছা করলে আমরা তা তিক্ত করে তুলতে পারি। তাহলে কেন তোমরা কৃতজ্ঞ হচ্ছো না? আর তোমরা যে আগুন নিভিয়েছো তা কি দেখেছো? তোমরাই কি তার গাছকে বৃদ্ধি করেছো, নাকি আমরাই উত্পাদক? আমরা (এ সব কথা উল্লেখ করেছি) তোমাদের (প্রকৃত ঘটনা) স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। মনে রেখো ১ আমরা ক্ষুধার্তদের জন্য এই সমস্ত রিযিকের ব্যবস্থা করেছি (৫৬: ৬৩-৭৩)।

অতএব, আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে: রাবুবিয়্যাহ আদেশের ঐশ্বরিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে, আমরা একটি যৌথ ব্যবসায়িক উদ্যোগে অংশগ্রহণ করছি যেখানে মূলধন বিনিয়োগ স্রষ্টা দ্বারা করা হয় এবং আমরা কেবল শ্রম প্রদান করি। আমরা আমাদের শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত জমির ফসলের কেবলমাত্র সেই অংশ দাবি করতে পারি এবং বাকিটা স্রষ্টার কাছে সমর্পণ করতে হবে, অর্থাৎ সমাজের কল্যাণে উৎসর্গ করতে হবে।

কবি ইকবাল এই ধারণাটি অপূর্ব সৌন্দর্যের পংক্তিতে প্রকাশ করেছেন, যার অনুবাদ নিম্নরূপ: যে মাটিতে আলোর রশ্মি প্রবেশ করে না, সেখানে কে বীজ পুষ্ট করে? সমুদ্রের ঢেউ থেকে কে মেঘ উত্তোলন করে? কে (পশ্চিম থেকে অনুকূল বাতাস এখানে নিয়ে এসেছে? মাটি কার, সূর্যের আলো কার? কে শস্যের শীষ মুক্তা শস্য দিয়ে ভরে দিয়েছে? কে ঋতুকে নিয়মিত পরিবর্তন করতে শিখিয়েছে? জমির মালিক! জমি

তোমারও নয়, আমারও নয়, তোমার পূর্বপুরুষরা এর মালিক ছিল না, তুমিও নয়, আমিও নই।(বাল-এ-জিব্রিল, পৃষ্ঠা ১৬১)। পৃষ্ঠা ১৬১)।

কোরআন ঘোষণা করে যে পৃথিবীর ফসল "মানবজাতির জীবিকা নির্বাহের উপায়" (৫০:১১)। প্রাকৃতিক নিয়মের সামান্যতম পরিবর্তনও মানুষকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করতে পারে: যদি তিনি তাঁর রিজিক বন্ধ করে দেন, তাহলে কে তোমাদের রিজিক দেবে? (৬৭:২১)।

এই ধারণাটি নিম্নলিখিত আয়াতগুলিতে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: মানুষ তার খাদ্যের দিকে তাকাক। আমরা কীভাবে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পানি বর্ষণ করি, তারপর পৃথিবীকে বিভক্ত করি এবং তাতে শস্য, আঙ্গুর ও সবুজ খাদ্য উৎপাদন করি এবং জলপাই গাছ, খেজুর গাছ, ঘন পাতার বাগান, ফল ও ঘাস। তোমাদের এবং তোমাদের গবাদি পশুর জন্য রিজিক (৮০:২৪-৩২)।

কোরআন জমির মালিকানা অনুমোদন করে না, এবং অন্য কোনও উৎপাদনের উপায়ও অনুমোদন করে না। প্রাণীরা যতটা প্রয়োজন ততটা খায় এবং বাকিটা অন্যদের জন্য রেখে দেয়। মানুষ একাই মজুদ করার আকাঙ্ক্ষায় জর্জরিত এবং তার ভাণ্ডার নিয়ে গর্ব করে, এভাবে নিজের জন্য যা তার আসলে প্রয়োজন হয় না তা রাখে: আর কত জীবন্ত প্রাণী যারা তার রিজিক বহন করে না (২৯:৬০)।

পুঁজি জমানোর আকাঙ্ক্ষাই সেই প্রক্রিয়া শুরু করে যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চূড়ান্ত রূপ নেয়। পুঁজিবাদ, ধনীদের দরিদ্রদের শোষণ করতে সক্ষম করে, পৃথিবীকে দুর্দশা, ঘৃণা এবং পারস্পরিক সন্দেহে ভরে দিয়েছে। এটি পৃথিবীকে একটি প্রকৃত নরকে পরিণত করেছে। কোরআন পুঁজিবাদীদের মানবজাতির শত্রু হিসেবে নিন্দা করেছে: যারা সোনা-রূপা জমা করে এবং আল্লাহর নির্ধারিত উদ্দেশ্যে ব্যয় করে না, তাদেরকে (হে মুহাম্মদ!) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও, যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তাদের কপাল, পার্শ্ব এবং পিঠে দাগ দেওয়া হবে (এবং তাদের বলা হবে): এই হলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। এখন তোমরা যা জমা করে রেখেছিলে তার স্বাদ গ্রহণ করো (৯:৩৪-৩৫)।

পুঁজিবাদ মানুষের স্বার্থপর উদ্দেশ্যকে আকর্ষণ করে এবং যারা সম্পদ জমা করেছে তাদের তাদের সমাজবিরোধী প্রবণতাগুলিকে মুক্ত রাখতে প্রলুব্ধ করে। তারা যেন ভুলে না যায় যে, কোরআনের ভাষায়, যারা এমন একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে লাভবান হয় যা মানবজাতির প্রকৃত স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর: আর যারা আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা দান করেছেন তা জমা করে রাখে, তারা যেন মনে না করে যে এটি তাদের জন্য ভালো। বরং এটি তাদের জন্য আরও খারাপ। তারা যা জমা করে তা তাদের কর্মের ফলাফল প্রকাশের সময় তাদের গলায় ঝুলবে; আর আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল্লাহর, এবং তিনি তোমাদের কর্ম সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত (৩: ১৭৯)।

পুঁজিবাদ মানবজাতির জন্য দুর্দশার একটি উর্বর উৎস এবং তাই এটি একটি অমানবিক ব্যবস্থা। যখন মানুষ আরও আলোকিত হবে এবং তাদের প্রকৃত স্বার্থ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবে তখন এটি অবশ্যই পরিত্যক্ত হবে: দেখুন! তোমরাই সেই ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহর নির্ধারিত উদ্দেশ্যে ব্যয় করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি মজুদ করে এবং এভাবে অন্যদের জীবনযাত্রার রিযিক থেকে বঞ্চিত করে, সে আসলে নিজেকেই বঞ্চিত করে। আর আল্লাহ ধনী এবং তোমরা দরিদ্র। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে আনবেন; এবং তারা তোমাদের মতো হবে না (৪৭: ৩৮)।

এটাই ইতিহাসের রায়। কোরআন আমাদেরকে সেই জাতিগুলির ভাগ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করে যারা সম্পদ সংগ্রহে নিজেদের নিবেদিত করেছিল এবং উচ্চ আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তাদের স্থান অন্য জাতি দ্বারা দখল করা হয়েছিল: আর কত অন্যায় আচরণকারী জাতিকে আমরা ভেঙে ফেলেছি; এবং তাদের পরে অন্য জাতিকে সৃষ্টি করেছি (২১: ১১)।

মানুষ তার জীবিকা অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে বাধ্য, তারপর নিজের জন্য যা প্রয়োজন তা নিজের কাছে রাখতে এবং অবশিষ্ট অংশ তার সমাজের হাতে তুলে দিতে। কোরআন এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে: এবং তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে: "তাদের কী দান করা উচিত।" তুমি বলো: "উদ্বৃত্ত" (২: ২১৯)

### ৪ পরিবর্তনকালীন সময়

তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কলমের এক আঘাতে বিলুপ্ত করা যাবে না। এটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং আধুনিক সমাজের জন্য অপরিহার্য বলে মনে হয়। এটি উপড়ে ফেলার এবং রাবুবিয়্যাতের আদেশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে কিছু সময় লাগবে। হতাশার পথ না দেখিয়ে আমাদের এই সত্যের মুখোমুখি হতে হবে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে মানুষ কেবল ধীরে ধীরে এবং ধীরে ধীরে অগ্রগতি করতে পারে।

যতক্ষণ সে সঠিক পথে অবিচল থাকে, ততক্ষণ তাকে অধৈর্য হওয়ার দরকার নেই। উচ্চ লক্ষ্য অর্জন করা সহজ নয়। তার কঠোর পরিশ্রম করা উচিত এবং চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য ধৈর্য ধরে কিন্তু আত্মবিশ্বাসের সাথে অপেক্ষা করা উচিত। কোরআন আমাদের এই বিষয়ে সতর্কতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার এবং তাড়াহুড়ো এবং তাড়াহুড়ো না করার পরামর্শ দেয়। এটি অল্প কিছু লোকের হাতে সম্পদ জমা হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রস্তাব করেছে। সুদ, অর্থাৎ মূলধনের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ, অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তরাধিকারের আইনটি মৃত ব্যক্তির সম্পদের তার সমস্ত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সুষম বন্টন নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। মানুষকে তার পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন এবং অভাবগ্রস্ত সকলকে উদারভাবে সাহায্য করার এবং তার ঋণী ব্যক্তিদের সকল সম্ভাব্য ছাড় দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মজুদদারি নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে, এটি নিশ্চিত করে যে অর্থ প্রচলিত থাকে। সংক্ষেপে, কোরআন সেই পদক্ষেপগুলি সুপারিশ করেছে যার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত রাবুবিয়্যাহ তরিকা চালু করা যেতে পারে। তবে, এই সমস্ত ব্যবস্থা শুধুমাত্র ক্রান্তিকালে বৈধ। রবুবিয়্যাহ তরিকার অধীনে, প্রতিটি মানুষ স্বেচ্ছায় তার সমাজের কাছে তার মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য যা প্রয়োজন তা সমর্পণ করবে। এই তরিকার প্রধান হিসেবে, রাসূল প্রথম ব্যবহারিক উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে এই উচ্চ লক্ষ্য কীভাবে অর্জন করা উচিত। তিনি তাঁর সারা জীবন কখনও একটি পয়সাও জমা করেননি, বা কোনও সম্পত্তির মালিক হননি। তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করে আমরা পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে অগ্রগতি আশা করতে পারি। যা প্রয়োজন তা হলো এই উপলব্ধি করা যে, একমাত্র নিয়মই মানবজাতির জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সুখ বয়ে আনতে পারে এবং মানুষের অগ্রগতি ও বিকাশের পথ খুলে দিতে পারে। যখন এই উপলব্ধি উদিত হবে, তখন আধুনিক সমাজকে রাবুবিয়্যাত ব্যবস্থায় রূপান্তর করা কঠিন কাজ হবে না। ইতিমধ্যেই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে: অবশ্যই, প্রতিশ্রুত বিপ্লব অবশ্যই আসবে; এতে কোন সন্দেহ নেই; তবুও বেশিরভাগ মানবজাতি বিশ্বাস করে না (৪০:৫৯)।

ঐশ্বরিক সৃজনশীল কার্যকলাপ যা অগ্রগতির জন্য দায়ী, তা অবশ্যই মানুষের জগতে যেমন প্রকৃতিতে রয়েছে তেমনই কাজ করছে: এবং তিনিই হলেন সেই ব্যক্তি যার আইন স্বর্গে (বহির্বিশ্ব) এবং পৃথিবীতে (মানব সমাজে) কার্যকর এবং তিনিই জ্ঞানী এবং জ্ঞানী (৪৩:৮৪)।

সংক্ষেপে, রাবুবিয়্যাত ব্যবস্থা মানব সত্তাকে সর্বোচ্চ মূল্য দেয় এবং এমন পরিস্থিতি তৈরি করার লক্ষ্য রাখে যেখানে সত্তা স্বাধীনভাবে বিকাশ করতে পারে এবং ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে। এটি অন্যান্য ব্যবস্থা এবং মতাদর্শ থেকে এই ব্যবস্থাকে আলাদা করে। কমিউনিস্ট রাষ্ট্র এবং কোরআনী সমাজের মধ্যে ভাসা ভাসা সাদৃশ্য দেখে আমাদের নিজেদেরকে বিভ্রান্ত হতে দেওয়া উচিত নয়। কমিউনিস্ট রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদের কুফল থেকে মুক্ত, তবে এটি গোষ্ঠীর স্বার্থে, বরং দলের স্বার্থে কাজ করে এবং ব্যক্তির প্রতি আগ্রহী নয়।

জনগণ কেবল কাঁচামাল যা দলীয় নেতৃত্ব তার ইচ্ছামতো তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে, কোরআন মানুষের আত্মকে রক্ষা, সংরক্ষণ এবং উন্নত করতে চায়। ব্যক্তিগত মূল্যের প্রতি এই তীব্র ব্যস্ততা ইসলামকে কমিউনিজম এবং সর্বগ্রাসীবাদ থেকে পৃথক করে।

বিঃদ্রঃ ভূমিকায় ইতিমধ্যেই যেমন বলা হয়েছে, বর্তমান গ্রন্থে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কেবল আকস্মিকভাবে স্পর্শ করা হয়েছে। এটি অন্য একটি বইতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যা শীঘ্রই প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

# অধ্যায় ১৪

## ক: রাজনৈতিক ব্যবস্থা: প্রথম পর্ব

## মানবসৃষ্ট ব্যবস্থা

### ১. আদিম যুগ

মানুষ কখনও বাঘ বা সিংহের মতো একাকী জীবনযাপন করতো এই মতবাদকে সমর্থন করে না। তার চারপাশে ঘোরাফেরাকারী শক্তিশালী পশুদের বিরুদ্ধে সে দুর্বল এবং অরক্ষিত ছিল। সে কেবল কিছু ধরণের গোষ্ঠীগত জীবনের মাধ্যমেই বেঁচে থাকতে পারত। একদল মানুষ এমন পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকতে পারত যেখানে একজন ব্যক্তির কোনও সুযোগ ছিল না, তাই আদিম মানুষ স্বাভাবিকভাবেই দলবদ্ধভাবে বাস করত। গোষ্ঠীগত জীবনের জন্য এক ধরণের সামাজিক সংগঠন প্রয়োজন। পুরুষরা কেবল তাদের অহংকারী আবেগের বিনিময়ে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করতে পারে। গোষ্ঠীগত জীবনের নির্দেশ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে আক্রমণ করে। প্রথম সামাজিক বন্ধন রক্তের সম্পর্ক থেকে এসেছিল। গোষ্ঠীগুলি প্রায় অতিবৃদ্ধ পরিবার ছিল। পিতার দ্বারা ব্যবহৃত কর্তৃত্ব গোত্রের প্রধান পিতৃপুরুষের হাতে চলে যেত। প্রথা এই গোষ্ঠীর সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করত। আদিম মানুষ বিশ্বাস করত যে তার গোত্রের রীতিনীতি অপরিবর্তনীয় এবং অলঙ্ঘনীয়। পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্ব এবং কঠোর রীতিনীতি সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করত এবং ব্যক্তিদের সকল ধরণের অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ছিল। তবে, দলে একটি নতুন কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল - তিনি ছিলেন পুরোহিত। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং মন্দিরে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সঠিক আচরণ সম্পর্কে তার বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের উপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আচার-অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে এবং পিতৃপুরুষকে এটি একজন পেশাদার ব্যক্তির উপর অর্পণ করতে হয়েছিল। আদিম জীবনে কুসংস্কার, যা বিবেচনা করা উচিত, পুরোহিতের কর্তৃত্বকে শক্তিশালী সমর্থন দিয়েছিল। পরিবর্তনশীল বিশ্বে কোনও ধরণের সামাজিক সংগঠন স্থায়ী হতে পারে না। উপজাতি সংগঠনটি বিলুপ্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠনের স্থান দখল করে। রাজা বা রাজা পিতৃপুরুষকে প্রতিস্থাপন করেছিলেন। তিনি সাধারণত এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি একটি সামরিক বাহিনী সংগঠিত করেছিলেন যা তাকে বিভিন্ন উপজাতির উপর তার আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম করেছিল। উদ্ভূত রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিভিন্ন উপজাতির সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এই পরিবর্তনের ফলে মানুষের উপর উপজাতি রীতিনীতির নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মানুষ তাদের সহ-নাগরিকদের বিভিন্ন রীতিনীতি পালন করতে দেখেছিল, এবং তাই কোনও নির্দিষ্ট রীতিনীতিকে আর পবিত্র এবং অলঙ্ঘনীয় হিসাবে বিবেচনা করা যেত না। সামাজিক ব্যবস্থা এখন শারীরিক শক্তির মাধ্যমেই বজায় রাখতে হত। রাজা যদি শক্তিশালী হতেন, তাহলে তিনি সাধারণত এই কাজে সফল হতেন এবং বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীকে একত্রিত রাখতেন। তিনি সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের উপর নির্ভর

করতেন। তবে নতুন সামাজিক ব্যবস্থা রক্তের বন্ধন এবং সময়-সম্মানিত রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি উপজাতি ব্যবস্থার মতো স্থিতিশীল হতে পারত না। কেবল নিষ্ঠুর শক্তির মাধ্যমে মানুষকে বেশিক্ষণ ধরে আটকে রাখা যেত না। বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহ প্রায়শই রাজার কর্তৃত্বকে নাড়া দিত। এই পরিস্থিতিতে তিনি একজন মিত্রের সন্ধান করতেন এবং এমন একটি মিত্র খুব কাছেই ছিল। পুরোহিতেরও কিছু স্বার্থ ছিল যা তিনি ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যেকোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক উত্থান রাজা এবং পুরোহিত উভয়ের স্বার্থকে বিপন্ন করে তুলত। ফলস্বরূপ রাজা এবং পুরোহিত সাধারণ উদ্দেশ্য নিয়েছিলেন এবং একে অপরকে পারস্পরিক সমর্থন দিয়েছিলেন। রাজা ধর্মীয় ক্ষেত্রে পুরোহিতদের ক্ষমতা জোরদার করেছিলেন এবং ধর্মীয় ব্যবস্থার স্বার্থ রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞ পুরোহিত রাজাকে পবিত্রতা এবং বিস্ময়ে আচ্ছন্ন করেছিলেন। জনগণের আনুগত্য এখন বলপ্রয়োগ এবং কুসংস্কার উভয়ের মাধ্যমেই প্রয়োগ করা হয়েছিল।

**২. শাসক এবং প্রজার লড়াই**

মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যা বাহ্যিক বাধ্যবাধকতায় জ্বলে ওঠে। মানুষের হৃদয়ে স্বাধীনতার শিখা কখনও কখনও জ্বলতে পারে, কিন্তু কখনও নিভে যায় না। মানুষের ধৈর্য অক্ষয় নয়, এবং পুরোহিত ও রাজার দ্বৈত অত্যাচারের শিকার হয়ে সে ক্রমশ অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। সে বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। পুরোহিতের দখল এবং রাজার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সে খুব বেশি সময় ধরে রুখে দাঁড়ায়নি। ইতিহাসে জনগণের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার এবং আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক উভয় ধরণের জোয়াল উল্টে ফেলার জন্য দীর্ঘ এবং রক্তাক্ত সংগ্রামের কথা লিপিবদ্ধ আছে। এই সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের চিহ্নিত করা যেতে পারে:

১. পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক শাসক, যারা স্থিতাবস্থার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন।

২. উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপাদান যারা তাদের নিজস্ব একটি টুকরো তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন।

৩. সাধারণ মানুষ যারা বারবার তাদের নিপীড়নমূলক ওজন ছুঁড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন।

৪. চিন্তাশীল মনের কিছু মানুষ নিজেদেরকে এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরির কঠিন কাজ শুরু করেছিলেন যা কর্তৃত্বকে ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবে। তারা সামাজিক ব্যবস্থা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন কারণ সর্বোপরি, তারা রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ভয় পেয়েছিলেন; কিন্তু তারা চেয়েছিলেন যে ব্যক্তি স্বাধীনতা উপভোগ করুক যা তার জন্মগত অধিকার।

মানুষের মৌলিক মানবাধিকার স্বীকার করে এবং একই সাথে সামাজিক শৃঙ্খলাকে একটি নিরাপদ ভিত্তির উপর স্থাপন করে এমন একটি সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরির প্রচেষ্টার ইতিহাস আকর্ষণীয়। খ্রিস্টান

পুরোহিতের দ্বারা এমন একটি প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। তারা একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছিলেন যা থিওক্রেসি নামে পরিচিত। এটি খুব একটা কার্যকর হয়নি।

মূলত, মানুষের স্বাধীনতার উপর ধর্মান্ধ ও নিপীড়নমূলক দাবির কারণে। এটি ছিল ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত একটি অত্যাচার। এটি খ্রিস্টধর্মের নামে করা হয়েছিল, যদিও খ্রিস্টধর্ম কেবল মানুষের "আধ্যাত্মিক" স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানোর দাবি করেছিল। ভিসকাউন্ট স্যামুয়েলের ভাষায়:

এটি (খ্রিস্টধর্ম) 'রাজাদের ঐশ্বরিক অধিকার' মতবাদকে সমর্থন করেছে এবং ইউরোপের ইতিহাসে এই মতবাদের সমস্ত মন্দ পরিণতির জন্য অবশ্যই দায়ী থাকবে। [১]

### ৩. ক্ষমতাই আইন (শক্তিই ন্যায়)

যে মতবাদটি ক্ষমতা সঠিক তারও সমর্থক ছিল। এটিকে যুক্তিসঙ্গত যুক্তি দিয়ে রক্ষা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, যে সামাজিক ব্যবস্থায় শক্তিশালীদের সমর্থন ছিল না, তা বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। মানব ইতিহাস জুড়ে, যাদের ক্ষমতা ছিল তারা দুর্বলদের উপর শাসন করেছে। শক্তিশালী এবং দুর্বলকে সমান করা প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়ানো, অধিকারের বিরোধীরা যুক্তি দিয়েছিলেন। যুক্তিসঙ্গত মানুষ সর্বদা শক্তির এই মতবাদকে বিদ্রোহী এবং অপমানজনক বলে মনে করেছেন।

### ৪. চুক্তি তত্ত্ব

সপ্তদশ এবং আঠারো শতকের কিছু মহান চিন্তাবিদ রাজাদের ঐশ্বরিক অধিকারের মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। হবস, লক, রুশো এবং অন্যান্যরা রাজত্বের উত্থানের কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য এবং রাজার প্রজাদের আনুগত্যের দাবিকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য একটি প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন। সামাজিক চুক্তির তত্ত্বটি একটি পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে তৈরি। ধারণা করা হয় যে, প্রথমে মানুষের কর্মকাণ্ডের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আইন-শৃঙ্খলার অস্তিত্ব ছিল না এবং মানুষের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। জঙ্গলের আইন প্রাধান্য পেয়েছিল এবং প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব স্বার্থের জন্য লড়াই করেছিল। অনাচারের এই অবস্থা শীঘ্রই অসহনীয় হয়ে ওঠে। নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। এমনকি শক্তিশালী ব্যক্তিও এই ভয়ে আক্রান্ত হয়েছিল যে একজন শক্তিশালী ব্যক্তি যেকোনো সময় এসে তাকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারে। অবশেষে মানুষ একত্রিত হয়েছিল এবং সামাজিক নিরাপত্তার জন্য যেকোনো মূল্য দিতে সম্মত হয়েছিল। তারা তাদের স্বাধীনতা ত্যাগ করতে এবং নিজেকে একজন রাজার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের অধীনে রাখতে সম্মত হয়েছিল। রাজার কর্তব্য ছিল আইন প্রয়োগ করা এবং তার কোনও প্রজার প্রতি কোনও অবিচার না করা দেখা।

অতএব, জনগণের সম্মতিতে রাজার শাসনের অধিকারের উৎস ছিল। সেই সম্মতি প্রত্যাহার করা যেতে পারে

যদি রাজা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। তাই, রাজত্বকে একটি মানবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হয়। জনসাধারণের ইচ্ছা তাকে রাজা করে তুলেছিল এবং জনসাধারণের ইচ্ছা তাকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারে।

সামাজিক চুক্তির তত্ত্বটি অবশ্য সচেতন ঐতিহাসিক সত্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়নি। তবুও, এটি নিজস্ব উপায়ে উদ্ভাবনী ছিল। এটি তার স্বর্গীয় ক্ষমতার রাজত্বকে বিচ্ছিন্ন করে জনগণের সাধারণ ইচ্ছাকে কর্তৃত্বের উৎস করে তোলে। এইভাবে গণতন্ত্রের আবির্ভাবের পথ প্রশস্ত হয়।

গণতন্ত্রের উত্থানের সাথে সাথে সার্বভৌমত্বের সমস্যা সামনে আসে। সার্বভৌমত্ব কার? বিভিন্ন উত্তর দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা সকলেই জনগণের উপর এটি ন্যস্ত করার বিষয়ে একমত ছিলেন। রুশো যুক্তি দিয়েছিলেন যে সার্বভৌমত্ব সমগ্র জনগণের। লক বলেছিলেন যে এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের। কার্ল মার্কস এটি তাদের উপর ন্যস্ত করেন যারা উৎপাদনের উপায় নিয়ন্ত্রণ করে। পুঁজিবাদ সার্বভৌমত্ব পুঁজিপতি শ্রেণীর উপর ন্যস্ত করে যখন সমাজতন্ত্র এটি শ্রমিক শ্রেণীর উপর ন্যস্ত করে।

**৫. গণতন্ত্র**

গণতন্ত্রকে এখন সাধারণত সর্বোত্তম সরকার ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি মূলত পশ্চিমে বিকশিত হয়েছিল, কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষও এটিকে রাজনৈতিক জ্ঞানের শেষ কথা বলে মনে করে। আসুন আমরা এর দাবিগুলি সাবধানতার সাথে পরীক্ষা করি এবং দেখি যে এর প্রশংসা কতটা ন্যায্য। গণতন্ত্রকে জনগণের, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য সরকার হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই সংজ্ঞার এটি প্রধানত দ্বিতীয় বিষয় যা এখানে মন্তব্য করার দাবি রাখে। এর অর্থ হল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসক এবং শাসিতদের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না। জনগণ নিজেদের শাসন করার কথা। তারা সরাসরি তা করতে পারে না, তাই তারা তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে। এই প্রতিনিধিরা, পালাক্রমে, মন্ত্রীদের নির্বাচন করে যারা প্রকৃতপক্ষে সরকার পরিচালনা করে। রাষ্ট্রের আইন ও নীতি এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রধান পদক্ষেপগুলি প্রকৃতপক্ষে জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে, সমগ্র জনগণের নয় বরং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে।

সংক্ষেপে এটিই গণতন্ত্র। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এটিই এখন পর্যন্ত মানুষ নিজের জন্য বিকশিত হতে পেরেছে এমন সেরা ব্যবস্থা। এটি যে মৌলিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ, কারোরই অন্যের উপর শাসন করার অধিকার নেই, তা আদর্শ। কিন্তু মূল কথা হল এটি কি তার সামনে যে লক্ষ্য রেখেছিল তা

অর্জন করেছে, অথবা অর্জনে সক্ষম? পশ্চিমা বিশ্ব গণতন্ত্রের জন্মভূমি, তাই আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি যে সেখানকার চিন্তাবিদরা এটি সম্পর্কে কী বলেন।

**৬. গণতন্ত্রের ব্যর্থতা**

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলফ্রেড কোবান তার "সভ্যতার সংকট" বইয়ে আলোচনা করেছেন, পশ্চিমা সভ্যতার পতনের কারণগুলি সম্পর্কে তিনি বলেন:

রাজনীতিকে বাস্তব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে, বিমূর্ত তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, এটা স্বীকার করতে হবে যে জনগণের সার্বভৌমত্বের তত্ত্বে ধরে নেওয়া শাসক এবং শাসিতের মধ্যে পার্থক্য করা একটি বাস্তব অসম্ভব। সরকার হল একদল মানুষ এবং শাসিত অন্য দল। একবার সমাজ ক্ষুদ্রতম এবং সবচেয়ে আদিম সম্প্রদায়ের বাইরে বিকশিত হয়ে গেলে, তারা কখনও একই ছিল না এবং কখনও হতে পারে না। তারা যে ভান করে তা কেবল রাষ্ট্রে ক্ষমতার সবচেয়ে খারাপ বাড়াবাড়ির দিকে পরিচালিত করতে পারে (পৃষ্ঠা ৬৮)।

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ. সি. ইউইং তার "দ্য ইন্ডিভিজুয়াল, দ্য স্টেট অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট" বইয়ে গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। বই থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি তার চিন্তার প্রবণতা দেখায়: আধুনিক বিশ্বের গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতার আগে রুশো যদি এখন লিখতেন, এবং মিথ্যার মতো না লিখতেন, তাহলে তিনি এত আশাবাদী হতে পারতেন না (পৃষ্ঠা ১১৬)।

একই রকম মতামত আরেকজন চিন্তাবিদ রেনে গুয়েনন তার "দ্য ক্রাইসিস অফ দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড" বইতে প্রকাশ করেছেন। প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি, যদিও দীর্ঘ, সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করার জন্য সংরক্ষিত: যদি 'গণতন্ত্র' শব্দটিকে জনগণের সরকার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তবে এটি একটি সম্পূর্ণ অসম্ভবতা প্রকাশ করে এবং আমাদের সময়ে অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় এর বাস্তব অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এটা বলা বিরোধপূর্ণ যে একই ব্যক্তি একই সময়ে শাসক এবং শাসিত হতে পারেন, কারণ, অ্যারিস্টটলীয় বাক্যাংশ ব্যবহার করলে, একই সত্তা একই সময়ে এবং একই সম্পর্কের বৃত্তে 'কার্যকরী' এবং 'ক্ষমতায়' থাকতে পারে না। শাসক এবং শাসিতের সম্পর্ক দুটি পদের যৌথ উপস্থিতির প্রয়োজন; যদি শাসক না থাকত তবে কেউ শাসিত হতে পারত না, যদিও তারা অবৈধ এবং তাদের নিজস্ব ভান ছাড়া ক্ষমতার অন্য কোনও অধিকার নেই; তবে আধুনিক বিশ্বে যারা নিয়ন্ত্রণে আছেন তাদের দুর্দান্ত ক্ষমতা হল জনগণকে বিশ্বাস করানো যে তারা নিজেদের শাসন করছে, এবং জনগণ এটি বিশ্বাস করতে তত বেশি আগ্রহী কারণ তারা এর দ্বারা প্রশংসিত হয় এবং যেহেতু তারা যে কোনও ক্ষেত্রেই, এর অসম্ভবতা দেখার জন্য পর্যাপ্ত প্রতিফলন করতে অক্ষম। এই ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করার জন্যই 'সর্বজনীন ভোটাধিকার' উদ্ভাবিত হয়েছিল। আইনটি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত দ্বারা তৈরি হওয়ার কথা, কিন্তু যা উপেক্ষা করা হয় তা হল এই মতামত

এমন একটি বিষয় যা খুব সহজেই পরিচালিত এবং সংশোধন করা যেতে পারে; উপযুক্ত পরামর্শের মাধ্যমে সর্বদা এই বা সেই দিকে ইচ্ছামত চলমান স্রোত জাগানো সম্ভব। [২]

এই সমস্ত লেখক প্রমাণ করার জন্য প্রচেষ্টা করেছেন যে গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব বা আইন প্রণয়নের নিরঙ্কুশ এবং অবাধ অধিকার জনগণের, এই বিশ্বাসের বাস্তবে কোনও ভিত্তি নেই। ধারণা করা হয়েছে যে জনগণের প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে প্রণীত আইন রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে মূর্ত করে এবং তাই, এটি ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তি করে। এই ধারণাটি বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের পতনের প্রধান কারণ। এই মতামত মেনেকেন দ্বারা সমর্থিত, যেমন নীচের অনুচ্ছেদটি দেখায়।

এই ধরণের সমস্ত ব্যর্থতার পিছনে আরও একটি বৃহত্তর কারণ রয়েছে: মানুষের, সমস্ত উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে সামাজিক এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমান, নিজেকে কিছু প্রদান করতে ব্যর্থতা, এমনকি দূরবর্তীভাবে ভাল সরকার হিসাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি এই দিকে অনেক প্রচেষ্টা করেছেন, যার মধ্যে কিছু অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত এবং অন্যগুলি অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ, কিন্তু তাদের বাস্তবায়নে সর্বদা দুঃখ পেয়েছে। কারণটি অবশ্যই গোপন নয়; এটি তত্ত্বগতভাবে সরকার কী এবং বাস্তবে এটি কী তার মধ্যে অভূতপূর্ব পার্থক্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। তত্ত্বগতভাবে এটি কেবল সাধারণ চাহিদার একটি পরিবর্তনশীল সিরিজ সরবরাহের একটি হাতিয়ার, এবং এটি গঠনকারী ব্যক্তিরা (যেমন তাদের সকল স্তরের লোকেরা বলতে খুব পছন্দ করে) কেবল জনসেবক; কিন্তু বাস্তবে, এর মূল উদ্দেশ্য মোটেও সেবা নয়, বরং শোষণ। [৩]

তিনি এগিয়ে যান: সকল ধরণের সরকারের মধ্যে, সম্ভবত গণতন্ত্রই এই ভাইদের হাতে আরও খারাপ ফলাফল করেছে। তাদের শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে, সাধারণভাবে কত কম মানুষ যুক্তিবাদী ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং কত বেশি হৈচৈ করে, তা জেনেও, তারা প্রতিটি চাপপ্রবণ গোষ্ঠীর সাথে একমত হয় এবং এইভাবে জনসাধারণের শত্রুদের একটি অবিরাম সিরিজ দ্বারা ক্ষমতায় থাকে।[৪]

আর্নল্ড জে. টয়েনবি লিখেছেন (তার সাম্প্রতিক বই, দ্য প্রেজেন্ট ডে এক্সপেরিমেন্ট ইন ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন, ১৯৬২) : গণতান্ত্রিক সংসদীয় সরকার একটি কম দক্ষ এবং তাই, অলিগার্কিক সংসদীয় সরকারের তুলনায় আরও অপচয়কারী শাসন ব্যবস্থা, এবং এমনকি একটি সংসদীয় অলিগার্কিক একটি সু-পরিচালিত কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থার তুলনায় অদক্ষ এবং অমিতব্যয়ী (পৃষ্ঠা ৩৫)।

## ৭. জাতিসংঘের (UNO) এর প্রশ্নাবলী

১৯৪৭ সালে, জাতিসংঘের সাংস্কৃতিক সংস্থা UNESCO, বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা অধ্যয়ন এবং প্রতিবেদন করার জন্য একটি গবেষণা কমিটি গঠন করে। কমিটি গণতন্ত্রের উপর প্রস্তাবিত খণ্ডে নিবন্ধ অবদান রাখার জন্য কিছু মহান পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ জানায়। সকল ধরণের

"ডেমোক্রেসি ইন আ ওয়ার্ল্ড অফ টেনশনস" শিরোনামে প্রকাশিত খণ্ডটিতে মতামত উপস্থাপন করা হয়েছিল। "ডেমোক্রেসির অর্থ কী?" ছিল তাদের জিজ্ঞাসা করা প্রথম প্রশ্ন। বেশিরভাগ পণ্ডিত স্বীকার করেছেন যে শব্দটি অস্পষ্ট এবং এর সঠিক অর্থ নির্ধারণ করা হয়নি। কেউ কেউ এটিকে "বর্তমান ব্যবহারের সবচেয়ে অস্পষ্ট শব্দগুলির মধ্যে একটি" (পৃষ্ঠা ৪৬০) বলে অভিহিত করেছেন।

পরবর্তী প্রশ্নটি ছিল, "সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট কি সর্বদা সঠিক, এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ"? উত্তরগুলি ছিল: তবে, এর অর্থ এই নয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় ভুল; এবং তাই এটি সংখ্যালঘুদের পূর্ববর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের বিপরীতে আন্দোলন এবং ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা দেয় (পৃষ্ঠা ৫০৪)।

এর ত্রুটিগুলি তুলে ধরার সময় আমাদের অবশ্যই ন্যায্য হতে হবে এবং একই সাথে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুণাবলী স্বীকার করতে হবে। রাজতন্ত্র, স্বৈরাচার এবং ধর্মতন্ত্রের সাথে তুলনা করলে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার প্রভাব পড়বে।*

*ধর্মতন্ত্র হলো স্বৈরাচারের সবচেয়ে খারাপ রূপ। এই ব্যবস্থায়, স্রষ্টার নামে মানুষ শোষিত হয়। দীনে পুরোহিতদের কোনও স্থান নেই।

এটি পূর্ববর্তী রূপগুলির উপর একটি সাহসী অগ্রগতি। সকল মানুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করে, রাষ্ট্রকে জনগণের স্বার্থকে এগিয়ে নিতে বাধ্য করে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে, এটি মানবতার জন্য উল্লেখযোগ্য সেবা প্রদান করেছে। এর বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করা হয়েছে তা আসলে সাধারণভাবে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং পশ্চিমে বিকশিত তার সাধারণ রূপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গণতন্ত্রের এই রূপটি ধর্মনিরপেক্ষতার উপর ভিত্তি করে এবং তাই এটি একটি মারাত্মক দুর্বলতা ভোগ করে। এটি পরিবর্তিত মানবিক স্বার্থ এবং বিশ্বাসের পরিবর্তনশীল বালির উপর নির্মিত। যেহেতু এটি স্থায়ী মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে নয়, তাই এটি প্রতিটি ঝোড়ো হাওয়ার করুণার উপর নির্ভর করে। ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র আসলে ধর্মতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইউরোপে শান্তি ও স্বাধীনতার ভিত্তিকে ব্যাহত করেছিল। ধর্মতাত্ত্বিক বিরোধ ক্রমাগত অভ্যন্তরীণ শান্তিকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নীতি ও ধর্মকে সরকারের আওতা থেকে বাদ দিয়ে এবং এগুলিকে ব্যক্তির ব্যক্তিগত উদ্বেগের বিষয় করে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছিল। দুর্ভাগ্যজনক ফলাফল ছিল যে, রাজনৈতিক জীবনে মানুষের কোনও স্থিতিশীল রেফারেন্স কাঠামো এবং তাকে পরিচালিত করার জন্য কোনও বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ড ছিল না। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কোনও প্রতিষ্ঠিত নীতির ভিত্তিতে নয়, বরং জাতীয় মেজাজের প্রভাবে নেওয়া যেত। "ভুল করা মানুষের পক্ষে" অত্যন্ত সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। মানুষ প্রায়শই ভুল বিচার করত এবং ভুল কাজ করত, যৌথভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে উভয় ক্ষেত্রেই। এই ধারণা যে সামগ্রিকভাবে মানুষ কখনও ভুল করতে পারে না, বাস্তবে খুব কম সমর্থন পেয়েছিল। যৌথ জ্ঞান ব্যক্তিগত জ্ঞানের মতোই অসম্পূর্ণ এবং ভুলভ্রান্ত। বিকশিত সরকারগুলি ব্যক্তিগত ব্যর্থতা প্রতিফলিত করেছিল। লর্ড স্নেলের মতে: সরকার সর্বদা এমন মানুষদের দ্বারা গঠিত যারা মানবজাতির সাধারণ অপূর্ণতাগুলি ভাগ করে নেয়, যার ফলে তারা কখনই তাদের আইন পরিচালনা করে এবং তাদের নীতি গঠন করে এমন মানুষের চেয়ে বেশি মহৎ বা আলোকিত হতে পারে না।[৫]

অ্যালডাস হাক্সলি তার "বিজ্ঞান, স্বাধীনতা এবং শান্তি" বইতে একই কথা বলেন যখন তিনি বলেন, এমন কোনও সময় ছিল না যখন অতিরিক্ত ক্ষমতা তার মালিককে কলুষিত করেনি, এবং এই ক্ষেত্রে, মানুষের ভবিষ্যতের আচরণ অতীত এবং বর্তমান সময়ের আচরণ থেকে কোনওভাবেই আলাদা হবে বলে ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই (পৃষ্ঠা ৪১)।

স্থায়ী মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে বস্তুনিষ্ঠ মান দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। এগুলি ছাড়া মানুষ তার তাৎক্ষণিক স্বার্থের বাইরে খুব বেশি দেখতে পারে না যা দীর্ঘমেয়াদে তার নিজের পক্ষে সর্বোত্তম নাও হতে পারে। তার আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা, সমস্ত একা, শেষ পর্যন্ত কেবল নিজের জন্যই ক্ষতিকারক প্রমাণিত হতে পারে না বরং তাকে তার আশেপাশের গোষ্ঠী থেকেও বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে।

সামাজিক গোষ্ঠীগুলি অনিবার্যভাবে মানবজাতির বিভাজনের দিকে পরিচালিত করেছে। প্রতিটি গোষ্ঠী তার সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্বকে উৎসাহিত করে এবং তাদের নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রতি শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতে উৎসাহিত করে। উপজাতিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আগে তিক্ত এবং বারবার ঘটত। পরবর্তীতে জাতীয় রাষ্ট্রগুলি উপজাতিগুলিকে প্রতিস্থাপন করে। বহির্মুখী প্রতি শত্রুতা জাতিগুলির মতোই জাতিগুলির বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি জাতিরই তার প্রতিবেশীর প্রতি বিদ্বেষ এবং ঘৃণার অনুভূতি থাকে। সামান্যতম উস্কানি তাদের একে অপরের গলায় উড়ে বেড়ায়। এই বিষয়ে কোব্বানের মন্তব্য উল্লেখ করা উচিত: জাতীয়তাবাদ এমন একটি অনুভূতি যা ঘৃণা থেকে জন্ম নেয় এবং শত্রুতার উপর নির্ভর করে। জাতিগুলি অন্যান্য জাতির সাথে তাদের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হয় এবং জাতীয় ঐক্যের সমাপ্তির সাথে সাথে তাদের শত্রুতার অনুভূতি শেষ হয় না। যখনই কোনও জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণের নিজস্ব অধিকার দাবি করে, তখনই তারা একই দাবিকারী অন্যান্য জাতিগুলিকে নিপীড়ন করতে শুরু

করে। এই সকল কারণেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে জাতীয়তাবাদ একটি রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ভিত্তি। [৬]

জাতীয়তাবাদের ইতিহাসবিদ ফ্রেডরিক হার্টজ তার "জাতীয়তা ইতিহাস ও রাজনীতিতে" বইটিতে লিখেছেন: ইতিহাস দেখায় যে বৃহত্তর অংশে ঝগড়াগুলি বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই জাতিগুলি বিভিন্ন ধরণের মানুষের সমন্বয় এবং বিভিন্ন নামে ডাকা ছাড়া আর কোনও উপলক্ষ ছিল না। একজন ইংরেজের কাছে, একজন ফরাসি, স্পেনীয় বা একজন ইতালীয় ব্যক্তির নাম অবশ্যই ঘৃণা এবং অবজ্ঞার ধারণা জাগায়। তবুও মানুষের সরল নামটি, সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে, কখনও কোনও শুভ প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয় না (পৃষ্ঠা ৩২৮)।

বার্ট্রান্ড রাসেল তার "নতুন আশার জন্য একটি পরিবর্তনশীল বিশ্বের" বইতে এই মতামত প্রকাশ করেছেন যে বর্তমান যুগে, জাতির সীমা ছাড়িয়ে বিস্তৃত সামাজিক যোগাযোগের পথে যে জিনিসটি দাঁড়িয়ে আছে এবং যা মানব জাতির জন্য সবচেয়ে গুরুতর হুমকিস্বরূপ, তা হল জাতীয়তাবাদের ধর্ম। আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করি যে রাসেল সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদের নিন্দা করলেও, তিনি তার নিজের জনগণের জাতীয়তাবাদের উচ্চারণ করেন।

তবে, অতীতের উপজাতি এবং বর্তমান সময়ের জাতিগুলির মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। জাতীয়তাবাদ কেবল রাজনৈতিক গোষ্ঠীবদ্ধতার একটি রূপকেই নির্দেশ করে না: এটি এমন একটি সম্প্রদায়ে বিকশিত হয়েছে যা ব্যক্তির মধ্যে তার জাতির প্রতি আবেগপূর্ণ ভক্তি এবং অন্যান্য জাতির প্রতি হিংসাত্মক বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে। এটা অদ্ভুত যে পশ্চিমা বিশ্ব, যারা কার্যত যুক্তিবাদী মানুষের জন্য উপযুক্ত নয় বলে ধর্মের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, জাতীয়তাবাদের ছদ্ম-ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সমর্থন করেছে। এই বিষয়ে অ্যালডাস হাক্সলির মন্তব্য লক্ষণীয়: জাতীয়তাবাদ নৈতিক ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে, কারণ এটি সর্বজনীনতাকে অস্বীকার করে, একক স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, মানুষ হিসেবে মানুষের মূল্য অস্বীকার করে; এবং একই সাথে, এটি একচেটিয়াতাকে নিশ্চিত করে, অহংকার, অহংকার এবং আত্মতৃপ্তিকে উৎসাহিত করে, ঘৃণাকে উদ্দীপিত করে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা এবং ন্যায্যতা ঘোষণা করে।[৭]

একই লেখক অন্য জায়গায় নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন: বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা অবিশ্বাস্যভাবে আদিম। ধারণাটি একটি জীবন্ত প্রাণী হিসাবে মূর্ত, যার আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, সংবেদনশীলতা রয়েছে। জাতীয় ব্যক্তি আকার এবং শক্তিতে অতিমানবীয়, কিন্তু নৈতিকতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অমানবিক। সাধারণত, জাতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে ভদ্র আচরণ আশা করা যায় না, যাকে ধৈর্য, সহনশীলতা, ক্ষমা এমনকি সাধারণ জ্ঞান এবং আলোকিত স্বার্থের অক্ষম বলে মনে করা হয়। যারা ব্যক্তিগত জীবনে

যুক্তিসঙ্গত এবং নীতিবান প্রাণী হিসেবে বিশ্বাস করে, তারা জাতীয় ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার সাথে সাথেই তাদের মূর্খ, হিস্টিরিয়া এবং উন্মাদভাবে স্পর্শকাতর উপজাতীয় দেবত্বের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়। এটি তাই হওয়ার কারণে, বর্তমান সময়ে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে আশা করার মতো খুব কমই আছে। [৮]

অ্যাডাম ডি হেগেডাসের একটি চিন্তা-উদ্দীপক অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছে: এই দুটি যুদ্ধের নীচে, বিশ্বকে সার্বভৌম স্বাধীন জাতি রাষ্ট্রে একই নৈরাজ্যকর বিভক্ত করা হয়েছিল, যারা তাদের স্বভাবগতভাবেই একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা এবং সংঘাত করতে বাধ্য হয় এবং পারস্পরিকভাবে সুস্থ অর্থনৈতিক সংগঠন তৈরি করতে অক্ষম। এই পরিস্থিতির সবচেয়ে খারাপ বৈশিষ্ট্য যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি নয় বরং শান্তির অনুপস্থিতি।[৯]

**৮. দেশপ্রেম**

জাতীয়তাবাদ মানুষের মনে এই বিশ্বাস স্থাপন করেছে যে দেশপ্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ গুণ। দেশপ্রেমিকদের স্লোগান হল: "আমার, দেশ, সঠিক বা ভুল।" টিউবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রুমেলিন (১৮৭৫ সালে) লিখেছিলেন যে: রাষ্ট্র স্বৈরাচারী। আত্মসম্মান তার নির্ধারিত কর্তব্য; নিজস্ব ক্ষমতা এবং কল্যাণের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিকাশ। অহংকার - যদি আপনি এটিকে অহংকার বলেন - সমস্ত রাজনীতির সর্বোচ্চ নীতি। রাষ্ট্র কেবল অন্য যেকোনো রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতিই মনোযোগ দিতে পারে যতক্ষণ না এটিকে তার নিজস্ব স্বার্থের সাথে চিহ্নিত করা যায়। আত্মনিবেদন ব্যক্তির জন্য নীতি; রাষ্ট্রের জন্য আত্মপ্রত্যয়। রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ প্রতিটি ত্যাগকে ন্যায্যতা দেয় এবং প্রতিটি নৈতিক নিয়মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। [১০]

রুমেলিন নির্মমভাবে স্পষ্টবাদী, কিন্তু লর্ড গ্রে মৃদু ভাষায় একই অনুভূতি প্রকাশ করেছেন: আমি নীতির একজন মহান প্রেমিক, প্রকাশ্য এবং ব্যক্তিগত; কিন্তু জাতির মধ্যে মেলামেশা সেই নিয়ম দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না।[১১]

বার্ক যখন বিপ্লবের নিন্দা করছিলেন, তখন ওয়ালপোল লিখেছিলেন: কোনও মহান দেশ কখনও ভালো মানুষদের দ্বারা রক্ষা পায়নি, কারণ ভালো মানুষরা যতদূর সম্ভব যেতে পারে। [১২]

প্রফেসর সি.ই.এম. জোয়াড নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেন: রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্কের উপর আদর্শবাদী তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রভাব হল, তাই, নৈতিকতার একটি দ্বৈত মান তৈরি করা। ব্যক্তির জন্য নীতির একটি ব্যবস্থা রয়েছে এবং রাষ্ট্রের জন্য আরেকটি, যাতে ব্যক্তিগত জীবনে, মানবিক, সৎ এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিরা বিশ্বাস করেন যে, যখন তারা অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সাথে রাষ্ট্রের পক্ষে লেনদেন করেন,

তখন তারা এমনভাবে আচরণ করার পক্ষে ন্যায্য যা ব্যক্তিগত ব্যক্তি হিসাবে তারা হৃদয় থেকে লজ্জিত হবেন।[১৩]

ক্যাভোর এই দৃষ্টিভঙ্গিটি ছোট করে বলেছেন: আমরা যদি আমাদের দেশের জন্য যা করি তা নিজেদের জন্য করি, তাহলে আমাদের কত বদমাশ হওয়া উচিত।[১৪]

জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসের পশ্চিমা বিশ্বে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে তিনটি দুর্ভাগ্যজনক ফলাফল:

১. মানবতা পরস্পরবিরোধী স্বার্থের অজুহাতে বেশ কয়েকটি জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

২. একটি শক্তিশালী জাতি তার স্বার্থ রক্ষার অজুহাতে দুর্বল জাতিগুলিকে শোষণ করতে প্রলুব্ধ হয়েছিল।

৩. নৈতিক সংযমের অভাব বিশ্বকে পরিণত করেছে, যেমন ওয়েকম্যান সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, "পশুদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে, যেখানে কেবল একটি নীতির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তা হল, শক্তিই সঠিক।" [১৫]

আধুনিক যুগে পশ্চিমা মনকে ম্যাকিয়াভেলির আত্মা আধিপত্য বিস্তার করেছিল। পশ্চিমা শাসকরা ম্যাকিয়াভেলির তার রাজপুত্রের নিন্দুক পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়েছেন: একজন রাজপুত্রকে পশুর মতো আচরণ করতে জানতে বাধ্য হতে হবে, তাকে অবশ্যই শিয়াল এবং সিংহের অনুকরণ করতে হবে, কারণ সিংহ নিজেকে ফাঁদ থেকে রক্ষা করতে পারে না এবং শিয়াল নেকড়েদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। অতএব, ফাঁদ চিনতে শিয়াল এবং নেকড়েদের ভয় দেখানোর জন্য সিংহ হতে হবে।

যারা কেবল সিংহ হতে চায় তারা এটি বোঝে না। অতএব, একজন বিচক্ষণ শাসকের উচিত বিশ্বাস রাখা উচিত নয় যখন এটি করার মাধ্যমে এটি তার স্বার্থের বিরুদ্ধে হয় এবং যখন তাকে নিজেকে আবদ্ধ করার কারণগুলি আর বিদ্যমান থাকে না।[১৬]

কয়েকটি ভালো আচরণের গুণাবলী উল্লেখ করার পর তিনি বলেন: অতএব, একজন রাজপুত্রের উপরোক্ত (ভালো) গুণাবলী থাকা আবশ্যক নয়, তবে সেগুলি থাকা খুবই প্রয়োজনীয়। আমি এমনকি বলতে সাহস করব যে এগুলি ধারণ করা এবং সর্বদা সেগুলি পালন করা বিপজ্জনক, তবে সেগুলি ধারণ করে বলে মনে করা কার্যকর। সুতরাং করুণাময়, বিশ্বস্ত, মানবিক, আন্তরিক, ধার্মিক এবং তাই হওয়াও ভালো; তবে আপনার মন এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত যাতে অন্যথায় প্রয়োজন হলে আপনি বিপরীত গুণাবলীতে পরিবর্তন করতে সক্ষম হতে পারেন। এবং এটা বুঝতে হবে যে একজন রাজপুত্র, বিশেষ করে একজন নতুন রাজপুত্র, সেই সমস্ত জিনিস পালন করতে পারেন না যা মানুষের মধ্যে ভালো বলে বিবেচিত হয়, প্রায়শই রাষ্ট্র বজায় রাখার জন্য, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, দানের বিরুদ্ধে, মানবতার বিরুদ্ধে এবং ধর্মের

বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য থাকে। আর তাই, তার এমন মন থাকতে হবে যে সে বাতাসের সাথে খাপ খাইয়ে নেবে, এবং ভাগ্যের পরিবর্তন যেমন নির্দেশ করে, এবং যেমন আমি আগেই বলেছি, সম্ভব হলে ভালো থেকে বিচ্যুত হবে না, বরং বাধ্য হলে মন্দ কাজ করতে সক্ষম হবে।[১৭]

বইটি থেকে এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়ার জন্য কোনও ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ এটি সুপরিচিত যে রাজপুত্র বাইবেলটি লেখার পর থেকেই পশ্চিমা রাজনীতিবিদ এবং শাসকদের বাইবেল। এটি চার্লস পঞ্চম, তার পুত্র এবং তার সভাসদদের সর্বদা সঙ্গী ছিল। টমাস ক্রমওয়েল ইতালি থেকে একটি কপি নিয়ে এসেছিলেন এবং ঘুমাতে যাওয়ার সময় এটি তার বালিশের নীচে রাখতেন। বইটি যাকে উৎসর্গ করা হয়েছিল তার কন্যা ক্যাথরিন ডি মেডিসি এটি ফ্রান্সে নিয়ে এসেছিলেন এবং তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এতে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তার পুত্র, হেনরি তৃতীয়, সর্বদা এটি তার পকেটে বহন করতেন। যখন তাকে হত্যা করা হয়েছিল, তখন এটি তার শরীরে পাওয়া গিয়েছিল। হেনরি চতুর্থের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। অনেক পোপ এবং রাজা এটির প্রশংসা করেছিলেন এবং এর রাজনৈতিক দর্শনের অনুমোদন করেছিলেন।

ফ্রেডেরিক, যিনি অন্যান্য শাসকদের সাথে তার আচরণে এর নীতিমালা অনুসরণ করেছিলেন, তিনি তার রাজনৈতিক টেস্টামেন্টে এইভাবে লিখেছেন: মহান বিষয় হল নিজের পরিকল্পনা গোপন করা এবং নিজের চরিত্র ঢেকে রাখা। নীতি হল অনুকূল সংযোজনগুলি আগে থেকে প্রস্তুত করার চেয়ে লাভবান হওয়া। এই কারণেই আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভর করে চুক্তি না করা এবং আপনার হাত মুক্ত রাখা। তাহলে আপনি সময়, স্থান এবং আপনার বিষয়গুলির পরিস্থিতি অনুসারে, এক কথায়, আপনার আগ্রহের ভিত্তিতে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।[১৮]

মাকিয়াভেলির অনুসরণকারী রাজনীতিবিদরা বিশ্বাস করেন যে নৈতিক নিয়মগুলি তাদের উপর বাধ্যতামূলক নয়। তারা রাজনৈতিক বিষয়গুলির সাথে অপ্রাসঙ্গিক হিসাবে নৈতিক বিবেচনাকে প্রত্যাখ্যান করেন। বর্তমান যুগেও ম্যাকিয়াভেলির অনেক উৎসাহী অনুসারী রয়েছে। জন এফ. কেনেডি (তার বই, প্রোফাইলস ইন কারেজ,, ১৯৬৩) ফ্রাঙ্ক কান্টকে উদ্ধৃত করে বলেছেন: রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষীর জন্য সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক অর্জন হল তা না করে কিছু বলার মতো সূক্ষ্ম শিল্প। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বর্তমান ইস্যুতে সঠিক দিকে থাকা নয় বরং জনসাধারণের পক্ষে থাকা, নিজের বিশ্বাস বা তথ্য নির্বিশেষে। ভোট পাওয়ার বিষয়টি বেশ কয়েকটি ব্যবহারিক সমস্যা যেখানে নৈতিকতা, সঠিক এবং ভুলের বিষয়গুলিকে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হবে না (পৃষ্ঠা ৮)।

কেনেডি আরও বলেন: কিন্তু কেউ কেউ বলবেন এটি কোনও বাস্তব সমস্যা নয়। সর্বদা যা সঠিক তা করুন, তা জনপ্রিয় হোক না কেন। চাপ, প্রলোভন, মিথ্যা আপস উপেক্ষা করুন। এটি একটি সহজ উত্তর -

তবে এটি কেবল তাদের জন্য সহজ যারা নির্বাচিত পদের দায়িত্ব বহন করেন না (পৃষ্ঠা ১১)। তাই ম্যাকিয়াভেলির মতামতকে অপ্রচলিত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

## ৯. পশ্চিমা চিন্তাবিদগণ

কোনও সামাজিক গোষ্ঠী অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত নয়। সমস্ত দ্বন্দ্বের মূল উৎস হল একই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত। এখনও পর্যন্ত এমন কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করা হয়নি যা স্বার্থকে দূর করে জাতীয় সংঘাত। গণতন্ত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। এটি অভ্যন্তরীণ চাপকে আরও তীব্র করেছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার রাজনীতিকে উৎসাহিত করেছে। তবুও, আধুনিক চিন্তাবিদরা গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস হারাননি এবং বিশ্বাস করেন যে এর ত্রুটিগুলি অপূরণীয় নয়। আসুন দেখি তারা কী প্রতিকারের পরামর্শ দিয়েছেন।

গণতন্ত্র দুটি মৌলিক অনুমানের উপর ভিত্তি করে। প্রথম অনুমান হল সার্বভৌমত্ব জনগণের উপর ন্যস্ত এবং দ্বিতীয়টি হল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত সর্বদা সঠিক। গণতন্ত্রের ভিত্তিতে অধ্যাপক কোবানের মন্তব্য সাবধানতার সাথে বিবেচনা করার যোগ্য: জনগণের সার্বভৌমত্বের ঐতিহ্যগত যুক্তি হল যে সরকার অবশ্যই বলপ্রয়োগ বা সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, এবং যেহেতু বলপ্রয়োগ সঠিক করতে পারে না, তাই ন্যায়সঙ্গত সরকার অবশ্যই সম্মতির উপর ভিত্তি করে হতে হবে। কিন্তু এটি যুক্তিসঙ্গত নয় এবং এটি সত্যও নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ ভুল কাজকে সম্মতি দেয়, এই সত্যটি তাকে কম ভুল করে না। যদি শব্দের কোনও অর্থ থাকে, তবে যে কোনও সরকারের কর্তৃত্বের ন্যায্যতা তার উদ্দেশ্য এবং এটি কীভাবে প্রয়োগ করা হয় তার উপর নির্ভর করে। একটি ইচ্ছা কেবল তখনই জয়লাভ করা উচিত যদি এটি একটি সদিচ্ছা হয়; কিন্তু এটি কার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না বরং এর বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে।[১৯]

## ১০. নৈতিক মান

প্রফেসর কোবান সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের পরিবর্তে "নৈতিক মূল্যবোধ" কে সঠিক এবং ভুল বিচারের মানদণ্ড হিসেবে প্রস্তাব করেছেন। লক এটিকে "অপরিবর্তনীয়" - বা প্রাকৃতিক আইন" বলে অভিহিত করেছেন।" আমরা ম্যাবট থেকে উদ্ধৃত করছি: মানুষ এবং মানুষের মধ্যে ন্যায্য সম্পর্ক পরিচালনাকারী একটি অপরিবর্তনীয় আইন রয়েছে, তারা যে কোনও সমাজ বা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন। এই প্রাকৃতিক আইন প্রাকৃতিক অধিকারের মতো সরকারগুলির নিরঙ্কুশ শাসনের উপর সীমাবদ্ধতা হিসাবে কাজ করবে, তা সে যতই গঠিত হোক না কেন এবং তারা যে কোনও লক্ষ্য অনুসরণ করুক না কেন। [২০]

## ১১. লকের (Locke) ভুল

লক প্রাকৃতিক আইনের উপর আস্থা রেখেছিলেন, সঠিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে যতক্ষণ মানুষ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতা ছাড়াই থাকে ততক্ষণ তারা প্রাকৃতিক আইন অনুসরণ করে। এই সময়ে যুক্তি তাদের পথপ্রদর্শক ছিল, অনুভূতি নয়। পরবর্তীতে, তারা অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং প্রাকৃতিক আইন অনুসারে জীবনযাপন বন্ধ করে দিয়েছিল। প্রাকৃতিক আইনের পুনরুজ্জীবন এবং প্রয়োগ এখন সমাজের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যখন আমরা জিজ্ঞাসা করি যে এই প্রাকৃতিক আইন কীভাবে আবিষ্কার করা যেতে পারে, লক আমাদের "সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা" উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি একটি বৃত্তে তর্ক করছেন বলে মনে হচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত সঠিক যদি এটি প্রাকৃতিক আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, এবং প্রাকৃতিক আইন কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছায় প্রকাশিত হয়। অতএব, প্রাকৃতিক আইন কোনও জাতির কর্মকাণ্ড বিচারের জন্য বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ড হিসেবে কাজ করতে পারে না। যখন লক কোনও সরকারকে অন্যায়ভাবে কাজ করতে দেখেন, তখন তিনি চিৎকার করে বলেন যে কোনও সরকারের জনগণের উপর তার ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার কোনও অধিকার নেই; এটিকে প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় আইন মেনে চলতে হবে। "যাইহোক, যখন তাকে প্রাকৃতিক আইনের উৎস নির্দিষ্ট করতে বলা হয়, তখন তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার চেয়ে ভালো আর কিছুই ভাবতে পারেন না। এটি "ছাদের নর্দমার নীচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি থেকে সুরক্ষা খোঁজার" মতো দেখায়। ফলাফলটি তার চিন্তাভাবনার ঠিক বিপরীত ছিল। তার ধারণা ছিল মানবজাতিকে সর্বদা পরিবর্তনশীল মানবসৃষ্ট আইনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা কিন্তু প্রাকৃতিক আইনের তার তত্ত্ব আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। নিঃসন্দেহে প্রথম দৃষ্টান্তে, "স্কুলম্যানরা এই তত্ত্বকে ঐশ্বরিক ইচ্ছার পক্ষপাতিত্ব দিয়ে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের সাথে যুক্ত করেছিলেন এবং এর ফলে এটি মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারায় দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছিলেন।"[২১] পরবর্তীকালে, "ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাকৃতিক আইন তত্ত্বের প্রাথমিক আধুনিকীকরণকারীরা, বিশেষ করে হুগো গ্রোটিয়াস এবং স্যামুয়েল পুফেনডর্ফ, যে কাজটি করেছিলেন তা প্রায় বিপরীত ছিল।" "প্রাকৃতিক আইন থেকে স্রষ্টাকে বের করে তারা এটিকে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ সাংবিধানিক রাষ্ট্রের ভিত্তি করে তুলেছিল। তারা প্রাকৃতিক আইনের একটি তত্ত্ব তৈরি করেছিল যা "এমন এক যুগে বিশ্বাসযোগ্যতা বহন করবে যেখানে ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক ধীরে ধীরে তা করার ক্ষমতা হারাচ্ছিল," যার ফলে "স্রষ্টার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয় করে তুলবে।" "মতবাদ।"[২২]

## ১২. উচ্চতর আইন

পশ্চিমের আধুনিক চিন্তাবিদদের মধ্যে এখন সাধারণ প্রবণতা হল যে, সকল পরিস্থিতিতেই সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তকে সঠিক হিসেবে গ্রহণ করা ভুল। মানুষের কর্মকাণ্ড বিচার করার জন্য আমাদের একটি বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ডের প্রয়োজন। লকের মতে এটি ছিল প্রাকৃতিক আইন। কোবান এটিকে নৈতিক মানদণ্ড বলে

অভিহিত করেছেন। তবে, ইতালীয় দেশপ্রেমিক, মাজিনি এটিকে আরও সুনির্দিষ্ট আকারে তুলে ধরেন যখন তিনি বলেন যে সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি একটি ভালো জিনিস ছিল কারণ এটি ধ্বংসাত্মক শক্তির বিরুদ্ধে রক্ষা করার এবং তাদের নিজস্ব সরকার চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি আইনসঙ্গত পদ্ধতি প্রদান করে।

যাইহোক, যে সকল জনগণের মধ্যে কোন সাধারণ বিশ্বাস নেই, গণতন্ত্র যা করতে পারে তা হল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ রক্ষা করা এবং সংখ্যালঘুদের দমন করা। তিনি আরও বলেন, আমরা স্রষ্টার বা মানুষের, একজনের বা একাধিকের অধীন হতে পারি। যদি কোনও উচ্চতর কর্তৃপক্ষ না থাকে আর মানুষ, শক্তিশালী ব্যক্তিদের অধীনতা থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য কী আছে? যদি আমাদের কাছে এমন কিছু পবিত্র এবং অপরিবর্তনীয় আইন না থাকে, যা মানুষের তৈরি নয়, তাহলে আমাদের কাছে সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য করার কোনও মানদণ্ড থাকতে পারে না। স্রষ্টার ইচ্ছা ব্যতীত অন্য আইনের উপর ভিত্তি করে একটি সরকার, তিনি আরও বলেন, স্বৈরাচারী বা বিপ্লবী যাই হোক না কেন, একই ফলাফল দেয়। স্রষ্টা ছাড়া, যে কেউই কর্তৃত্বে থাকবে সে একজন স্বৈরাচারী হবে.. যদি কোনও সরকার স্রষ্টার আইন মেনে না চলে, তবে তার শাসন করার কোনও অধিকার নেই। সরকারের উদ্দেশ্য হল স্রষ্টার ইচ্ছা কার্যকর করা যদি কোনও সরকার তার উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়, তাহলে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা এবং আনার অধিকার এবং কর্তব্য। [২৩]

"উচ্চতর আইন" ধারণাটি নতুনভাবে জন্মগ্রহণ করেনি। প্রাচীন গ্রীকরা, যাদের মধ্যে সোফিলি, হেরাক্লিটাস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল অন্তর্ভুক্ত, ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত, সর্বজনীন, অপরিবর্তনীয় এবং চিরন্তন প্রাকৃতিক আইনের ধারণার উত্থান এবং বিকাশে অনেক অবদান রেখেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা লিখেছিলেন যে, "সমস্ত মানবিক আইন একটি ঐশ্বরিক আইন দ্বারা টিকে থাকে, যা অসীমভাবে শক্তিশালী এবং সকলের জন্য যথেষ্ট এবং তার চেয়েও বেশি" (হেরাক্লিটাস)। প্লেটোর মানবিক আইনের তত্ত্ব, যা কেবল ধারণার জগতে বিদ্যমান একটি আদর্শ রূপের অসম্পূর্ণ প্রতিরূপ, একই দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি প্রকাশ। প্লেটো এবং গ্রীক সাধারণের জন্য, প্রকৃতির আইন তুলনার ভিত্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না - একটি বৌদ্ধিক মান এবং - সুনির্দিষ্ট আইনগত সিদ্ধান্তের জন্য একটি উপায় হিসাবে কাজ করেনি। করউইনের মতে, "অ্যারিস্টটলকে মানবিক আইনে সাধারণের সাথে যুক্তিসঙ্গতকে চিহ্নিত করতে পরিচালিত করা হয়েছিল।" তার রাজনীতিতে আইনের শাসন নাকি ব্যক্তির শাসন অগ্রাধিকারযোগ্য এই প্রশ্নটি রেখে, তিনি তার নিজের প্রশ্নের উত্তর অনির্দিষ্টভাবে দেন। "আইনকে কর্তৃত্ব দেওয়া মানে মনে হয় কেবল স্রষ্টা এবং যুক্তি দেওয়া; একজন মানুষকে কর্তৃত্ব দেওয়া মানে হল ইচ্ছাকে পশুত্ব হিসেবে উপস্থাপন করা, এমনকি কর্তৃত্বে থাকা সেরা মানুষরাও আবেগ দ্বারা কলুষিত হতে পারে। তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে আইন আবেগ ছাড়া যুক্তি এবং তাই এটি যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে পছন্দনীয়।"[২৫]

তবে, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ সালের পরে গ্রীসে এবং পরে রোমে স্টোইকদের জন্য এই দার্শনিক ভিত্তির উপর একটি খাঁটি প্রাকৃতিক আইন তত্ত্ব স্থাপন করা বাকি ছিল। হেনরি তৃতীয়ের রাজত্বকালে রাজার বেঞ্চের বিচারক ব্র্যাক্টন রোমান আইনের অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করে একটি বিশাল কাজ তৈরি করেছিলেন।

আমরা তার গ্রন্থে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পাই যা আইন সম্পর্কে রোমানদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে। এতে বলা হয়েছে: রাজা নিজে মানুষের অধীন নন বরং স্রষ্টা এবং আইনের অধীন হওয়া উচিত, কারণ আইন রাজাকে রাজা করে। তাহলে রাজাকে আইনের সাথে সেইসব বিষয় যুক্ত করতে দিন যা আইন তাকে আরোপ করে, অর্থাৎ কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা, কারণ এমন কোন রাজা নেই যেখানে ইচ্ছাই প্রাধান্য পায়, আইন নয়।[২৬]

তবে, মহান রোমান আইনবিদ এবং বক্তা সিসেরো খুব স্পষ্টভাবে এই বিষয়টি প্রজাতন্ত্রের একটি অনুচ্ছেদে বলেছেন যা নিম্নরূপ: আসলে একটি সত্য আইন আছে—যার অর্থ সঠিক কারণ—যা প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য এবং অপরিবর্তনীয় এবং চিরন্তন। এর আদেশ দ্বারা, এই আইন মানুষকে তাদের কর্তব্য পালনের জন্য আহ্বান করে; এর নিষেধাজ্ঞা দ্বারা এটি তাদের অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। মানব আইন দ্বারা এই আইনকে বাতিল করা কখনই নৈতিকভাবে সঠিক নয়, এর কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ করাও অনুমোদিত নয় এবং এটি বাতিল করা অসম্ভব। সিনেট বা জনগণ কেউই এই আইন মেনে চলার বাধ্যবাধকতা থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারে না, এবং এটি ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যা করার জন্য কোনও সেক্সটাস আলেইউসের প্রয়োজন হয় না। এটি রোমে একটি নিয়ম এবং এথেন্সে আরেকটি নিয়ম স্থাপন করবে না, আজ একটি নিয়ম এবং আগামীকাল আরেকটি নিয়ম থাকবে না। কিন্তু একটি আইন থাকবে, চিরন্তন এবং অপরিবর্তনীয়, সর্বদা সকল মানুষের উপর আবদ্ধ; এবং মানুষের একজন সাধারণ প্রভু এবং শাসক থাকবেন, অর্থাৎ স্রষ্টা, যিনি এই আইনের লেখক, এর ব্যাখ্যাকারী এবং এর পৃষ্ঠপোষক। যে ব্যক্তি এটি মান্য করবে না সে তার উত্তম সত্ত্বাকে ত্যাগ করবে এবং মানুষের প্রকৃত স্বভাবকে অস্বীকার করে তাকে কঠোরতম শাস্তি ভোগ করতে হবে, যদিও সে অন্যান্য সমস্ত পরিণতি থেকে রক্ষা পেয়েছে যা মানুষ শাস্তি বলে।[২৭]

### ১৩. আলোর সন্ধানে আধুনিক মানুষ

মানবসৃষ্ট আইন নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্যর্থ পরীক্ষার পরও, আধুনিক মানুষ এখনও সেই ধরণের আইনের সন্ধান করছে যা সিসেরো এত তীব্রভাবে চেয়েছিলেন। সমস্যা হল এই ধরণের আইন কোথায় পাওয়া যাবে - এগুলি চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়, অপরিবর্তনীয়, অলঙ্ঘনীয় - সকলের জন্য এবং সর্বদা প্রযোজ্য। উৎস হতে হবে মানব-উপর, অর্থাৎ স্বয়ং স্রষ্টা প্রদত্ত আইন। পশ্চিমাদের স্বাভাবিকভাবেই এই ধরণের আইন নির্ধারণের জন্য ধর্মের সাহায্য নিতে হয়েছিল। তারা খ্রিস্টধর্মের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু

কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। খ্রিস্টধর্মের কোনও আইন নেই, এবং এটি সম্পূর্ণরূপে অন্য জাগতিক। জোয়াদের ভাষায়:খ্রিস্টধর্ম মানুষের প্রকৃত জীবনকে এই পৃথিবীতে নয় বরং পরকালে স্থাপন করে। যদিও পরকাল সম্পূর্ণরূপে ভালো, এই পৃথিবীকে অন্তত কিছুটা হলেও মন্দ বলে ধারণা করা হয়; যদিও পরকাল চিরন্তন, পৃথিবীতে জীবন ক্ষণস্থায়ী। মানুষের পরকালের জীবনের জন্য, এটি, তার বর্তমান অস্তিত্ব, একটি প্রস্তুতি এবং প্রশিক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হবে; এবং এর উৎকর্ষতা হল

প্রশিক্ষণ যে নিখুঁততা এবং দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয়। পৃথিবীতে কিছুই সম্পূর্ণরূপে এবং সম্পূর্ণরূপে ভালো নয়, এবং পার্থিব জীবনের মতো জিনিসগুলি কেবল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া বৃহত্তর জিনিসের উপায় হিসাবেই ভালো।[২৮]

স্প্যানিশ পণ্ডিত ডঃ ফাল্টা ডি গ্রাসিয়া লিখেছেন:ন্যায়বিচারের ধারণা খ্রিস্টধর্মের চেতনার সাথে সম্পূর্ণরূপে বিজাতীয়, যেমন বৌদ্ধিক সততার। এটি সম্পূর্ণরূপে এর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে।[২৯]

প্রফেসর এ.এন. হোয়াইটহেড লিখেছেন:যেহেতু সমাজ এখন গঠিত হয়েছে, গসপেল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নৈতিক নীতিগুলির আক্ষরিক আনুগত্যের অর্থ আকস্মিক মৃত্যু।[৩০]

সভ্যতার ইতিহাসবিদ ডরসি দাবি করেছেন যে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ মনে করে যে খ্রিস্টধর্ম পরাজিতদের ধর্ম। তারা ধর্ম গ্রহণ করে কিন্তু এর পরাজয়বাদী চেতনাকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে। জীবনে কিছুই সন্তোষজনক নয়, তারা যুক্তি দেন। "তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা ভুল এবং ভুল ইচ্ছা পূরণ পাপ" এমন একটি স্লোগান যা একটি সত্য এবং সুস্থ জীবনকে অসম্ভব করে তোলে। "এটি মানবতাকে ধ্বংস করে।" জার্মান মানবতাবাদী, গেরহার্ড সেজেসনি, খ্রিস্টধর্মকে একটি মরুভূমির মানুষের ধর্মবিশ্বাস হিসেবে দেখেন, যা মূলত দর্শন ও বিজ্ঞানের সাথে এর দ্বৈতবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সাথে অসঙ্গত এবং দুই হাজার বছরের জন্য তাদের অগ্রগতির পথে বাধা। [৩২]

### ১৪. মানবাধিকারের ঘোষণা

পূর্ব ও পশ্চিম উভয় ক্ষেত্রেই অন্যান্য ধর্মীয়দের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ধর্মে পরম ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ডের জন্য স্রষ্টার আইন অনুসন্ধান করা আসলে উর্বর। ধর্ম নিজেই মানবসৃষ্ট। এই পরিস্থিতিতে, আধুনিক মানুষ, একজন হতাশ, অসহায় করুণ আত্মা, ধর্মের ক্ষেত্রের বাইরে বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ড অনুসন্ধান করার জন্য শক্তি অর্জন করেছিল। তিনি জাতিসংঘ সংস্থার সাহায্যের জন্য প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। জাতিসংঘ, মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি বর্ণনা এবং সংজ্ঞায়িত করার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করেছিল। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে, জাতিসংঘ, ১০৪৮ সালে তার বিখ্যাত মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছিল। এই নথিতে মৌলিক মৌলিক মানবাধিকার তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

জাতিসংঘ তার সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে তাদের সকল প্রজাদের জন্য এই অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে এবং এগুলোকে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় হিসেবে বিবেচনা করতে বলেছে। এই ঘোষণাপত্রটিকে আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় অর্জন হিসেবে প্রশংসিত করা হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল যে, ভবিষ্যতে সারা বিশ্বের সরকার মানুষের এই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে। দুর্ভাগ্যবশত, এই আশা পূরণ হয়নি। জাতিসংঘের একটি অঙ্গ সংস্থা ইউনেস্কো প্রস্তাবিত ঘোষণাপত্রের খসড়ার উপর একটি প্রশ্নপত্র প্রচার করেছিল। প্রশ্নপত্রের উত্তর জ্যাক ম্যারিটেনের ভূমিকা সহ প্রকাশিত হয়েছে। তার দৃষ্টিভঙ্গি "মানুষ হিসেবে অধিকারের উপর কিছু সীমা আরোপ করা উচিত এবং সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্য দায়ী বলে বিবেচিত হওয়া উচিত" (পৃষ্ঠা ১৫)। লন্ডনের মডার্ন কোয়ার্টারলির সম্পাদক জন লুইস ঘোষণাপত্রের সমালোচনায় সমানভাবে স্পষ্টবাদী। তিনি লিখেছেন যে এটি কেবল কল্পকাহিনী যে "মানবাধিকার" পরম, অথবা মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত এবং মানুষ সংগঠিত সমাজে বসবাস শুরু করার আগে থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছিল। (পৃষ্ঠা ৫১)। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেরার্ড লিখেছেন যে ঘোষণাপত্রটি মানুষ ও সমাজের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নির্ধারণের একটি প্রচেষ্টা এবং "অধিকার" কে ভবিষ্যতের জন্য সর্বদা অপরিবর্তনীয় হিসাবে দেখা যাবে না (পৃষ্ঠা ২০)।

## ১৫ স্থায়ী মূল্যবোধের সন্ধান

এই ধরনের সমালোচনা ঘোষণাপত্রের প্রতি আমাদের উৎসাহকে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করেছে। মানুষের কিছু অবিচ্ছেদ্য অধিকার রয়েছে এই বিশ্বাস ন্যায্য বলে মনে হয় না। যদি মানুষের জীবনের একটি সাধারণ দর্শন থাকে, তাহলে তাদের কাছ থেকে আশা করা যেতে পারে যে তারা সেই দর্শন সমর্থন করে এমন "অধিকার" সম্মান করবে। এই ধরনের দর্শনের অনুপস্থিতিতে, কোন গ্যারান্টি নেই যে এক চিন্তাধারা দ্বারা স্বীকৃত অধিকারগুলি অন্য চিন্তাধারা দ্বারা গৃহীত হবে। পূরণ করার প্রথম শর্ত হল মূল্যবোধের একটি সম্মত ব্যবস্থা। অধ্যাপক জোয়াড এটি স্পষ্ট করেন: আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম যে ব্যক্তির জন্য ভালো জীবন নির্দিষ্ট পরম মূল্যবোধের অনুসরণের মধ্যে নিহিত। যদি আমি ঠিক বলি, যদি, অর্থাৎ, মূল্যবোধের অনুসরণের মাধ্যমেই একজন মানুষ তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ করে, তাহলে আমরা যোগ করতে পারি যে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হল সেই পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠা করা যেখানে ব্যক্তি পরম মূল্যবোধ অনুসরণ করতে পারে এবং তাকে তাদের অনুসরণে উৎসাহিত করা। এইভাবে আমরা সমাজে অগ্রগতির একটি নীতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই, যা বিভিন্ন সমাজের আপেক্ষিক মূল্য মূল্যায়নের জন্য পরিমাপের একটি মানদণ্ডও।[৩৩]

তাই আমাদের প্রথম কাজ হল পরম মূল্যবোধের প্রকৃতি নির্ধারণ করা। তারপর আমরা দেখব যে রাষ্ট্রের কর্তব্য হল এমন পরিস্থিতি প্রদান করা যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে সেগুলি অনুসরণ করতে পারে। এরপর মানবাধিকারকে মূল্যবোধের সাধনার সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে আনা হবে এবং এটিকে

স্বেচ্ছাচারী হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এই কাজটি এখনও করা হয়নি। দেখা যাক ইসলাম এই বিষয়ে সাহায্য করতে পারে কিনা।

### *তথ্যসূত্র*


১. ভিসকাউন্ট স্যামুয়েল, বিশ্বাস এবং কর্ম, পৃষ্ঠা, ৩৯।

২. এ.সি. ইউইং কর্তৃক উদ্ধৃত, দ্য ইন্ডিভিজুয়াল, দ্য স্টেট অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট, পৃষ্ঠা ১০৬-১০৯।

৩. এইচ.সি. মেনেকেন, দ্য ট্রিটাইজ অন রাইট অ্যান্ড র‍্যান্ট, পৃষ্ঠা ২৩৪।

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫।

৫. লর্ড স্নেল, দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড, পৃষ্ঠা ১৭।

৬. আলফ্রেড কোবান, ওপ. সিট., পৃষ্ঠা ১৬৬।

৭. অ্যালডাস হাক্সলি, সায়েন্স, লিবার্টি অ্যান্ড পিস, পৃষ্ঠা ৩৪।

৮. অ্যালডাস হাক্সলি, এন্ডস অ্যান্ড মিনস, পৃষ্ঠা ৪০।

৯. অ্যাডাম ডি হেগেডাস, দ্য স্টেট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃষ্ঠা ১১।

১০. আর. এইচ. মারে, দ্য ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড দ্য স্টেট, পৃষ্ঠা ২১৬-তে উদ্ধৃত।

১১. এল.এস. স্টেবিং, আইডিয়ালস অ্যান্ড ইলিউশনস-এ উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১৩।

১২. প্রাগুক্ত., পৃষ্ঠা। ১৪.

১৩. সি. ই. এম. জোয়াড, নীতি ও রাজনীতির দর্শনের নির্দেশিকা, পৃষ্ঠা ৭২৯-৩০।

১৪. ক্যাভোর, বৈদেশিক বিষয়ক, জুলাই ১৯৫২।

১৫. স্প্যাল্ডিং কর্তৃক উদ্ধৃত, "পূর্ব ও পশ্চিমে সভ্যতা"।

১৬. এন. ম্যাকিয়াভেলি, দ্য প্রিন্স অ্যান্ড দ্য ডিসকোর্সেস, পৃষ্ঠা ৬৪।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৫।

১৮. আর.এইচ. মারে, উপাধি, পৃষ্ঠা ২০৯-১২।

১৯. আলফ্রেড কোবান, উপাধি, পৃষ্ঠা ৭৬।

২০. জে.ডি. ম্যাবট, রাষ্ট্র ও নাগরিক, পৃষ্ঠা ২৩।

২১. সংবিধান ও সংবিধানবাদ, উইলিয়াম জি. অ্যান্ড্রুজ দ্বারা সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৭।

২২. প্রাগুক্ত.

২৩. গ্রিফিথ কর্তৃক উদ্ধৃত, "ইন্টারপ্রেটারস অফ ম্যান", পৃষ্ঠা ৪৬।

২৪. ডব্লিউ.জি. অ্যান্ড্রুজ, অপ. সাইট., পৃষ্ঠা ১৩।

২৫. এডওয়ার্ড এস. করউইন, আমেরিকান সাংবিধানিক আইনের "উচ্চতর আইন", পৃষ্ঠা ৮।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৭।

২৭. ডব্লিউ.জি., অ্যান্ড্রুজ, অপ. সাইট., পৃষ্ঠা ১৬।

২৮. সি.ই.এম. জোয়াড, অপ. সাইট., পৃষ্ঠা ১২৭।

২৯. রবার্ট ব্রিফোল্ট কর্তৃক উদ্ধৃত, "দ্য মেকিং অফ হিউম্যানিটি", পৃষ্ঠা ৩৩৩।

৩০. এ.এন. হোয়াইটহেড, অ্যাডভেঞ্চারস অফ আইডিয়াস, পৃষ্ঠা ১৮।

৩১. জর্জ এ. ডরসি, সভ্যতা, পৃষ্ঠা ৪৪৬।

৩২. গেরহার্ড সেজেসনি, দ্য ফিউচার অফ আনবিলিফ, এডওয়ার্ড বি. গারসাইড দ্বারা অনুবাদিত। পৃষ্ঠা ৪৪। ১০৫।

# অধ্যায় ১৫: খ:
## রাজনৈতিক ব্যবস্থা: দ্বিতীয়  পর্ব
## কোরআনের ব্যবস্থা

**১. মানবতার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি**

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে, আমরা মানব ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা দিয়েছি। আমরা দেখেছি যে মানুষের অপরিহার্য মূল্য তার সত্তার মধ্যে নিহিত, তার শারীরিক দেহে নয়। সত্তার ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান, জাতি, ধর্ম বা বর্ণের ক্ষেত্রে তারা যতই ভিন্ন হোক না কেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদার পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়। কোরআন এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছে: সত্যিই, আমরা প্রতিটি মানুষকে সম্মানিত করেছি (১৭:৭০)।

মানুষ হিসেবে, সকল মানুষ সমান; প্রত্যেকেই সেই মূল্যবান রত্ন, মানব সত্তার অধিকারী। এটিই ইসলামী সমাজের মূলনীতি। অবশ্যই, এটি অবশ্যই অনুসরণ করে, সেই ব্যক্তিত্ব নিজেই একটি লক্ষ্য। কোনও মানুষের অন্য মানুষকে শোষণ করার বা তার ব্যক্তিগত স্বার্থকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাকে একটি উপায় হিসাবে ব্যবহার করার অধিকার নেই।* যদি এই ভিত্তিতে সমাজ সংগঠিত হত, তাহলে শাসক বা প্রজা থাকত না। এটিই দ্বিতীয় নীতি যার উপর ইসলামে সমাজ প্রতিষ্ঠিত। কোন মানুষকে অন্যদের বাধ্য করার অনুমতি নেই। শুধুমাত্র স্রষ্টাকেই তাঁর দ্বারা প্রকাশিত আইনের মাধ্যমে আনুগত্য করতে হবে।
* দাসত্বের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে, অ্যারিস্টটল যুক্তি দিয়েছিলেন যে কিছু মানুষ জন্মগতভাবে দাস। তাই তাদের সাথে জিনিসপত্র হিসেবে ব্যবহার করা উচিত, অর্থাৎ একজন কারিগর যেমন তার হাতিয়ার ব্যবহার করে, তেমনি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। অন্যদিকে, কোরআন স্পষ্টভাবে এই ধারণাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মানুষকে তার হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সকল ধরণের দাসত্বের উপর মারাত্মক আঘাত করেছে। নারীর উপর অধ্যায়ে এই বিষয়টি আরও যুক্তিযুক্ত।

মানুষের জন্য এটা ঠিক নয় যে স্রষ্টা তাকে আইনের কিতাব, বিচার করার ক্ষমতা এবং (এমনকি) নবুওয়াত দেবেন এবং সে তার সহ-সত্তাদেরকে স্রষ্টার আদেশের পরিবর্তে তার আদেশ মান্য করতে বলবে। বরং তার বলা উচিত: তোমরা কিতাবের অবিরাম শিক্ষা এবং এর অবিরাম অধ্যয়নের মাধ্যমে স্রষ্টার বিশ্বস্ত বান্দা হও (৩: ৭৮)।

কোরআন মানুষকে অন্য পুরুষদের বিচার এবং শাসন করার অধিকার নিজের কাছে রাখতে নিষেধ করে; এবং তবুও এটি একটি আইনহীন অরাজক সমাজের পক্ষে কথা বলে না। এর কাজ হলো এই নীতি প্রতিষ্ঠা

করা যে সকলেই সমান, এবং তাদের উপর শাসন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। (১২:৪০), এবং এতে কারোরই কোন অংশ নেওয়ার অধিকার নেই। (১৮:২৬)। এই নীতিগুলি ইসলামী সমাজের কাঠামো তৈরি করে।

যাইহোক, স্রষ্টা হলেন পরম, অতীন্দ্রিয় বাস্তবতা। আমরা যদি তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে না পারি তবে আমরা কীভাবে তাঁর আনুগত্য করব? উত্তর হল, কোরআনে প্রদত্ত তাঁর আইন পালন করে। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘোষণা করতে বলা হয়েছিল: আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে খুঁজব, যখন তিনিই তোমাদের উপর এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (৬:১১৫)।

ঐশ্বরিক ওহীর সামাজিক অংশ আমাদের সামাজিক বিবর্তনের পথ নির্দেশ করার উদ্দেশ্যে আইন প্রদান করে। ইসলাম কোরআনের চিরন্তন নীতির উপর ভিত্তি করে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছে। যেহেতু এই নীতিগুলির উৎস মানুষের বুদ্ধিতে নয় বরং ঐশ্বরিক জ্ঞানে রয়েছে, তাই মানুষ যখন তাদের আনুগত্য করে, তখন তারা স্রষ্টার আনুগত্য করে, কোনও নশ্বর মানুষ বা মানুষের দলকে নয়। ইসলামী সমাজে আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। এটি স্বাধীন ও সমান ব্যক্তিদের একটি সম্প্রদায়, যারা স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তাঁর আইন মেনে চলে।

এখানে আরেকটি দৃষ্টিকোণ রয়েছে। আমরা দেখেছি যে মানুষের দুটি সত্ত্বা রয়েছে, আসল সত্ত্বা এবং শারীরিক সত্ত্বা বা দেহ। দুটি সত্ত্বার মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং ঘনিষ্ঠ। কিন্তু দেহ অবিরাম পরিবর্তিত হলেও, স্থায়ীত্ব প্রকৃত সত্ত্বার বৈশিষ্ট্য। দেহ পরিবর্তিত হওয়ার সময় প্রকৃত সত্ত্বা অপরিবর্তিত থাকে। যেহেতু ইসলাম সমগ্র ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত, তাই এটি দুটি সত্যের সমন্বয় সাধন করতে চায়। ইকবাল এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন: ইসলামের ধারণা অনুসারে সমস্ত জীবনের চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক ভিত্তি চিরন্তন এবং বৈচিত্র্য এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে। বাস্তবতার এই ধারণার উপর ভিত্তি করে একটি সমাজকে অবশ্যই তার জীবনে স্থায়ীত্ব এবং পরিবর্তনের শ্রেণীগুলির সমন্বয় সাধন করতে হবে। এর সামগ্রিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এটির অবশ্যই চিরন্তন নীতি থাকতে হবে; কারণ চিরন্তন আমাদের চিরন্তন পরিবর্তনের জগতে একটি পা রাখার জায়গা দেয়। কিন্তু চিরন্তন নীতিগুলি, যখন সেগুলিকে বোঝানো হয় যে পরিবর্তনের সমস্ত সম্ভাবনা বাদ দেয়, যা কোরআন অনুসারে, স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি, তার প্রকৃতিতে যা মূলত গতিশীল তা অচল করে দেয়। ১

কোরআনে বর্ণিত আইন, যদিও অপরিবর্তনীয়, তবুও স্থায়ীত্ব এবং পরিবর্তন উভয়ই পূরণ করার জন্য গতিশীল: সত্য ও ন্যায়বিচারে তোমার রবের কালাম পরিপূর্ণ। তাঁর বাণী পরিবর্তন করতে পারে এমন কেউ নেই (৬: ১১৬)।

এই অপরিবর্তনীয় এবং চিরন্তন আইন যা করে তা হল, এটি বৈধতার সীমারেখা নির্ধারণ করে - কোরআনের পরিভাষায় "সীমা" - যা লঙ্ঘন করার অধিকার কারও নেই। তবে, সীমারেখার মধ্যে, আমরা সময়ের প্রয়োজন অনুসারে এমন পরিপূরক আইন প্রণয়ন করতে স্বাধীন। এই পরিপূরক আইনগুলি অবশ্যই পরিবর্তন সাপেক্ষে এবং জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা "পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে" প্রণয়ন ও সংশোধন করা হবে (৪২: ৩৮)। কোরআনের আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে, ইসলাম মুক্ত এবং অবাধ গণতান্ত্রিক কার্যকলাপকে সমর্থন করে। এমনকি কোরআন মানুষকে তার নিজস্ব পরামর্শমূলক যন্ত্রপাতি তৈরি করার জন্যও স্বাধীন রেখেছে। যা জনগণের সুবিধার উপর নির্ভর করে আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।

ইসলামী গণতন্ত্রের আইন প্রণয়নের কার্যকলাপের সীমা নির্ধারণকারী চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় আইনের ক্ষেত্রে, উম্মাহ, সমাজ, উম্মাহ, এর প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি তার ভিত্তি থেকে ভেঙে পড়তে পারে না। ইসলামী আচরণের নির্দেশনার জন্য কোরআনে বর্ণিত আইন থেকে বিচ্যুত হওয়ার অধিকার কেউ দাবি করতে পারে না। কোনও মানুষ বা মানুষের দল ত্রুটিমুক্ত নয়। আমরা এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারি না যে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং স্টিভেনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। তবে, এই ধরনের ভুল সিদ্ধান্তগুলি যদি সমাজের ভিত্তিকে অক্ষত রাখে তবে খুব বেশি ক্ষতি করতে পারে না। তবে, যদি আইনসভাকে সমাজের ভিত্তিকে চার্জ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তবে এর ভুল সিদ্ধান্তগুলি রাজনৈতিক সংস্থার জন্য বিপর্যয়কর পরিণতি বয়ে আনবে। সামাজিক স্থিতিশীলতা কেবল তখনই নিশ্চিত হবে যখন আইনসভা কোরআন দ্বারা নির্ধারিত স্থায়ী মৌলিক নীতিগুলির কাঠামোর মধ্যে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। যদি এই কাঠামো প্রত্যাখ্যান করা হয়, তবে এটি একটি ইসলামী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এই স্থায়ী কাঠামোর মধ্যে, পরিবর্তন কেবল অনুমোদিত নয় বরং পরামর্শযোগ্য। জীবনের অবস্থা সর্বদা পরিবর্তিত হয়, এবং রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র এবং সরকারের যন্ত্রপাতিকেও সময়ে সময়ে সংশোধন এবং হালনাগাদ করতে হবে। এটা স্পষ্ট যে এই ধরনের ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব এবং পরিবর্তনের সমন্বয় ঘটে। ইসলামী সমাজ স্থিতিশীল এবং প্রগতিশীল উভয়ই। এটি চিরন্তন নীতির দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু মানুষ সেই ভিত্তির উপর যা খুশি তা গড়ে তুলতে স্বাধীন। অন্যদের ভালো করা একটি অপরিবর্তনীয় নৈতিক নীতি, তবে আমরা কীভাবে অন্যদের ভালো করতে পারি তা সেই সময়ের বিশেষ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। প্রথমটি মানুষের উপর ছেড়ে দেওয়া যাবে না, তবে দ্বিতীয়টি তাদের দ্বারাই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। আমাদের মনে রাখতে হবে যে অগ্রগতি এমন একটি পরিবর্তন যা ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণতার কাছাকাছি নিয়ে আসে। এটি

এমন একটি পরিবর্তন যা অর্জিত মূল্যবোধ সংরক্ষণ করার সাথে সাথে তাদের আরও যোগ করে এবং তাদেরকে উচ্চ স্তরে উন্নীত করে।

**২. সর্বজনীন মানবতা**

কোরআন মানবজাতির ঐক্যকে নিশ্চিত করে এবং বর্ণ, জাতি, বর্ণ বা ধর্মের ভিত্তিতে মানবজাতিকে উচ্চ ও নিকৃষ্ট গোষ্ঠীতে বিভক্ত করার যে কোনও প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করে। এটি আমাদের বলে যে "মানবজাতি কেবল একটি সম্প্রদায়" (২:২১৩)। তাছাড়া, এই ঐক্যকে দেহ গঠনের সাদৃশ্য থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয় না বরং হৃদয়ে এর উৎস হিসেবে দেখা হয়। কোরআন বলে: "তোমাদের সৃষ্টি এবং তোমাদের পুনরুত্থান কেবল একটি একক সত্তার সৃষ্টি এবং পুনরুত্থান হিসাবে" (৩১:২৮)। ইসলামী সমাজের প্রথম এবং প্রধান কাজ হল এই ঐক্য সংরক্ষণ এবং বৃদ্ধি করা। তবে, অদূরদর্শী মানুষ এমন জীবনযাপনের পদ্ধতি গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হয় যা এটিকে দুর্বল করে তোলে: সীমালঙ্ঘনকারীরা স্রষ্টার চুক্তি প্রতিষ্ঠার পরে তা ভঙ্গ করে এবং স্রষ্টা যা সংযুক্ত করার আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে, (২:২৭)।

কোরআন জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গিতে অত্যন্ত ব্যবহারিক। এটি কেবল এমন একটি আদর্শকে ধরে রাখে না যা আমাদের প্রশংসা করতে এবং দেখার জন্য বলা হয়। এটি বাস্তব জীবনে আদর্শ কীভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে তা দেখায়। মানবজাতির ঐক্য যা বাস্তব কিন্তু অদৃশ্য তা মানুষের প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে হবে। মানবজাতির ঐক্যের প্রথম পদক্ষেপ ইব্রাহিম (আ.) দ্বারা নেওয়া হয়েছিল। তাঁর (সা.) পূর্বে প্রতিটি গোত্র তাদের নিজস্ব উপাস্য দেবতার উপাসনা করত এবং তাদের টোটেম দ্বারা প্রতীকী উপাস্য ঐক্যে বিশ্বাস করত। ইব্রাহিম (আঃ) প্রথমে ঘরটি নির্মাণ করেছিলেন যা সকলের স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল এবং মানবজাতির ঐক্যের প্রতীক ছিল। এটি ছিল মানুষের জন্য প্রথম সাধারণ মঞ্চ: দেখো! মানবজাতির জন্য নির্মিত প্রথম ঘরটি ছিল মক্কায় (৩:৯৫)। এই ঘর, কাবা, সকল মানুষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার দৃশ্যমান প্রতীক ছিল: এবং যে কেউ এতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ (৩:৯৬)।

কাবাকে কোনও পবিত্রতা দেওয়া হয়নি। এটি যা প্রতীকী তা থেকেই এর গুরুত্ব অর্জন করে। পতাকা জাতীয় ঐক্যের প্রতীক; রাজদণ্ড রাজকীয় ক্ষমতার প্রতীক। 'কাবা হল সমস্ত মানবজাতির প্রকৃত ঐক্যের প্রতীক। কোরআনে প্রতীকগুলিকে শা'ইর-উল্লাহ বলা হয়েছে। কাবা মানবজাতির ঐক্যের পাশাপাশি সর্বজনীন রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতীক যা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে: "আমরা মক্কার ঘরকে মানবজাতির জন্য আশ্রয়স্থল এবং নিরাপত্তার স্থান করে দিয়েছি" (২: ১২৫)। অন্য কথায়, এটি পৃথিবীর পৃষ্ঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমস্ত মানুষের জন্য কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবে।

কাবাকে কোরআনের রূপরেখা অনুসারে সর্বজনীন সামাজিক ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাটি শারের অনুপস্থিতি এবং খায়েরের জীবন্ত উপস্থিতি উভয় দ্বারা চিহ্নিত। প্রথম দিকটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে যখন কোরআন দাবি করে যে যারা এই ব্যবস্থায় যোগদান করবে তারা সর্বদা ভয় থেকে মুক্ত থাকবে এবং নিরাপত্তা উপভোগ করবে। দ্বিতীয় দিকটির উপর এই আয়াতে জোর দেওয়া হয়েছে: স্রষ্টা কাবাকে মানবজাতির জন্য একটি পাদদেশ বানিয়েছেন (৫: ৯৭)।

এর অর্থ হল এই সামাজিক ব্যবস্থার মাধ্যমে, মানবজাতি স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে এবং উচ্চ স্তরে উঠতে শিখবে। এটি মানুষের অব্যাহত বিকাশের সূচনা বিন্দু হিসেবে কাজ করবে। এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআনে হজ্জের সূরায় মক্কাকে একটি উন্মুক্ত শহর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এখানে প্রবেশাধিকার এবং নাগরিকত্ব কোনও মানুষকেই অস্বীকার করা যাবে না। কোরআন বলে: আমরা মক্কাকে মানবজাতির জন্য, সেখানে বসবাসকারী এবং বহিরাগত সকলের জন্য নিরাপত্তার স্থান হিসেবে নিযুক্ত করেছি (২২:২৫)। ইব্রাহিম (আঃ)-কে "মানবজাতির কাছে হজ্জের ঘোষণা" করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল (২২:২৭), যাতে মানবজাতির ঐক্যে বিশ্বাসী সকলেই একত্রিত হন এবং সেই ঐক্যকে একটি দৃশ্যমান সত্যে পরিণত করেন। হজ্জের অর্থ এটাই। এটি তাদের সাধারণ স্বার্থের উপর মনোনিবেশ করতে সক্ষম করবে এবং চুক্তির ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করবে, "যাতে তারা তাদের জন্য উপকারী জিনিসগুলি প্রত্যক্ষ করতে পারে" (২২:২৮)। সকলের আবাসস্থল মক্কায় সকলকে স্বাগত: এবং এই গৃহে যাওয়া আল্লাহর প্রতি মানবজাতির জন্য, যারা এখানে পথ খুঁজে পেতে পারে তাদের জন্য একটি কর্তব্য (৩:৯৬)। "তাই, প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহর ঘর যিয়ারত করা, যদি তার সামর্থ্য এবং ইচ্ছা থাকে। এর দ্বারা কেবল তিনিই উপকৃত হবেন, আল্লাহ নন, কারণ আল্লাহ সকল সৃষ্টি থেকে স্বাধীন" (৩: ৯৬)।

আল্লাহর ঘরের দাওয়াত সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই সর্বজনীন সমাবেশে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষ তাদের সাধারণ স্বার্থ, লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্পর্কে সচেতন হয়। এটি কোন "ধর্মীয় সমাবেশ" নয়। যারা সেখানে যান তাদের কাছ থেকে আশা করা হয় যে তারা মানবজাতির মুখোমুখি সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন এবং এমনভাবে সমাধান খুঁজবেন যাতে মানুষের জন্য অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত হয়। মানুষের স্বার্থ এবং মানুষের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ এই সমাবেশে অংশগ্রহণকারী সকলের উপর কর্তব্য হল সমস্ত সংকীর্ণ স্বার্থ ত্যাগ করে কেবল মানবতার কল্যাণের কথা চিন্তা করা। হজের উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হতে পারে যখন স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি থাকে। অন্যায়, নিষ্ঠুরতা এবং সংকীর্ণ স্বার্থ যেকোনো ক্ষেত্রেই ঘৃণ্য কাজ, তবে মানবজাতির প্রকৃত ঐক্যের প্রতীক এবং এর সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কেন্দ্র মক্কায় যারা যান তাদের জন্য এগুলি বিশেষভাবে ঘৃণ্য হওয়া উচিত। স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাসী সকল মানুষেরই মক্কায় প্রবেশের এবং মানবজাতির ঐক্যের লক্ষ্যে এবং

মানবজাতির জন্য ঐশ্বরিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের অবদান রাখার অধিকার রয়েছে। মুশরিকদের মক্কায় প্রবেশ করা যাবে না কারণ তারা আইনের একত্ব এবং পরোক্ষভাবে মানবজাতির একত্বকে অস্বীকার করে। তাই হজ্জে আকবরের দিনে ঘোষণা করা হয়, মুশরিকদের কাবা ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয় (৯:৩; ২৮)। কোরআন অনুসারে, মুশরিকরা কেবল মূর্তি পূজাকারী নয় বরং অমানবিক লক্ষ্য অর্জনকারীও। যারা এই ধরণের উদ্দেশ্য লালন করে তারা স্রষ্টার প্রতি অনুগত হতে পারে না।

### ৩. আন্তর্জাতিক মানবতা

ইসলামী সমাজ সকল মানুষের সমতার উপর ভিত্তি করে। ইসলাম মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এমন বিষয়গুলির উপর জোর দেয়। যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, এটি বর্ণ, জাতি, ধর্ম, ভাষা বা অঞ্চলের ভিত্তিতে মানবজাতির সমস্ত বিভাজনকে অস্বীকার করে। এই ধরণের বিভাজন ঐক্যের মূলকে কেটে ফেলে। এই কারণেই কোরআন বিশ্বাসীদের "মানবজাতির কল্যাণের জন্য গড়ে ওঠা সর্বোত্তম সম্প্রদায়" হিসেবে সম্বোধন করে (৩:১০৯)। কোরআনের দ্বিতীয় সূরায় কাবাকে ইসলামের সামাজিক জীবনের কেন্দ্র এবং এর আদর্শের প্রতীক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। একই সূরায় মানবজাতির প্রতি আমাদের কর্তব্যের কথা এই শব্দে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে: এবং এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি আন্তর্জাতিক জাতিতে পরিণত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির কর্মকাণ্ডের উপর নজর রাখো (২:১৪৩)।

মুসলিম সম্প্রদায়, উম্মাহ, এইভাবে মানবজাতিকে তার লক্ষ্যে পরিচালিত করার দায়িত্বে নিযুক্ত। কোরআনে বর্ণিত পরম মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি সার্বজনীন সমাজ গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবেই মানবজাতির একটি পরিবার হিসেবে স্থিতিশীল নৈতিক ও বস্তুগত অগ্রগতি নিশ্চিত করা হয়েছে। হজের প্রতিষ্ঠান বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে মানুষকে এক জায়গায়, মক্কায় একত্রিত করে। এই সত্যিকারের আন্তর্জাতিক সমাবেশ কোরআনে বর্ণিত নীতিমালা অনুসারে মানবজাতির ঐক্যের জন্য একটি উপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য একটি চমৎকার সুযোগ প্রদান করে। মানবতার কল্যাণ যাদের অন্তরে আছে তারা সকলেই এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে হাত মেলাতে পারে যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির তার সম্ভাবনা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ থাকবে। কাবা ঘরের নির্মাতা ইব্রাহিম (আঃ) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মানবজাতিকে এই কাজে আহ্বান করেছিলেন। কোরআন তাঁর সম্পর্কে যথাযথভাবে বলেছে যে তিনি "মানবজাতির নেতা হিসেবে নিযুক্ত" (২: ১২৪)।

### ৪. স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং সৌন্দর্য

কোরআনের শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা এই সত্য থেকে উদ্ভূত হয় যে একটি সার্বজনীন জীবনধারার অনুপস্থিতিতে, মানবজাতিকে পারস্পরিক শত্রুতাপূর্ণ দলে বিভক্ত থাকতে হবে। এই পরিস্থিতিতে, স্থায়ী

শান্তি, ব্যক্তির জন্য স্থায়ী নিরাপত্তা এবং পৃথিবীতে কোনও সমৃদ্ধি ও সুখ থাকতে পারে না। এই কারণে, কোরআন ক্রমাগত মানবজাতির ঐক্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে, যদিও সংঘাত তাৎক্ষণিকভাবে দূর করা সম্ভব নয়: যদি আল্লাহ কিছু মানুষকে অন্যদের, মঠ, গির্জা, বক্তৃতা এবং মসজিদের মাধ্যমে বিতাড়িত না করতেন, যেখানে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়। প্রায়শই উল্লেখ করা হলেও, নিশ্চিতভাবেই ভেঙে ফেলা হত। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তাকেই সাহায্য করেন যে তাকে সাহায্য করে (২২:৪০)।

এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠনের জরুরি প্রয়োজন যা সমগ্র মানবতাকে আলিঙ্গন করবে তা অস্বীকার করা যায় না। বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা কেবল মানবজাতিকে যুদ্ধরত শিবিরে বিভক্ত করে। প্রতিটি গোষ্ঠী এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছে যা তার নিজস্ব স্বার্থ পূরণ করে এবং তার নিজস্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে। প্রতিটি রাজনৈতিক মতাদর্শ কেবল তার লেখকদের জন্য উপযুক্ত কিন্তু অন্যদের সেবা করতে ব্যর্থ হয়। এই মতাদর্শগুলিতে একটি একক গোষ্ঠীর, জাতিগত, সাংস্কৃতিক বা পেশাগত শ্রেষ্ঠত্ব হয় অন্তর্নিহিত বা স্পষ্টভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। নাৎসিবাদ এবং ফ্যাসিবাদ দুর্বল জাতির শোষণের জন্য শক্তিশালী জাতির অধিকার রক্ষা করে। কমিউনিজম তাত্ত্বিকভাবে দাবি করে যে শ্রমিকদের শ্রেষ্ঠত্ব কিন্তু কার্যত দলের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পণ করে। গণতন্ত্র একটি রাষ্ট্রের জনগণের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের জনগণের ব্যয়ে তাদের সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে। একমাত্র কোরআনই এমন একটি আদর্শ প্রদান করে যা সকল মানুষের কাছে আবেদন করতে পারে। মানবিক সমতা এবং মানবিক মূল্য এর ভিত্তি। এর লক্ষ্য হলো সমগ্র মানবজাতির উন্নয়ন ও ঐক্য। এটি মানবজাতিকে দলে দলে বিভক্ত করার সকল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই করে। এটি মানুষের মধ্যে শারীরিক পার্থক্যকে অকার্যকর বলে উড়িয়ে দেয় এবং তাদের মধ্যে যা মৌলিক এবং তাই সকল মানুষের জন্য সাধারণ তা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে। এই কারণেই কোরআনে আল্লাহকে সকল মানবজাতির রব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (১:১), রাসূলকে "সকল মানুষের জন্য রহমতের উৎস" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (২১:১০৭), এবং এর বার্তাকে "সমগ্র বিশ্বের জন্য স্মারক" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (৬:৯১)।

**৫. আদল ও ইহসান**

আমরা এখন 'আদল ও ইহসান'-এর নীতিগুলি বিবেচনা করতে পারি যা ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি করে। মুসলমানদেরকে 'আদল ও ইহসান'-এর পথ থেকে কখনও বিচ্যুত হতে আদেশ করা হয়েছে - কোরআন বলে: "নিশ্চয়ই আল্লাহ 'আদল ও ইহসান'-এর নির্দেশ দেন।" (১৬:৯১)। 'আদল' বলতে প্রত্যেক মানুষকে তার প্রাপ্য প্রদান করা বোঝায়, আর 'ইহসান' বলতে অন্যদের অভাব পূরণে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখা বোঝায় যাতে তারা বাধাহীনভাবে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ করতে পারে। 'আদল' শব্দটি কঠোরভাবে আইনি অর্থে ব্যবহার করা হয় না - ন্যায়বিচার। এটি সম্ভাব্য বিস্তৃত অর্থে নেওয়া হয়েছে এবং

মানুষকে কেবল তার আইনি অধিকারই নয় বরং সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ নিশ্চিত করে। মানুষের নির্দেশনার জন্য কোরআন দুটি নীতি নির্ধারণ করেছে।

প্রথমত, কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না (৫৩:৩৮), এবং দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকেই তার প্রচেষ্টা অনুসারে পাওয়ার অধিকারী হবে (৫৩:৩৯)। এর অর্থ হল, ইসলামী ব্যবস্থায়, মানুষ তার নিজের কাজের জন্য শাস্তি বা পুরস্কৃত হয় এবং তার স্বেচ্ছাকৃত কাজের জন্য দায়ী। কাউকে তার শ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, এবং অন্য কেউ যা অর্জন করেছে তা নিজের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। যদি এই নীতিগুলিতে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা হয় এবং বিবেকবানভাবে কাজ করা হয়, তাহলে সকল শোষণ ও অবিচারের অবসান হবে।

আবার, কোরআন আমাদেরকে আমাদের শত্রুদের সাথেও কঠোরভাবে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার নির্দেশ দেয়। এই ক্ষেত্রে আমাদের বন্ধু এবং শত্রুর মধ্যে পার্থক্য করার কোন অধিকার নেই। কোরআন এই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলে: হে ঈমানদারগণ! ন্যায়ের সাথে আল্লাহর জন্য অবিচল সাক্ষী থাকো, এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার না করার জন্য প্ররোচিত না করে। ন্যায়বিচার করো; এটাই তোমাদের কর্তব্যের কাছাকাছি। আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন করো (৫:৮)।

আমাদের সর্বদা ন্যায়বিচার করা উচিত, এমনকি যখন ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের নিজস্ব স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হয়: হে ঈমানদারগণ! ন্যায়বিচারে দৃঢ় থাকো; আল্লাহর জন্য সাক্ষী থাকো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের, তোমাদের পিতামাতার, অথবা তোমাদের আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধেই হোক না কেন, ধনী ব্যক্তি হোক বা দরিদ্র, কারণ আল্লাহ উভয়েরই (তোমাদের চেয়ে) নিকটবর্তী। অতএব, আবেগের অনুসরণ করো না, যাতে তোমরা সত্য থেকে বিচ্যুত না হও, অথবা সত্যকে বিকৃত না করো অথবা বিপথগামী না হও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত (৪:১৩৫)।

ন্যায়ের প্রতি ভক্তি আমাদের নিজেদের ন্যায়বিচার করার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। আমাদের এটাও লক্ষ্য রাখা উচিত যে ন্যায়বিচার সর্বত্র বিরাজমান। মুসলমানদের কর্তব্য হল অন্যায় যেখানেই হোক এবং যেভাবেই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে লড়াই করা। এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে: আমরা কীভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করব? উত্তর হল, যতদূর সম্ভব, আমাদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে, যেমন প্ররোচনা এবং যুক্তিসঙ্গত যুক্তি দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। যখন এই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখনই বল প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত। এই মুহূর্তে আমরা যুদ্ধ এবং এর কারণগুলির প্রশ্নের মুখোমুখি হই।

**৫. যুদ্ধ এবং আদর্শগত পার্থক্য**

যুদ্ধ কি বিলুপ্ত করা যেতে পারে, এবং যদি হয় কীভাবে? যুদ্ধ কি কখনও ন্যায়সঙ্গত এবং যদি হয় কখন? এই প্রশ্নগুলির প্রতি কোরআনের মনোভাব অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। যুদ্ধকে মন্দ হিসাবে নিন্দা করার সময়, কোরআন স্বীকার করে যে এটি প্রয়োজনীয় হতে পারে যতক্ষণ না "সে তার অস্ত্র সমর্পণ করে" (৪৭:৪)। যদি কোনও দেশের শান্তিপ্রিয় জনগণ আক্রমণাত্মক নির্মম শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে তাদের জন্য একমাত্র সম্মানজনক পদক্ষেপ হল আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা। শত্রুর শারীরিক শক্তিকে একটি সমন্বিত শক্তি দ্বারা পরাস্ত করতে হবে। শারীরিক ও নৈতিক শক্তির সমন্বয়। যখন সফল প্রতিরোধ শত্রুকে যুক্তিসঙ্গত মানসিকতার অধিকারী করে তুলবে, তখন বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ উন্মুক্ত হবে। ইসলাম আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে, সকল ধর্মের উপাসনালয় রক্ষার জন্য, অন্যায়, নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার নির্মূল করার জন্য এবং পরিশেষে, আরও ভয়ঙ্কর এবং বৃহত্তর পরিসরে যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেয়।*

যুদ্ধ বিলোপের প্রশ্নে ইসলামের মনোভাব সতর্ক এবং বাস্তবসম্মত। যুদ্ধ বিলোপ আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে এটি কেবল ধীরে ধীরে অর্জন করা যেতে পারে। কোরআন এমন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেয় যা বাস্তবায়ন করা হলে পৃথিবী থেকে যুদ্ধ নির্মূল হবে। প্রথমত, মানুষকে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে রাজি করা উচিত যে যুক্তিসঙ্গত প্রাণী হিসেবে, তাদের সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা এবং তাদের সমস্ত পার্থক্য শান্তিপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গতভাবে সমাধান করা তাদের জন্য উপযুক্ত। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের কারণগুলি দূর করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। যুদ্ধের প্রধান কারণ হল আদর্শিক পার্থক্য। যুদ্ধ প্রায়শই শুরু হয় কারণ একটি শক্তিশালী জাতি অন্য জাতির উপর তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস বা রাজনৈতিক মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

কোরআন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেকোনো ধরণের জোরজবরদস্তি নিষিদ্ধ করেছে। মানুষের নিজস্ব জীবনযাত্রা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকা উচিত; তার উপর জোরজবরদস্তি করা উচিত নয়। কোরআন জোর দিয়ে বলে: "দ্বীনের ক্ষেত্রে কোন জোরজবরদস্তি নেই" (২: ২৫৬)। দ্বীনের ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন। স্বাধীনতা এবং জোরজবরদস্তি একসাথে চলে না এবং চলতে পারে না। অন্যের উপর ইসলাম চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার কারও নেই। একজন মুসলিমকে সমানভাবে ইসলামের আওতাধীন থাকতে বাধ্য করা যাবে না। এটি ব্যক্তির নিজের ইচ্ছামত প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণ করার অধিকার: বলুন: (এটি) তোমাদের সকলের রবের পক্ষ থেকে সত্য। তারপর, যে তাকে বিশ্বাস করতে দেবে এবং যে ইচ্ছা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে (১৮: ২৯)।

কেবল শারীরিক জোরজবরদস্তিই নিষিদ্ধ নয়, বরং ইসলামের অনুসারীদের আকর্ষণ করার সমস্ত অযৌক্তিক পদ্ধতি নিষিদ্ধ। পরামর্শ, মিথ্যা প্রচারণা বা আর্থিক লাভের প্রতিশ্রুতি বা রাজনৈতিক ক্ষমতার

মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে প্ররোচিত করা ভুল; যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করে তার উচিত স্বাধীনভাবে, যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং নিজের ইচ্ছায় তা করা। অতএব, কোরআন বারবার সেই সময়ের মানুষকে আশ্বস্ত করেছে যে, রাসূল (সা.) অলৌকিকতার উপর নির্ভর করেননি, বরং কেবল তাঁর বার্তার অন্তর্নিহিত মূল্যের উপর নির্ভর করেছিলেন। তিনি মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ নিতে অবিচল ছিলেন:

* যুদ্ধের প্রশ্নটি পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আর যদি আপনার রব ইচ্ছা করতেন, তাহলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই একসাথে ঈমান আনত। কী? তাহলে কি আপনি (হে মুহাম্মদ) বাধ্য করবেন যাতে তারা ঈমান আনে? (১০:৯৯)।

কোরআন সমগ্র মানবজাতিকে একটি পরিবার হিসেবে বিবেচনা করে (২:২১৩), এবং তাই মানবজাতিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করার বিরোধী। এটি কেবলমাত্র আদর্শের ভিত্তিতে বিভক্তিকে স্বীকৃতি দেয়। প্রথম দলটি তাদের দ্বারা গঠিত যারা কোরআনে বর্ণিত পরম মূল্যবোধে বিশ্বাস করে। অন্য দলটি তাদের দ্বারা গঠিত যারা পরম মূল্যবোধকে অস্বীকার করে এবং প্রত্যাখ্যান করে। এটিই বিভাজনের একমাত্র ভিত্তি। বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীরা স্বাভাবিকভাবেই পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিশ্বাসীরা স্রষ্টা ঐক্যবদ্ধ এবং স্থায়ী মূল্যবোধের সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ। অবিশ্বাসীদের স্রষ্টা এবং পরম মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাসের অভাব রয়েছে, এবং ফলস্বরূপ তাদের নিজস্ব উচ্চ ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে।

যারা ইসলামের আদর্শ মেনে চলে না তাদের কোরআন "অস্পৃশ্য" বলে গণ্য করে না। তাদের অধিকারকে পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। মুসলিমদের অমুসলিমদের অধিকার রক্ষা করার জন্য একই উদ্যোগের সাথে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন তারা মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় দেখায়। এটি লক্ষণীয় যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা অমুসলিমদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপায় সরবরাহ করতে চায়। এটি অমুসলিমদের কল্যাণ ও কল্যাণের সাথে যতটা জড়িত, ততটাই মুসলিমদের কল্যাণ ও কল্যাণের সাথেও জড়িত। তারা (মুসলিমরা) বলে: আমরা তোমাদের আল্লাহর জন্য (অর্থাৎ, একটি কর্তব্য হিসেবে যা আল্লাহ আমাদের উপর অর্পণ করেছেন) খাওয়াই। আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না (৭৬: ৯)।

প্রায়শই অভিযোগ করা হয় যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্র তার এলাকার মধ্যে বসবাসকারী মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করে, যার নাম জিজিয়া। এটি সম্পূর্ণ ভুল এবং সঠিক অবস্থান সম্পর্কে গুরুতর ভুল বোঝাবুঝির উপর ভিত্তি করে। মুহাম্মদ (সা.) যখন প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, তখন কিছু ছোট অমুসলিম রাষ্ট্র তাদের বিদ্রোহী মনোভাবের কারণে পরাধীন ছিল, কিন্তু তাদের অঞ্চল দখল

করার পরিবর্তে, তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছিল এবং বহিরাগত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সুরক্ষার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্যের প্রতীক হিসেবে এবং তাদের প্রদত্ত সামরিক সুরক্ষার বিনিময়ে, তারা জিজিয়া নামে একটি নামমাত্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল। এই শব্দটি কোরআনে মাত্র একবার এসেছে (৯:২৯) এবং লেনের অভিধান অনুসারে, প্রদত্ত সুরক্ষার ক্ষতিপূরণ বোঝায়।" ইতিহাসে এমন কিছু ঘটনা রেকর্ড করা আছে যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদের সুরক্ষা দিতে অক্ষম থাকাকালীন জিজিয়ার পরিমাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। স্থূল রাষ্ট্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। ইসলাম মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে। এর লক্ষ্য ছিল স্থায়ী মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে একটি শ্রেণীহীন ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা। কোরআন বলে: বির ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য করো, ইহম ও উজ্‌দানে একে অপরকে সাহায্য করো না (৫:২)।

অতএব, ইসলামী রাষ্ট্র মানবজাতির কল্যাণে অবদান রাখার সম্ভাবনা রয়েছে এমন সকল উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জোরালো সমর্থন করে।

### ৭. সাম্প্রদায়িকতা

মানবজাতির ঐক্যের প্রতি তার মনোযোগের কারণে, কোরআন স্বাভাবিকভাবেই দ্বীনে সাম্প্রদায়িকতা এবং রাজনীতিতে উপদলবাদের বিরোধী। উপদল ও উপদল উম্মাহর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিভেদের জন্ম দেয়। কোরআন অনুসারে, সাম্প্রদায়িকতা হল শির্কের একটি রূপ: এবং মুশকিরিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, অর্থাৎ, যারা তাদের দ্বীনকে বিভক্ত করে এবং বিভেদ সৃষ্টি করে, প্রতিটি সম্প্রদায় তাদের যা আছে তাতেই আনন্দিত হয়। (৩০:৩১-৩২)। নবীজীকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যারা মুসলিমদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে, তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখো না: যারা নিজেদের ধর্মকে বিভক্ত করে এবং বিভেদ সৃষ্টি করে, তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই (৬:১৬০)। আমাদের আরও সতর্ক করা হয়েছে: এবং স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বিবাদে লিপ্ত হয় তাদের মতো হও না। তাদের জন্য ভয়াবহ আযাব (৩:১০৪; ১১:১১৮)।

রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য খুব একটা যুক্তিসঙ্গততা নেই। রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতিটি দলের প্রকাশ্য দাবি আসলে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং তা নিজের স্বার্থে ব্যবহারের একটি অজুহাত। ঐশী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আদর্শে নিবেদিতপ্রাণ এবং মানুষের বিভিন্ন দলকে একটি একক প্রগতিশীল সমাজে ঝালাই করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ উম্মাহতে এই ধরনের রাজনৈতিক দলের কোন স্থান নেই যা প্রতিটি ব্যক্তিকে তার সমস্ত সম্ভাবনা এবং সুপ্ত শক্তি বিকাশের মাধ্যমে সৃজনশীল জীবনযাপন করার সুযোগ দেবে। এটাই মানুষের যোগ্য জীবন। যেমন কোরআন বলে এটাই জীবনের সঠিক পথ (৩০:৩০)।

পশ্চিমা জাতীয়তাবাদ যুদ্ধ ও সংঘাতের একটি উর্বর উৎস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এর অধীনে এবং এর শাখা, ঔপনিবেশিকতাবাদ, এশিয়া ও আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ মানুষ পরাধীনতার অপমান এবং শোষণের দুর্দশা ভোগ করেছে। জাতীয়তাবাদ মানবজাতির ঐক্যের পথে প্রধান বাধা। জাতীয়তাবাদের ভাইরাস কীভাবে দমন করা হবে? আসুন দেখি মারে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কী ভাবেন: জাতীয়তাবাদের ধর্মটি শয়তানী। এটি জার্মান, রাশিয়ান, জাপানি, আমেরিকান বা ইংরেজদের মধ্যে থাকুক না কেন, এটি আত্মমর্যাদার সর্বোচ্চ উত্থান হিসাবে দেখা যায় - এই বিশ্বের রাজপুত্র শয়তানের ধর্ম। আজ এর কাছে সমস্ত বৃহৎ ধর্মই পরাধীন। খ্রিস্টধর্ম তার সকল রূপে ... জাতীয়তাবাদকে অস্বীকারকারী ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রচারিত জাতীয়তাবাদের শয়তানী ধর্মে নিমজ্জিত। অতএব, বৃহৎ পরিসরে ধর্ম আমাদের দুর্দশা থেকে মুক্তি দিতে পারে না। সত্য এবং সর্বজনীন ধর্ম হিসাবে, জাতীয়তাবাদের দাবিকে অগ্রাহ্য করে এমন একটি আনুগত্যের আদেশ দেয়, এর অস্তিত্ব নেই। জাতীয়তাবাদের সাথে এর নীরব ও অপবিত্র মিশ্রণে, এটি আমাদের দুর্দশার প্রধান কারণকে পবিত্র করে তোলে। ধর্ম যদি আমাদের মুক্তির জন্য অপরিহার্য হয় তবে এটি অবশ্যই, প্রথমত, এমন একটি ধর্ম হতে হবে যা ব্যক্তিকে এমন একটি আনুগত্যের উপর জোর দেয় যা জাতীয়তাবাদের দাবিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে; এবং দ্বিতীয়ত, এটি এমন একটি ধর্ম হতে হবে যা ব্যক্তি হিসাবে কাজ করার জন্য মানুষের ক্ষমতাকে প্রসারিত এবং শক্তিশালী করে।

মিঃ মারে যে ধরণের "ধর্ম" কামনা করেন তা বিদ্যমান। কেবল ইসলামকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা উচিত। খ্রিস্টধর্মের প্রতি মোহভঙ্গকারী পশ্চিমা চিন্তাবিদরা জাতীয়তাবাদের বিষের কার্যকর প্রতিষেধক হিসাবে আন্তর্জাতিকতার দিকে ঝুঁকছেন। অল্প সময়ের জন্য, এটি বিশ্বাস করা হয়েছিল যে লীগ অফ নেশনস বিশ্বের জাতিগুলির মধ্যে শান্তি ও বন্ধুত্বের যুগের সূচনা করবে। এটিকে বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হয়েছিল। লীগ ব্যর্থ হয়েছিল এবং বিশ্ব আবারও আরেকটি যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে, পশ্চিমা রাষ্ট্রনায়করা আরেকটি যুদ্ধ এড়াতে মরিয়া প্রচেষ্টায়, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেখানে লীগ ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে কি জাতিসংঘ কি সফল হবে? এমেরি রেভস এ ব্যাপারে বেশ হতাশাবাদী: আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদের খেলনা নিয়ে যথেষ্ট সময় ধরে খেলেছি। আমরা যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি তা জাতীয়তাবাদের মধ্যে সমস্যা নয়। এটি মানব সমাজের একটি সংকটের সমস্যা, যা জাতীয়তাবাদের কারণে সৃষ্ট, এবং ফলস্বরূপ জাতীয়তাবাদ বা আন্তর্জাতিকতাবাদ কখনই সমাধান করতে পারে না। ৩

যা প্রয়োজন তা হল সর্বজনীনতা। জাতি-রাষ্ট্র কাঠামোকে অতিক্রম করে এমন মূল্যবোধের ব্যবস্থা তৈরির জন্য একটি ধর্মবিশ্বাস এবং আন্দোলন। রেভস আরও বলেন: স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, বিংশ শতাব্দীর সংকটের অর্থ হল এই গ্রহকে কিছুটা হলেও ঐক্যবদ্ধ নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনতে হবে। আমাদের কাজ,

আমাদের কর্তব্য হল গণতান্ত্রিক উপায়ে এই ঐক্যবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা, প্রথমে এর নীতিগুলি ঘোষণা করে এবং প্ররোচনা দিয়ে এবং সম্ভাব্য সর্বনিম্ন রক্তপাতের মাধ্যমে এটি অর্জন করা। যদি আমরা এটি অর্জন করতে ব্যর্থ হই, তাহলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে ইতিহাসের উন্মাদনা আমাদেরকে আরও বেশি শক্তিশালী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আরও বেশি শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার করে আরও বেশি যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে, যতক্ষণ না বিজয়ের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা হয়।৪

বিশ্বের মুখোমুখি সমস্যার একমাত্র সমাধান হিসেবে রেভেস কর্তৃক প্রস্তাবিত রাজনৈতিক সংগঠনটি উপরে বর্ণিত ইসলামী সামাজিক ব্যবস্থার সাথে ভিন্ন নয়। আমরা আরেকজন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এফ. হার্টজের উদ্ধৃতি উদ্ধৃত করছি, যার মতামত অত্যন্ত আগ্রহের বিষয় বলে মনে করা হবে: এখন এটি সর্বজনস্বীকৃত যে সঠিক চেতনার অভাব থাকলে আন্তর্জাতিক সংগঠনের একটি সাধারণ যন্ত্র কাজ করতে পারে না। কিন্তু এই চেতনা কীভাবে তৈরি বা শক্তিশালী করা যেতে পারে। সাধারণ নীতি ঘোষণা স্পষ্টতই যথেষ্ট নয়। বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক না থাকলে জাতিগুলিকে সেই চেতনার প্রতি শিক্ষিত করা উচিত, তা নির্ধারণ করাও যথেষ্ট নয়। এই ধরনের প্রশ্নগুলিকে অবাস্তব এবং অযৌক্তিকভাবে বিবেচনা করার অভ্যাস ব্যর্থতা, মোহ এবং নিন্দার দিকে পরিচালিত করবে।

বিশ্ব নাগরিকত্বের প্রতি শিক্ষা, তদুপরি, কেবল স্কুলগুলির জন্য একটি বিষয় নয়। এটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সকল বৃহৎ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত এবং শুধুমাত্র তখনই এর সমাধান সম্ভব যদি বিশ্বের রাজনৈতিক জাতিগুলি একই নীতির উপর ভিত্তি করে বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে।৫

অধ্যাপক কোবান একই মতামত ব্যক্ত করেছেন, যে সমাধানের জন্য আমরা স্পষ্টতই বাধ্য হচ্ছি তা হল একটি বিশ্ব রাষ্ট্র তৈরি করা।৬

লাস্কি "একটি সর্বজনীন সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করেছিলেন যা পৃথিবীর চার দিক থেকে আগত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।" ৭

ডব্লিউ.এ. গোল্ড একই লাইনে চিন্তা করছেন যেমন নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি দেখায়: আমাদের প্রাথমিক উদ্বেগ 'বাড়ি এবং দেশ' হওয়া উচিত তা স্বাভাবিক এবং যথাযথ কিন্তু আমরা বিশ্ব সমাজে সদস্যপদ লাভের প্রভাব এড়াতে পারি না।৮

আবার: এখন পর্যন্ত সমস্ত মানবজাতিকে আলিঙ্গন করে আন্তর্জাতিক ঐক্যের একটি সাধারণ অনুভূতির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এটি আশা করা এখনও খুব তাড়াতাড়ি; কিন্তু বিভিন্ন দেশের ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট

গোষ্ঠীর মধ্যে এটি খুবই বাস্তবিক মাত্রায় বিদ্যমান, এটাই গ্যারান্টি যে যথাসময়ে বিশ্ব সহযোগিতার সক্রিয় অভিজ্ঞতা আরও ব্যাপকভাবে ভাগ করে নেওয়া সম্ভব।৯

আধুনিক চিন্তাবিদরা পরিস্থিতি যত গভীরভাবে অনুসন্ধান করবেন, ততই তারা এই সত্যে বিশ্বাসী হবেন যে মানবজাতির চূড়ান্ত মুক্তি সমগ্র মানবতাকে একটি একক সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করার মধ্যেই নিহিত। ওয়ারেন ওয়াগার সম্প্রতি একটি তথ্যবহুল বই প্রকাশ করেছেন, যার শিরোনাম, "দ্য সিটি অফ ম্যান", তিনি যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছেন তার ইঙ্গিত দেয়। তিনি সমসাময়িক ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী, ধর্মতত্ত্ববিদ, চিন্তাবিদ, রাষ্ট্রনায়ক ইত্যাদির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের, যারা অনেক আগেই বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তার বইয়ের বিশ্ব সরকার অধ্যায়টি এই মন্তব্য দিয়ে শুরু হয়: যদি এটি মানবজাতির সামনে "চূড়ান্ত প্রশ্ন" হয়, তাহলে বিশ্ব সরকার হল বিশ্ব সমস্যা সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বইগুলিতে নবজাতক বিশ্ব সভ্যতার সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অন্বেষণ করা দিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং পরে বেশ কয়েক বছর ধরে বিশ্ব সংবিধানের ভবিষ্যদ্বাণী করা বা প্রস্তাব করা ছিল বিশেষ করে ইংরেজি-ভাষী বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রধান জাতীয় বিনোদন। ১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে বিশ্ব সরকার আন্দোলন বিশ্বজুড়ে প্রায় সত্তরটি সংগঠিত গোষ্ঠীর জন্ম দেয়, যার লক্ষ লক্ষ সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমেরিকান কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রায় এক-চতুর্থাংশ সদস্য নীতিগতভাবে বিশ্ব ফেডারেল সরকারের পক্ষে প্রস্তাবগুলিকে বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত তার সর্বাধিক বিক্রিত বই "দ্য ইউজেস অফ দ্য পাস্ট"-এর সমাপ্তিতে, হারবার্ট জে. মুলার "এই সাধারণ সিদ্ধান্তে" পৌঁছাতে পেরেছিলেন যে মানুষের সর্বোত্তম আশা "গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে এক ধরণের বিশ্ব ফেডারেশন"-এর মধ্যে নিহিত। এইচ. স্টুয়ার্ট হিউজেস তার "আওয়ার টাইমস"-এর প্রবন্ধে "এই দৃঢ় এবং এখন পরিচিত দৃঢ় বিশ্বাসের কথা বলেছিলেন যে প্রতিটি জাতিকে তার সার্বভৌমত্বের অপরিহার্য বিষয়গুলি একটি বিশ্ব কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।" নরম্যান কাজিনদের জন্য, বিশ্ব সরকার কেবল "আসছিল"। এটি "অনিবার্য ছিল। এর পক্ষে বা বিরুদ্ধে কোনও যুক্তিই সেই সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না," বিশিষ্ট প্রবীণ রাজনীতিবিদ, আলবার্ট আইনস্টাইনের মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানী, বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো বিখ্যাত দার্শনিক, গির্জাবাসী, নাগরিক নেতা, স্কুলের শিশুরা: এই কোরাসটি এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে এটি একটি সংক্ষিপ্ত প্রতারণামূলক মুহূর্তের জন্য অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হয়েছিল (পৃষ্ঠা ৩২)।

গানার মিরডাল "বিয়ন্ড দ্য ওয়েলফেয়ার স্টেট" বইতে লিখেছেন: স্পষ্টতই, আমাদের আদর্শের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সীমানা ছাড়াই এবং জাতীয় বৈষম্য ছাড়াই একটি বিশ্ব তৈরি করবে, এমন একটি বিশ্ব যেখানে সমস্ত মানুষ তাদের ইচ্ছামত চলাফেরা করতে এবং সমান শর্তে তাদের নিজস্ব সুখ অর্জন করতে স্বাধীন। রাজনৈতিকভাবে, এর অর্থ হবে একটি বিশ্ব রাষ্ট্র, যা গণতান্ত্রিকভাবে সকল মানুষের ইচ্ছা দ্বারা শাসিত

হবে। আমাদের আত্মার ধর্মীয় অংশে কোথাও না কোথাও আমরা সকলেই নিখুঁত একীকরণে একটি বিশ্বের এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি (পৃষ্ঠা ১৬৩)।

পিটিরিম সোলোকিনের মতামত যে "যুদ্ধ নির্মূলের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটি বিশাল অংশ হিসাবে, এক ধরণের বিশ্ব সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে" "ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউ মিলার লিখেছেন: সভ্যতাকে অবশ্যই সেই সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করতে হবে যা মূলত পৃথিবীতে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এবং যা অস্থায়ীভাবে গোষ্ঠী, উপজাতি এবং বর্ণে ছড়িয়ে পড়েছিল। সভ্যতা হল মানবজাতিকে আবার আত্মীয় এবং দয়ালু করে তোলা। (মানুষের বিবর্তনের পরবর্তী ধাপ হতে হবে) এমন একটি বিশ্ব সমাজ যেখানে সমস্ত ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ভবিষ্যতের মহান সমাজে বোনা হবে। ১১

টেলহার্ড ডি চার্ডিন - "একজন রহস্যবাদী, একজন স্রষ্টাবাদী, একজন জেসুইট, একজন বিজ্ঞানী, একজন বিবর্তনীয় মানবতাবাদী এবং বিশ্বব্যবস্থার একজন নবী" - বলেছেন: কেবলমাত্র একটি পথ আছে যা উপরের দিকে নিয়ে যায়; যেটি বৃহত্তর সংগঠনের মাধ্যমে বৃহত্তর সংশ্লেষণ এবং ঐক্যের দিকে নিয়ে যায়। (মানুষের চেতনাকে পরিবার, দেশ এবং বর্ণের বিস্তৃত, কিন্তু এখনও অনেক সীমাবদ্ধ, বৃত্তের বাইরে প্রসারিত হতে হবে)। জাতির যুগ অতীত। এখন আমাদের সামনে কাজ, যদি আমরা ধ্বংস না হই, তাহলে আমাদের প্রাচীন কুসংস্কারগুলিকে ঝেড়ে ফেলা এবং পৃথিবী গড়ে তোলা। ১২

মহান ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি এমন একটি বিশ্বব্যবস্থার কল্পনাও করেছেন "যেখানে সমগ্র মানবজাতি একটি একক সর্বব্যাপী পরিবারের সদস্য হিসেবে ঐক্যবদ্ধভাবে একসাথে বসবাস করতে সক্ষম হবে।" ১৩

তিনি তার ছোট, কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা বই, "দ্য প্রেজেন্ট ডে এক্সপেরিমেন্ট ইন ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন" (১৯৬২) -এ এই বিষয়টিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন: যদি আমরা গণ-আত্মহত্যা এড়াতে চাই, তাহলে এমন কোনও কারণ নেই যে আমরা অবশেষে একটি গণতান্ত্রিক সংসদীয় সংবিধান সহ একটি বিশ্ব-রাষ্ট্র পেতে সক্ষম হব না। কিন্তু যদি আমরা গণ-আত্মহত্যা এড়াতে চাই, তাহলে আমাদের দ্রুত আমাদের বিশ্ব-রাষ্ট্র থাকতে হবে, এবং এর অর্থ সম্ভবত এটি একটি অ-গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক আকারে শুরু করতে হবে। সংসদীয় সরকার - এবং, একটি চল্লিশটি, গণতান্ত্রিক সংসদীয় সরকার কেবলমাত্র এমন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই বাস্তবসম্মত যার সদস্যদের সাধারণ-সাধারণ রাজনৈতিক নীতিতে অনেক কিছু রয়েছে যা একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত হয় যা, পরিবর্তে, একটি সাধারণ জীবনধারা থেকে উদ্ভূত হয়। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন জাতি, জাতি, সভ্যতা এবং ধর্ম এখনও এই সমতা এবং

সংহতির স্তরে পৌঁছাতে অনেক দূরে (পৃষ্ঠা ৬৭)। এবং চৌদ্দশ বছর আগে কোরআন ঠিক এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিল যখন এটি বলেছিল: মানবজাতি কেবল একটি একক সম্প্রদায় (২: ২১৩; ১০: ১৯)।

কোরআন কর্তৃক নির্ধারিত সামাজিক ব্যবস্থা হল মানবজাতিকে একটি সুরেলা সম্প্রদায়ে একত্রিত করার ব্যবহারিক উপায়। এরিক ফ্রম আগামী কয়েকশ বছরের মধ্যে এই ধর্মের আবির্ভাবের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, এমন একটি ধর্ম যা মানব জাতির বিকাশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; এই ধরণের ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হবে এর সর্বজনীন চরিত্র, যা এই যুগে মানবজাতির একীকরণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; এটি পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত মহান ধর্মের জন্য সাধারণ মানবতাবাদী শিক্ষাগুলিকে আলিঙ্গন করবে। এটি ইতিহাসের প্রথম সম্পূর্ণ মানব ধর্ম হবে। ১৪

ওয়াগারের মতে: বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি যুক্তিসঙ্গত, নীতিগত, ব্যবহারিক বিশ্বাস এবং মানুষকে অবশেষে নিজের এবং মহাবিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বসবাস করতে সক্ষম করে। ১৫

"এই ধরণের ধর্ম" আবির্ভূত হওয়ার জন্য বিশ্বকে শত বছর অপেক্ষা করতে হবে না: এটি ইতিমধ্যেই কোরআনের শব্দে সংরক্ষিত আছে। অসুবিধা হল যে এটিকে তার আসল রঙে বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করা হয়নি। এবং এর জন্য, আমরা স্বীকার করি, দোষ আমাদের উপর - সেই গ্রন্থের রক্ষকদের উপর।

### *তথ্যসূত্র*


১. এম. ইকবাল, ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন, পৃষ্ঠা ১৪০।

২. জে. এম. মারে, অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ, পৃষ্ঠা ৬৬।

৩. এমেরি রেভস, দ্য অ্যানাটমি অফ পিস, পৃষ্ঠা ১৬৪।

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৩।

৫. এফ. হার্টজ, ইতিহাস ও রাজনীতিতে জাতীয়তা, পৃষ্ঠা ৪১৩।

৬. আলফ্রেড কোবান, পৃষ্ঠা ২২৫.

৭. হ্যারল্ড লাস্কি, মানবাধিকার, পৃষ্ঠা ৯১.

৮. ডব্লিউ. এ. গোল্ড, মানুষ, প্রকৃতি এবং সময়, পৃষ্ঠা ২৮১.

৯. আপ্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮৪.

১০. পিটিরিম সোরোকিন, মানবতার পুনর্গঠন, পৃষ্ঠা ১৮.

১১. হিউ মিলার, মানুষের সম্প্রদায়, পৃষ্ঠা ১৩১; ১৪০.

১২. টেইলহার্ড ডি চার্ডিন, পৃথিবীর নির্মাণ, পৃষ্ঠা ১৩; ১৬; ৩০.

১৩. আর্নল্ড টয়েনবি, ইতিহাসের একটি অধ্যয়ন, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ২৭৯.

১৪. এরিক ফ্রম, দ্য স্যান সোসাইটি, পৃষ্ঠা ৩৫২.

১৫. ওয়ারেন ওয়াগার, মানুষের শহর, পৃষ্ঠা ১৮. ১৬৮.

# অধ্যায় ১৬

## মানুষ এবং যুদ্ধ

**১. সুদূর অতীত**

মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের জটিলতা এবং দ্বন্দ্বের কারণে বিভ্রান্তিকর। মানুষের মর্যাদা অর্জনের ক্ষমতা কেবল তার অবমাননার ক্ষমতার সাথে সমান। সে মহত্ত্বের উচ্চতায় উঠতে পারে কিন্তু অধঃপতনের সর্বনিম্ন গভীরতায়ও ডুবে যায়। সে স্রষ্টাকে এমন এক উৎসাহে পূজা করতে পারে যা সত্যিকার অর্থে দেবদূতের মতো; অন্যদিকে, সে অশ্লীলতা এবং কামুকতায় শয়তানী আনন্দ পেতে পারে। যদি সে প্রেমে আধ্যাত্মিক মহিমার উচ্চতায় উঠতে পারে এবং এমনকি তার প্রিয়জনের জন্য মৃত্যুবরণ করতে পারে, তবে সে জঙ্গলের পশুর মতো ঘৃণাও করতে পারে। এমন একটি বুদ্ধিমত্তার অধিকারী যা আন্তঃনক্ষত্রিক স্থানগুলি অন্বেষণ করতে পারে এবং সূর্য ও পৃথিবীকে ওজন করতে পারে, সে তার নিজের মূল্য এবং সুপ্ত শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে এবং বোকামি করে এমন একটি পথ অনুসরণ করতে পারে যা অবশ্যই মানব জাতির ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করবে।  এই গ্রহে যুদ্ধ তার অস্তিত্ব জুড়ে মানুষের সাথে ছিল। যতদূর আমরা সুদূর অতীতের ধোঁয়াশা ভেদ করতে পারি, আমরা মানুষদের একে অপরের সাথে লড়াই করতে দেখি। তিনি যে অপূর্ব সভ্যতা তৈরি করেছেন এবং শিল্প ও বিজ্ঞানে তার গৌরবময় সাফল্য অর্জন করেছেন তা সত্ত্বেও, কেউ ভাবতে পারে যে তার ধরণের ধ্বংস করার জন্য এত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, মানুষ কি মানুষ বলে পরিচিত হওয়ার যোগ্য? এটা সত্য যে সময়ে সময়ে এমন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে যারা শান্তি, সহনশীলতা এবং সহানুভূতির পতাকা উত্তোলন করেছেন, কিন্তু সমানভাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রায়শই বিপরীত সুসমাচার প্রচার করেছেন এবং যুদ্ধকে মহিমান্বিত করেছেন। নিৎশের কাছে, যুদ্ধ ছিল একটি মহৎ পেশা। "পুরুষদের যুদ্ধের জন্য শিক্ষিত করা উচিত," তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, "এবং নারীদের যোদ্ধা তৈরির জন্য," এবং তার অর্থ স্পষ্ট করার জন্য যোগ করেছেন, "অন্য সবকিছুই বোকামি"। মুসোলিনি যুদ্ধকে একটি নৈতিক প্রয়োজনীয়তা হিসাবে দেখতেন। হিটলার যুদ্ধকে জীবনের মৌলিক নীতি হিসাবে বিবেচনা করতেন। তার কাছে আইন ছিল কেবল একজন সৈনিক যা নির্ধারণ করেছিলেন। তার দৃষ্টিতে, যারা রাষ্ট্রকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করে তারাই জাতীয় সংস্কৃতি এবং সামাজিক কল্যাণে অবদান রাখে। "আমাদের উচিত সেই সকল প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা যা মানুষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করে।" হাইনরিখ হাউসার বলেন, "আমাদের উচিত সেই সকল প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা যা মানুষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। জীবন তখনই স্থিতিশীল এবং সহজ হবে যখন আমরা বর্বরতাকে বর্জন করি"।

যদিও এই ধরণের চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিকে এখন সাধারণত ঘৃণা এবং উপহাস করা হয়, তবুও আজও অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি আছেন যারা আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিশ্বকে যুদ্ধে নিক্ষেপ করতে দ্বিধা করবেন না: সৌভাগ্যবশত প্রতিটি দেশের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তাদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। তারা পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা দ্বারাও নিরুৎসাহিত, যা বিজয়ী এবং পরাজিত উভয়েরই ধ্বংসের ইঙ্গিত দেবে।

এটা সত্য যে বর্তমান বিশ্ব থেকে যুদ্ধের হুমকি এখনও কমেনি। কিছু রাষ্ট্রপ্রধানের দ্বারা অনুশীলন করা কৃপণতার নীতি মানবজাতির জন্য হুমকিস্বরূপ। এটা আশ্চর্যজনক যে আধুনিক মানুষ যারা চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহকে উপনিবেশ স্থাপন করতে আগ্রহী তারা পৃথিবীতে তার মুখোমুখি হওয়া সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে না।

আসুন দেখি কোরআন কি এই দুর্দশায় আমাদের সাহায্য করতে পারে? এটি কি আমাদের সামাজিক অস্থিরতার জন্য কোন কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে? যদি তাই হয়, তাহলে প্রতিকারটি কীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে? কোরআনে আল্লাহ আস-সালাম এবং আল-মু'মিনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। আস-সালাম হলেন সেই সত্তা যিনি শান্তি ও সম্প্রীতির উৎস এবং যিনি সকল প্রাণীর জন্য শান্তিপূর্ণ অস্তিত্ব নিশ্চিত করেন। আল-মু'মিন হলেন সেই সত্তা যিনি সকলকে আশ্রয় দেন এবং রক্ষা করেন এবং সকল প্রাণীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শান্তি প্রদান করেন। অধিকন্তু, কোরআন আমাদের জন্য যে জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছে তাকে ইসলাম বলা হয়, যার মূলত অর্থ শান্তি।

মু'মিন হলেন সেই ব্যক্তি যার জীবন শান্তির উদাহরণ। কোরআন নিজেকে সেই উপায় হিসেবে উল্লেখ করে যার মাধ্যমে শান্তির পথ প্রশস্ত করা হয় (৫:১৬)। এটি মানুষকে "শান্তির গৃহে" ডাকে, (১০:২৫)। এর নীতি অনুসারে জীবনযাপনের পুরস্কার হল "শান্তির আবাস" (৬:১২৮)। মু'মিনের সমাজে শান্তি রাজত্ব করে। তারা যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, তখন মালাইকা তাদেরকে এই অভিবাদন জানিয়ে স্বাগত জানান: "শান্তির জন্য পৃথিবীতে তোমরা যে দৃঢ়তার সাথে কাজ করেছো, তার জন্য এখানে তোমাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পুরস্কার রয়েছে" (১৩:২৪)। একজন মুসলিম অন্য মুসলিমকে যে ভাষায় শুভেচ্ছা জানায়, তাতে শান্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়। তিনি তার বন্ধুকে বলেন, "তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক", এবং আনন্দের সাথে উত্তর পান, "তোমার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক"। কোরআন ফাসাদ শব্দটি সামাজিক শান্তির যেকোনো বিঘ্নের জন্য ব্যবহার করে। এটি স্রষ্টার কাছে ঘৃণ্য (২:২০৫)। স্রষ্টা মানুষকে পৃথিবীতে বিভেদ সৃষ্টি বা সহিংসতা না করার নির্দেশ দেন (৭:৫৬)। বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে বলা হয় যে তারা দুষ্টুমি ও সহিংসতা সৃষ্টি করে না (২৮:৮৩)।

এভাবে এটা স্পষ্ট যে ইসলাম শান্তির একনিষ্ঠ সমর্থক এবং যে কোনও রূপেই দুষ্টুমি ও সহিংসতা এর কাছে ঘৃণ্য। এটি সর্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এবং সমস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়।

নিঃসন্দেহে এটা সত্য যে মানুষ, সাধারণভাবে, শান্তিতে বসবাস করতে চায়। তবুও, সহিংসতার প্রাদুর্ভাব কোনওভাবেই বিরল ঘটনা নয়। কোরআন আমাদেরকে সহিংসতা শুরু হলে তা কীভাবে দমন করা যায় সে সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ দেয়। যদি কোনও ব্যক্তি শান্তি বিঘ্নিত করে তবে আমরা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি এবং যদি তা ব্যর্থ হয়, তবে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং বলপ্রয়োগ করে তাকে দমন করতে হবে। তবে, যখন একটি জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালায় তখন সমস্যাটি আরও কঠিন হয়ে ওঠে।

**২. খ্রিস্টধর্ম এবং যুদ্ধ**

খ্রিস্টধর্ম মন্দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না করার নীতিকে সমর্থন করে। এটি আমাদের পরামর্শ দেয় যে মন্দের বিনিময়ে মন্দের প্রতিশোধ না নেওয়া, সহিংসতার সাথে সহিংসতার মুখোমুখি না হওয়া। নতুন নিয়ম আমাদের বলে যে সহিংসতার কাজের সঠিক জবাব হল ভালোবাসার কাজ: তোমরা শুনেছ যে বলা হয়েছে, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত: কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, মন্দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করো না: কিন্তু যে কেউ তোমার ডান দিকে আঘাত করবে, তার দিকে অন্য দিকেও তাকাও। আর যদি কেউ তোমার বিরুদ্ধে মামলা করে তোমার জামা কেড়ে নিতে চায়, তাহলে তাকে তোমার চাদরটিও দিতে দাও। আর যে কেউ তোমাকে এক মাইল যেতে বাধ্য করে, তার সাথে দু'মাইল যাও (সেন্ট ম্যাথিউ, ৫: ৩৮-৪১)।

বলা হয় মন্দের বিনিময়ে ভালো করাই সর্বোত্তম উপায়। মন্দের বিরুদ্ধে লড়াই করুন। নিঃসন্দেহে, এগুলি মহৎ অনুভূতি এবং ব্যক্তিজীবনে প্রশংসনীয় হতে পারে। কিন্তু যীশু (পৃ.) সর্বজনীন আচরণের জন্য এই নীতিগুলি শেখাতে পারতেন কিনা তা সন্দেহজনক; কারণ অভিজ্ঞতা তাদের জ্ঞান প্রমাণ করে না। তারা কেবল বিরল ক্ষেত্রেই ভালো বলে মনে করে, এবং অ্যানবিয়া বিরল ব্যতিক্রমগুলির কথা বলেন না। খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসও এর সত্যতা অস্বীকার করে। মন্দের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এই পদ্ধতি সম্পর্কে ডিন ইঙ্গের মন্তব্য সাবধানতার সাথে বিবেচনার দাবি রাখে: প্রতিকূল পরিবেশে একটি ছোট পালের জন্য অ-প্রতিরোধের নীতিটি স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু একটি সংগঠিত সমাজ বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে পারে না। কেউই পরামর্শ দেবে না যে একটি খ্রিস্টান সরকারকে তার নিজস্ব সীমানার মধ্যে অপরাধীদের একটি দলকে দমন করা উচিত নয়, এবং যদি এটি স্বীকার করা হয়, তাহলে আমরা কি সন্দেহ করতে পারি যে এটি একটি আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করবে? ....

অগাস্টিন বলেছিলেন যে যুদ্ধ ন্যায্য এবং লুণ্ঠনমূলক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এবং এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে আমরা আক্রমণকারীর প্রকৃত স্বার্থে কাজ করছি। ন্যায়বিচার ছাড়া সাম্রাজ্য আর কী, বৃহৎ পরিসরে লুণ্ঠন। এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যা একটি প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে, তাই আমরা এমন একটি নীতি খুঁজে পেয়েছি যা আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পথ দেখাবে। [1]

এমনকি নতুন নিয়মে, যেমনটি আজ বিদ্যমান, সেখানেও এমন কিছু বিবৃতি রয়েছে যা স্পষ্টতই অহিংসা এবং মন্দের প্রতি সম্পূর্ণ অপ্রতিরোধ্যতার বিশ্বাসের সাথে ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, খ্রিস্ট বলেছেন: মনে করো না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি পাঠাতে এসেছি: আমি শান্তি পাঠাতে আসিনি, বরং তরবারি দিতে এসেছি।

কারণ আমি একজন পুরুষকে তার পিতার বিরুদ্ধে, কন্যাকে তার মায়ের বিরুদ্ধে এবং পুত্রবধূকে তার শাশুড়ির বিরুদ্ধে বিবাদে লিপ্ত করতে এসেছি (সেন্ট ম্যাথিউ, ১০: ৩৪-৩৫)। এটা স্পষ্ট যে খ্রিস্টধর্মে একটি ভালো উদ্দেশ্য রক্ষার জন্য বল প্রয়োগের বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া হয় না।

আমাদের সময়ে, ভারতের "মহাত্মা" গান্ধীকে অহিংসার বিশ্বাসের একজন দৃঢ় এবং আপোষহীন সমর্থক বলে মনে করা হত। তাকেও তার আদর্শবাদকে দমন করতে হয়েছিল এবং মন্দের প্রতি আরও বাস্তববাদী মনোভাব গ্রহণ করতে হয়েছিল: যদি একটি প্রকাশ্য যুদ্ধ সম্ভব হত, তাহলে আমি স্বীকার করতে পারি যে আমরা অন্যান্য দেশের মতো সহিংসতার পথে চলতে পারি এবং সর্বোচ্চ চেষ্টা করলে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার গুণাবলী বিকাশ করতে পারি।২

অহিংসার এই প্রেরিত এমনকি স্বীকার করেছেন যে যখন প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন কেবল পুরুষদেরই নয়, নারীদেরও সহিংসতার আশ্রয় নিতে হবে এবং বল প্রয়োগের সাথে লড়াই করতে হবে।৩ এটা বলা বাহুল্য যে এই ঋষির অনুসারীরা যখনই তাদের উদ্দেশ্য অনুসারে সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছে।

**৩. কোরআন এবং যুদ্ধ**

কোরআন কখনও মানুষের আবেগকে আকর্ষণ করে না এবং তাকে হাস্যরসের জন্যও নত হয় না। এটি জীবনের সমস্যাগুলিকে বাস্তবসম্মতভাবে মোকাবেলা করে এবং তাদের জন্য ব্যবহারিক সমাধান প্রদান করে। নতুন নিয়মের মতো, এটি আমাদের মন্দের বিনিময়ে ভালো করার পরামর্শ দেয়, কারণ এই ধরনের কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনা

দুষ্ট ব্যক্তির উপর সুস্থ প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলে আমাদের নৈতিক মূল্যও বৃদ্ধি পাবে: সুন্দর এবং ভালো কাজের দ্বারা খারাপ কাজের প্রতিশোধ নেওয়া। হতে পারে যে, যার এবং তোমার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে ওঠে (৪১:৩৪)।

অন্য এক জায়গায়, একজন মু'মিনকে "যে ন্যায় দিয়ে অন্যায় প্রতিহত করে" (২৮:৫৪) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু যদি শত্রু এই ধরনের ভালো কাজের সুযোগ নেয়, তাহলে কোরআন বলপ্রয়োগের অনুমতি দেয়, তবে তা ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী। এই ধরনের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি, কোরআন আমাদেরকে সেই ব্যক্তির প্রতি নম্র হতে পরামর্শ দেয় যে আমাদের উপর অন্যায় করেছে। যদি সে তওবা করে, তাহলে তাকে ক্ষমা করতে হবে। কোরআন আমাদেরকে আমাদের শত্রুদের এবং যারা আমাদের উপর অন্যায় করেছে তাদের ক্ষমা করার জন্য উৎসাহিত করে: কিন্তু যে ক্ষমা করে এবং (তার প্রতিপক্ষের সাথে) শান্তি স্থাপন করে, তার প্রতিদান আল্লাহর উপর বর্তায় (৪২:৪০)।

কোরআন তাদের জন্য "জালিম" (নিষ্ঠুর, নিপীড়ক) শব্দটি ব্যবহার করে যারা তাদের শত্রুদের ক্ষমা করে না। তবে, অন্য এক জায়গায়, কোরআন মানুষকে তার শত্রুর কাছ থেকে তার করা অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকার স্বীকার করে এবং যদি তাকে শাস্তি না দেওয়া হয়। যারা অন্যায়কারী এবং নিষ্ঠুর, কোরআন তাদের নিন্দা করেছে। এই ধরণের মানুষদের কঠোর শাস্তি প্রাপ্য (৪২: ৪১-৪২)। তবে, কোরআন মানুষের মনে এই শিক্ষা দান করে যে ক্ষমা করা একটি মহৎ কাজ। যখনই আমাদের বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে এই ক্ষমা অন্যায়কারীর পাশাপাশি সমাজেরও মঙ্গল করবে, তখনই আমাদেরকে সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে বলে, যিনি আমাদের ক্ষতি করেছেন।

**৪. আইন এবং বলপ্রয়োগ**

কোরআন বলেছে যে, কেবল ভালো আইন প্রণয়নই পৃথিবীতে শান্তি নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা জরুরি: আমরা আমাদের রাসূলদের স্পষ্ট যুক্তি এবং এই আইন এবং ন্যায়বিচারের মানদণ্ড দিয়ে পাঠিয়েছি যাতে মানুষ ন্যায়বিচারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে; এবং এর সাথে আমরা ইস্পাতও তৈরি করেছি যার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানবজাতির জন্য আরও অনেক ব্যবহার (৫৭: ২৫)।

অন্য কথায়, এমন আইন যা ভিত্তিহীন নয়। বল প্রয়োগ কেবল ধার্মিক উপদেশ মাত্র। সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে আইন প্রয়োগ করতে হবে। অতএব, কোরআন রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতা বজায় রাখার পক্ষে। কোরআন যদি আল্লাহকে শান্তির উৎস বলে, তাহলে এটি তাঁর জন্যও

প্রযোজ্য, রক্ষাকর্তা, পরাক্রমশালী, বাধ্যকারী এবং আত্মনির্ভরশীল। রাষ্ট্রেরও এই গুণাবলী প্রতিফলিত করা উচিত।

রাষ্ট্রের উপর অর্পিত ক্ষমতা আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং তার স্বাধীনতার জন্য হুমকিস্বরূপ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। রাষ্ট্র তার ক্ষমতা ব্যবহার করে ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে না। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হল এমন পরিস্থিতি বজায় রাখা যেখানে ব্যক্তি বিকাশ করতে পারে এবং আত্ম-উপলব্ধি অর্জন করতে পারে। এই উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হয় যখন রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে এবং যেকোনো দিক থেকে আগ্রাসন মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকে: আপনার প্রতিপক্ষের জন্য যথাসাধ্য সশস্ত্র বাহিনী এবং বাঁধা ঘোড়া প্রস্তুত করুন, যাতে আপনি আল্লাহর শত্রু এবং আপনার শত্রু এবং যাদেরকে আপনি জানেন না তাদের ভয় দেখাতে পারেন (৮: ৬০)।

রাষ্ট্রের উচিত দুর্বল জাতিগুলোর উপর অত্যাচার করার জন্য তার ক্ষমতা ব্যবহার করা নয়। তাদের উচিত এমন পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য তার ক্ষমতা ব্যবহার করা যেখানে স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত জীবনধারা অনুসরণ করা যেতে পারে। মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ শক্তির সঠিক ব্যবহারের উদাহরণ।

রাসূল এবং তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদের একটি ছোট দল তেরো বছর ধরে মক্কায় বসবাস করেছিলেন। এই সময়কালে তারা ধৈর্য ও নম্রতার সাথে সকল ধরণের নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। প্রতিটি অপমান বা সহিংসতা নীরবে বা সর্বোচ্চ পরিমাণে গ্রহণ করা হয়েছিল, এটি একটি মৃদু প্রতিবাদের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু তাদের স্ব-আরোপিত সংযমকে দুর্বলতা বলে ভুল করা হয়েছিল এবং প্রতিদিন তারা ক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছিল। যখন নিপীড়ন অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন তারা তাদের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে মক্কা থেকে কয়েকশ মাইল দূরে অবস্থিত মদীনায় আশ্রয় নেয়। এখানেও তাদের শান্তিতে রাখা হয়নি। তাদের শত্রুরা তাদের নতুন ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করতে বা যদি তারা তা করতে অস্বীকৃতি জানায় তবে তাদের নির্মূল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। একটি শক্তিশালী শক্তি তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিল। শরণার্থীদের জন্য এটি জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন ছিল। তবুও তারা শক্তির সাথে শক্তির মুখোমুখি হতে দ্বিধা করেছিল। তারা ধৈর্য ধরে ঐশ্বরিক নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করেছিল, যাতে তারা যা সঠিক তা করতে পারে। অবশেষে তাদেরকে তাদের অদম্য শত্রুদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ এবং যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হল: এবং যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হওয়ার পর আত্মরক্ষা করে। তাদের জন্য কোন উপায় নেই তাদের বিরুদ্ধে দোষারোপ নেই (৪২:৪১)।

নিম্নলিখিত আয়াতগুলিতে একটি স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে: যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে তাদের (সঠিক পথে) যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কারণ তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে; এবং

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন: যাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের ঘর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা বলেছিল: "আমাদের রব আল্লাহ"। কারণ যদি আল্লাহ কিছু মানুষকে অন্যদের মাধ্যমে তাড়িয়ে না দিতেন, তাহলে গির্জা, গির্জা, উপাসনালয় এবং (অন্যান্য) সমস্ত উপাসনালয়, যেখানে আল্লাহর নাম প্রায়শই উচ্চারিত হয়, সেগুলো অবশ্যই ধ্বংস করে দেওয়া হত। এবং আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন যে তাকে সাহায্য করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শক্তিশালী, পরাক্রমশালী (২২:৩৯-৪০)।

এই আয়াতগুলি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, যারা নির্যাতিত এবং শান্তিতে বসবাস করতে দেওয়া হয়নি, কেবল তারাই যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত। প্রশ্ন জাগে, যদি তাদের আত্মরক্ষার জন্য কোন উপায় না থাকে, তাহলে তাদের করণীয় কী? এই পরিস্থিতিতে, কোরআন সকল সৎকর্মশীল পুরুষকে তাদের উদ্ধারের জন্য দ্রুত এগিয়ে আসার এবং তাদের পক্ষে লড়াই করার নির্দেশ দেয়: তোমরা কীভাবে আল্লাহর পথে এবং দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করবে না যারা চিৎকার করছে: "হে আমাদের রব! আমাদের এই শহর থেকে বের করে আন, যার বাসিন্দারা অত্যাচারী। ওহ, তোমার সামনে থেকে আমাদের একজন রক্ষাকারী বন্ধু দাও! ওহ, তোমার সামনে থেকে আমাদের একজন রক্ষাকারী দাও!"

যারা বিশ্বাস করে তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা অবিশ্বাস করে তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। তাই শয়তানের দলবলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল সর্বদা দুর্বল (৪: ৭৫-৭৬)।

অর্থ স্পষ্ট। সারা বিশ্বের নির্যাতিত মানুষ তাদের উদ্ধারের জন্য একজন সাহায্যকারীর জন্য প্রার্থনা করে, তাদের জন্য লড়াই করার জন্য একজন রক্ষাকারীর জন্য প্রার্থনা করে। তুমি কি নির্যাতিতদের আর্তনাদ শুনতে পাও না? নাকি, তুমি কি মনে করো যে, নিজের নিরাপত্তার জন্য ছেলের যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন নেই? তুমি ভুল ভাবছো। নিপীড়নের শিকার সকলের সাহায্যে ছুটে যাওয়া তোমার কর্তব্য - নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা তোমার কর্তব্য, এমনকি যদি ভুক্তভোগীরা তোমার মূল্যবোধ ও ধারণা প্রকাশ না করে এবং তোমার দেশ বা জাতির অন্তর্ভুক্ত না হয়। যেখান থেকেই নির্যাতিতদের আর্তনাদ আসে, সেখানেই তোমার দ্রুত এগিয়ে এসে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। "আল্লাহর নামে" যুদ্ধের অর্থ এটাই।

মু'মিনরা আল্লাহর পথে নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার এবং অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তাদের উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। অবিশ্বাসীরা অন্যদের দমন করার জন্য এবং তাদের নিজেদের স্বার্থে তাদের শোষণ করার জন্য লড়াই করে। কোরআন আমাদের সহজ এবং সরাসরি ভাষায় বলে দেয় কখন

যুদ্ধ ন্যায্য এবং কখন তা ন্যায্য নয়। কোরআন দ্বারা নির্ধারিত নীতিগুলি স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। এগুলিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি।

এমন ভাষায় যা বিভিন্ন ব্যাখ্যার জন্য সংবেদনশীল হতে পারে। ন্যায়সঙ্গত এবং অন্যায্য যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট এবং অলৌকিক যুক্তি দ্বারা ঝাপসা করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, লোকেরা, যদি তারা সত্যিই নির্যাতিত হয়, তবে তাদের দেশের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আলো থাকে। তবে, তারা যদি কোনও ক্ষুদ্র অভিযোগকে বড় করে তোলে এবং এটিকে নিপীড়ন বলে অভিহিত করে তবে তারা সরাসরি কোরআনের নীতির বিরুদ্ধে কাজ করবে। কোরআন দ্বারা সংজ্ঞায়িত মৌলিক অধিকারগুলি তাদের অস্বীকার করা হলেই কেবল তাদেরকে নিপীড়নের শিকার বলা যেতে পারে। মু'মিন কেবল এই অধিকারগুলি রক্ষা করার জন্য অস্ত্র ধারণ করবেন এবং তিনি মুসলিম বা অমুসলিম নির্যাতিতদের সাহায্য করার জন্য তাড়াহুড়ো করবেন।

**৫. আচরণবিধি**

যুদ্ধ অনুমোদিত হওয়ার শর্তাবলী সম্পর্কে এখন পর্যন্ত। আসুন এখন যুদ্ধে থাকা মুসলমানদের জন্য কোরআন কর্তৃক নির্ধারিত আচরণের নিয়মগুলি বিবেচনা করা যাক। প্রথমত, অন্যদের সাথে আচরণে ন্যায়সঙ্গত থাকা কর্তব্য যুদ্ধে যেমন বাধ্যতামূলক, তেমনি শান্তিতেও: হে বিশ্বাসীরা! আল্লাহর জন্য ন্যায়ের উপর অবিচল সাক্ষী থাকো এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার না করার জন্য প্ররোচিত না করে। ন্যায়বিচার করো, এটাই তোমাদের কর্তব্যের নিকটবর্তী। আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন করো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত (৫:৮)।

আমাদের শত্রুদের প্রতিও ন্যায়বিচার করা উচিত। কোরআন আমাদেরকে যেকোনো পরিস্থিতিতে ন্যায়বিচারের পথ থেকে বিচ্যুত হতে অনুমতি দেয় না। যদি কোন অত্যাচারী মানুষকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তাহলে ন্যায়বিচার দাবি করে যে সেই অধিকারগুলো তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। যতদূর সম্ভব শান্তিপূর্ণ উপায়ে তা করা উচিত। যখন এগুলো ব্যর্থ হয়, তখনই যুদ্ধের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যুদ্ধেও, আমাদের শত্রুর মৌলিক অধিকারকে সম্মান করা উচিত। যখন শত্রুরা পরাজিত হয়, তখন তাদের সাথে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, কোরআন জোর দিয়ে ঘোষণা করে যে, একটি চুক্তি সর্বদা সম্মান করা উচিত, যুদ্ধের পাশাপাশি শান্তিতেও। বিশ্বের শান্তি সর্বোপরি, চুক্তিতে স্থাপিত আস্থার উপর নির্ভর করে। একটি চুক্তির মূল্য তখনই থাকে যখন পারস্পরিক আস্থা থাকে। যদি কোন পক্ষই যুদ্ধে সবকিছু ন্যায্য এই মত পোষণ করে তাহলে কি এটি সম্মানের যোগ্য হবে? শক্তিশালী পক্ষ যখনই তার উদ্দেশ্য পূরণ করবে তখনই এটি প্রত্যাখ্যান

করতে পারে। এই কারণেই সোলন বলেছেন যে চুক্তি হল একটি মাকড়সার জাল যা তার চেয়ে দুর্বল ব্যক্তিকে জড়িয়ে ফেলে এবং শক্তিশালী ব্যক্তির জন্য এটি খড়ের মতো মূল্যবান নয়।

ম্যাকিয়াভেলি দৃঢ়ভাবে রাজনীতিতে অসাধু লেনদেনকে সমর্থন করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় শাসককে পরামর্শ দিয়েছেন যে, যখনই তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে তখনই তার বিশ্বাস ভাঙতে হবে: একজন বিচক্ষণ শাসকের উচিত যখন এটি করার মাধ্যমে তার স্বার্থের বিরুদ্ধে হবে এবং যখন তাকে আবদ্ধ করার কারণ আর বিদ্যমান থাকবে না তখন বিশ্বাস রাখা উচিত নয়। ৪

তার শিষ্য দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক বিশ্বাস করতেন যে: নীতি হল অনুকূল সংযোজনগুলি আগে থেকে প্রস্তুত করার চেয়ে লাভবান হওয়া। এই কারণেই আমি আপনাকে অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভর করে চুক্তি না করার এবং আপনার হাত মুক্ত রাখার পরামর্শ দিচ্ছি। ৫

ম্যাকিয়াভেলির অনেক আগে, ভারতের একজন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ একই রকম মতবাদ তুলে ধরেছিলেন। তাঁর উপর কৌটিল্য (ধূর্ততা) উপাধি প্রয়োগ করা হয়েছিল, যা দেখায় যে তিনি রাজনীতিতে কৌশলের ব্যবহারকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কেবল একজন ধূর্ত এবং নীতিহীন ব্যক্তিই সফলভাবে রাজনীতির খেলা খেলতে পারেন। তাঁর অর্থশাস্ত্রে তিনি লিখেছেন যে চুক্তিগুলির পবিত্রতা রয়েছে এবং সময়ের প্রয়োজনে এগুলি বিকৃত বা ভেঙে ফেলা যেতে পারে। তবে, তিনি শাসককে পরামর্শ দিয়েছেন যে বিরোধীরা তাকে চুক্তি লঙ্ঘন করার সন্দেহে এটি করতে।

সুবিধার এই মহিমান্বিত করার সরাসরি বিরোধিতা করে, কোরআন স্পষ্টভাবে বলেছে: তোমাদের বন্ধন পূরণ করো (৫:১)। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমরা কেবল তাদের কাছেই জবাবদিহি করতে বাধ্য নই যাদের কাছে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, বরং আল্লাহর কাছেও। আল্লাহ আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন: তোমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করো: মনে রাখবেন, তোমাদের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে (১৭:৩৪)

তবে, অন্য পক্ষ যদি চুক্তি ভঙ্গ করে তবে কী করতে হবে? সাধারণ মতামত হল যে এই ক্ষেত্রে, চুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায়। কোরআনের ক্ষেত্রে তা নয়। এটি তাড়াহুড়ো করে করা পদক্ষেপকে নিন্দা করে এবং শত্রুর কাছে তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার এবং চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আবেদন করার পরামর্শ দেয়। যখন এই আবেদন ব্যর্থ প্রমাণিত হয় এবং শত্রু চুক্তি লঙ্ঘন করতে থাকে, তখনই আমরা এটিকে আর আমাদের উপর বাধ্যতামূলক নয় বলে বিবেচনা করার ন্যায্যতা পাই: যদি তুমি কোন জাতির হাতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করো, তাহলে তাদের (তাদের চুক্তি) ফিরিয়ে দাও এবং

এভাবে তাদের সাথে সমানভাবে চুক্তিটি ভেঙে দাও: নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ভালোবাসেন না (৮: ৫৮)।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে, যখন কোরআনের আইন সর্বদা মেনে চলা হত, তখন মুসলমানদের দ্বারা চুক্তি লঙ্ঘন অকল্পনীয় ছিল। এমনকি যদি একজন মুসলিম দ্বারা অঙ্গীকার করা হত, তবুও তা সর্বদা সম্মানিত হত। বদরের যুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা একজন মুসলিমের অঙ্গীকারের প্রতি রাসূলের মনোভাবকে চিত্রিত করে। এই যুদ্ধে, একশো তেরো জন মুসলমান এক হাজারেরও বেশি শক্তিশালী বাহিনী দ্বারা বিরোধিতা করেছিল।বালির লোক। সম্ভাবনা তাদের বিরুদ্ধে ছিল এবং তারা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিকে স্বাগত জানাত। যখন যুদ্ধ চলছিল এবং সমস্যাটি এখনও অনিশ্চিত ছিল, তখন হঠাৎ দুজন সশস্ত্র লোক তাদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। রাসূল তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কীভাবে শত্রুর ভূমি অতিক্রম করতে পেরেছে। তারা উত্তর দিল যে তারা তাদের থামানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নেবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে তাদের যেতে দেওয়া হয়েছিল। রাসূল বললেন যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। তিনি তাদের যুদ্ধ না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে যুদ্ধের বিষয়টি স্রষ্টার আইন অনুসারে নিষ্পত্তি করা হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়েও তিনি তার লোকদের তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে দেননি।

কিছু পৌত্তলিক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের স্বামীরা তাদের পুরানো ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য নির্যাতন শুরু করে। এই মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ মদিনায় আশ্রয় চেয়েছিলেন। মুসলমানদের তাদের বৈধ স্বামীদের কাছে স্ত্রীদের ফিরিয়ে দিতে বলা হয়েছিল। ইসলামী আইন একজন মুসলিম মহিলার একজন পৌত্তলিকের সাথে বিবাহ অনুমোদন করে না। অতএব, মহিলাদের বলা হয়েছিল যে তারা স্বাধীন এবং তাদের স্বামীদের কাছে ফিরে যেতে বাধ্য করা হবে না। কিন্তু তাদের স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের যা কিছু দিয়েছে বা তাদের জন্য ব্যয় করেছে তা ফেরত দেওয়া হয়েছিল (৬০:১০)। উল্লেখ্য যে, এই পুরুষরা ইসলামের শত্রু ছিল এবং মুসলিমদের ছোট্ট দলটিকে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। এমনকি এই শত্রুদের কাছ থেকেও রাসূল (সা.) তাদের ন্যায়বিচারের প্রাপ্য জিনিসটি প্রত্যাখ্যান করেননি। ন্যায়বিচার এবং ন্যায্য আচরণের প্রতি এই উৎসাহ ইসলামের বিরোধীদের প্রভাবিত না করে থাকতে পারেনি।

পরিশেষে, যদি শত্রুরা শান্তির প্রস্তাব দেয়, তবে কোনও অবস্থাতেই এই ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। শত্রুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ করার জন্য মুসলমানদের যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে তবে তাদের সন্দেহ তাদের শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধা দেবে না। বিজয় যখন মুসলমানদের নাগালের মধ্যে থাকে তখনই এই প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে। তবুও তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া উচিত নয় বরং অস্ত্র রেখে শান্তির জন্য আলোচনা শুরু করা উচিত। যদি শত্রুকে শান্তির জন্য মামলা করতে বাধ্য করা হয়, তবে

যুদ্ধের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল শত্রুকে পরাজিত করা বা তাদের অঞ্চল দখল করা নয়, বরং আক্রমণ প্রতিহত করা। যদি, যেকোনো কারণেই হোক, শত্রু অস্ত্র সমর্পণ করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে মুসলমানদেরও একই কাজ করা উচিত।

শত্রুরা হয়তো কেবল সময় লাভের জন্য অথবা কোন খারাপ উদ্দেশ্যকে ঢাকতে শান্তির প্রস্তাব দিয়ে থাকে। তবুও, মুসলমানদেরকে আল্লাহর উপর আস্থা রাখতে এবং সরল বিশ্বাসে তা গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, "কারণ আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই তোমাদেরকে তাঁর সাহায্য এবং মুমিনদের মাধ্যমে সমর্থন করেন" (৮:৬২)। তবে, প্রয়োজনীয় সকল সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং শত্রুকে তার আগ্রাসন ত্যাগ করতে বলা উচিত, তবে কেবল অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্যের সন্দেহের ভিত্তিতে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়।

শত্রুরা যদি সমঝোতায় আসতে অস্বীকৃতি জানায় তবে কতক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া উচিত? কোরআন মুসলিমদেরকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় যতক্ষণ না এটির উদ্দেশ্য পূরণ হয়। উদ্দেশ্য অর্জন হয়ে গেলে, যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। অযৌক্তিক আগ্রাসন, ধর্মীয় গোষ্ঠীর উপর নির্যাতন, নিপীড়ন এবং মানবাধিকার অস্বীকার করা যুদ্ধকে ন্যায্যতা দেয় এমন কিছু কারণ।

যদি যুদ্ধ বন্ধ করা না যায় কিন্তু যুদ্ধরত পক্ষগুলি সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হতে পারে, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে সুযোগটি কাজে লাগানো উচিত। যুদ্ধবিরতির সময়, মেজাজ শান্ত করা যেতে পারে, আবেগ ঠান্ডা করা যেতে পারে এবং সংযত চিন্তাভাবনা এবং হৃদয়গ্রাহীতা এমন পরিবেশ তৈরি করতে পারে যেখানে বিরোধের একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান সম্ভব হতে পারে। আজকাল, যুদ্ধবিরতি শব্দটি এই ধরনের অস্থায়ী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। যুদ্ধবিরতি বন্ধ করার এই পদ্ধতিটি চৌদ্দ শতাব্দী আগে কোরআন সুপারিশ করেছিল। একই দিকে আরেকটি পদক্ষেপ ছিল একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করা যাতে নির্দিষ্ট মাসগুলিতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা উচিত (৯: ২৬)।

### ৬. যুদ্ধবন্দী

কোরআন যুদ্ধবন্দীদের সাথে মানবিক ও সহানুভূতিশীল আচরণের নির্দেশ দেয়। সেই সময়ে অন্যান্য স্থানের মতো আরবেও যুদ্ধবন্দীদের সাধারণত দাস হিসেবে তৈরি করা হত। যুদ্ধে আটক পুরুষ ও মহিলাদের দাস হিসেবে বিক্রি করা হত। কোথাও এই প্রথাকে আপত্তিকর বলে মনে করা হত না। কোরআন, মানুষের আত্মমূল্যের উপর জোর দিয়ে, মানবিক মর্যাদার উপর এমন আঘাতকে অনুমোদন করতে পারে না। এটি মুসলিমদের যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণের অন্যান্য উপায় গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়। নির্দেশ দেওয়া হলো: এখন যখন তোমরা যুদ্ধে তোমাদের প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হবে, তখন তাদের ঘাড়ে

আঘাত করা হবে যতক্ষণ না তোমরা তাদের পরাজিত কর: তারপর শৃঙ্খল শক্ত করে বেঁধে ফেলো; তারপর হয় তাদেরকে মুক্তভাবে বিদায় দাও অথবা মুক্তিপণ আদায় করো (৪৭:৪)।

আয়াতটির অর্থ বেশ স্পষ্ট। যুদ্ধবন্দীদের শত্রুর হাতে থাকা মুসলমানদের সাথে বিনিময় করা যেতে পারে, অথবা তাদের জন্য নির্ধারিত মুক্তিপণ পরিশোধের পর তাদের মুক্ত করা যেতে পারে, অথবা শত্রুর প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ হিসেবে অথবা সম্পূর্ণ মানবিক কারণে তাদেরকে নিঃশর্তভাবে মুক্ত করা যেতে পারে।

অন্য অর্থ গ্রহণ করলে ফলাফল একই হয় অর্থাৎ বন্দীরা তাদের স্বাধীনতা ফিরে পায়। সমগ্র কোরআনে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে এটিই একমাত্র আয়াত। এখানে বা অন্য কোথাও তাদের দাস বানানোর কোনও ইঙ্গিত নেই। কোরআন, যা মুমিনদেরকে দাস মুক্ত করে সামান্যতম দুর্ঘটনার জন্যও তাদের দোষের প্রায়শ্চিত্ত করার নির্দেশ দেয় (৯০: ১৩), যা মানবাধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধ পরিচালনার অনুমতি দেয় এবং যা মানুষের সমতা ঘোষণা করে, কোনওভাবেই দাসত্বকে অনুমোদন করতে পারে না। বিপরীতে, এটি আদেশ দেয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত বন্দীরা মুসলমানদের হেফাজতে থাকবে ততক্ষণ তাদের সাথে অতিথি হিসেবে আচরণ করা উচিত। বদরের যুদ্ধে বন্দী হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে আবু আজিজ ছিলেন একজন। মুক্তি পাওয়ার পর, তিনি তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসেন এবং তাদের সাথে তার আচরণ সম্পর্কে কথা বলেন। "আমি একজন আনসারের সাথে থাকতাম। সে আমাকে রুটি এবং অন্যান্য ভালো জিনিস খেতে দিত, আর সে নিজে এবং তার পরিবার খেজুর খেয়ে বেঁচে থাকত। আমি লজ্জিত বোধ করতাম এবং প্রায়শই তাকে রুটি ফিরিয়ে দিতাম। সে তা স্পর্শ করতে অস্বীকৃতি জানাত এবং আমাকে তা খেতে বাধ্য করত।"

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে পড়া আরেক ব্যক্তি হলেন সোহেল বিন উমর। সোহেল একজন বিখ্যাত বক্তা ছিলেন এবং রাসূলের নিন্দা ও নিন্দা জানিয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবেই তাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিল এবং কেউ একজন তার সামনের দুটি দাঁত উপড়ে ফেলার পরামর্শ দিয়েছিল। তবে রাসূল এই প্রস্তাবে সম্মতি দেননি এবং সোহেলকে স্পর্শ করা হয়নি।

বদরের যুদ্ধে বন্দীদের মধ্যে কয়েকজনকে মুক্তিপণ দেওয়ার পর মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। অনেকেই মুক্তিপণ দেওয়ার জন্য এত দরিদ্র ছিল যে তাদের মুক্তিপণ দিতে পারত না। এর মধ্যে যারা শিক্ষিত ছিল তাদের বলা হয়েছিল যে দশজন মুসলিম ছেলের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে প্রত্যেকে তার স্বাধীনতা কিনতে পারবে। বাকিদের নিঃশর্তভাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। যারা মুক্তিপণ দিয়েছিল তাদের বলা হয়েছিল যে, ভবিষ্যতে যদি তারা মুসলমানদের পক্ষে আসে, তাহলে তাদের প্রদত্ত অর্থ তাদের ফেরত দেওয়া হবে: হে রাসূল! তোমাদের হাতে থাকা বন্দীদের বলো: যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে কোন ভালো জিনিস জানেন,

তাহলে তোমাদের কাছ থেকে যা কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার চেয়ে তিনি তোমাদেরকে উত্তম কিছু দেবেন এবং তোমাদের রক্ষা করবেন (৮: ৭০)।

উল্লেখ্য, যখনই কোরআনে "দাস-পুরুষ" বা "দাস-দাসী" শব্দটি এসেছে, তখনই তারা সর্বদা তাদের কথা উল্লেখ করেছে যারা ইতিমধ্যেই আরব সমাজে ছিল। তাদের কথা অতীত কালের মধ্যে বলা হয়েছে। কোরআনে কোথাও বলা হয়নি: "তোমাদের শত্রুদের দাস বানাও এবং তাদের জন্য এই নিয়মই প্রযোজ্য"। যখন মুসলমানরা ক্ষমতায় আসে, তখন তারা ধীরে ধীরে আরব সমাজে যত দাস ছিল তাদের মুক্ত করে দেয় এবং ভবিষ্যতের জন্য দাসত্বের দরজা বন্ধ করে দেয়।

শত্রু শিবিরের পুরুষরা মাঝে মাঝে মুসলিম শহরে আশ্রয় নিতেন। কোরআন মুসলমানদেরকে তাদের ফিরিয়ে না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। তাদের আশ্রয় দেওয়া উচিত এবং তাদের অবস্থানকালে কোরআনের শিক্ষা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করা উচিত। তবে, তারা তা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা ছিল। যদি তারা তাদের লোকদের কাছে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তাদের কেবল তা করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয় বরং তাদের জন্য একজন সহচরের ব্যবস্থাও করা উচিত যাতে তারা নিরাপদে তাদের শহরে পৌঁছাতে পারে: আর যদি তোমাদের কোন প্রতিপক্ষ তোমাদের কাছে আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে রক্ষা করো যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পারে এবং তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে পারে (৯:৬)।

মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই ব্যক্তিদের আলোকিত করা কর্তব্য: কিন্তু কোরআন স্পষ্টভাবে মুসলিমদেরকে ইসলামী বিশ্বাস গ্রহণে বাধ্য করতে নিষেধ করেছে।

**৭. যুদ্ধের অবসান কি অসম্ভব?**

মানব ইতিহাস যুদ্ধের সময়কালের সাথে সাথে শান্তির পর্যায়ক্রমিক এক চকচকে প্যাটার্ন উপস্থাপন করে। একই প্যাটার্ন কি অব্যাহত থাকবে নাকি অদূর ভবিষ্যতে স্থায়ী শান্তি অর্জন সম্ভব? আমরা কোরআনের সাহায্যে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। যুদ্ধবন্দীদের সাথে সম্পর্কিত আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, "যুদ্ধ চলতেই থাকবে যতক্ষণ না সে তার বোঝা চাপিয়ে দেয়" (৪৭:৪)। অন্য কথায়, যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যগুলি মানুষের মধ্যে নিহিত নয়। এগুলি একটি নির্দিষ্ট ধরণের সামাজিক সংগঠনে উদ্ভূত হয় এবং যদি সামাজিক ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন করা হয় তবে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আমরা যে সমাজ গড়ে তুলেছি তা একটি প্রতিযোগিতামূলক এবং অর্জনমূলক সমাজ। যদি কোরআনের সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা এটি প্রতিস্থাপন করা হয়, যা সমাজসেবায় সৃজনশীল কার্যকলাপ এবং প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করে, তাহলে যুদ্ধ মানবজাতির ক্ষেত্রে একটি উপাদান হয়ে উঠবে না। সারা বিশ্বে শান্তি থাকবে। কোরআন

মানবজাতিকে একটি একক সুরেলা সার্বজনীন সমাজে সংযুক্ত করতে চায়। অতএব, সমস্ত জাতীয় এবং গোষ্ঠীগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অদৃশ্য হয়ে যাবে। এই ধরনের সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগুলি ক্ষমতার পুরস্কারের জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দেবে, সেই শক্তি যা তাদের অন্যদের শোষণ করতে সক্ষম করতে পারে। তারা এমন কিছু মহৎ কামনা করতে শিখেছিল যা তাদের বিভক্ত করার পরিবর্তে একত্রিত করবে। তারা অন্যদের সেবা করার এবং সাধারণ কল্যাণের জন্য কাজ করার মাধ্যমে আত্ম-উন্নয়ন কামনা করবে - মানবতার অগ্রগতি।

এই সামাজিক ব্যবস্থা মানুষকে তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি প্রদান করবে — নিরাপত্তা, স্বাধীনতা এবং আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের সুযোগ। এতে ঈর্ষা জাগানোর মতো কিছুই থাকবে না। মানুষের হৃদয়ে হিংসা, লোভ বা বিদ্বেষ থাকবে না। স্বার্থের কোন সংঘাত থাকবে না এবং তাই কোন সংঘাত থাকবে না। তাহলে, কোরআনের ভাষায়, "যুদ্ধ তার বোঝা চাপিয়ে দেবে", অর্থাৎ, এটি এখন পর্যন্ত যে ভূমিকা পালন করেছে তা নতুন ব্যবস্থায় প্রয়োজন হবে না।

যাইহোক, পরিস্থিতি যেমন আছে, কখনও কখনও ন্যায়বিচারের জন্য যুদ্ধ করার প্রয়োজন হতে পারে। রাসূল (সা.) বলেছেন, "যুদ্ধের উদ্দেশ্য হল অত্যাচারীকে ন্যায়সঙ্গতের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য করা" (তিরমিযী)। রাসূলের হাদীসের সংকলক বুখারী বর্ণনা করেছেন যে একবার পরেরটিকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল, "একজন ব্যক্তি খ্যাতির জন্য যুদ্ধে যায়, অন্যজন তার সাহস প্রমাণ করার জন্য এবং অন্যজন ব্যক্তিগত প্রতিশোধের জন্য। এর মধ্যে, আমরা কার উদ্দেশ্যকে অনুমোদন করতে পারি?" রাসূল (সঃ) উত্তর দিয়েছিলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর আইনকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়ার জন্য লড়াই করে, তার যুদ্ধ আল্লাহর জন্য"।

মানব রচিত আইন কেবল একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে। এই ধরণের আইন অন্য কোন গোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না: কিন্তু স্রষ্টা হলেন সকল মানবজাতির রব। তাঁর আইন সকল মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে। ফলস্বরূপ তাঁর আইন বিশ্ব শান্তির জন্য একটি নিরাপদ ভিত্তি প্রদান করে। ইসলামে এই ভিত্তিকে "তাওহীদ" বলা হয়। অর্থাৎ একত্ব। তাওহীদ বলতে এক সৃষ্টি-মানবজাতির জন্য এক স্রষ্টার আইনের একটি সেটকে বোঝায়। এই ভিত্তির উপর ভিত্তি করে যে সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা হল দ্বীন, এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য এক।

এই সত্যটি পশ্চিমা চিন্তাবিদদের মনে উদিত হতে শুরু করেছে। যদি তাদের কাছে পূর্ণ উপলব্ধি না আসে, তাহলে দোষ হবে সেই মুসলমানদের যারা চৌদ্দ শতাব্দী আগে ঐশ্বরিক আইন পেয়েছিলেন এবং এখনও তা ব্যাখ্যা করেননি এবং মানবজাতির কাছে তা ব্যাখ্যা করেননি। মুসলমানদের মনে রাখা উচিত যে

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক মনের গভীরে প্রবেশ করেছে এবং আধুনিক মানুষ বিজ্ঞানের ভাষায় কথা বলে। কোরআন বলে: "মানবজাতি এক সম্প্রদায়" (২: ২১৩)। চৌদ্দ শতাব্দী আগে তার পূর্বপুরুষদের তুলনায় আধুনিক মানুষের পক্ষে এই সত্য বোঝা অনেক সহজ। মানুষ কেবল একটি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সদস্য হিসেবেই নিজের অস্তিত্বে আসতে পারে। কোরআন এমন একটি ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল এবং কোরআনের আইন যেখানে প্রচলিত ছিল তার মধ্যেই এটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর বার্তা কোনও গোষ্ঠীর জন্য নয় বরং সমগ্র মানবতার জন্য। মুহাম্মদ (সা.) এর পূর্ববর্তী প্রতিটি আম্বিয়া একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। মুহাম্মদ (সা.) একাই সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি বার্তা বহনকারী ছিলেন: হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, তাঁর রাসূল যার আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের মালিক। তিনি ছাড়া আর কোন সার্বভৌম কর্তৃত্ব নেই (৭: ১৫৮)।

অতএব, এই পৃথিবীর সকল শান্তিপ্রিয় বাসিন্দার কর্তব্য হল কোরআনের দিকে সমবেত হওয়া এবং এর পতাকাতলে এগিয়ে যাওয়া। চিরস্থায়ী শান্তির স্বপ্ন তখন বাস্তবে পরিণত হবে: হে মানবজাতি! তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে একটি উপদেশ এসেছে, যা বুকের মধ্যে যা আছে তার জন্য মলম, মুমিনদের জন্য একটি পথনির্দেশনা এবং রহমত (১০: ৫৭)।

এই সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কোরআন বলে: যে এতে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ (৩: ৯৬)। সারা বিশ্বের মানুষের উচিত এই সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করা, যার উপর মানবতার আশা নিহিত।

### *তথ্যসূত্র*


১. ডিন ইঙ্গ, দ্য ফল অফ আইডলস, পৃষ্ঠা ১৭৬-১৭৯; ১৭৭; ১৮১।

২. দ্য ইয়ং ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা ১৪৭, (প্রসেস অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সে ফাতিমা মনসুর কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৪৪)।

৩. হরিজন, তারিখ ২৭ অক্টোবর ১৯৪৬।

৪. এন. ম্যাকিয়াভেলি, দ্য প্রিন্স, পৃষ্ঠা ৬৪।

৫. জে.এম. মারে কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২১২।

# অধ্যায় ১৭
## জাতিসমূহের উত্থান ও পতন

### ১. কোরআন ও ইতিহাস

কোরআন বারবার প্রকৃতির ঘটনাবলী এবং ইতিহাসের ঘটনাবলীর প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং সেগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা ও চিন্তাভাবনা করার জন্য তাকে উৎসাহিত করেছে। এই দুটি ক্ষেত্র, একে অপরের থেকে এতটাই পৃথক যে, মৌলিকভাবে একই রকম, কারণ উভয়ই একই ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য প্রতিফলিত করে। উভয় ক্ষেত্রেই আইনের কার্যকারিতা স্পষ্ট। আজ, জীবিত প্রাণীর অস্তিত্বে প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়ন্ত্রণকারী প্রক্রিয়াগুলি বেশ স্পষ্ট বলে মনে হয়। কিন্তু যখন আমরা ব্যক্তিগত জীবন থেকে গোষ্ঠী অস্তিত্বে প্রবেশ করি, তখন চিত্রটি একটু অস্পষ্ট হয়ে যায়। তবুও, মানব গোষ্ঠীর উত্থান এবং বিচ্ছিন্নতা নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলির উপর নির্ভরযোগ্য তথ্য সংকলিত হয়েছে। ইতিহাসের দর্শন বর্ণালীকে প্রসারিত করার এবং জাতির উত্থান ও পতন নিয়ন্ত্রণকারী আইনগুলি সনাক্ত করার চেষ্টা করেছে। এটি একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা, কিন্তু এটি এখনও পর্যন্ত মানব ইতিহাসের গতিপথের বোধগম্য বিবরণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সামনে উত্থাপিত কোনও ধারণাই দীর্ঘকাল ধরে এই ক্ষেত্রটিকে ধরে রাখতে পারেনি। ফলস্বরূপ, ইতিহাস এখনও আকস্মিক ঘটনাবলীর একটি বিশৃঙ্খল ধারাবাহিকতা বলে মনে হয়। কোরআন ইতিহাসকে একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার আহ্বান জানায় যা মনোযোগের দাবি রাখে। কোরআন অনুসারে, ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য মানবিক বিষয়গুলিতে কাজ করছে যেমনটি প্রকৃতিতে জড় জগতে রয়েছে, কিন্তু কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। প্রকৃতিতে, ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে এমন আইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় যার থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। আমরা তাদেরকে ঐশ্বরিক ইচ্ছা বলতে পারি। বস্তুগত ইচ্ছা নিষ্ক্রিয় এবং স্রষ্টার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যেকোনো রূপে রূপান্তরিত হতে পারে। অন্যদিকে, ইতিহাসে, উদ্দেশ্যটি স্বাধীন সসীম সত্তার স্বেচ্ছায় এবং সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। ঐশ্বরিক ইচ্ছা, একটি স্ব-আরোপিত সংযমের মাধ্যমে, তাদেরকে নিজের জন্য কাজ করার এবং বেছে নেওয়ার অনুমতি দেয়। ইতিহাসের মঞ্চে যারা তাদের ভূমিকা পালন করে, তারা কখনও কখনও স্রষ্টার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এবং কখনও কখনও এর বিরুদ্ধে জীবনযাপন করেছে এবং কাজ করেছে। পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে তারা সমৃদ্ধ হয়েছে, অগ্রগতি করেছে এবং সভ্যতার অগ্রদূতে তাদের ন্যায্য স্থান দখল করেছে; পরবর্তী ক্ষেত্রে, তারা অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়েছে, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত অন্যদের দ্বারা তাদের স্থানচ্যুত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায়, একটি কার্যকারণ সম্পর্ক নির্দেশিত হয়েছে। প্রতিটি জীবনধারা তার নিজস্ব পরিণতি তৈরি করে। এই ফলাফলগুলিকে নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলির একটি সেট হল প্রতিদানের আইন। আপনি যেমন বীজ বপন করবেন, তেমনি আপনিও ফসল কাটবেন। এই আইনটি প্রকৃতির অন্যান্য আইনের মতোই নিরলস এবং অদম্য। কোরআন বারবার এই আইনকে নিশ্চিত করেছে

এবং মানব ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে এর কার্যকারিতার প্রচুর উদাহরণ প্রদান করেছে। যে জাতি মহাবিশ্বের নৈতিক শৃঙ্খলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারা গ্রহণ করে, তারা কার্যকলাপের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে। তারা জ্ঞান এবং বস্তুগত সমৃদ্ধি উভয়ই অর্জন করে। যে জাতি এই শৃঙ্খলার বিপরীত, অনিবার্যভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ভেঙে যায়।

ইতিহাস হল জাতিগুলির উত্থান-পতনের একটি রেকর্ড। এটি আমাদের অতীতে বিকশিত জাতিগুলির সম্পর্কে বলে - তাদের জীবনধারা, তারা যে লক্ষ্যগুলি অনুসরণ করেছিল, যে মূল্যবোধের চারপাশে তাদের সংস্কৃতি সংগঠিত হয়েছিল, তাদের কর্মকাণ্ড এবং সেই কর্মের পরিণতি। ইতিহাসকে কেবল ঘটনাবলীর ইতিহাস হিসেবে নয় বরং মূল্যবোধের কার্যকারিতার মূল্যায়ন হিসেবে বিবেচনা করলে আমাদের নিজস্ব সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারে। এই মূল্যায়ন আমাদের সামগ্রিক বিষয়ের ক্ষেত্রে শক্তি - ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা - দেবে। আমরা বিপদ এড়াতে পারি। যদি আমরা এমন একটি পথ অনুসরণ করতে দেখি যা জাতিগুলিকে একটি বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে গেছে, তাহলে আমরা সময়ের সাথে সাথে নিজেদের পরীক্ষা করতে পারি, আমাদের পদক্ষেপগুলি ক্রসরোডে ফিরে যেতে পারি এবং সঠিক পথ না হলেও আরও ভাল পথ বেছে নিতে পারি।

এইভাবে আমরা কেবল আমাদের নিজস্ব জীবনযাত্রা, আমাদের চিন্তাভাবনা এবং আমাদের কর্মকাণ্ড বিচার করার জন্য একটি পথপ্রদর্শক আলোই পেতে পারি না, বরং অন্যান্য জাতির অনুসৃত আদর্শ থেকে তাদের ভবিষ্যতের অন্তর্দৃষ্টিও পেতে পারি। সংক্ষেপে, যদি আমরা জীবনের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে চাই, তাহলে ইতিহাস অধ্যয়ন করে মানুষের আচরণ এবং তাদের ভাগ্যের সাথে সম্পর্কিত ইতিহাস অধ্যয়ন করা থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই। এই কারণেই কোরআন আমাদের বিশ্বজুড়ে ঘুরে দেখার এবং "যারা স্রষ্টাকে অমান্য করেছে তাদের ভাগ্য" অর্থাৎ তাঁর আইন নিজেরাই দেখার পরামর্শ দেয়। সম্পদ, ক্ষমতা, সংখ্যা, কিছুই তাদের রক্ষা করতে পারেনি যখন তারা উচ্চ মূল্যবোধের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। ইতিহাস তাদের বিচার করেছে, যেমনটি সময় আমাদের বিচার করবে। ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের কাছে উপলব্ধিযোগ্য: নিশ্চয়ই, আমরা তোমাদের জন্য স্পষ্ট করে এমন আয়াত নাযিল করেছি, এবং তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়ে গেছেন তাদের উদাহরণ। যারা জীবনের পথে বিপদ থেকে নিরাপদ থাকতে চান তাদের জন্য একটি উপদেশ (২৪: ৩৪)।

কোরআনের পদ্ধতি হল, প্রথমে জাতিগুলোর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী আইনগুলি বর্ণনা করা এবং তারপর সেই আইনগুলির কার্যকারিতা চিত্রিত করার জন্য ইতিহাস থেকে উদাহরণ উদ্ধৃত করা। কোরআনের উদ্দেশ্য অতীতের ঘটনাগুলিকে তাদের সমস্ত বিবরণে লিপিবদ্ধ করা নয় বরং নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরার জন্য পর্যাপ্ত রেফারেন্স দেওয়া এবং বাকিগুলি বাদ দেওয়া। এভাবে কোরআন জীবন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি সম্পর্কে

এত গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে যে এটি তার ঘোষণার উপর সন্দেহাতীত বিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করে যখন এটি বলে: তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি?

তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতির ধরণ কী ছিল? তারা এদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি ছিল এবং শক্তিতে এবং পৃথিবীতে (যা তারা রেখে গেছে) তাদের চিহ্নে আরও শক্তিশালী ছিল। কিন্তু তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের কোন কাজে আসেনি। আর যখন তাদের রাসূলরা তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ (তাদের কাজের পরিণতি সম্পর্কে) নিয়ে এসেছিলেন, তখন তারা নিজেদের জ্ঞান নিয়ে আনন্দিত হয়েছিল। আর যা তারা উপহাস করত, তা তাদের উপর এসে পড়েছিল (৪০: ৮২-৮৩)।

এই জাতিগুলি অনেক সুবিধা ভোগ করেছিল। তাদের ক্ষমতা, সম্পদ, প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং সমৃদ্ধ বস্তুগত সংস্কৃতি ছিল। সমৃদ্ধিতে তারা পৃথিবীতে সংখ্যাবৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু যখন তারা মহাবিশ্বের নৈতিক শৃঙ্খলাকে অমান্য করতে বেছে নিয়েছিল, তখন ভাগ্যের আঘাত এড়াতে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। তারা ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। তারা অজ্ঞতার দাবি করতে পারেনি কারণ তাদের নিজেদের মধ্য থেকে বারবার আম্বিয়া সতর্ক করেছিল। এই আম্বিয়া তাদের তাদের ভুল স্বীকার করতে এবং তাদের পথ সংশোধন করতে সতর্ক করেছিল। তবে, তারা সতর্কবাণী উপেক্ষা করতে বেছে নিয়েছিল এবং একটি বিপজ্জনক পথে চলতে থাকে। অহংকার ও অহংকার তাদের হৃদয়কে শাসন করেছিল এবং সাময়িক সাফল্যে উল্লসিত হয়ে তারা তাদের কর্মের দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল পূর্বাভাস দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। অবশেষে, তারা স্রষ্টার আইন সবকিছুর জন্য যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিল তা পৌঁছেছিল। যখন তারা তা অতিক্রম করেছিল, তখন তাদের ভাগ্য সিলমোহর করা হয়েছিল। তারা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যেখানে আর ফিরে আসার কোন সুযোগ ছিল না। এরপর অনুশোচনা এবং অনুতাপ তাদের রক্ষা করতে পারেনি: (যখন তারা সীমা অতিক্রম করেছিল) তখন তাদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসতে পারেনি যখন তারা তাদের ধ্বংস দেখেছিল। এটি আল্লাহর আইন যা তাঁর বান্দাদের (মানবজাতির) ক্ষেত্রে সর্বদাই চলে এসেছে; এবং সেখানে অধার্মিকরা হারিয়ে গিয়েছিল (৪০: ৮৫)।

চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় আইনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এমন কিছু সীমা রয়েছে যার মধ্যে পরিবর্তন এবং পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সীমা অতিক্রম করে, কিছুই লাভ হয় না এবং নিজেকে বাঁচানোর সমস্ত প্রচেষ্টা বালিতে পড়ে যায়।

**২. কার্যকর আইন**

মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে আইন যে মৌলিক মনোভাব দাবি করে তা হল মানুষের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা - মানব ব্যক্তিত্বের জন্য যা প্রতিটি ব্যক্তির সমানভাবে থাকে এবং যার একটি অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে। এই মূল্যবোধের অবজ্ঞা অন্য মানুষের শোষণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, হয় তাদের জীবন বা তাদের সম্পদের ক্ষতি করে। শোষক জাতি ধ্বংস হয়ে যায়: কত অন্যায়কারী সম্প্রদায়কে আমরা ভেঙে ফেলেছি এবং তাদের পরে অন্য একটি সম্প্রদায় তৈরি করেছি। আর যখন তারা তাদের কর্মের পরিণতি তাদের আযাবের আকারে দেখেছিল, তখন তারা সেখান থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু তাদের বলা হয়েছিল: পালিয়ে যেও না, বরং যেখানে তোমরা আনন্দিত ছিলে এবং তোমাদের বাসস্থানে ফিরে যাও, যাতে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় (তোমরা এত সম্পদ কোথা থেকে পেয়েছ এবং অন্যদের সাথে কীভাবে আচরণ করেছিলে)।

তারা সেখানে স্বীকার করে বলেছিল: দেখো, আমরা অন্যায়কারী ছিলাম। আর তাদের এই কান্না থামেনি যতক্ষণ না আমরা ফসল কাটা শস্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলাম (২১: ১১-১৪)।

পরিণাম তাদের সময় নিতে পারে কিন্তু অনিবার্য। মহাবিশ্ব নৈতিক শৃঙ্খলা ছাড়া থাকার জন্য তৈরি হয়নি: আমরা আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সবকিছুকে খেলাধুলায় সৃষ্টি করিনি (২১: ১৬)। এগুলো তৈরি করা হয়েছে যাতে আমাদের প্রতিশোধের আইন কার্যকর হয় (৪৫: ২২)।

যখন কোন জাতি নৈতিক শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে জীবন ত্যাগ করতে পছন্দ করে, তখন কার্যকলাপ এবং এর ক্ষয়িষ্ণু পরিণতির মধ্যে আসলে কোন সময় থাকে না। কিন্তু এর প্রভাব উপলব্ধিযোগ্য হতে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাধিতে নিজেকে প্রকাশ করতে কিছুটা সময় লাগতে পারে।

যে কেউ একটি জাতির পতনের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রোগের উপর থেমে থাকলে সে কেবল স্পষ্ট লক্ষণগুলিতে পৌঁছাবে কিন্তু মূল কারণ - অধার্মিক জীবনধারা - এর কাছে পৌঁছাবে না। প্রকৃত রোগ নিরাময় না করে লক্ষণগুলিকে দমন করা যেতে পারে। এটি অন্যান্য এবং আরও বিপজ্জনক আকারে রোগের প্রাদুর্ভাবকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। কোরআন, জীবনের একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, একটি আমূল প্রতিকারের আহ্বান জানায়, অর্থাৎ হৃদয়ের পরিবর্তন এবং একটি নতুন দিকনির্দেশনা। যখন এই পরিবর্তন আনা হয়, তখন লক্ষণগুলি অদৃশ্য হয়ে যেতে শুরু করে। সামাজিক ব্যাধিগুলির একমাত্র প্রতিকার হল ধার্মিকতা এবং সততার পথে ফিরে আসা।

কোরআনে প্রতিশোধের আইনকে আল্লাহর সুন্নাহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে - পৃথিবীর সাথে তার ভৌত ও নৈতিক দিকগুলিতে তিনি যে অভিন্ন পদ্ধতিতে আচরণ করেন। সুন্নাহ বলতে শৃঙ্খলা, অভিন্নতা এবং ধারাবাহিকতা বোঝায়। এটি স্রষ্টার যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিচালিত ইচ্ছার প্রকাশ।

পূর্বে যারা গত হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে স্রষ্টা এই পথ অনুসরণ করেছেন। স্রষ্টার আদেশ হল একটি আদেশ, যা ঐশ্বরিক আইন (৩৩: ৩৯) নামক একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসারে পরিমাপ করা হয়। এই আইন, অথবা "স্রষ্টার অভ্যাস" কোন পরিবর্তন জানে না। এটি ভবিষ্যতেও কার্যকর থাকবে যেমনটি অতীতে পরিচালিত হয়েছে: পূর্বে যারা গত হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে এটি আল্লাহর পদ্ধতি (অভ্যাস); এবং আপনি কখনও আল্লাহর পদ্ধতিতে (আইনে) পরিবর্তন পাবেন না (৩৩: ৬২)।

এই "স্রষ্টার অভ্যাস" বিশেষভাবে তাঁর আইনের বিরুদ্ধে যাওয়ার পরিণতির সাথে সম্পর্কিত: এবং তারা তাদের সবচেয়ে বিশ্বাসী আল্লাহর নামে শপথ করেছিল, শপথ করে বলছি, যদি তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসেন, তাহলে তারা সকল জাতির চেয়ে বেশি সংযত হবেন। কিন্তু যখন তাদের কাছে একজন সতর্ককারী আসেন, তখন তিনি তাদের মধ্যে কেবল পৃথিবীতে অহংকার এবং অশান্তি সৃষ্টির ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ঘৃণা জাগিয়ে তোলেন; আর অশান্তি সৃষ্টিকারীরা ছাড়া আর কিছুই করেন না। তাহলে কি তারা পূর্ববর্তীদের সাথে করা আচরণের চেয়ে ভিন্ন আচরণের আশা করেন? কিন্তু আপনি আল্লাহর পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তনও পাবেন না (৩৫: ৪২-৪৩)।

এবং বিশ্বজগতের কোন কিছুই তাঁর নাগালের বাইরে নয় বা তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়: আল্লাহ এমন নন যে আকাশে বা পৃথিবীতে কোন কিছুই তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকে। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, পরাক্রমশালী (৩৫: ৪৪)।

### ৩. ইতিহাস সম্পর্কে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

তার যুক্তিসঙ্গত স্বভাবের কারণে মানুষ সর্বদা জিনিসের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে। ইতিহাসের অর্থ বোঝার প্রচেষ্টায় সে খুব কমই সফল হয়েছে। ইতিহাসের অর্থ কী? এটা কি কেবল "একজন বোকার বলা গল্প, যার কোন অর্থ নেই?" নাকি আমরা বুঝতে পারি যে, এর মধ্যে লিপিবদ্ধ দীর্ঘ ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতায় কোন পরিকল্পনা, নকশা, প্যাটার্ন বা ছন্দ কতটুকুই বা অস্পষ্ট হোক না কেন? এই প্রশ্নটি কিছু মহান চিন্তাবিদদের মনকে চর্চা করেছে।

ইতিহাসের অর্থের আকর্ষণীয় আভাস তারা পেয়েছেন কিন্তু আর নেই। আমরা সংক্ষেপে ঊনবিংশ শতাব্দীর দুই প্রভাবশালী চিন্তাবিদ - হেগেল এবং মার্ক্স - এর মতামত উল্লেখ করব। বিবর্তন হল ইতিহাসের হেগেলীয়

তত্ত্বের মূল কথা। যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি যে বিবর্তন কী, তাহলে উত্তর হল যুক্তি বা পরম ধারণা। ধারণাটি ক্রমাগত নিজেকে প্রকাশ করছে। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় তার বিশাল সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করছে। অতএব, প্রক্রিয়াটি অর্থপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যমূলক। তবে, উন্নয়ন সরাসরি এগিয়ে যায় না: ধারণাটি প্রথমে একটি থিসিস হিসাবে শুরু হয়, তারপর এর বিপরীতে একটি শক্তির উদ্ভব হয়, যাকে একটি অ্যান্টিথিসিস বলা হয়, এবং অবশেষে একটি সমঝোতা হয় যাকে একটি সংশ্লেষণ বলা হয়, যা পূর্ববর্তী প্রতিটি অবস্থানে সেরাটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। ধারণার এই অগ্রসরমান গতিকে দ্বান্দ্বিক বলা হয়। ব্যক্তি, সমাজ বা মহাবিশ্ব যাই হোক না কেন, যুক্তি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিকশিত হয়। সবকিছুর মধ্যে নিহিত বৈষম্যই পরিবর্তন এবং বিকাশের কারণ। হেগেলের মতে, মহাবিশ্ব যুক্তিসঙ্গত এবং গতিশীল উভয়ই। প্রতিটি সভ্যতা মূল্যের স্কেলে পূর্ববর্তীটির চেয়ে উচ্চতর এবং তার পালাক্রমে আরও উচ্চতরকে স্থান দেবে। অতএব, অগ্রগতি একটি বাস্তব সত্য। হেগেলের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে অর্থবহ করে তোলে। তবে, এই দৃষ্টিভঙ্গি একটি মারাত্মক দুর্বলতা থেকে ভুগছে। এটি ব্যক্তিত্বের সাথে ন্যায়বিচার করতে ব্যর্থ হয়। বিবর্তন, যা অগণিত যুগ ধরে ধীরে ধীরে কাজ করে, অবশেষে মুক্ত যুক্তিবাদী ব্যক্তি তৈরি করেছে। এই ধরনের ব্যক্তিকে সেই লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যার দিকে প্রক্রিয়াটি এগিয়ে চলেছে। অতএব, বিবর্তনের ভবিষ্যত পথটি ব্যক্তির ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতার দিকে পরিচালিত হবে। হেগেলের পরিকল্পনায়, জোর দেওয়া হয় সমগ্রের উপর এবং ব্যক্তি কেবল সমগ্রের উদ্দেশ্য পূরণ করে।

আমরা বিশ্বাস করি, এটি একটি মারাত্মক ভুল, এবং "জাতি একটি জীব, যার একটি সত্তা, লক্ষ্য এবং কর্মের উপায় পৃথক বা গোষ্ঠীবদ্ধ ব্যক্তিদের চেয়ে উচ্চতর, যার দ্বারা এটি গঠিত একটি নৈতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ঐক্য, যা (একটি সর্বগ্রাসী) অবস্থায় অবিচ্ছেদ্যভাবে বাস্তবায়িত হয়," এই তত্ত্বের জন্য দায়ী, যদিও এটি কেবল নয়। ১১ এর ফলে ব্যক্তিকে এই জগন্নাথ রথের লৌহ চাকার নীচে পিষে ফেলা হয়।

মার্কসীয় তত্ত্বে, অর্থনৈতিক বিষয়ের সাথে সর্বাধিক গুরুত্ব সংযুক্ত করা হয়। যেকোনো নির্দিষ্ট সময়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আদর্শ, মূল্যবোধ, নৈতিক মান এবং সমাজের প্রতিটি দিক নির্ধারণ করে। একই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অন্যটিকে স্থান দেয়। এখানেও, আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু সমাজের উপর, ব্যক্তির উপর নয়। অর্থনৈতিক শক্তির কাজের মাধ্যমে সমাজ বিকশিত হয় এবং ব্যক্তির উত্থানের পথে যে কোনও সামাজিক ব্যবস্থায় খাপ খাইয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনও বিকল্প থাকে না। যে কোনও ব্যক্তি সামাজিক প্যাটার্নে খাপ খাইয়ে নিতে অস্বীকার করে, তাকে বাদ দেওয়া হয়। মার্কসীয় তত্ত্ব বর্তমান যুগে বিবর্তনের মূল ধারাকে উপেক্ষা করে। এটিও এমন এক সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত করেছে যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি একটি বিশাল যন্ত্রের মধ্যে কেবল একটি কণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এটা স্পষ্ট যে হেগেল এবং মার্কস উভয়েই সত্যের কেবলমাত্র একটি অংশের আভাস পেয়েছিলেন, সমগ্র নয়। উভয়েই মহাবিশ্বকে একটি গতিশীল বিবর্তনশীল ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিলেন: উভয়ই অস্বীকার করার ক্ষেত্রে ভুল ছিলেন যে লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণরূপে বিকশিত, নিখুঁত, মুক্ত এবং যুক্তিবাদী ব্যক্তিদের উত্থান। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন এটিকে এই লক্ষ্যের দিকে বিকাশমান হিসাবে দেখা হয়।

ইতিহাসের কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি কেন্দ্রীয় উপাদান। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হল বিবর্তন প্রক্রিয়ার একটি প্রকাশ - এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে শগ্রহণকারীরা ব্যক্তি, স্বাধীনতা এবং দূরদর্শিতা দ্বারা সমৃদ্ধ। যাইহোক, তাদের যে দূরদর্শিতা রয়েছে তা সীমিত এবং জঘন্য বিভ্রান্তি দ্বারা বিকৃত। এই পরিস্থিতিতে, সীমা রয়েছে, ভুল মোড় নেওয়ার সম্ভাবনা কম। উদ্দেশ্য হলো বস্তুনিষ্ঠ দিকনির্দেশনা যা দূরবর্তী লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে যা তাৎক্ষণিকভাবে বোধগম্য নয়। মানবিক যুক্তি ওহীর পরিপূরক মানুষকে সঠিক পথ পুনরাবিষ্কার করতে সক্ষম করে। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি শেষ পর্যন্ত এমন পরিস্থিতি তৈরি করবে যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি ওহীর প্রাথমিক উদ্বেগের পরম মূল্যবোধের সাধনায় নিজেকে নিবেদিত করতে পারে। লক্ষ্য হল ঐশ্বরিক সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

তবে আমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে হবে যে কেন এই সামাজিক ব্যবস্থা কোথাও দৃশ্যমান নয়, এমনকি কোনও মুসলিম দেশেও নয়, যদিও কোরআন চৌদ্দ শতাব্দী ধরে আমাদের সাথে রয়েছে। উত্তর হল মহাজাগতিক প্রক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে, খুব ধীরে ধীরে কাজ করে। দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেই আমরা একটি বিশ্ব প্রক্রিয়ার প্রবণতা উপলব্ধি করতে পারি। কোরআনের উদ্ধৃতি: "কিন্তু দেখ! আল্লাহর কাছে একটি দিন তোমাদের ধারণা অনুসারে হাজার বছরের সমান" (২২:৪৭)। সমগ্র মানবজাতি এই লক্ষ্যের দিকে কেবল ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে পারে। মানুষকে এটি অর্জন করার আগে অনেক বিপত্তি, বিপরীত, হতাশা সহ্য করতে হয় এবং অনেক পরীক্ষা ও কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাকে ধৈর্য ধরে এবং আশার সাথে কাজ করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ অন্ধকার হলেও তার সাহস ধরে রাখতে হবে। যে সঠিক কাজ করে, তা যত কমই হোক না কেন, সে প্রক্রিয়াটিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে, আর যে ভুল করছে সে তা পিছিয়ে দিচ্ছে। প্রতিটি কাজেরই স্বাভাবিক পরিণতি কর্তা হিসেবে নিজের জন্য এবং তার জাতির জন্যও রয়েছে: এবং যে কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করে, সে তখন তা দেখতে পাবে এবং যে কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করে, সে তখন তা দেখতে পাবে (৯৯: ৭-৮)।

মানুষের প্রতিটি কাজ লিপিবদ্ধ থাকে এবং তার পরিণতি অনিবার্যভাবে অনুসরণ করে। তবে ভালো খারাপের উপর জয়লাভ করে। একটি ভুল কাজের পরিণতি একটি সঠিক কাজের মাধ্যমে বাতিল করা যেতে পারে। "সৎকর্ম", কোরআন বলে, খারাপ কাজ বাতিল করে দেয় (১১:১১৪)। অতএব, ব্যক্তি বা

জাতির ভাগ্য নির্ভর করে কোন ধরণের কর্মের প্রাধান্য তার উপর: যার পাল্লা ভারী (ভালো কাজের মাধ্যমে) সে সুখী জীবনযাপন করবে। কিন্তু যার পাল্লা হালকা, তার "অসহায় ও ক্ষুধার্ত" হবে তার মা (বাসস্থান)। আহ! তোমাকে কী বোঝাবে যে সে কী—একটি প্রচণ্ড আগুন (১০১:৬-১১)।

যে জাতি মহাবিশ্বের নৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তাদের ভাগ্য অবশ্যই ভয়াবহ। যাইহোক, যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, প্রতিশোধের আইন ধীরে ধীরে কাজ করে। একটি নির্দিষ্ট জীবনধারার প্রভাব বছরের পর বছর ধরে স্পষ্ট নাও হতে পারে। জাতি নিরাপত্তার একটি মিথ্যা অনুভূতি দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। যদি এটি তার পথ সংশোধন না করে এবং ভুল পথে অবিচল থাকে, তবে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত "এবং স্রষ্টা তাদের এমন পদক্ষেপ দ্বারা (ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবেন যা তারা বুঝতে পারে না" (৬৮:৪৪)। সার্বজনীন ঐশ্বরিক আদেশের কোন ব্যবহার নেই। যে জাতি কেবল মানবতার অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। এমন একটি জাতি মানবজাতির মিছিল থেকে ছিটকে পড়ে এবং কখনও তার সাথে পুনরায় যোগ দিতে পারে না। এর অন্তর্ধান এমনকি লক্ষণীয়ও নয়: এবং আকাশ ও পৃথিবী তাদের জন্য কাঁদেনি, এবং তাদের অবকাশও দেওয়া হয়নি (৪৪:২৯)।

এমন একটি জাতি, শীঘ্রই বা পরে, ইতিহাস থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। যে জাতি ধ্বংসাত্মক পথে চলে, তাদের দীর্ঘ বা স্বল্প সময়ের জন্য অবকাশ দেওয়া হয়। যদি তারা তাদের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে এবং সঠিক পথে ফিরে আসে এবং ফিরে আসার কোনও বিন্দুতে পৌঁছায় না, তবে তারা রক্ষা পায়। কোরআনে একে আজল বলা হয়েছে। "প্রত্যেক জাতির জন্য একটি আজল আছে" (৭:৩৪), এবং "প্রত্যেক আজলের জন্য একটি আইন আছে" (১৩:৩৮)। যে সীমা অতিক্রম করে একটি জাতি অপূরণীয়ভাবে হারিয়ে না গিয়ে অতিক্রম করতে পারে না তা ঐশ্বরিক আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়: আল্লাহ সবকিছুকে মুছে ফেলেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেন এমন একটি আইন অনুসারে যার উৎস তাঁর কাছে রয়েছে (১৩:৩৯)।

**৪. জাতির ধ্বংস**

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ব্যক্তিদের মতো জাতিদের আচরণও প্রতিশোধের আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। যে জাতি নৈতিক শৃঙ্খলা অনুসারে জীবনযাপন করে এবং মানুষের বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সে উন্নতি লাভ করে এবং শক্তিশালী হয়। অন্যদিকে, একটি অন্যায্য এবং প্রতিক্রিয়াশীল জাতি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। প্রতিটি জাতি তার নিজস্ব কর্মের ফলে সফল বা ব্যর্থ হয়। ইতিহাসের ঘটনাগুলি সম্পর্কহীন এবং স্বেচ্ছাচারী নয় বরং প্রকৃতপক্ষে একটি অপরিবর্তনীয় মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইতিহাস কোনও কৌতুকপূর্ণ ভাগ্যের খেলা নয় বরং একটি আইনসঙ্গত, সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া। যদি কোনও জাতি কষ্ট ভোগ করে, তবে সে নিজের উপর দুর্ভোগ ডেকে এনেছে। এটি কোনও বাইরের সংস্থার উপর দোষ চাপাতে

পারে না। "যাকে ধ্বংস হতে হবে", কোরআন বলে, "একটি স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হয়, এবং যাকে বেঁচে থাকতে হবে, সে একটি স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা বেঁচে থাকে" (৮: ৪২)। সাফল্য বা ব্যর্থতা আমাদের ভাল বা খারাপ আচরণের চূড়ান্ত পরিণতি। কোরআন এটি স্পষ্ট করে: স্রষ্টা কারও প্রতি অবিচার করেন না। লোকেরাই নিজের প্রতি অবিচার করে (১১: ১০১)।

মানুষই প্রায়শই তার স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে: যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তাহলে কেন আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দেবেন? (৪: ১৪৭)।

অন্যত্র, কোরআন আরও স্পষ্টভাবে বলেছে। "মানুষের উপর যখন দুর্দশা আসে, তখন সে চিৎকার করে বলে: 'আমার রব আমাকে অকারণে অপমান করেছেন'। কোরআন উত্তর দেয় যে, আল্লাহ মানুষের সাথে তার আচরণে কখনও অন্যায় করেন না। "যদি তুমি কষ্ট পাও, তবে এর কারণ হল তুমি তোমার পক্ষ থেকে কখনও এতিম ও একাকীকে সাহায্য করো না এবং অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হও না।"

"তোমরা দরিদ্রদের খাদ্য দান করছো, আর তোমরা লোভের সাথে উত্তরাধিকার গ্রাস করছো, আর প্রচুর ভালোবাসার সাথে সম্পদকে ভালোবাসো" (৮৯: ১৬-২০)। এগুলোই তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ। এই প্রসঙ্গে, কোরআন একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি পেশ করে: সত্যি বলতে, আমার রব এমন ছিলেন না যিনি জনপদগুলিকে অত্যাচারের সাথে ধ্বংস করে দিতেন যখন তাদের লোকেরা সৎকর্ম করছিল (১১: ১১৭)। যারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয় কেবল তাদেরই শাস্তি দেওয়া হয় (৪৬: ৩৫)।

"জাতির ধ্বংস" কোরআনে বারবার উল্লেখিত একটি বিষয়। এই শব্দটির সঠিক অর্থ নির্ধারণ করা সময়সাপেক্ষ। কিছু জাতি আসলে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে। তবে, এই সত্যের দিকে কোরআন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। কোরআন আমাদের এমন একটি জাতির দুর্দশার কথা চিন্তা করতে চায়, যারা তার অপকর্মের মাধ্যমে তার স্বাধীনতা হারিয়েছে এবং দারিদ্র্য, রাজনৈতিক পরাধীনতা এবং অর্থনৈতিক নির্ভরতার অবস্থায় বাস করছে। এটি পৃথিবীতে একটি সৃজনশীল ভূমিকা পালন করা বন্ধ করে দিয়েছে। মানবতার নেতৃত্ব তার থেকে চলে গেছে। হাত। এটি আর বেঁচে থাকে না, কেবল উদ্ভিদের মতোই থাকে। এটি মানবতার মিছিল থেকে বেরিয়ে এসেছে যা ধীরে ধীরে কিন্তু অবিচলভাবে একটি মহান গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। যে মুহূর্তে এটি নৈতিক ব্যবস্থার সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে, সে মুহূর্তে এটি ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করে। ক্ষয়িষ্ণুতার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। কোরআন বলে যে একটি জাতি যখন সম্পদের পিছনে ছুটে এবং অর্থ সঞ্চয় করতে শুরু করে তখন তার পতন শুরু হয়। তাদের উচিত ছিল সাধারণ কল্যাণের জন্য অর্থ ব্যয় করা। ধনীরা দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করার পরিবর্তে নিজেদের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করে। এর অনিবার্য পরিণতি হল যে জাতিটি অধঃপতন শুরু করে। তারা বিশ্বাস করত যে সম্পদ

তাদেরকে শক্তিশালী করবে কিন্তু সম্পদ তাদের ব্যবস্থায় বিষের মতো কাজ করে এবং এটিকে দুর্বল করে দেয়। একটি নিকৃষ্ট লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে এটি নিজেকে ধ্বংস করে দেয়: তোমরা সেইসব লোক যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য ডাকা হয়েছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা সঞ্চয় করে। আর যে সঞ্চয় করে সে কেবল নিজের জন্যই সঞ্চয় করে। আর আল্লাহ ধনী এবং তোমরা দরিদ্র। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তিনি তোমাদের অন্য কাউকে দিয়ে বিনিময় করবেন এবং তারা তোমাদের মতো হবে না (৪৭:৩৮)।

অর্থ স্পষ্ট। যদি কোন জাতি মানবজাতির উন্নয়ন এবং ঐশ্বরিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং আত্মমর্যাদার অবমাননাকর লক্ষ্য অনুসরণ করে, তাহলে মানবতার ভারসাম্যে আরও বেশি গুরুত্ব বহনকারী অন্য একটি জাতি তার স্থান দখল করবে। লোভী জাতি তার সম্পদে আটকে থাকবে এবং অন্য একটি জাতিকে মানবজাতির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হবে। এই পরবর্তী জাতিকে "পূর্বসূরীর চেয়ে উত্তম" বলা হয় (৭০:৪১)।

জাতিগুলির মধ্যে সংগ্রাম শারীরিক এবং নৈতিক উভয় দিক থেকেই পরিচালিত হয়। যে জাতি নিষ্ঠুর শক্তি এবং ধূর্ততার উপর নির্ভর করে তারা কিছু সময়ের জন্য সফল হতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। তাদের কেবল বহিরাগত শত্রুর মুখোমুখি হতে হয় না, বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষেরও মুখোমুখি হতে হয়। সরকারগুলি যত শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত হোক না কেন, তারা তার বিরোধীদের কাছে নতি স্বীকার করে কারণ এটি অন্যায় এবং অত্যাচারের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নিপীড়ক শাসনের অধীনে জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, সংগঠনের পতন ডেকে আনে - এমনকি যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত না হলেও। এই হলো অন্যায় সমাজের পরিণতি: বলুন: তিনি তোমাদের উপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে শাস্তি পাঠাতে পারেন, অথবা তোমাদের দলে দলে বিভ্রান্ত করতে পারেন এবং তোমাদের একে অপরের অত্যাচারের স্বাদ গ্রহণ করাতে পারেন (৬:৬৫)।

জাতির মধ্যে যে সংগ্রাম, যখন তা শারীরিক স্তরে থাকে, যেখানে নিষ্ঠুর শক্তির বিপরীতে নিষ্ঠুর শক্তি ব্যবহার করা হয়, তা মানুষকে হেয় ও পশুত্বহীন করে তোলে। সংগ্রাম যদি নৈতিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে তবে মানুষ নৈতিকভাবে হতাশ হয় না। এই ধরনের সংগ্রাম জাতিগুলির মধ্যে ঘৃণার জন্ম দেয় না। এই ক্ষেত্রে, সেই ব্যবস্থা, তা রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক যাই হোক না কেন, বিরাজ করে যার মূল্য বেশি এবং অগ্রগতির পথ পরিষ্কার করে। এখানে সতর্কতার কথা বলা প্রয়োজন। যে মুহূর্তে একটি ব্যবস্থা সফল হয়, তখনই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত নয় যে এটি তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় বেশি মূল্যবান। আমাদের দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত। কেবলমাত্র যখন এর সাফল্য স্থায়ী হয় এবং এটি নির্দিষ্ট

সময়ের মধ্যে মানবজাতির জন্য ভালো ফলাফলের জন্য উৎপাদনশীল বলে দেখানো হয়, তখনই এটি মূল্যবান বলে গণ্য করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া প্রতিটি ব্যবস্থা পরীক্ষা করে এবং কেবল সেই ব্যবস্থা সংরক্ষণ করে যা প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনকে প্রসারিত এবং সমৃদ্ধ করে। কোরআন আমাদের ইতিহাস অধ্যয়ন করার জন্য যথার্থই পরামর্শ দেয়:তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি যে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কী হয়েছিল? তারা তাদের চেয়ে শক্তিতে শক্তিশালী ছিল এবং তারা পৃথিবী খনন করেছিল এবং এর উপর তারা যা তৈরি করেছে তার চেয়েও বেশি নির্মাণ করেছিল। তাদের নিজস্ব রাসূলরা তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন। অবশ্যই আল্লাহ তাদের উপর জুলুম করেননি বরং তারা নিজেদের উপর জুলুম করেছিল (৩০:৯)।

তাদের শহরগুলির বিস্ময়কর ধ্বংসাবশেষের দিকে একবার নজর দিলেই বোঝা যায় যে তারা মানুষের কাঙ্ক্ষিত সবকিছুর অধিকারী ছিল; ক্ষমতা, সম্পদ, বিশাল সম্পদ এবং উচ্চমানের বুদ্ধিমত্তা, তবুও, তারা ক্ষয় এবং বিচ্ছিন্নতার শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি। কারণ তাদের মূল্যবোধের ব্যবস্থা মৌলিকভাবে ভুল ছিল। ক্ষমতা, সম্পদ এবং বস্তুগত সমৃদ্ধির মতো মিথ্যা এবং ক্ষণস্থায়ী মূল্যের জাদুকরী দ্বারা তারা মুগ্ধ হয়েছিল। তাদের বুদ্ধি ছিল কিন্তু জ্ঞান নয়। জীবনের গভীর বিষয়গুলিতে তাদের অন্তর্দৃষ্টির অভাব ছিল। মহাবিশ্বের নৈতিক ব্যবস্থার দাবি উপেক্ষা করার জন্য তাদের মূল্য দিতে হয়েছে। কোরআন আদ ও সামুদের উদাহরণ উদ্ধৃত করেছে। উভয়ই ধনী ও শক্তিশালী জাতি ছিল। তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল; যেমন কোরআন বলে, তারা ছিল "সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক" (২.১): ২৮)। কিন্তু তারা এমন একটি জীবনযাপন পদ্ধতি বেছে নিয়েছিল যা নৈতিক ব্যবস্থার বিপরীত ছিল। তাদের মূল্যবোধের মাপকাঠি ভুল ছিল। কোরআন বলে যে মুস্তাবসিরীন, বুদ্ধিজীবী এবং চিন্তার নেতাদের কর্তব্য হল সঠিক পথ আবিষ্কার করা এবং জনগণকে তা অনুসরণ করতে প্ররোচিত করা। যখন এই ব্যক্তিরা তাদের কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে না, তখন জাতি অন্যায় ও অত্যাচারের দিকে ধাবিত হয় এবং ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। চিন্তার নেতাদের জাতির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং ভুল হলে সতর্ক করতে হবে। যদি জাতি মিথ্যা মূল্যবোধ অনুসরণ করে তবে বুদ্ধিজীবীদের দোষ দেওয়া উচিত। যদি একটি জাতির ক্ষয় শুরু হয়, তবে প্রক্রিয়াটি সাধারণত উপরের দিক থেকে শুরু হয়। সমাজের উপরের স্তরটি প্রথমে দুর্নীতিগ্রস্ত হয় এবং দুর্নীতি নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটা অদ্ভুত যে উচ্চ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ব্যক্তিরা প্রথমে দুর্নীতিগ্রস্ত হন। কারণ তারা তাদের নিজস্ব স্বার্থ হাসিলের জন্য তাদের বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার প্রলোভনকে প্রতিহত করতে পারে না: এবং প্রকৃতপক্ষে, আমরা তাদের এমন ক্ষমতা দিয়েছিলাম যা আমরা তোমাদের ক্ষমতা দিইনি, এবং তাদের কান, চোখ এবং মন দিয়েছিলাম; কিন্তু তাদের কান, চোখ এবং মন তাদের কোনও কাজে আসেনি, কারণ তারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন প্রত্যাখ্যান করেছিল: এবং তারা যা উপহাস করত তা তাদের উপর এসে পড়েছিল (৪৬:২৬)।

কোরআন এই সত্যের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা যদি চিরন্তন নৈতিক ব্যবস্থার বিপরীত পথ গ্রহণ করি তবে জ্ঞান এবং বোধগম্যতা, সম্পদ এবং ক্ষমতা, দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তা আমাদের কোনও কাজে আসবে না। সম্পদ এবং ক্ষমতার গৌরবের উপর ভিত্তি করে মিথ্যা মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে একটি সমাজ ব্যবস্থা কিছু সময়ের জন্য বিকাশ লাভ করতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে। ইকবাল ঠিকই বলেছেন: পুঁজিবাদের উপর ভিত্তি করে একটি সমাজ নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। যতই চালাক রাজনীতিবিদরা এটিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করুক না কেন। (বাঙ্গ-এ-দারা)।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন ও পতনের আলোচনার সময়, ব্রিফল্ট কিছু চিন্তা-উদ্দীপক পর্যবেক্ষণ করেছেন, যা আমাদের বিবেচনা করা উচিত: মানব সংগঠনের যে কোনও ব্যবস্থা যা তার নীতিগত ভিত্তিতেই মিথ্যা, সেই ব্যবস্থায় যে কোনও ধরণের চতুরতা এবং দক্ষতার দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে পারে না যেভাবে সেই মিথ্যাকে পরিচালিত করা হয় এবং যে কোনও পরিমাণে ভাসাভাসা সমন্বয় এবং ছলনা দ্বারা বজায় রাখা হয়। যতক্ষণ না মূলটি তার মতোই থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মূল এবং শাখা।২

তিনি আরও বলেন: মানবতা মেঘের উপরে চড়ে উচ্চতর স্তরে দাঁড়িয়ে থাকে না, এবং ঘন্টায় একশ মাইল গতিও অগ্রগতির অন্তর্ভুক্ত নয়; মানুষ তারাগুলিকে ওজন করতে এবং জ্ঞানের বৃহত্তর ক্ষেত্রগুলিতে তার মনকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়ে বৌদ্ধিকভাবে রূপান্তরিত হয় না। মানবিক বিষয়গুলির আরও গভীর দিক রয়েছে। প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ বা মনের অন্তর্দৃষ্টির বিকাশের চেয়ে, বস্তুগত বা বৌদ্ধিক শক্তির যেকোনো রূপের চেয়ে মানবিক মূল্যের সারাংশের কাছাকাছি কিছু আছে। শক্তি, সভ্যতা, সংস্কৃতি কোনও মূল্য দেয় না, যদি সেগুলি নৈতিক মন্দের সাথে যুক্ত থাকে। মানব জগতের মূল্য যে প্রকৃত মানদণ্ড দ্বারা গণনা করা হয় তা হল নৈতিক মানদণ্ড। নীতিগত অর্থে 'ভালো' শব্দটির অপরিহার্য অর্থ মানবিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়; এবং মানব বিবর্তনের কোনও প্রক্রিয়াই বাস্তব হিসাবে গণ্য করা যায় না যা সর্বোপরি "ভালো" বিবর্তন নয়।৩

মিথ্যা নীতির উপর ভিত্তি করে একটি সমাজ অনিবার্যভাবে ভেঙে পড়ে। আমরা আবার ব্রিফোল্টের উদ্ধৃতি দিচ্ছি: আসলে যা ঘটে তা হল সমাজের পর্যায়, জিনিসপত্রের ক্রম যেখানে অধিকারের অবহেলা অভ্যাসগত এবং গৃহীত, অনিবার্যভাবে অবনতি এবং প্যারাসাইড হয়। ব্যক্তি যতই সাময়িকভাবে বৈষম্যের দ্বারা উপকৃত হোক না কেন, যে সামাজিক সংগঠনের সে একটি অংশ এবং যে শ্রেণী সেই বৈষম্যের ফল ভোগ করে, তার ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে অনিবার্য অবনতির শিকার হয়। তারা তাদের পরিবেশের বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নেয় না। প্রাকৃতিক নির্বাচনের অনিবার্য ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পাপের মজুরি মৃত্যু।৪

এটি কেবল সুদূর অতীতে ঘটেনি যখন মানুষ এখনও অজ্ঞ এবং বৌদ্ধিকভাবে অপরিণত ছিল। আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় অবনতির একই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করি। আসুন দেখি পাশ্চাত্য চিন্তাবিদরা তাদের নিজস্ব সভ্যতা সম্পর্কে কী বলেন। আমরা রেনে গুয়েননের উদ্ধৃতি উদ্ধৃত করছি: আধুনিক সভ্যতা ধাপে ধাপে অধঃপতনের দিকে এগিয়ে চলেছে, যতক্ষণ না এটি মানুষের সর্বনিম্ন উপাদানে ডুবে গেছে এবং তার প্রকৃতির বস্তুগত দিকের অন্তর্নিহিত চাহিদা পূরণের চেয়ে সামান্য বেশি লক্ষ্য রেখে শেষ হয়েছে, যা কোনওভাবেই মায়াময় কারণ এটি ক্রমাগত যতটা কৃত্রিম চাহিদা পূরণ করতে পারে তার চেয়ে বেশি তৈরি করে।৫

তিনি আরও বলেন: তারা কেবল যন্ত্র আবিষ্কার এবং নির্মাণের মধ্যেই তাদের বৌদ্ধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং বাস্তবে তারা নিজেই যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে যে আবিষ্কারগুলির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেগুলি হল যতটা বিপজ্জনক, ততটাই বিপজ্জনক যে তারা এমন শক্তিকে কাজে লাগায় যাদের প্রকৃত প্রকৃতি তাদের ব্যবহারকারীদের কাছে একেবারেই অজানা।৬

গুয়েনন এই কার্যকলাপের চূড়ান্ত ফলাফল ভবিষ্যদ্বাণী করার উদ্যোগ নেন: যারা পদার্থের নিষ্ঠুর শক্তিকে শৃঙ্খলমুক্ত করে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, এই একই শক্তির দ্বারা পিষ্ট হবে, যার তারা আর প্রভু থাকবে না।৭

এই বিষয়ে আইনস্টাইনের মন্তব্যগুলি মনোযোগ সহকারে মনোযোগের দাবি রাখে: বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা শিখেছি যে যুক্তিসঙ্গত চিন্তাভাবনা আমাদের সামাজিক জীবনের সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য যথেষ্ট নয়। অনুপ্রবেশকারী গবেষণা এবং তীব্র বৈজ্ঞানিক কাজ প্রায়শই মানবজাতির জন্য দুঃখজনক প্রভাব ফেলেছে, একদিকে এমন আবিষ্কার তৈরি করেছে যা মানুষকে ক্লান্তিকর শারীরিক শ্রম থেকে মুক্তি দিয়েছে, তার জীবনকে সহজ এবং সমৃদ্ধ করেছে, অন্যদিকে, তার জীবনে একটি গুরুতর অস্থিরতা প্রবর্তন করেছে, তাকে তার প্রযুক্তিগত পরিবেশের দাস করে তুলেছে এবং সবচেয়ে বিপর্যয়কর - তার নিজস্ব গণ ধ্বংসের উপায় তৈরি করেছে। এটি প্রকৃতপক্ষে অপ্রতিরোধ্য মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি।৮

তিনি আমাদের ভাগ্যকে বুদ্ধির হাতে অর্পণ করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন: আমাদের যত্ন নেওয়া উচিত যেন বুদ্ধিকে আমাদের স্রষ্টা না করা হয়: এর অবশ্যই শক্তিশালী পেশী আছে, কিন্তু কোনও ব্যক্তিত্ব নেই। এটি নেতৃত্ব দিতে পারে না, এটি কেবল সেবা করতে পারে, এবং নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটি কৃপণ নয়। এই বৈশিষ্ট্যটি এর পুরোহিতদের - বুদ্ধিজীবীদের গুণাবলীতে প্রতিফলিত হয়। বুদ্ধির পদ্ধতি এবং সরঞ্জামের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে কিন্তু লক্ষ্য এবং মূল্যবোধের প্রতি অন্ধ।৯

ফলস্বরূপ, জং-এর ভাষায়, "পৃথিবীর মহান রাস্তাগুলিতে, সবকিছুই জনশূন্য এবং জীর্ণ বলে মনে হয়"।১০

এখন পর্যন্ত আমরা আধুনিক সমাজের কথা বিবেচনা করে আসছি। ব্যক্তি এবং তার সমস্যার দিকে ফিরে যাওয়ার সময় এসেছে। এটি সাধারণত স্বীকৃত যে আধুনিক মানুষ সুখী হওয়া থেকে অনেক দূরে। তার কাছে জ্ঞান, শক্তি এবং বস্তুগত আরাম রয়েছে যা তার পূর্বপুরুষরা স্বপ্নেও ভাবেননি। তবে, এগুলি তাকে এমন জিনিস দেয়নি যা সে সবচেয়ে বেশি চায় - শান্তি এবং সুখ। জগ নিজেকে সেই রোগ নির্ণয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন যা থেকে আধুনিক মানুষ ভুগছে। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে আধুনিক মানুষের শরীর সন্তুষ্ট হলেও তার আত্মা সন্তুষ্ট নয়। তিনি মহাবিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নন। তিনি মহাবিশ্বের সাথে একীকরণের জন্য আকুল হন কিন্তু দেখতে পান যে একটি প্রশস্ত উপসাগর তাকে বাস্তবতার হৃদয় থেকে আলাদা করে দিচ্ছে। কোথাও না কোথাও সে ভুল পথে পা বাড়ায় এবং বিলাসিতায়, তীব্র অসন্তোষের শিকার হয়। কবি ইকবালও একই রকম সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আধুনিক মানুষের সম্পর্কে তিনি বলেছেন: ভালোবাসার তার জীবনে কোন স্থান নেই, এবং বুদ্ধি, সাপের মতো কামড়ানো, তাকে অস্থির রাখে। সে ঐশ্বরিক নির্দেশনাকে তার বুদ্ধিকে বশীভূত ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম করেনি। সে আন্তঃনক্ষত্রিক স্থান অন্বেষণ করে, কিন্তু মনের জগৎকে অনাবিষ্কৃত রেখে গেছে।

সে সূর্যের রশ্মিতে আবদ্ধ শক্তিকে বন্দী করেছে, কিন্তু তার নিজের জীবন অন্ধকারে আচ্ছন্ন (দরবে-এ-কালিম)। আধুনিক মানুষের সম্পদ, ক্ষমতা এবং বিশাল সম্পদ রয়েছে। প্রকৃতির শক্তির উপর তার নিয়ন্ত্রণ এবং তার প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সত্যিই আশ্চর্যজনক। তাহলে তার অসন্তোষ এবং তার সভ্যতার পতনের কারণ কী? কোরআন আমাদের একটি উত্তর প্রদান করে। কারণ হল নিজের মধ্যে: আল্লাহ কখনও কোনও জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা প্রথমে নিজের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন করে (৮: ৫৩)।

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে মানুষের ভাগ্য তার নিজের হাতে। তার যা প্রয়োজন তা হলো হৃদয়ের পরিবর্তন। সে মিথ্যা আদর্শ অনুসরণ করছে এবং নিকৃষ্ট লক্ষ্যের পিছনে ছুটছে। সে নিজেকে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে এবং লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে যাচ্ছে। ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের সাহায্যে সে যে মহৎ লক্ষ্যের আভাস পেয়েছিল তা সে ভুলে গেছে। কিছু সময়ের জন্য সে তা অনুসরণ করেছিল, কিন্তু শীঘ্রই চারপাশে ছড়িয়ে থাকা চকচকে চকচকে বস্তুর দ্বারা নিজেকে আকৃষ্ট হতে দিয়েছে। সে সেগুলি ধরে ফেলেছে কিন্তু তারা তাকে কেবল হতাশা এনে দিয়েছে। তাকে মহিমান্বিত পশুতে পরিণত করার জন্য নয় বরং অস্তিত্বের উচ্চতর স্তরে ওঠার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। সে কেবল স্রষ্টার প্রতি এবং তার নিজের মহৎ সত্তার প্রতি তার ঈমান পুনরুদ্ধার করে নিজেকে রক্ষা করতে পারে যা সে অবহেলা করেছে। তার

রোগের নিরাময় নিহিত আছে স্রষ্টার দিকে ফিরে আসার মাধ্যমে, অর্থাৎ পরম মূল্যবোধের সাধনা পুনরায় শুরু করার মাধ্যমে। আসুন দেখি বার্ট্রান্ড রাসেল এ সম্পর্কে কী বলেন:

আমরা যে পৃথিবীতে নিজেদের খুঁজে পাই, সেখানে ভালোর সম্ভাবনা প্রায় সীমাহীন এবং মন্দের সম্ভাবনাও কম নয়। আমাদের বর্তমান দুর্দশার কারণ, অন্য যেকোনো কিছুর চেয়েও বেশি, আমরা আমাদের বাইরের প্রকৃতির শক্তিগুলিকে ভয়ঙ্কর পরিমাণে বুঝতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে যে শক্তিগুলি মূর্ত আছে সেগুলিকে নয়।১১

কোরআনের বেশ কয়েকটি আয়াত একটি জাতির ধীরে ধীরে পতনের উপর আলোকপাত করে। আমাদের বলা হয়েছে যে, যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, সমাজের উচ্চ স্তরই সর্বপ্রথম দুষ্টতা দ্বারা আক্রান্ত হয়। রাষ্ট্রনায়ক এবং চিন্তার নেতারা মিথ্যা আদর্শ এবং মূল্যবোধের প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার করেন। তারা মনে করেন যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং প্রযুক্তি তাদেরকে বিশ্বের প্রভু করে তুলবে। তারা পরম মূল্যবোধকে কল্পনার কল্পনা, দূরদর্শীদের মনের সৃষ্টি বলে মনে করে। তারা মানুষের মনের লুকানো সম্পদের প্রতি তাদের চোখ বন্ধ করে এবং মানুষের মধ্যে যা মিল রয়েছে তা মহিমান্বিত করে। পশুদের সাথে। তাদের জীবনের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি তাদের অনুসারীরাই গ্রহণ করে। সংক্রমণটি নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে যতক্ষণ না পুরো সমাজ দূষিত হয়।

তুমি কি তাদের দেখেছ যারা অকৃতজ্ঞতার বিনিময়ে আল্লাহর অনুগ্রহ দান করেছে এবং তাদের জনগণকে ধ্বংসের আবাসস্থল - জাহান্নামে নিয়ে গেছে? তারা কি এতে উন্মুক্ত। একটি হতাশাজনক পরিণতি (১৪ ২৮-২৯)।

জনগণও, যেহেতু তারা তাদের নেতাদের দ্বারা নিজেদেরকে বিভ্রান্ত হতে দিয়েছে, তাই তারা মোটেও নির্দোষ নয়। নিঃসন্দেহে, এটা সত্য যে সাধারণ মানুষের তাদের নেতাদের মতো বুদ্ধিমত্তা এবং জ্ঞান নেই। তবে, স্বাধীন দায়িত্বশীল প্রাণী হিসেবে, তাদের কর্তব্য নিজেদের জন্য চিন্তা করা এবং ভুল করলে তাদের নেতাদের তিরস্কার করা। তারা এটি করেনি এবং তাই, তারাও শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে না।

যাইহোক, জাহান্নামে সাধারণ মানুষ তাদের নেতাদের তাদের উপর যে পরিণতি এসেছে তার জন্য দায়ী করবে: আহা! যদি তুমি দেখতে পারতে যখন অন্যায়কারীদের তাদের রবের সামনে হাজির করা হয়, তখন তারা কীভাবে একে অপরের উপর দোষ চাপায়; যারা দুর্বল ছিল (অনুসারীরা) অহংকারীদের (নেতাদের) কিভাবে বলে: "তোমরা না হলে আমরা অবশ্যই বিশ্বাসী হতাম" (৩৪:৩১)।

নেতারা জবাব দেবে যে তারা (অনুসারীরা স্বেচ্ছায় তাদের আনুগত্য করেছিল এবং তাদের অপরাধের ভাগীদার ছিল) : এবং যারা অহংকারী ছিল তারা দুর্বলদের বলবে: "তোমাদের কাছে হেদায়েত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে বিচ্যুত করেছিলাম? বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে অপরাধী" (৩৪:৩২)।

সংক্ষেপে, অনুসারী এবং নেতারা যখন আযাব দেখবে তখন তারা একে অপরের উপর দোষারোপ করবে। অনুসারীরা স্বীকার করবে যে তারা তাদের ইচ্ছামত আনুগত্য করেছে, তবুও তারা বলবে যে তারা তাদের কল্পিত যুক্তি এবং যুক্তি দ্বারা ফাঁদে পড়েছে: যারা দুর্বল ছিল তারা অহংকারীদের বলবে: "না, বরং এটা ছিল তোমাদের রাত-দিনের চক্রান্ত যখন তোমরা আমাদেরকে আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী (তোমাদের মতো) স্থাপন করতে নির্দেশ দিয়েছিলে" (৩৪:৩৩)।

অনুসারীরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে যে নেতাদের উপর দ্বিগুণ শাস্তি দান করুন কারণ তারা দ্বিগুণ অপরাধী ছিল, নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল এবং অন্যদের সাথে নিয়ে গিয়েছিল: এবং তারা বলবে: হে আমাদের রব! হায়! আমরা আমাদের আনুগত্য করেছিলাম আমাদের নেতারা এবং আমাদের মহাপুরুষরা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে এক বিরাট অভিশাপ দাও (৩৩: ৬৭-৬৮)।

এভাবে কোরআন, একটি রূপক রূপে, একটি জাতির পতন ও পতনে নেতা এবং অনুসারীদের নিজ নিজ ভূমিকা প্রদর্শন করে। দুর্নীতি সমাজের উপরের স্তর থেকে শুরু হয় এবং নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে, তাদের নেতাদের অপরাধের সহযোগী হয়ে ওঠে। যদি তারা বিদ্রোহ করত, তাহলে নেতারা হয়তো তাদের জ্ঞান ফিরে পেতেন এবং নিজেদের পরীক্ষা করতেন। ভুল নেতাদের প্রতি তাদের স্বেচ্ছায় আনুগত্য নিজেই একটি অপরাধ ছিল এবং তাদের এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

কেবল ব্যক্তিরাই তাদের উন্নতদের অনুকরণ করে না। জাতিগুলিও শক্তিশালী, ধনী এবং আরও উন্নত জাতিগুলিকে অনুকরণ করতে প্রলুব্ধ হয়। পশ্চাদপদ জাতিগুলি আগ্রহের সাথে একটি উন্নত জাতির নেতৃত্ব অনুসরণ করে। তারা মহান জাতির প্রতি প্রতারক বানরের ভূমিকা পালন করে, বিশ্বস্ততার সাথে এর আচরণ এবং জীবনধারা অনুকরণ করে এবং এর প্রতিষ্ঠান, নৈতিক মান এবং আদর্শ গ্রহণ করে। দুর্বল জাতির বেশিরভাগ সদস্য উন্নত জাতির বিশ্বাস এবং মতামতকে ফ্যাশনেবল করে রাখার জন্য গর্ববোধ করে। নেতা এবং অনুসারীর সম্পর্ক মহান জাতি এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। নেতা জাতি আদেশ দেয় এবং অনুসারী জাতিগুলি বশ্যতা স্বীকার করে। যদি মহান জাতি মিথ্যা আদর্শ এবং মূল্যবোধ অনুসরণ করে, তবে যে জাতিগুলি তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে তারাও তাই করে। অন্য জাতির প্রতি এই

ধরনের নিষ্ক্রিয় বশ্যতা দুর্বল জাতিগুলির সদস্যদের মানসিক শক্তিকে পঙ্গু করে দেয়। তারা স্বাধীন চিন্তাভাবনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তারা নেতা জাতির গ্ল্যামারের কাছে নতি স্বীকার করে এবং এর ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অন্ধ হয়ে যায়। তারা তাদের জীবনকে তার মডেল অনুসারে গড়ে তোলে এবং তার মতো চিন্তা করে এবং অনুভব করে। এটি যা সঠিক বলে মনে করে তা তাদের জন্য সঠিক। তারা মহান জাতির পদক্ষেপে অন্ধভাবে অনুসরণ করে এবং অবশেষে তার সাথে একই অধঃপতনের অতল গহ্বরে পতিত হয়। ইতিহাসে এটি বারবার ঘটেছে। বর্তমান সময়ে, প্রাচ্যের মানুষ পশ্চিমা সভ্যতার গ্ল্যামারে মুগ্ধ। তারা এটিকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে দেখে না। তারা এর ভাল এবং খারাপ উভয় গুণেরই প্রবল ভক্ত। তারাও বস্তুগত সমৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত শক্তির মিথ্যা দেবতাদের উপাসনা করে। যখন তাদের উভয়ের উপর বিপদ আসবে, তখন তারা একে অপরকে দোষারোপ করবে: যখনই কোন জাতি (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে, তখন তারা তার ভগ্নিপতিকে অভিশাপ দেবে, এমনকি যখন তারা সবাই সেখানে চলে যাবে, তখন তাদের পরবর্তীরা তাদের পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে: "হে আমাদের রব! এরা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, অতএব তাদেরকে দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দাও" (৭:৩৮)। আর আল্লাহ বলবেন: প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ (আযাব) আছে কিন্তু তোমরা জানো না (৭:৩৮)। কারণ স্পষ্ট। আল্লাহ সকল মানুষকে "চোখ ও কান" (জ্ঞান ও বোধগম্যতা) দিয়েছেন। তাদের কর্তব্য হলো এগুলোর পূর্ণ ব্যবহার করা। তাদের উচিত সাবধানে চিন্তা করা।

অন্যরা যে কোনও কর্মপন্থা অনুসরণ করার পরামর্শ দেয় তার পরিণতি। যুক্তিবাদী এবং স্বাধীন প্রাণী হিসেবে, তারা তাদের কর্মের জন্য দায়ী। তারা অন্যের কাঁধে দায়িত্ব চাপাতে পারে না। তাদের চিন্তা করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং বেছে নিতে হবে। যদি তারা অন্যদের, বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানে তাদের চেয়ে যতই উচ্চতর হোক না কেন, তাদের চিন্তাভাবনা, সিদ্ধান্ত নিতে এবং বেছে নিতে দেয়, তবে তারা তাদের স্বাধীন পছন্দের অধিকার ত্যাগ করছে। তারা তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করতে হবে, তা তারা যথাযথ বিবেচনার পরে বা যাদের তারা প্রশংসা করত তাদের অচিন্তনীয় অনুকরণে। যদি তারা ঐশ্বরিক ওহী নিয়ে চিন্তা করত এবং অতীতে ভুল জাতিগুলির ভাগ্য নিয়ে চিন্তা করত, তবে তারা নৈতিক শৃঙ্খলার প্রকাশ্য অবাধ্যতা করে কাজ করা একটি জাতির ক্ষণস্থায়ী সাফল্য দেখে হতবাক হত না। তারা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে এবং তাদের পক্ষে যুক্তি দিতে পারে না যে তারা কেবল তাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী লোকদের নেতৃত্ব অনুসরণ করছে: এবং আমরা কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যারা আনন্দিত ছিল কিন্তু জীবিকার উপায়ের অপব্যবহার করেছিল! এবং তাদের বাসস্থানের কথা চিন্তা করো, যেখানে তাদের পরে সামান্য ছাড়া আর কেউ বাস করেনি। আর আমরা, এমনকি আমরাও উত্তরাধিকারী ছিলাম (২৮:৫৮)।

আবার: কত শহর ধ্বংস করেছি যখন তারা অন্যায় করেছিল, যার ফলে আজও ধ্বংসস্তূপে পড়ে আছে, এবং কত পরিত্যক্ত কূপ এবং সুউচ্চ মিনার (২২:৪৫)।

কোরআন তাদের সম্পর্কে বলে যে "তাদের কিংবদন্তিতে পরিণত করা হয়েছে" (২৩:৪৪)। পার্থিব গৌরব কতটা ক্ষণস্থায়ী তা অতীতের মহান শহরগুলির ধ্বংসাবশেষ দ্বারা দেখানো হয়েছে: বলুন: পৃথিবীতে ভ্রমণ করুন এবং দেখুন অপরাধীদের পরিণতি কী হয়েছিল (২৭:৬৯)।

আমাদের ইতিহাস অধ্যয়ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে আমরা সেই পথ এড়াতে পারি যা অন্যদের ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে। আমাদের বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করার এবং সমসাময়িক জাতিগুলির জীবন সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তখন আমরা দেখতে পাব যে জ্ঞান, ক্ষমতা, সম্পদ, এগুলোর কোনটিই একটি জাতিকে রক্ষা করতে পারে না যখন তারা মিথ্যা মূল্যবোধ অনুসরণ করতে শুরু করে: তারা কি দেশে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের হৃদয় আছে যা দিয়ে তারা অনুভব করতে পারে এবং কান আছে যা দিয়ে তারা শুনতে পারে! কারণ প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ হয় না, বরং অন্তর অন্ধ হয়ে যায় (২২:৪৬)।

কোরআন আমাদের যে মহান শিক্ষা দেয় তা হল ব্যক্তি এবং জাতি উভয়ই তাদের নিজস্ব ভাগ্যের স্থপতি। তাদের ভাগ্য তাদের নিজস্ব হাতে। যদি তারা নৈতিক ব্যবস্থাকে অমান্য করতে চায়, তবে তারা নিজেদের উপর অপূরণীয় ধ্বংস ডেকে আনে। অন্যদিকে, যদি তারা চিরন্তন নৈতিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে জীবনযাপন করে এবং পরম মূল্যবোধ অনুসরণ করে, তবে তাদের সামনে অগ্রগতির সীমাহীন দৃশ্য রয়েছে। তবে, কোরআন কেবল এই সাধারণ সত্যটিই বর্ণনা করে না। এটি ব্যক্তি এবং জাতির জন্য আচরণের নিয়মাবলী নির্ধারণ করে। নিম্নলিখিত আয়াতে মূল নীতিটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে: তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, এবং নদীগুলি তাদের নিজ নিজ পরিমাপ অনুসারে প্রবাহিত হয় এবং বন্যা একটি ফোলা ফেনা বহন করে। এবং তারা অলঙ্কার এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিক্ষেপ করার জন্য আগুনে যে ধাতুগুলি গলে যায়, তা থেকে এর মতোই একটি আবর্জনা উৎপন্ন হয়। এভাবে আল্লাহ সত্য এবং মিথ্যার (উদাহরণ) তৈরি করেন। তারপর ফেনার কথা বলতে গেলে, তা তীরে আবর্জনার মতো চলে যায়, আর যা মানুষের জন্য উপকারী, তা পৃথিবীতেই থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ উপমা দিয়েছেন (১৩:১৭)।

অলঙ্ঘনীয় এবং অপরিবর্তনীয় মানদণ্ড হল: কেবল যা সমগ্র মানবজাতির জন্য উপকারী তা-ই অবশিষ্ট থাকে; বাকি সবকিছু আবর্জনার মতো চলে যায়।

এটি চিরন্তন অপরিবর্তনীয় নীতি যা জাতির উত্থান-পতনের উপর আলোকপাত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি জাতি মানবজাতির জন্য উপকারী কিছু অবদান রাখছে এবং বিশ্বের কল্যাণের ভাণ্ডারে যোগ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি সমৃদ্ধ এবং সমৃদ্ধ হয়। যে মুহূর্তে এটি তা করতে ব্যর্থ হয়, তখন এটি নিম্নগামী হতে

শুরু করে এবং অবশেষে বিশ্ব বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করা বন্ধ করে দেয়। এটি অদৃশ্য হয়ে যাক বা দশক বা এমনকি শতাব্দী ধরে স্থায়ী হোক তা অর্থহীন। মহাজাগতিক উদ্দেশ্যের জন্য এর কোনও ব্যবহার নেই এবং এটি অন্যান্য জাতির মাধ্যমে নিজেকে কার্যকর করে তোলে। অতএব, এটা স্পষ্ট যে যে জাতি তার ভালোকে সমগ্র মানবজাতির ভালোর সাথে চিহ্নিত করেছে তারা সঠিক পথ অনুসরণ করছে। সেই জাতি প্রগতিশীল যা মানবজাতির জন্য মূল্যবান কিছু তৈরি করছে, এমন কিছু যা সকল মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করে। সেই জাতি টিকে থাকবে যা সকল মানুষের জন্য সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধির জীবন নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা করে। সশস্ত্র শক্তি, প্রকৃতি এবং সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ, কোনও জাতির কোনও কাজে আসবে না যদি তাদের নীতিগুলি মানবজাতির স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হয়। এটি অবশ্যই বিলুপ্ত হবে, কারণ, কেবলমাত্র যা সমগ্র মানবজাতির জন্য উপকারী তা-ই অবশিষ্ট থাকে (১৩ ১৭)।

**৫. মহাজাগতিক প্রক্রিয়া**

এই আলোচনাটি এই প্রশ্ন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল: কেন মানবজাতির জন্য শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ এবং গৌরবময় জীবনের নিশ্চয়তা প্রদানকারী কোরআনের সামাজিক ব্যবস্থা বিশ্বের কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এমনকি কোনও মুসলিম রাষ্ট্রেও নয়, যদিও ঐশ্বরিক নির্দেশনা চৌদ্দ শতাব্দী ধরে আমাদের সাথে রয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রদত্ত উত্তর হল যে মহাজাগতিক প্রক্রিয়াটি ধীর, ক্রমিক বা ঐতিহাসিক সময়ের দ্বারা পরিমাপ করা হলে খুবই ধীর। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার প্রয়োজন।

ঐশ্বরিক পরিকল্পনা অনুসারে, এবং পর্যায়ক্রমে বহির্বিশ্বে বিবর্তনীয় পরিবর্তনগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে, প্রতিটি সম্পন্ন করতে হাজার হাজার বছর সময় লাগে। এই মহাজাগতিক প্রক্রিয়া। তবে, মানুষের ক্ষেত্রে, এই প্রক্রিয়াটি কিছুটা ভিন্ন উপায়ে কাজ করে। মানুষ (এবং এখানে আমরা ঐশ্বরিক নির্দেশনার আলোকে ভ্রমণ করার কথা বলছি না) যখন পরিস্থিতির দ্বারা বিদ্যমান কোনও পরিস্থিতি পরিবর্তন করার জন্য চাপে পড়ে, তখন এমন একটি পথ গ্রহণ করে যা সে সর্বোত্তম বলে মনে করে, দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু শেষে দেখতে পায় যে গৃহীত পথটি ভুল ছিল। সে তা পরিত্যাগ করে এবং অন্য পথে যাত্রা শুরু করে। এটি তাকে বারবার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। প্রায়শই সে তার যাত্রার সময় ক্লান্ত বোধ করে এবং চরম হতাশার মধ্যে পরীক্ষাটি অসম্পূর্ণ রেখে যায়। এমনকি যখন সে তার গন্তব্যে পৌঁছায়, তখন জড়িত শ্রম এবং ব্যয়িত সময়, অর্জিত ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না - মানুষের জীবনের সময়কাল এত কম এবং দূরত্ব এত দীর্ঘ। "পরীক্ষা এবং ত্রুটি" এই প্রক্রিয়াটি মহাজাগতিক প্রক্রিয়ার আরেকটি রূপ। কিন্তু, মানুষকে পথপ্রদর্শক ছাড়া অথবা পথে কোনও সাইনবোর্ড ছাড়াই তার পথ খুঁজে বের করার জন্য মরুভূমিতে ফেলে রাখা হয়নি। সে ঐশ্বরিক নির্দেশনা লাভ করেছে। যদি সে সরাসরি এর দ্বারা প্রস্তাবিত পথ গ্রহণ করে, তবে সে কেবল বিপদ থেকে রক্ষা পাবে না বরং লক্ষ্যে পৌঁছাতে সময়ও মহাজাগতিক গণনা থেকে মানব ক্যালেন্ডারে সংকুচিত হবে। চৌদ্দশ বছর আগে, একদল বিশ্বাসী এই পরীক্ষাটি সবচেয়ে

সফলভাবে করেছিলেন, যা এর উৎপাদিত অলৌকিক ফলাফল ছাড়াও প্রমাণ করেছিল যে কোরআনের সমাজ ব্যবস্থা একটি ইউটোপিয়া ছিল না এবং এটি প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ধারিত কর্মসূচিও অকার্যকর ছিল। তবে তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলি সেই পথ পরিত্যাগ করেছিল, যার ফলে তাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলির মতো একই পরিণতি হয়েছিল - যারা একইভাবে কাজ করেছিল। (যাইহোক, এটি জাতির উত্থান ও পতন নিয়ন্ত্রণকারী ঐশ্বরিক আইনের কার্যকারিতার নেতিবাচক প্রমাণ)। ঐশ্বরিক পথ এখনও বিদ্যমান এবং যে কোনও জাতি নিরাপদে এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মানব গন্তব্যে পৌঁছাতে চায় তারা এটি গ্রহণ করতে পারে:

বলুন: আপনার রবের কাছ থেকে সত্য এসেছে; তাই যে কেউ গ্রহণ করতে চায়, আর যে কেউ প্রত্যাখ্যান করতে চায় তাকে তা দিতে দাও (১৮ ২৯)।

### *তথ্যসূত্র*


১. ১৯২৭ সালের শ্রম সনদ, আর্নেস্ট বার্কার কর্তৃক উদ্ধৃত, প্রিন্সিপলস অফ সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল থিওরিতে, পৃষ্ঠা ১৩৩।

২. আর. ব্রিফোল্ট, দ্য মেকিং অফ হিউম্যানিটি, পৃষ্ঠা ১৫৯।

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৯।

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬২।

৫. রেনে গুয়েনন, দ্য ক্রাইসিস অফ দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড, পৃষ্ঠা ২৬।

৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৬; ১৩১।

৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৬।

৮. এ. আইনস্টাইন, আউট অফ মাই লেটার ইয়ার্স, পৃষ্ঠা ১৫২।

৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬০।

১০. সি. জি. জং, মডার্ন ম্যান ইন সার্চ অফ সোল, পৃষ্ঠা ১০। ২৫১.

১১. বি. রাসেল, কর্তৃপক্ষ এবং ব্যক্তি, পৃ. ১২৫.

# অধ্যায় ১৮
# মানুষ এবং তার পরিবেশ

**১. মানুষ এবং মহাবিশ্ব**
কেবলমাত্র যা টিকে থাকে তা মানবজাতির জন্য উপকারী (১৩:১৭)।

গত অধ্যায়ের শেষে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি চিন্তা-উদ্দীপক, এবং আমরা এর তাৎপর্য অনুসন্ধান এবং অন্বেষণ করার একটি প্রচেষ্টা পাব, যা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। মানুষের কার্যকলাপ বিচার করার জন্য এখানে একটি নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড রয়েছে। কেবলমাত্র সেই কার্যকলাপের অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে যা মানবজাতির জন্য উপকারী কিছু উৎপাদনের দিকে পরিচালিত করে। তবে মানদণ্ডটি এর চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে যায়। বিবর্তনের ধারায়, কেবলমাত্র সেই বৈচিত্রগুলিই সংরক্ষিত ছিল যা প্রজাতির বেঁচে থাকার সংগ্রামে তাদের উপকারে আসে। একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, ভৌত জগৎও, অসংখ্য যুগের ব্যবধানে, মানুষের বসবাস এবং সত্যিকারের মানবিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপযুক্ত স্থানে পরিণত হয়েছে। পৃথিবী যদি ক্রমশ উষ্ণ বা ঠান্ডা হয়ে উঠত, তাহলে মানুষ অনেক আগেই তার তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যেত। যেমন আছে, সে এতে সমৃদ্ধ এবং সমৃদ্ধ হয় এবং এটি বোঝার এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার প্রচেষ্টা প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত হয়েছে। এখন, সে তার ভৌত পরিবেশকে এমনভাবে পরিবর্তন করতেও হাত দেয় যা তাকে অস্তিত্বের মাপকাঠিতে আরও উঁচুতে উঠতে সাহায্য করে।

তবে, ভৌত পরিবেশের প্রতি এই চ্যালেঞ্জিং মনোভাব সাম্প্রতিককালের। দীর্ঘ যুগ ধরে, মানুষ পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। আদিম মানুষ নিজেকে ধ্বংস করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ শত্রু শক্তি দ্বারা বেষ্টিত বলে বিশ্বাস করত। সে বিশ্বাস করত যে তার বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হল সেই শক্তিগুলিকে শান্ত করা এবং শান্ত করা, এবং ফলস্বরূপ, সে তাদের মূর্ত রূপ এবং দেবতা রূপে রূপান্তরিত করে। সম্পূর্ণ অসহায়ত্বের অনুভূতিতে পীড়িত হয়ে, সে ভেবেছিল যে সে কেবল দেবতাদের করুণা জাগিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারে। সে প্রচণ্ড ঝড়, উত্তাল নদী বা প্রচণ্ড বজ্রপাতকে শান্ত করার জন্য এমন পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল যা একজন ক্রোধিত প্রতিবেশী বা ক্রোধী শত্রুকে শান্ত করতে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল। জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে, বিশ্বের এই আদিম দৃষ্টিভঙ্গি পৌত্তলিকতা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। পৌত্তলিকরা পৃথিবীতে আরও নিরাপদ বোধ করত এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব বলে মনে করত। মানুষের ভৌত প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের প্রথম স্থূল প্রচেষ্টা জাদু এবং জাদুবিদ্যার রূপ নিয়েছিল। পরবর্তীতে, আরও উন্নত পৌত্তলিকরা জাদুবিদ্যার বিকাশ ঘটিয়ে প্রকৃতি বোঝার জন্য তাদের বুদ্ধির উপর নির্ভর করেছিল। তবে, প্রাচীন বিশ্বাস যে ভৌত প্রকৃতি মানুষের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ এবং বিজাতীয়, তা স্থায়ীভাবে

স্থায়ীভাবে পৌত্তলিক চিন্তাবিদদের চিন্তাভাবনাকে রঙিন করে তুলেছিল। প্লেটো তার বিশ্বাস মানুষের যুক্তির উপর স্থাপন করেছিলেন এবং বস্তুজগৎ যুক্তির ধারণা এবং রূপের পরিপূর্ণতা থেকে অনেক দূরে থাকা দেখে তিনি এটিকে বাস্তব জগতের একটি দুর্বল এবং ক্ষীণ অনুলিপি হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি ভৌত জগৎকে বাস্তবতার ছায়া হিসেবে সম্পূর্ণ অবজ্ঞার চোখে দেখেছিলেন। দার্শনিক, তিনি বিশ্বাস করতেন, চিরন্তন ধারণা এবং রূপের চিন্তাভাবনায় নিমগ্ন থাকা উচিত। প্লেটোবাদের অন্য জাগতিক প্রবণতাটি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত আকারে নব্য-প্লেটোবাদে আবির্ভূত হয়েছিল, যা সকল ধরণের রহস্যবাদের উৎস। প্রকৃত রহস্যবাদী ভৌত পরিবেশকে মূলত মন্দ বলে মনে করেন এবং তার প্রধান উদ্বেগ হল এটিকে এড়িয়ে চলা এবং এর দ্বারা দূষিত হওয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা। তিনি ভৌত জগতের সাহায্যে নয় বরং এর সাথে সমস্ত যোগাযোগ এড়িয়ে মুক্তি চান।

রহস্যবাদীরাও প্লেটোর জ্ঞান তত্ত্বের প্রতি আস্থা রাখেন। প্লেটো মনে করতেন যে ইন্দ্রিয়গুলি প্রতারণামূলক এবং এর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান অবিশ্বাস্য। ইন্দ্রিয়-অনুভূতি প্রকৃত জ্ঞান প্রদান করতে পারে না; সর্বোপরি, এটি কেবল মতামত প্রদান করতে পারে। যুক্তিই প্রকৃত জ্ঞানের একমাত্র উৎস। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের পরিবর্তে, আমাদের অতীন্দ্রিয় বাস্তবতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। এই রহস্যবাদী নির্জনতা খুঁজতেন যেখানে তিনি নিজেকে ধ্যান ও চিন্তাভাবনায় নিয়োজিত করতে পারতেন। নিজের মধ্যে ডুবে থাকা অবস্থায়, তিনি প্রকৃতির প্রতি যতটা উদাসীন ছিলেন ততটাই মানব সমাজের প্রতিও ছিলেন। সামাজিক জীবনের সমস্যাগুলিতে তিনি খুব কমই আগ্রহী ছিলেন বা ছিলেন না। একটি সামাজিক ব্যবস্থা তার জন্য অন্যটির মতোই ভালো বা খারাপ ছিল। সাধারণ মানুষের জন্য জীবনকে আরও উপভোগ্য এবং মনোরম করে তোলার লক্ষ্য তার কাছে আকর্ষণীয় ছিল না। তার জন্য আদর্শ জীবন ছিল সন্ন্যাসীর জীবন। তিনি পরম সত্তার সাথে মিলন কামনা করেছিলেন, ভৌত এবং সামাজিক উভয় জগতের প্রতিই অজ্ঞ ছিলেন। চরম আত্মনিষ্ঠার সাথে, মানুষের সাথে মিশতে এবং জীবনের অবস্থার উন্নতির জন্য তাদের সাথে কাজ করতে তার কাছে অপ্রীতিকর ছিল। সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলি তার মনে আগ্রহের স্ফুলিঙ্গ জাগিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল, যেমনটি অন্যান্য জাগতিক বিষয়গুলির সাথে মগ্ন ছিল। প্রকৃতিকে বুঝতে এবং তার শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে শেখার মাধ্যমে, তিনি আত্ম-বিকাশ এবং আত্ম-উপলব্ধিতে আরও ভালো অগ্রগতি অর্জন করতে পারবেন বলে তিনি মনে করেননি। তিনি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তিনি নিজের সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। মানুষকে বিচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়ন করলে মানব জীব এবং তার সম্ভাবনা বোঝা যায় না। তাকে বোঝার জন্য, আমাদের তাকে তার ভৌত পরিবেশের প্রেক্ষাপটে অধ্যয়ন করতে হবে। প্রকৃতি এবং সমাজের জগতের সাথে ঘনিষ্ঠ মিথস্ক্রিয়াতেই মানুষের আত্মা তার সমস্ত মহিমায় নিজেকে প্রকাশ করে। মানুষের মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি কেবল প্রকৃতির শক্তির সাথে লড়াই করে এবং তাদের পরাস্ত করেই বাস্তবায়িত করা যেতে পারে। তথাকথিত "আধ্যাত্মিক" বিকাশ যা বিভাজন।

শারীরিক ও মানসিক বিকাশ থেকে উদ্ভূত এবং যা সকল ধর্মের লক্ষ্য, এর কোন অর্থ নেই। মানুষ একটি জীব এবং জীবের এক দিক অন্য দিকের বিনিময়ে বিকশিত হতে পারে না। তাকে সামগ্রিকভাবে বিকশিত হতে হবে। যদি তার বিকাশ একতরফা হয় তবে তাকে একটি ভারী মূল্য দিতে হবে। তাকে শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক - সকল ক্ষেত্রেই অগ্রগতি করতে হবে এবং এভাবেই তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে। তিনি কেবল বিশ্বকে বসবাসের জন্য একটি উন্নত স্থান করে তোলার মাধ্যমে এবং স্বাধীনতা এবং বিকাশের জন্য পূর্ণ সুযোগ প্রদানকারী একটি সামাজিক সংগঠন তৈরি করে অগ্রগতির পথ খুলে দিতে পারেন। এখানেই রহস্যবাদীরা ব্যর্থ হন। তাদের কেবল একটি সংকীর্ণ দৃষ্টি ছিল। তাদের নিজস্ব কল্পনার সম্পূর্ণ "আধ্যাত্মিক" বিষয়গুলিতে ব্যস্ত থাকা, যা বাস্তবে বিদ্যমান নয়, তারা তাদের পরিবেশের সাথে একটি গতিশীল সম্পর্ক উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাদের লক্ষ্য করা উচিত ছিল মহাবিশ্বে মানুষের জ্ঞান এবং মহাবিশ্বের সাথে সম্পর্কের দিকে। বিচ্ছিন্নভাবে মানুষ খুব কমই মানুষ। শুধুমাত্র যখন সে তার ভৌত পরিবেশ এবং তার সহ-সত্তার সংস্পর্শে আসে যেখানে সে উন্নীত হয়: তার পূর্ণ মর্যাদা।

**২. মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে কোরআন**

কোরআন মানুষকে প্রকৃতির সাথে একটি অর্থপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে ফেলেছে। কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য বোঝার জন্য, আমাদের এটিকে আরও দুটি দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তুলনা করা উচিত যা কিছু আধুনিক চিন্তাবিদ দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন। এর মধ্যে একটির মতে, প্রকৃতি অবশ্যই মানুষের প্রতি শত্রু এবং তার মহৎ উদ্যোগগুলিকে ব্যর্থ করে দিতে পৈশাচিক আনন্দ পায়। হার্ডি এবং শোপেনহাওয়ার জীবন সম্পর্কে একটি বিষণ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন যে মানুষ শান্তি, অসংবেদনশীলতার শান্তি উপভোগ করতে পারে, কেবল তখনই যখন তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। অন্য দৃষ্টিভঙ্গিটি আধুনিক চিন্তাধারার আবিষ্কারের সাথে স্পষ্টতই বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মতে, প্রকৃতি মানুষ এবং তার আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। মানুষ সফল হোক বা ব্যর্থ হোক তা কেবল তার পরোয়া করে না। মানব ইতিহাস মহাজাগতিক বিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত পর্ব হতে পারে। মানুষ তার পৃষ্ঠ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরেও পৃথিবী যুগ যুগ ধরে সূর্যের চারপাশে ঘুরতে পারে। এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে কোরআন প্রকৃতিকে মানুষের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ, তার বুদ্ধির প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল এবং তার নৈতিক প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতিশীল হিসাবে উপস্থাপন করে। প্রকৃতি এবং মানুষ উভয়কেই একজন জ্ঞানী এবং দানশীল স্রষ্টা দ্বারা সৃষ্ট করা হয়েছে এবং মৌলিকভাবে তাদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। মানুষ কেবল প্রকৃতির সাহায্যেই বিকশিত হতে পারে। এই সাহায্য সে পেতে পারে যদি সে প্রকৃতির জ্ঞান অর্জন করে এবং ঐশ্বরিক নির্দেশনার আলোকে তার নৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য তা ব্যবহার করে। যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে তা হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। একমাত্র পদ্ধতি যার মাধ্যমে সে প্রকৃতি লাভজনকভাবে অধ্যয়ন করতে পারে তা হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে সজ্জিত হয়ে সে প্রকৃতিকে তার সেবায় নিয়োজিত করতে পারে।

প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করা যেতে পারে। কোরআন এই সত্যকে রূপক ভাষায় প্রকাশ করেছে যে "মালাইকা (মহাজাগতিক শক্তি) আদম (মানুষ) এর সামনে সিজদা করেছিল" (২': ৩৪)। নীচে উদ্ধৃত আয়াতগুলি যেমন দেখায়, মানুষ ভৌত জগতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে এবং এর মালিক হওয়া তার নিয়তি:

স্রষ্টা সূর্য ও চন্দ্রকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, তাদের কার্য সম্পাদনের জন্য, এবং তিনি রাত ও দিনকে তার সেবায় নিয়োজিত করেছেন (১৪: ৩৩)।

আবার: আর তিনি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন যা কিছু আসমানে এবং যা কিছু জমিনে আছে; সবকিছুই তাঁর কাছ থেকে। দেখ! এখানে নিঃসন্দেহে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে (৪৫:১৩)।

আমরা যদি ভৌত জগতের উপর চিন্তা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে এটি অপরিবর্তনীয় নিয়ম দ্বারা পরিচালিত, এবং এই নিয়মগুলি আবিষ্কার করে আমরা এর সবকিছুকে বশীভূত করতে পারি এবং এটিকে আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারি। মানুষের ভাগ্য প্রকৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যে নয় বরং এটিকে তার ইচ্ছার আনুগত্য করাতে নিহিত।

কোরআন দাবি করে যে, ভৌত জগৎ কোন ছায়া বা মায়া নয়। এটি বাস্তব এবং কেবল একটি আভাস নয়। "এবং আমরা আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সবকিছু নিরর্থকভাবে সৃষ্টি করিনি" (৩৮:২৭)। যারা দৃশ্যমান জগতের সাথে বাস্তবতা আরোপ করতে অস্বীকার করে তারা ভুল করে। "এটি তাদের মতামত যারা (সত্যে) বিশ্বাস করে না" (৩৮:২৭)। এই লোকেরাই পৃথিবীকে একটি মায়া বলে মনে করে। যদি এটি একটি মায়া হয়, তবে এর অর্থ হল এর কোনও অর্থ নেই। ইসলাম এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কুফর বলে প্রত্যাখ্যান করে। কোরআন বলে যে মহাবিশ্ব বিল হক্ব দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, যার অর্থ এটি সত্য এবং এর একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। "আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে হক্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন" (২৯:৪৪)। অতএব, বিশ্বাসী মু'মিনদের কর্তব্য হলো তাদের চোখের সামনে ছড়িয়ে থাকা সত্যকে পর্যবেক্ষণ করা। "এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিঃসন্দেহে একটি নিদর্শন রয়েছে" (২৯:৪৪)। মহাবিশ্বের বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। এটি (হিন্দুদের মতে) রামের লীলা নয়, এমন একটি খেলনা যা দিয়ে স্রষ্টা এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে আনন্দিত করেন, না ব্রহ্মার স্বপ্নও নয়। উভয় ক্ষেত্রেই এর কোনও গুরুতর উদ্দেশ্য থাকত না এবং স্রষ্টা জেগে উঠলে বা কোনও গুরুতর কাজে মনোনিবেশ করলে অদৃশ্য হয়ে যেত। কোরআন এই মতামতগুলিকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে: এবং আমরা আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সবকিছুকে খেলার জন্য সৃষ্টি করিনি। আমরা তাদেরকে হক্ব ছাড়া সৃষ্টি করিনি (৪৪:৩৮-৩৯)।

**৩. জ্ঞান**

কোরআন দুই ধরণের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করে - ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ধারণাগত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা ভৌত পরিবেশের সেই অংশ সম্পর্কে সচেতন হই এবং তার সাথে মোকাবিলা করি যা বর্তমানে আমাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ধারণাগত জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা মূর্ত তথ্যের বিশেষত্বের ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্বের বহুত্বের অন্তর্নিহিত ঐক্যকে উপলব্ধি করি। আমরা যে ধারণাগত কাঠামো তৈরি করি তা বাস্তব জগতের সমৃদ্ধ স্পষ্ট বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে, তবুও এটি আমাদের প্রকৃতির কার্যকারিতা এবং এর উপর নিয়ন্ত্রণের বৃহত্তর ক্ষমতা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দেয়। লক্ষণীয় বিষয় হল যে উভয় ধরণের জ্ঞানের উৎস ইন্দ্রিয়গুলিতে রয়েছে। প্লেটোনিক জ্ঞান তত্ত্বে, যুক্তি ইন্দ্রিয় থেকে স্বাধীনভাবে বাস্তবের জ্ঞান অর্জন করতে পারে। কোরআন "জ্ঞানমূলক কার্যকলাপে" ইন্দ্রিয়গুলির ভূমিকার পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়। কোরআন অনুসারে, মন (ফুয়াদ) ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রদত্ত তথ্য থেকে জ্ঞানের জন্য হাতড়ায়।

আমরা দেখতে পাই যে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞানের অভিজ্ঞতাগত তত্ত্বের কাছাকাছি, যদি একই রকম না হয়, তবে। কোরআন মানুষকে তার ইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে এবং প্রকৃতিকে বিচক্ষণতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে উৎসাহিত করে। প্রকৃতি এবং তার পথ জানার প্রথম ধাপ এটি: এবং এমন কিছুর অনুসরণ করো না যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। দেখো! এই প্রত্যেকের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয় জিজ্ঞাসা করা হবে (১৭:৩৬)।

যারা তাদের ইন্দ্রিয় এবং মানসিক শক্তির যথাযথ ব্যবহার করে না তারা পশু পর্যায়ে চলে যায়। "সভ্য এবং যাযাবর উভয় ধরণের মানুষেরই অনেক জীবন এমনভাবে যাপন করে যা তাদের নরকে নিপতিত করে" (৭:১৭৯)। এর কারণ হল "তাদের হৃদয় আছে যা দিয়ে তারা বোঝে না, চোখ আছে যা দিয়ে তারা দেখে না, এবং কান আছে যা দিয়ে তারা শোনে না" (৭:১৭৯)। ফলস্বরূপ তারা আর যুক্তিবাদী প্রাণী হতে পারে না। "এরা গবাদি পশুর মতো; বরং তারা আরও খারাপ। এরাই হল অবহেলাকারী" (৭:১৭৯)।

এই ধরণের লোকদের সম্পূর্ণ বিপরীত হল তারা যারা স্রষ্টার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে, কারণ তারা জানে যে "আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে অবশ্যই জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে" (৩:১৮৯)। তারা সেইসব লোক যারা "দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহর আইন মনে রাখে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে" (৩:১.৯০)। যখন তারা প্রকৃতির মহিমা নিয়ে চিন্তা করে, তখন তারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয় এবং চিৎকার করে বলে: "হে আমাদের রব! তুমি এটাকে নিরর্থক সৃষ্টি করোনি" (৭:১৯০)। যখন তারা মুমিনদের (মু'মিনদের) মনোভাব নিয়ে প্রকৃতির কাছে যায়, তখন তারা তাদের হাড়ে হাড়ে অনুভব করে যে এর একটি অর্থ এবং একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক

সততার সাথে, তারা স্বীকার না করে থাকতে পারে না যে এর কিছু জিনিস তাদের জ্ঞানের বর্তমান স্তরে তাদের কাছে বোধগম্য নয়। বিনয়ের সাথে তারা স্বীকার করে যে তারা জানে না, তবে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে যদি তারা আরও জ্ঞান অর্জন করতে থাকে, তাহলে একদিন তারাও এর অর্থ বুঝতে পারবে। যাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস নেই তারা "এক ধরণের নরকে" বাস করে (৭:১৯১), এবং দুঃখের বিষয় হল যে কেউ তাদের সাহায্য করতে পারে না" (৭:১৯১)।

যারা প্রকৃতি অধ্যয়ন করে এবং এটিকে পরিচালিত করে এমন আইন আবিষ্কার করার চেষ্টা করে তাদের "জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ" হিসেবে কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে; কারণ, কোরআন বলে: "দেখো! "আকাশ ও পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে" (৪৫:৩)। জ্ঞান অন্বেষণে, বিশ্বাসীরা তাদের ঈমান দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। "এবং তোমাদের সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে তিনি যে সমস্ত জীবজন্তু ছড়িয়ে দেন, তা সেই জাতির জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে যাদের ঈমান নিশ্চিত" (৪৫:৪)। তারা জানে যে রাত ও দিনের পরিবর্তন এবং আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিজিক বর্ষণ করেন এবং তার মাধ্যমে পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত করেন, এবং বায়ুর ক্রমবিন্যাস, তা বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী (৪৫:৫)। রাসূলকে বলা হয়েছে: এগুলো আল্লাহর নিদর্শনাবলী যা আমরা তোমাকে হক্কের সাথে পাঠ করছি (৪৫:৬)।

আল্লাহর প্রতি ঈমান সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত যুক্তির উপর নির্ভর করে না: এটি প্রকৃতির শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য এবং সৌন্দর্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হয়। কোরআন বলে যে এগুলো অদৃশ্য সত্তার দৃশ্যমান নিদর্শন: তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর নিদর্শনাবলী ছাড়া তারা আর কাদের উপর বিশ্বাস করবে? (৪৫:৬)।

কোরআনের মতে, ঈমান "স্রষ্টার দ্বৈত উৎস রয়েছে। প্রকৃতির বাইরের জগৎ এবং মানুষের নিজের উপর চিন্তাভাবনা আমাদেরকে সেই শক্তির দিকে পরিচালিত করে যা উভয়ের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। প্রকৃতি স্রষ্টার কাছে পৌঁছানোর পথ প্রদান করে এই জোর দিয়ে, কোরআন তথাকথিত প্রাকৃতিক ধর্মের বৈধতা স্বীকার করে।" তবে, এটি আরও যোগ করে যে প্রকৃতির চিন্তাভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত ঈমানকে ওহী দ্বারা শক্তিশালী করা উচিত। এটি দুটি প্রভাবের ধারার মিলন যা একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী, মু'মিনের ঈমান তৈরি করে। অবিশ্বাসী, কাফির, সেই ব্যক্তি যার মন শুষ্ক কারণ এটি উভয় ধারা দ্বারা সেচিত হয়নি। ঈমান কোনও মতবাদের প্রতি নিষ্ক্রিয় সম্মতি নয়। এটি স্রষ্টার আইনের স্পষ্ট অনুভূতি যা শরীরের প্রতিটি কোষকে মহাবিশ্বে বিদ্যমান অসীম শক্তির সাথে একত্রে কম্পিত করে। যখন ঈমান আসলে জীবনের একটি উপায়ে প্রকাশিত হয়, এবং যখন এটি তার মধ্যে প্রবেশ করে মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে এবং তাকওয়া প্রদান করে, কোরআনের ভাষায় একে তাকওয়া বলা হয়। ঈমান ও তাকওয়ায় সজ্জিত মু'মিনরা প্রতিটি ধ্বংসাত্মক শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে: নিশ্চয়ই, রাত ও দিনের পরিবর্তন এবং আকাশ

ও পৃথিবীতে স্রষ্টা যা সৃষ্টি করেছেন, তা অবশ্যই সেই সমস্ত লোকদের জন্য নিদর্শন যারা আল্লাহর আইন মেনে চলে এবং ধ্বংসাত্মক শক্তি থেকে রক্ষা পেতে চায় (১০:৬)।

উপরের নক্ষত্রময় আকাশের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কোরআন আমাদের মনে এর অসীমতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। আকাশের কথা চিন্তা করার সময় আমরা অসীমকে চিন্তা করছি। এতে আমাদের কৌতূহল, বিস্ময়, বিস্ময়, শ্রদ্ধা এবং মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের অনুভূতির সমন্বয়ে গঠিত একটি উচ্চমানের মূল্যবান অভিজ্ঞতা রয়েছে। কে জানে, মহাকাশের অসীমতায় অগণিত ছায়াপথের মধ্যে কিছুতে জীবন এবং যুক্তি থাকতে পারে: এবং তাঁর নিদর্শনগুলির মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, এবং তিনি উভয়ের মধ্যে জীবন্ত জিনিস ছড়িয়ে দিয়েছেন; এবং তিনি (তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে) তাদেরকে একত্রিত করার ক্ষমতা রাখেন (৪২:২৯)।

**৪. জ্ঞানী ব্যক্তি**

আমরা দেখেছি যে কোরআন জ্ঞান অর্জনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে কোরআন "জ্ঞান" শব্দটি এমন কিছুর জন্য ব্যবহার করে না যা কেবল বুদ্ধি নিজেই তৈরি করে বা সম্মিলিতভাবে ইন্দ্রিয়-তথ্যের জন্য নয়, বরং ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির মিথস্ক্রিয়ার ফসলের জন্য ব্যবহার করে। আমরা এখন জিজ্ঞাসা করতে পারি যে কোরআন কাদের জ্ঞানী ব্যক্তি বলে মনে করে - উলামা। নীচে উদ্ধৃত আয়াতগুলি থেকে একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়: তুমি কি দেখেছ যে আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে বিভিন্ন রঙের ফল উৎপন্ন করেন, এবং পাহাড়ের মধ্যে সাদা, লাল, বিভিন্ন রঙের এবং অন্যগুলি কালো রঙের রেখা রয়েছে। এবং মানুষ, পশু এবং গবাদি পশুর মধ্যেও একইভাবে বিভিন্ন রঙের। তাঁর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তিরা (সৃষ্টির বিশালতা এবং এটি পরিচালনাকারী ঐশ্বরিক আইনের প্রতিফলন করে) বিস্মিত হন এবং বিস্মিত হন (৩৫:২৭-২৮)।

এই আয়াতগুলিতে আমরা সাধারণ বিজ্ঞানের স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাই। অতএব, জ্ঞানী ব্যক্তিরা হলেন তারা যারা এই প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন, অর্থাৎ, তারাই সেই ব্যক্তি যাদের আমরা এখন বিজ্ঞানী বলি। উলামাদের কর্মক্ষেত্র হল মানুষ এবং প্রকৃতির বিজ্ঞান। এটা স্পষ্ট যে "মুসলিম উলামা" দীর্ঘকাল ধরে তাদের যথাযথ অধ্যয়নের বিষয় ত্যাগ করেছেন এবং তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তাকে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে প্রয়োগ করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অনুষঙ্গ, আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে ডুবে থাকার কারণে, তারা স্রষ্টার আদেশ অনুসারে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং অধ্যয়ন করার জন্য সময় ব্যয় করতে পারেননি। প্রকৃতির বিস্তৃত জগতের উপর বিস্তৃত হওয়ার পরিবর্তে, তাদের মন একটি সংকীর্ণ বৃত্তে চলে গিয়েছিল যার ফলে এটি তার প্রাণশক্তি এবং নমনীয়তা হারিয়ে ফেলেছে। এখনই সময় তাদের মনোযোগ তাদের সঠিক অধ্যয়নের বিষয়বস্তুর দিকে - স্রষ্টার নিদর্শন ও নিদর্শন, প্রকৃতির

বিভিন্ন ঘটনা এবং মানুষের মনের দিকে - মনোযোগ দেওয়ার: এবং আমরা তাদের দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শনগুলি দেখাব, যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এটি হক (৪১:৫৩)।

আমাদের জ্ঞানের সাথে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতির গোপন শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্য আমাদের কাছে প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে আমরা বিশ্বাস করি যে কোরআন সত্যকে ধারণ করে। আমরা বিশ্বাস করি যে "তিনিই এটি (কোরআন) প্রেরণ করেছেন যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন রহস্য জানেন" (২৫:৬)। অতএব, আমাদের উচিত "আনফুস (মানব সত্তা) এবং আফাক (ভৌত জগত) -এ প্রকাশিত তাঁর নিদর্শনগুলি" (৪১:৫৩) নিয়ে চিন্তা করা, যাতে তাঁর সৃষ্টির আইনের প্রকাশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। প্রকৃতির সাথে আমাদের যোগাযোগ যত বেশি ঘনিষ্ঠ হবে, ততই ঐশ্বরিক আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি গভীর হবে যা মহাবিশ্বকে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিচালিত করে।

এই মুহূর্তে আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে যে আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গিটি ব্যাখ্যা করছি তা প্রকৃতিবাদের একধরণের ব্র্যান্ড ছাড়া আর কিছুই নয় যার মধ্যে স্রষ্টাবাদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। "ঐশ্বরিক" উলামাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আমরা তাদেরকে কেবল বিজ্ঞানের মানুষ করে তুলছি এবং তাদের যথাযথ ক্ষেত্র যা একটি "ধর্ম" তা ত্যাগ করতে বলছি। আমরা একমত যে "ধর্ম" হিসাবে যা বলা হয় তার প্রেক্ষাপটে "ঐশ্বরিক"দের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ফিরে যেতে বলা অধর্ম হবে। কিন্তু ইসলাম একটি "ধর্ম" নয়, এটি দ্বীন, এবং দ্বীন হল একটি ভারসাম্যপূর্ণ পার্থিব ও ধার্মিক বিষয়। প্রকৃতির শক্তিগুলিকে জয় করা এবং ওহীর দ্বারা নির্ধারিত স্থায়ী মূল্যবোধ অনুসারে মানবজাতির কল্যাণের জন্য তাদের ব্যবহার করা দ্বীন। প্রকৃতির শক্তিগুলিকে ভালোভাবে ব্যবহার করার আগে আপনাকে প্রথমে তাদের আয়ত্ত করতে হবে। বিজ্ঞান কেবল একটি মিত্র নয় বরং দ্বীনের পূর্বশর্ত। যারা দ্বীনের পণ্ডিত বলে দাবি করে তারা যদি এর আত্মার সাথে অপরিচিত হয় এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতায় সন্তুষ্ট থাকে, তবে তারা দ্বীনের স্বার্থে কোনও উপকার করতে পারে না। তাদের উচিত বিজ্ঞানের বাতাসকে তাদের মনের উপর দিয়ে অবাধে প্রবাহিত হতে দেওয়া। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তাদের "দীনের অন্তর্দৃষ্টিকে আরও গভীর করবে কারণ এটি "স্রষ্টার নিদর্শন এবং নিদর্শন" সম্পর্কে জ্ঞান। এই গর্ভবতী কোরআনের বাক্যাংশের অর্থ হল যে লক্ষণের জ্ঞান - প্রকৃতি - স্রষ্টার জ্ঞানের ভূমিকা যাকে এটি নির্দেশ করে।

এটি কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন ইসলামের মৌলিক (প্রচলিত) ধারণাটি পরিবর্তন করা হবে এবং এটিকে "ধর্ম" এর পরিধি থেকে বের করে আনা হবে। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের 'উলামারা ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ) বলে মনে করেন। তাই আসুন আমরা আরও এগিয়ে যাই।

যেসব জাতি প্রকৃতির শক্তির উপর আধিপত্য অর্জন করেছে কিন্তু ঐশ্বরিক আইনের আলোকে - স্থায়ী মূল্যবোধ - সেগুলিকে ব্যবহার করে না, তারাও তাদের জন্য অপেক্ষা করা আযাব এড়াতে পারে না। কোরআন বলে: এবং অবশ্যই আমরা তাদের (অতীতের জাতিগুলিকে) এমন কিছু দিয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম যা দিয়ে আমরা তোমাদের ক্ষমতা দেইনি, এবং তাদের কান, চোখ এবং হৃদয় দিয়েছিলাম, কিন্তু তাদের গাড়ি, চোখ এবং হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি কারণ তারা আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তারা যা উপহাস করত তা তাদের উপর এসে পড়েছিল (৪৬: ২৬)।

**উল্লেখ্য যে, প্রধান বিষয়গুলো হলো:**

১. প্রকৃতির শক্তিকে বোঝা, নিয়ন্ত্রণ করা এবং ঐশী আইন অনুসারে তাদের জীবন গঠনে নিয়োজিত ব্যক্তিরা হলেন মু'মিন ও মুত্তাকি। তারা এই পৃথিবীতে সুখ উপভোগ করে এবং জীবনের পরবর্তী পর্যায়েও তা উপভোগ করবে।

২. যারা প্রকৃতিকে জয় করে কিন্তু ঐশী আদেশের বিপরীত উদ্দেশ্যে তাদের শক্তি ব্যবহার করে, তারা আপাতত এই পৃথিবীতে সাফল্য লাভ করে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের আশা করার মতো কিছুই থাকে না।

৩. যারা প্রকৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং একে বোঝার ও জয় করার কোন চেষ্টা করে না, তারা মানবিক মর্যাদা অর্জন করতে পারে না। তারা এই পৃথিবীতে কষ্ট ও দুর্দশার জীবনযাপন করে এবং পরকালে অগ্রগতির পথ খুঁজে পায়  না, কারণ:যে এখানে অন্ধ, সে পরকালে অন্ধ থাকবে, এবং সত্য পথ থেকে আরও দূরে থাকবে (১৭: ৭২)।

প্রকৃতির শক্তিকে জয় করা এবং স্রষ্টা কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর আইন অনুসারে মানবজাতির কল্যাণের জন্য তাদের ব্যবহার করা এবং এর মাধ্যমে নিজের আত্মিক বিকাশ করা, ইসলামের সারমর্ম। এটি, এবং কেবল এটিই, ইহকালে এবং পরকালে একটি সুন্দর স্বর্গীয় জীবন নিশ্চিত করতে পারে। এই জীবনধারাকে দীন বলা হয়।

# অধ্যায় ১৯
# নারী

**১. পুরুষ এবং নারী - একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন**

যুগ যুগ ধরে, পুরুষরা নারী-সমাজের সাথে ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতার সাথে আচরণ করত না। বুদ্ধিমত্তায় পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট নারীকে দীর্ঘকাল ধরে একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে বিবেচনা করা হত। অতএব, সমস্ত নিস্তেজ এবং অরুচিকর কাজ তার উপর অর্পিত হত। সভ্যতার পুরুষদের মধ্যে, নারীকে নিকৃষ্ট ভূমিকায় সন্তুষ্ট থাকতে হত। সম্প্রতি নারীরা তার অধিকার দাবি করতে শুরু করেছে এবং পুরুষের সাথে সমতা দাবি করতে শুরু করেছে। যদিও বর্তমান যুগের বৌদ্ধিক পরিবেশ সাধারণত নারীর সমতার দাবির পক্ষে অনুকূল, তবুও বিতর্কের ধোঁয়া থেকে এর বৈধতার প্রশ্নটি পুরোপুরি উঠে আসেনি।

নিঃসন্দেহে, পুরুষ এবং নারীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তবে বাস্তবে এগুলি পূর্বে উদ্ধৃত করা তুলনায় অনেক কম। এমনকি এই কয়েকটিও মূলত জৈবিক। একটি শক্তিশালী পার্থক্য হল শারীরিক দক্ষতায়। পুরুষ তার ধৈর্যের ক্ষমতায় নারীকে ততটা ছাড়িয়ে যায় না যতটা তার পেশীবহুল কর্মের তীব্রতায়। সে সাধারণত দ্রুত দৌড়ায় এবং আরও জোরে ঘুষি মারে। তার লোহিত রক্তকণিকা, যা ফুসফুস থেকে পেশীতে অক্সিজেন বহন করে, নারীর তুলনায় দশ শতাংশ বেশি পরিমাণে থাকে। তারপর তার নারীত্ব (জৈবিক) বৈশিষ্ট্য এবং মাতৃত্বের দায়িত্ব কেবল তার শক্তিকে অতুলনীয় পরিমাণেই গ্রহণ করে না, বরং দীর্ঘ সময়ের জন্য তাকে ঘরের ভেতরেও সীমাবদ্ধ করে রাখে। এই সমস্ত কারণগুলি তাকে এই দুটির মধ্যে দুর্বল রাখে বলে মনে করা হয়। অতএব, প্রচুর শারীরিক শক্তি বা নিয়মিত বাইরের কাজ, যেমন লড়াই এবং শিকার, স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল, যখন মহিলারা সাধারণত রান্না এবং ধোয়ার মতো হালকা এবং ঘরোয়া কাজগুলি গ্রহণ করতেন। যেহেতু অন্যান্য শত্রু গোষ্ঠীর দ্বারা ক্রমাগত হুমকির সম্মুখীন একটি আদিম গোষ্ঠীর জন্য শারীরিক শক্তি একটি অপরিহার্য মূল্য ছিল, তাই পুরুষ শীঘ্রই উপজাতি ব্যবস্থায় নিজের জন্য একটি প্রভাবশালী অবস্থান অর্জন করে। দীর্ঘকাল ধরে এই অবস্থা চলতে থাকায়, পুরুষরা তাদের আধিপত্যের অবস্থানকে সুসংহত করে এবং নারী-জনতার উপর উচ্চ হস্তে শাসন করে। ধীরে ধীরে নারীদের দাসত্বের অবস্থানে নামিয়ে আনা হয়।

ধীরে ধীরে পুরুষের মনে এই সত্যটি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয় যে সে শারীরিক শক্তি এবং সামরিক দক্ষতার মূল্যকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করেছে। সে বুঝতে পেরেছিল যে অন্যান্য ক্ষমতাও সমানভাবে মূল্যবান। আধুনিক সমাজে, শারীরিক শক্তির চেয়ে বুদ্ধিমত্তাকে বেশি মূল্য দেওয়া হয়। মনোবিজ্ঞানীরা আমাদের বলেন যে, বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য কিছু ক্ষমতায় নারী পুরুষের সমান। কিছু ক্ষমতায় পুরুষ নারীর চেয়ে

শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কিছু ক্ষমতায় পুরুষ তার চেয়ে নিকৃষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, যান্ত্রিক দক্ষতায় পুরুষ নারীকে ছাড়িয়ে যায়, অন্যদিকে ভাষাগত দক্ষতায় নারী পুরুষকে ছাড়িয়ে যায়।

এটা এখন সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, নারী সামগ্রিকভাবে পুরুষের সমান। তবুও, তার অবচেতনে, অনাদিকাল থেকে চলে আসা হীনমন্যতা জটিলতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ইউরোপ এবং আমেরিকার উন্নত দেশগুলিতে, নারীরা বিজ্ঞান, শিল্প এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে, কিন্তু তারাও পুরুষদের কাছে নিজেদের আকর্ষণীয় করে তোলার এক অচেতন তাড়নায় প্ররোচিত। তারা যে অর্থ উপার্জন করে তার বেশিরভাগই পোশাক, সাজসজ্জা এবং সাজসজ্জার পেছনে নষ্ট হয়। তারা যতটা সময় ব্যয় করতে পারে, তারা নিজেদের সৌন্দর্যবর্ধনে ব্যয় করে। স্পষ্টতই তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো নিজেদেরকে আকর্ষণীয় এবং মনোমুগ্ধকর করে তোলা। কারণ ধর্মীয় কর্তৃত্বে নারীদের সর্বদা বলা হয়েছে যে, স্রষ্টা মূলত পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং নারীকে পরবর্তীতে সৃষ্টি করা হয়েছে কারণ পুরুষ একাকীত্ব অনুভব করেছিল। তাই, সে এই বিশ্বাসে চালিত হয় যে সে নিজের জন্য নয়, বরং কেবল পুরুষের ইচ্ছা পূরণের জন্যই বেঁচে আছে: তাই পুরুষের কাছে যতটা সম্ভব আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার তার অবচেতন আকাঙ্ক্ষা।

নারী যে হীনমন্যতার জটিলতায় ভুগছে তার মূল অতীতে। যে সামাজিক কাঠামো মূলত অপরিবর্তিত রয়েছে তা তাকে পুরুষের তুলনায় অনেক নিম্ন মর্যাদা দিয়েছে। মানুষ তাকে মাঝে মাঝে দেবী হিসেবে, সাধারণত দাস হিসেবে, কিন্তু খুব কমই একজন সহকর্মী হিসেবে বিবেচনা করত। এই মানবসৃষ্ট সমাজে, তার বিরুদ্ধে পাশা পাশি ভারী ছিল। প্রথা, আইন এবং ধর্মের শক্তিশালী শক্তি তার বিরুদ্ধে ছিল। সে নিজের অধিকারে সম্পত্তির মালিক হতে পারত না। সে তার নিজের জীবনসঙ্গী বেছে নিতে পারত না। পিতা তাকে তার পছন্দের যে কাউকে বিয়ে দিতে পারত। যদি স্বামী অল্প বয়সেও মারা যেত, তাহলে তাকে পুনর্বিবাহ করার অনুমতি ছিল না। বাকি জীবন বিধবাত্ব তার ভাগ্যে ছিল। কখনও কখনও তাকে তার স্বামীর সাথে মারা যেতে হত। সতীদাহের বর্বর প্রথা তাকে তার মৃত স্বামীর চিতায় বসে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার জন্য বাধ্য করত। ধর্মও তার প্রতি সদয় ছিল না।

বাইবেলে আদম ও হবার গল্পটি তার কাছে খুব একটা ন্যায্য নয়। বলা হয় যে স্রষ্টা প্রথমে আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তারপর তার পাঁজর থেকে তিনি ইভকে সৃষ্টি করেছিলেন। পাঁজরটি বাঁকা এবং তাই ধর্মপ্রাণ পুরুষরা নারীর প্রকৃতির একই বক্রতা স্বীকার করতে বেশ প্রস্তুত ছিল। গল্পের পরবর্তী অংশ দেখায় যে নারী কেবল বাঁকাই নয়, দুর্বলও। সে দ্রুত শয়তানের প্রলোভনে আত্মসমর্পণ করে এবং আদমকে পাপে প্রলুব্ধ করে। আদম ও হবার গল্প, যেখানে ইভ একজন প্রলোভনকারীর ভূমিকায় অভিনয় করে, সমগ্র খ্রিস্টীয় বিশ্বে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়। খ্রিস্টধর্মের মনোভাব নারীর প্রতি বিদ্বেষ ভয় এবং শত্রুতার

সাথে মিশে আছে। তাদের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য, ধর্মপ্রাণ পুরুষরা নারীদের সাথে সমস্ত ধরণের যোগাযোগ এড়িয়ে চলা প্রয়োজন বলে মনে করতেন। বিবাহকে একটি প্রয়োজনীয় মন্দ হিসেবে দেখা হত। ব্রহ্মচর্যকে একটি পুণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হত। নারী আধ্যাত্মিক অগ্রগতির অন্তরায় ছিল, তাই অন্তত পুরোহিত, যার একমাত্র চিন্তা ছিল আত্মা, তাকে অবিবাহিত থাকতে হত।

এই ধরণের ধারণা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রচলিত ছিল এবং সম্প্রতি পর্যন্ত বিশ্বের সকল স্থানেই দেখা যেত। কুরআন নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করেছে। এটি পুরুষ ও নারীর মধ্যে সম্পর্ককে সমতার ভিত্তিতে স্থাপন করেছে, কাউকেই অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করেনি।

কুরআন বলে না যে পুরুষকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তাই নারীর চেয়েও অগ্রাধিকার রয়েছে। এটি আমাদের বলে যে প্রত্যেকের জন্য, জীবন একটি একক কোষ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য পরবর্তী পর্যায়ে এসেছিল, এবং যখন এটি আবির্ভূত হয়েছিল, তখন উভয়ই ছিল: স্রষ্টা তোমাদেরকে একটি একক জীবনকোষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গী (পুরুষের জন্য একজন নারী এবং নারীর জন্য একজন পুরুষ) তৈরি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে, অসংখ্য পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন (৪:১)

এইভাবে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে, কারোরই কোন অগ্রাধিকার ছিল না; পুরুষের প্রথম অবাধ্যতা এবং ফলস্বরূপ স্বর্গ থেকে বহিষ্কারের জন্য নারী দায়ী ছিল না। বলা হয় যে উভয়কেই শয়তান দ্বারা বিপথগামী করা হয়েছিল (২:৩৬)। কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, পুরুষ এবং নারী সমানভাবে সঠিক পথে চলতে সক্ষম এবং ধ্বংসাত্মক পথে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা সমান। অবশ্যই, তারা একেবারে এক নয়: কিছু বিষয়ে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, আবার কিছু ক্ষেত্রে নারী তাদের ছাড়িয়ে যায়। এটি এই সত্যের একটি অপরিহার্য পরিণতি যে জীবনে তাদের ভূমিকা একে অপরের পরিপূরক। তারা মূল্যের দিক থেকে সমান, যদিও নির্দিষ্ট গুণাবলীতে ভিন্ন: স্রষ্টা তোমাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে একজন অন্যজনের চেয়ে (কিছু ক্ষেত্রে) শ্রেষ্ঠ (৪:৩৪)।

এমন নয় যে পুরুষ নারীর চেয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষ অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য দিক দিয়ে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হাজার হাজার বছর ধরে, পুরুষ নারীকে বলে আসছে যে সে কেবল শারীরিক শক্তিতেই নয়, বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য ক্ষমতায়ও তার চেয়ে নিকৃষ্ট। সম্প্রতি সে বুঝতে পেরেছে যে সে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সমান হতে পারে। কুরআন তার মনে তার অপরিহার্য মূল্য এবং তার নিজস্ব ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা জাগিয়ে দেয়। কুরআন নারীকে পুরুষের সাথে যুগ যুগ ধরে চলা বন্ধন থেকে মুক্ত করেছে। এতে বলা হয়েছে: যদি পুরুষদের আল্লাহর আইনের

সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে নারীদেরও একই রকম সম্ভাবনা থাকে; যদি পুরুষরা আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় আইন অনুসারে বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে পরিচালিত একটি আন্দোলনের সদস্য হতে পারে, তাহলে নারীরাও এর সদস্য হয়ে এতে অংশগ্রহণ করতে পারে; যদি পুরুষরা আল্লাহর আইনের মধ্যে তাদের ক্ষমতাকে সংযত রাখতে পারে যাতে তারা তাদের ক্ষমতাকে বিকশিত করতে পারে, তাহলে নারীরাও তা করতে পারে; যদি পুরুষরা তাদের বিশ্বাসের সত্যকে জীবনে বাস্তবে প্রয়োগের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারে, তাহলে নারীরাও তা প্রমাণ করতে পারে; যদি পুরুষরা তাদের নির্বাচিত পথে অবিচল থাকতে পারে, তাহলে নারীরাও তা প্রমাণ করতে পারে; যদি পুরুষদের এই পথে যাত্রা শুরু করার পর আল্লাহর আইনের সাথে ক্রমশ সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার অশেষ ক্ষমতা থাকে, তাহলে নারীদেরও এই অক্ষয় ক্ষমতা থাকবে; যদি পুরুষরা উচ্চ মূল্যবোধের জন্য নিম্ন মূল্যবোধ ত্যাগ করতে পারে, তাহলে নারীরাও পারবে; যদি পুরুষরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং তাদের উপর নির্ধারিত সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘন না করতে পারে, তাহলে নারীরাও পারবে; যদি পুরুষরা তাদের যৌন আকাঙ্ক্ষাকে কাঙ্ক্ষিত সীমার মধ্যে রাখতে পারে, তাহলে নারীরাও পারবে; যদি পুরুষরা আল্লাহর আইন বুঝতে পারে এবং তাদের জীবনের কার্যকলাপকে সেগুলির উপর কেন্দ্রীভূত করতে পারে, তাহলে নারীরাও পারবে। এখন যদি পুরুষ এবং নারী উভয়েরই সমান ক্ষমতা এবং সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তাদের ফলাফলও তাদের উভয়ের জন্য একই হওয়া উচিত। অতএব উভয়ই সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা উপভোগ করবে, এবং তাদের কর্ম থেকে আসা অন্যান্য সমস্ত সুবিধা এবং আনন্দ (৩৩:৩৫)।*

এই আয়াতটি সন্দেহাতীতভাবে প্রকাশ করে যে সামাজিক কার্যকলাপে প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত বিষয়ে পুরুষ এবং নারী সমান। উন্নতির পথ উভয়ের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত এবং তা অর্জনের প্রতিদান উভয়ের জন্যই একই: এবং যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা মহিলা, এবং সে (অথবা সে) একজন মুমিন, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর খেজুর আঁটির পরিমাণও অবিচার করা হবে না (৪: ১২৪)।

কুরআন তার মালিকানার অধিকারের ক্ষেত্রেও কোন সন্দেহ রাখে না: পুরুষ যা উপার্জন করবে তা তার হবে এবং মহিলা যা উপার্জন করবে তা তার হবে (৪: ৩২)।

এভাবে দেখা যাবে যে কুরআন পুরুষ ও মহিলাকে সকল দিক থেকে সমান বিবেচনা করে। বাস্তবতা হল যে মানবজাতি তখনই মানব মর্যাদা অর্জন করবে যখন এটি পুরুষ ও মহিলাকে মানুষের দিক থেকে বর্ণনা করে, লিঙ্গগত পার্থক্যের ক্ষেত্রে নয়। নারীর (পুরুষের মতো) নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে এবং ব্যক্তিত্বের সাথে ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক উপায় এবং লক্ষ্যের সম্পর্ক হতে পারে না; সমস্ত ব্যক্তিত্ব নিজেই একটি লক্ষ্য।

**২. নারী (মা)**

পারিবারিক জীবনের মূলনীতি এমনকি প্রাণীজগতেও পাওয়া যায়। বেশিরভাগ প্রাণীর বাচ্চারা জন্মের সময় অসহায় থাকে এবং যদি তাদের একা ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তারা বেঁচে থাকতে পারে না। তাদের দেখাশোনার কাজ কখনও কখনও স্ত্রী প্রাণী দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে উভয়ই একসাথে। পাখিদের মধ্যে, পুরুষ এবং মহিলা শাবকদের লালন-পালনে অংশগ্রহণ করে। কিছু ধরণের মাছের ক্ষেত্রে, স্ত্রী শাবকদের প্রতি উদাসীন থাকে, অন্যদিকে পুরুষ শাবক তাদের ভরণ-পোষণ করে এবং বিপদ থেকে রক্ষা করে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে, শাবকদের যত্ন নেওয়া স্ত্রী শাবকদের প্রধান উদ্বেগ। তবে, কিছু প্রাণী তাদের শাবকদের অল্প বয়সেই নিজেদের যত্ন নিতে দেয়। মানব শিশু অসহায় থাকে এবং দীর্ঘ সময় ধরে পিতামাতার যত্নের প্রয়োজন হয়। মানব শিশুর দীর্ঘ শৈশবকাল কয়েক বছর ধরে শিশুদের সাথে পিতামাতার ঘনিষ্ঠ মেলামেশার প্রয়োজন হয়। এই ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে, কোমল আবেগ অঙ্কুরিত হয় এবং বিকাশ লাভ করে। ভালোবাসা এবং স্নেহের দৃঢ় বন্ধন পিতামাতা এবং শিশুদের ঘনিষ্ঠভাবে এবং স্থায়ীভাবে আবদ্ধ করে। ঘর হল সেই পর্যায় যেখানে পরিবারের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে। ঘর সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক সহানুভূতির প্রতীক। এটি সামাজিক যোগাযোগ এবং ফলপ্রসূ সহযোগিতার পরিতৃপ্তির ক্ষেত্র। পিতামাতার যত্নে, ব্যক্তি কেবল শারীরিক পরিপক্কতা অর্জন করে না বরং একটি মানবিক এবং সামাজিক সত্তায় পরিণত হয়। পরিবার হল সেই ম্যাট্রিক্স যেখানে তার ব্যক্তিত্ব গঠন এবং গঠন করা হয়। পরিবারের সদস্যপদ তাকে সমাজের সদস্য হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। সমাজ হলো কেবল বর্ধিত পরিবার। সহানুভূতি, সহনশীলতা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, সে সমাজে একজন স্বাধীন এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে তার ন্যায্য স্থান দখল করে।

মানব শিশুর কাছে পরিবার সর্বোপরি গুরুত্বপূর্ণ, এবং পরিবারে, মা প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তার সন্তানদের উপর তার প্রভাবকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া যায় না। তিনি তাদের মধ্যে আদর্শ অনুপ্রাণিত করেন এবং তাদের সমাজের সংস্কৃতি প্রদান করেন। এটি মূলত তার উপর নির্ভর করে যে তারা সমাজের কার্যকর সদস্য হবে নাকি কেবল অযোগ্য হবে।

কুরআন পরিবার এবং সমাজে মায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃতি দেয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য কুরআনের শব্দটি উম্মাহ, এবং এটি উম্ম থেকে এসেছে, যার অর্থ মা। মা পরিবারকে প্রত্যক্ষভাবে এবং সম্প্রদায়কে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেন, তবে কম কার্যকরভাবে নয়।

শিশু তখনই একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে যখন ঘরের পরিবেশে শান্তি বিরাজ করে এবং পিতামাতার মধ্যে সম্প্রীতি এবং সম্প্রীতি থাকে। পিতামাতার মধ্যে বিরোধ হল শিশুদের ব্যক্তিত্বের ব্যাধির প্রধান কারণ। তাই কুরআন পুরুষদের এমন একজন বন্ধুত্বপূর্ণ সঙ্গী বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেয় যার

দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শের সাথে মিল থাকে এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার সাথে একমত হয় (২: ২২১)। বিবাহ হল একটি চুক্তি যা পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের দ্বারাই স্বাধীনভাবে সম্পাদিত হয়। অতএব, মহিলা তার পছন্দের যে কাউকে বিয়ে করতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। পুরুষ কোনও মহিলাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করতে পারে না (৪: ১৯)। বিবাহিত দম্পতির কর্তব্য তাদের সন্তানদের জন্য একটি সুখী ঘর তৈরি করা।

যেহেতু নারীকে তার বেশিরভাগ সময় সন্তানদের যত্ন নেওয়ার জন্য ব্যয় করতে হয়, তাই তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় প্রদানের দায়িত্ব স্পষ্টতই পুরুষের উপর বর্তায়। এই শ্রম বিভাজন পুরো পরিবারের স্বার্থে: পুরুষরা (ঘরে) মহিলাদের ভরণপোষণের জন্য দায়ী (৪: ৩৪)

তবে, যদি একজন মহিলা নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য সময় বের করতে পারেন, তবে তিনি তা করতে স্বাধীন। তিনি যা উপার্জন করেন তা তার (৪: ৩২)। পুরুষ এবং মহিলা ঘর পরিচালনায় একটি দল হিসেবে কাজ করার জন্য সমান অংশীদার। তাদের কারোরই একে অপরের উপর কর্তৃত্ব এবং শোষণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

নারীর অধিকার পুরুষের মতোই সম্মানিত হওয়া উচিত। স্বামী তার স্ত্রীর অধিকার হরণ করতে পারে না: পুরুষদের উপর নারীর অধিকার রয়েছে যেমন যুক্তি ও আইনের দিক থেকে পুরুষদের উপর নারীর অধিকার রয়েছে (২:২২৮)

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং পারস্পরিক হতে হবে: তারা তোমার জন্য পোশাক এবং তুমি তাদের জন্য পোশাক (২:১৮৭)।

যেমন উপরে বলা হয়েছে, বিবাহ হল অংশীদারদের স্বেচ্ছায় চুক্তি দ্বারা সম্পাদিত একটি চুক্তি। এটি একটি গম্ভীর চুক্তি। এটি এখনও বাতিল করা যেতে পারে, তবে সঙ্গত কারণে যখন কোনও উপায় থাকে না এবং এটি রক্ষা করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এমনকি যখন এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়, তখনও স্বামী এবং স্ত্রীর উচিত একটি সম্মত আপসের মাধ্যমে চুক্তিটি রক্ষা করার চেষ্টা করা। যখন এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়, তখন সমাজের উচিত একটি পুনর্মিলন ঘটানোর জন্য হস্তক্ষেপ করা। তাদের - স্বামী এবং স্ত্রী - প্রত্যেকেরই একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করা উচিত এবং প্রতিনিধির উচিত বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করা (৪:৩৫)। যদি তাদের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়, তাহলে বিবাহ আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙে যেতে পারে।

আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, বিবাহের উদ্দেশ্য হল জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ভালোবাসা, সম্প্রীতি এবং সাহচর্যের পরিবেশ তৈরি করা এবং সেখানে বসবাস করা। একজন পুরুষের একসাথে

একাধিক স্ত্রী থাকার ধারণাটি এই ধরণের অংশীদারিত্বের উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনার সাথে খাপ খায় না। তাই কুরআন অনুসারে একবিবাহ - একজন পুরুষের সাথে এক মহিলা - একটি স্বাভাবিক নিয়ম। তবে, এমন একটি সময় আসতে পারে যখন সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে এই নিয়মের শিথিলকরণ একটি প্রয়োজনীয়তা হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সমাজে যুবকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে যার ফলে বিপুল সংখ্যক বিধবা মহিলা, সাধারণত সন্তান এবং অবিবাহিত মেয়েরা থাকবে। এই নারী ও মেয়েদের অবশ্যই তাদের মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য সুরক্ষিত এবং যত্ন নিতে হবে, তাদের মর্যাদা ও সম্মানের ক্ষতি না করে। এতিমখানা বা "বৃদ্ধাশ্রম" প্রতিষ্ঠা করা, এমনকি এই দরিদ্রদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন করে তোলাই একমাত্র প্রতিকার। স্পষ্টতই, সমস্যাটি কেবল অর্থনৈতিক নয়: এটি আরও বিস্তৃত এবং গভীর। সমাজের দায়িত্ব হবে এই নাজুক পরিস্থিতি মোকাবেলা করা, ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যক্তিগত মর্যাদা এবং সমাজের নৈতিক কাঠামো রক্ষা করা। এর জন্য, কুরআন একবিবাহের নিয়ম শিথিল করে একটি সম্ভাব্য বিকল্প প্রস্তাব করেছে: এবং যদি আপনি আশঙ্কা করেন যে সমাজে বিধবা এবং এতিমদের সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না, তবে তাদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত ব্যক্তিদের বিবাহ করুন, দুই, তিন বা চারজন (পরিস্থিতি অনুসারে)। কিন্তু যদি আপনি আশঙ্কা করেন যে আপনি ন্যায়বিচার করতে পারবেন না, তবে কেবল একজনকে বিবাহ করুন (৪: ৩)।

বহুবিবাহের প্রশ্নে এটিই কুরআনের একমাত্র আয়াত। এর উপসংহারের অংশ থেকে দেখা যাবে যে, যেখানে রাষ্ট্র এই শিথিলতা প্রদান করে, সেখানেও পুরুষদের উপর একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়। তারা কেবল তখনই বিবাহ করতে পারে যদি তারা ন্যায়বিচার করতে পারে। এটা স্পষ্ট যে, যদি একজন পুরুষ এইরকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিয়ে করে, তাহলে তা জাতির জন্য একটি সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে, তার পক্ষ থেকে এবং তার প্রথম স্ত্রীর পক্ষ থেকে উভয়ের পক্ষ থেকে। সে তার দুর্ভাগ্যবান বোনদের একজনকে আশ্রয় দেওয়াকে তার কর্তব্য বলে মনে করবে, যে তার নিজের কোনও দোষ ছাড়াই এমন করুণ অবস্থায় চলে গেছে। যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে আমরা খুব কমই এমন একজন মহিলা খুঁজে পাব যিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে তার বাড়িতে আনার জন্য রাজি হবেন। বর্তমান জীবনের ধরণে যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রথমে আসে সেখানে যুক্তিটি বৈধ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কুরআন দ্বারা আনা ধারণার বিপ্লবে এটি তার ভিত্তি হারিয়ে ফেলে যেখানে বলা হয়েছে: মুমিনরা নিজেদের চেয়ে অন্যদের পছন্দ করে, যদিও তাদের কষ্ট সহ্য করতে হতে পারে (৫৯: ৯)।

ইতিহাস আমাদের বলে যে, রাসূলের সময় মদীনার কুরআনী সমাজে, উপরে বর্ণিত পরিস্থিতিতে, একজন মুসলিমের ঘরে এমন একজন নবাগতকে আশীর্বাদের সাথে স্বাগত জানানো হত। নবীনরা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেও ঘরে প্রবেশ করত না: বরং তারা কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে ভরপুর ছিল। এটি ছিল ঈমানের হৃদয়ে আনা পরিবর্তনের ফল।

উপরে উল্লিখিত আয়াতে মূর্ত নীতিটি রাসূলের জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি যখন পঁচিশ বছর বয়সে খাদিজাকে বিয়ে করেছিলেন, যিনি তাঁর চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। পঁচিশ বছর ধরে তিনি তাঁর একমাত্র স্ত্রী ছিলেন। তিনি কেবল তাঁর মৃত্যুর পরেই পুনরায় বিবাহ করেছিলেন। তিনি যে পরিস্থিতিতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা যে আয়াতের কথা উল্লেখ করেছি তাতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। মদীনায় বসতি স্থাপনকারী ছোট মুসলিম সম্প্রদায় সর্বদা চারদিকে শত্রুদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। যুদ্ধ একটি দেশের যুবকদের উপর ভারী প্রভাব ফেলে। পুরুষের সংখ্যা তীব্র হ্রাস পেয়েছিল। এ ছাড়াও, মক্কা থেকে শরণার্থীদের আগমন ঘটেছিল, বেশিরভাগ মহিলা। বিপুল সংখ্যক বিধবা এবং অবিবাহিত মেয়েদের উপস্থিতি মুসলমানদের জন্য একটি সমস্যা তৈরি করেছিল। এটি ছিল একটি বিপদজনক পরিস্থিতি এবং এর জন্য একটি কঠোর প্রতিকার প্রয়োগ করতে হয়েছিল। এমন এক জরুরি পরিস্থিতিতে বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যাতে অসুরক্ষিত নারীদের নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা দেওয়া যায়।

যাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে এইভাবে একটি আবাসস্থল প্রদান করেছিলেন, তাদের সংক্ষেপে নিচে বর্ণনা করা হল: সওদাহ এবং তার স্বামী কুরাইশদের অত্যাচার থেকে পালিয়ে আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি একেবারে অসহায় হয়ে পড়েন।

হাফসা ছিলেন উমরের কন্যা এবং খুনাইসের বিধবা। খুনাইস উহুদের যুদ্ধে নিহত হন। তিনি যখন কষ্টে ছিলেন, তখন উমর (রাঃ) তার এক বন্ধুর সাথে তার বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সফল হননি। তিনি অন্য বন্ধুর কাছে যান কিন্তু তিনিও তাকে বিবাহ করতে রাজি হননি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উমরের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং তার জন্য একটি আবাসস্থল প্রদান করেন।

জয়নব। তার তৃতীয় স্বামীও উহুদের যুদ্ধে নিহত হন। তিনি নিঃস্ব হয়ে যান। অতএব, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক সুরক্ষিত হন, কিন্তু দুই মাস পরে তিনি মারা যান।

উম্মে সালামা। তার স্বামীর সাথে তিনি আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের ফিরে আসার পর, উহুদের যুদ্ধে তার স্বামী নিহত হন। রসুল যখন তাকে উদ্ধার করতে আসেন তখন তিনি অত্যন্ত কষ্টে ছিলেন।

জয়নব দ্বিতীয়। তিনি রসুল পরিবারের সদস্য ছিলেন। তার স্বামী, যিনি একসময় দাস ছিলেন, তাকে তালাক দিয়েছিলেন। একজন দাসের স্ত্রী হিসেবে, সাধারণভাবে তার সামাজিক অবস্থান নীচু হয়ে

গিয়েছিল। সমাজে এই ঐতিহ্যবাহী মনোভাব ইসলামের চেতনার পরিপন্থী তা বোঝানোর জন্য, রসুল নিজেই তাকে বিবাহের জন্য বেছে নিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন যে মুক্ত দাসের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কেউ জাতপাত হারায় না।

উম্মে হাবিবা। তিনি ছিলেন কুরাইশদের অন্যতম নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা। তিনি তার স্বামীর সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। তার স্বামী খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে ত্যাগ করেছিলেন। তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন কিন্তু তার পিতার কেউ আসেননি। মিলি তাকে স্বাগত জানাত এবং সুরক্ষা দিত। রসুল তাকে মর্যাদা এবং একটি ঘর দিয়েছিলেন।

মায়মুনা। যখন তার দ্বিতীয় স্বামী মক্কায় মারা যান, তখন তিনি নিঃস্ব হয়ে যান। রসুল তাকে আইনগত মর্যাদা দিয়ে একটি ঘর দিয়েছিলেন। জুওয়াইরিয়াও একজন বিধবা ছিলেন। তার স্বামী যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। তিনি বনি মুস্তালিকের গোত্রপ্রধানের কন্যা ছিলেন। সাফিয়ার বাবা, ভাই এবং স্বামী সকলেই যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। তার ভরণপোষণ করার মতো কেউ ছিল না।

আয়িশাই ছিলেন একমাত্র কুমারী যাকে রসুল বিয়ে করেছিলেন। মদীনায় হিজরতের আগে তিনি তাকে বিয়ে করেছিলেন, যখন তার বয়স প্রায় ১৯ বছর ছিল।

ঘটনাগুলি নিজের পক্ষে কথা বলে। আয়িশা ছাড়া, রসুল যাদের বিয়ে করেছিলেন তারা সকলেই বয়স্ক বিধবা, গৃহহীন এবং বন্ধুহীন ছিলেন। (কুরআনে এক সময়ে রসুলের কত স্ত্রী ছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি)। সামাজিক জীবন বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনতে হয়েছিল। যুদ্ধ চলতে থাকলে, ছোট সম্প্রদায়ের কাছে বিধবা ও এতিমদের জন্য ঘর এবং ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার জন্য সময় বা সম্পদ ছিল না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে, রাসূল (সাঃ) ইচ্ছা করলে তাদের তালাক দেওয়ার প্রস্তাব দেন। তারা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁর সাথেই থেকে যান।

### ৩. দাসী (ক্রীতদাসী নারী)

ইসলামের আবির্ভাবের আগে, সারা বিশ্বে দাসপ্রথা বিরাজমান ছিল। সেই সময়ের পুরুষদের কাছে, শক্তিশালী ও ধনী ব্যক্তিদের কাছে যুদ্ধে বন্দী বা বাজারে ক্রীতদাস থাকা একেবারে স্বাভাবিক বলে মনে হত। প্রাচীন বিশ্বের চিন্তাধারার নেতা ছিলেন গ্রীকরা। কোনও গ্রীক চিন্তাবিদ কখনও দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেননি। কুরআন স্রষ্টার দৃষ্টিতে সকল মানুষের সমান অধিকার ঘোষণা করেছিল। মানুষ হিসেবে মানুষের নৈতিক মূল্যকে স্বীকৃতি দিয়ে দাসপ্রথার মূলে আঘাত করেছিল। তবে, ইসলামের আবির্ভাবের সময়, বিশ্বের অন্যান্য জায়গার মতো আরবেও অসংখ্য দাস, পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই ছিল।

আরব অর্থনীতি দাসপ্রথার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। এক ধাক্কায় এটি বিলুপ্ত করা অসম্ভব ছিল। সমগ্র সমাজকে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত না করে এটি করা সম্ভব ছিল না। তবুও, সম্ভাব্য সকল উপায়ে, কুরআন দাসপ্রথাকে নিরুৎসাহিত করেছে এবং দাসদের ভাগ্য উন্নত করেছে। মুসলমানদের তাদের দাসদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হতে বলা হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে যে দাসকে মুক্ত করা একটি পুণ্যের কাজ। তারা একজন দাসকে মুক্ত করে তাদের কিছু অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারত। এভাবে দাসের সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পায় এবং সমাজ দাস শ্রমের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কুরআনে "যাদের তোমার ডান হাত অধিকার করেছে" শব্দটি অতীত কালের এবং তাদের বোঝায় যারা ইতিমধ্যেই দাসত্বে আবদ্ধ ছিল। যখন তারা ধীরে ধীরে মুক্তি পেয়েছিল, তখন দাসত্ব স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছিল। দাস-পুরুষ ও নারী-পুরুষের প্রধান উৎস ছিল যুদ্ধবন্দী। কুরআনে বলা হয়েছে যে তাদের মুক্তিপণের বিনিময়ে অথবা অনুগ্রহ হিসেবে মুক্ত করা উচিত (৪৭:৪)। ভবিষ্যতের দাসত্বের দরজা এভাবে কুরআন চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে। পরবর্তী ইতিহাসে যা কিছু ঘটেছিল তা ছিল মুসলমানদের দায়িত্ব, কুরআনের নয়।

ইসলাম মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব এনেছে, যার ফলে মালিক ও দাস, পুরুষ ও নারী উভয়কেই আল্লাহর সামনে সমতার ভিত্তিতে স্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য দেশের মতো আরবেও পুরুষরা কেবল তার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য নারীদের দিকে তাকাতে অভ্যস্ত ছিল। বিবাহ ছিল পুরুষদের কাঙ্ক্ষিত নারীদের অধিকারের জন্য ঝগড়া থেকে বিরত রাখার একটি হাতিয়ার। কুরআন সমাজে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং জীবনযাত্রায় তাদেরকে পুরুষের সমান অংশীদার করেছে।

**৪. যৌনতা এবং সমাজ**

যৌনতা পুরুষ ও নারীর সহজাত সরঞ্জামের একটি অংশ। বংশের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা হয় ব্যক্তির প্রজনন কার্যকলাপে জড়িত থাকার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা। এটি এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে জীবনের মশাল এগিয়ে নেওয়া হয়। প্রবৃত্তির ধ্রুপদী শ্রেণীবিভাগে তারা যে লক্ষ্যগুলি অর্জন করে তার ভিত্তিতে, যৌনতা জাতি সংরক্ষণের প্রবৃত্তির শ্রেণীর অন্তর্গত।

এটি এখন সাধারণত স্বীকৃত যে যৌনতা মানুষের আচরণের একটি শক্তিশালী নির্ধারক। তবে, দীর্ঘকাল ধরে, পিউরিটানিজম এবং যুক্তিবাদের প্রভাবে, মানুষের যৌন জীবনকে গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়নের যোগ্য বলে মনে করা হত না। ভালো সমাজে, বিষয়টিকে সতর্কতার সাথে এড়িয়ে যাওয়া হত। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, তবে, একটি প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এবং বর্তমানে ফ্যাশনটি হল মানব জীবনে এর গুরুত্বকে অতিরঞ্জিত করা। ফ্রয়েডের নেতৃত্বে কিছু মনোবিজ্ঞানী এটিকে "মানব প্রকৃতির" মৌলিক এবং মানব জীবনে সর্বব্যাপী বলে মনে করেন। মনোবিশ্লেষক খাওয়া এবং খেলাধুলার মতো সাধারণ কার্যকলাপের মাধ্যমে যৌন উদ্দেশ্যকে খনন করেন। তিনি যৌনতার উপর থেকে পর্দা তুলে ফেলার চেষ্টা করেন এবং

অপ্রত্যাশিত জায়গায় এটি আবিষ্কার করেন। গণিতবিদ রেখা এবং বক্ররেখা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন এবং ধ্যানে মগ্ন রহস্যময় ব্যক্তি উভয়ই একই আকাঙ্ক্ষাকে সন্তুষ্ট করছেন, যদিও ভিন্ন উপায়ে। অবদমিত এবং সামাজিকভাবে অনুমোদিত চ্যানেলে বিচ্যুত লিবিডিনাল শক্তি সংস্কৃতি এবং সভ্যতা তৈরি করে।

মনে হচ্ছে, পশ্চিমারা যৌনতার প্রতি শীতল উদাসীনতার চরম থেকে তীব্র ব্যস্ততার বিপরীত চরমে চলে গেছে। কুরআন একটি মধ্যম পথ নির্দেশ করে। এটি জীবনে যৌনতাকে তার ন্যায্য স্থান নির্ধারণ করে কিন্তু আর নয়। এই মনোভাব বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। প্রাণীদের আচরণের পরীক্ষামূলক গবেষণা দেখায় যে, যৌন ইচ্ছা যদিও প্রবল, তবুও কোনওভাবেই সবচেয়ে শক্তিশালী নয়। এটি ক্ষুধা ও তৃষ্ণার চেয়ে দুর্বল। এটি পিতামাতার প্রবৃত্তির চেয়েও দুর্বল।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মানুষ খাদ্য বা জল ছাড়া কয়েক দিনের বেশি বাঁচতে পারে না। কিন্তু যৌন ইচ্ছার সন্তুষ্টি তার শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা যেতে পারে। কিছু মহাপুরুষ যৌন ইচ্ছা ছাড়াই একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছেন। কিছু মানুষের জন্য ব্রহ্মচর্য জীবনযাপনের স্বাভাবিক পদ্ধতি। মনে হয় যৌন ইচ্ছার শক্তি স্থানচ্যুত হয় এবং অন্য দিকে প্রবাহিত হতে পারে।

আরেকটি দিকও রয়েছে। যৌনতা ছাড়া অন্য বিষয়ে অতিরিক্ত লিপ্ত হওয়া অসংযমী মানুষের নিজের ক্ষতি করবে। কিন্তু যৌনতার ক্ষেত্রে অসদাচরণ সমাজের জন্যও উদ্বেগের কারণ হবে। যৌন প্রেম একচেটিয়া হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ঈর্ষার শক্তিশালী এবং কখনও কখনও অনিয়ন্ত্রিত শক্তির জন্ম হবে যা সমাজের জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক।

যৌনতার আরেকটি দিকের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন। যৌনতা মূলত জৈবিক লক্ষ্য রক্ষা করে, কিন্তু এটি যে কার্যকলাপের দিকে নিয়ে যায় তা ব্যক্তির জন্যও অত্যন্ত আনন্দদায়ক। প্রকৃতির কৌশল হল ব্যক্তিকে এমন একটি কার্যকলাপে জড়িত হতে প্ররোচিত করা যা মূলত ব্যক্তির জন্য নয়, জাতির জন্য উপকারী। তবে, মানুষ যৌনতাকে তার ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য মূল্য দেয়। এই আনন্দ তার প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এটি উপভোগ করার জন্য, সে কৃত্রিমভাবে তার যৌন ক্ষুধাকে উদ্দীপিত করে এবং তাই এটিকে বিকৃত করে এবং এর স্বাভাবিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে। এইভাবে, যৌনতা মানুষের আত্ম-উপলব্ধির অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

উপরের বিবেচনাগুলি যদি মনে রাখা হয়, তাহলে আমরা যৌনতার প্রতি কুরআনের মনোভাব বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে পারি। আমরা দেখতে পাব যে যৌন প্রকাশের উপর এটি যে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে

তা পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত এবং মানব প্রজাতির সর্বোত্তম স্বার্থে। অবশ্যই, প্রতিটি সমাজেই মানুষের যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রিত। তবে কুরআন কখনোই যৌন আকাঙ্ক্ষার জৈবিক পরিণতি ভুলে যায় না। কিছু মহান ধর্ম শিক্ষা দিয়েছে যে যৌনতা মূলত মন্দ এবং "আধ্যাত্মিক" অগ্রগতি কেবল ব্রহ্মচর্যের মধ্যেই সম্ভব। কুরআন এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করে এবং যৌন আকাঙ্ক্ষাকে একটি প্রাকৃতিক ক্ষুধা হিসেবে বিবেচনা করে যা পরিমিতভাবে এবং এমন পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট করা যেতে পারে যেখানে এটি প্রভাবিত ব্যক্তির কোনও ক্ষতি করে না। পশ্চিমে, ব্যভিচারকে শাস্তি দেওয়া হয় কিন্তু ব্যভিচারকে নয়। কুরআন বিবাহের বাইরে সমস্ত যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করে। পুরুষকে কেবল তার বৈধ স্ত্রীর সাথেই এই ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এখানেও, তাকে আনন্দকে তার লক্ষ্য না করার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে। তাকে মনে রাখতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে সে একটি দায়িত্বশীল যুক্তিবাদী সত্তা তৈরিতে সহায়তা করছে। বছরের পর বছর ধরে, তাকে তার ছেলে বা মেয়েকে লালন-পালন এবং শিক্ষিত করার কাজে নিজেকে নিবেদিত করতে হবে যাতে সে অবশেষে সমাজের একজন কার্যকর সদস্য হয়ে ওঠে। যদি তার পক্ষে তার সন্তানকে জীবনের একটি ন্যায্য সূচনা দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে তাকে জন্ম দেওয়া উচিত ছিল না। কুরআন এমন একটি কার্যকলাপে নিয়োজিত উভয় অংশীদারের মনে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে চায় যা একটি নতুন সত্তার জন্ম দেবে। তাদের তাৎক্ষণিক আনন্দের বাইরে তাকাতে এবং তাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আনন্দ অনুমোদিত, কিন্তু এর দাস হওয়া ভুল। কুরআন মানুষকে বলে যে সে তার যৌন ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং পরিমিতভাবে এর প্রতি মনোযোগ দিতে পারে, এর ফলে তার উপর যে কর্তব্যগুলি ন্যস্ত হবে সেগুলি গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করে।

### ৫. সতীত্ব

এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, কুরআন সতীত্বের উপর বিশেষ জোর দেয়। এটিকে একটি প্রধান গুণ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং তাই মানুষের নৈতিক ও মানসিক অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। নৈতিক পবিত্রতা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সতীত্ব অপরিহার্য। ফ্রয়েডীয় যৌন তত্ত্ব, সঠিক বা ভুল, পুরুষদের এই চিন্তা করতে উৎসাহিত করেছে যে যৌন পরিহার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। এটি স্নায়বিক সমস্যার একটি ফলপ্রসূ কারণ বলে মনে করা হয়। যারা এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তারা ফ্রয়েডের প্রতি অবিচার করছেন। তিনি নিজে লম্পটতাকে সমর্থন করেননি। যৌন বিরত থাকা নয় বরং অবদমিত যৌনতাই স্নায়বিক ব্যাধি তৈরি করে। ফ্রয়েড আসলে এটাই শিখিয়েছিলেন।

কিছু চিকিৎসা পুরুষ, যাদের মনোবিশ্লেষণমূলক মতবাদের উপর কেবল ভাসাভাসা জ্ঞান রয়েছে, তারা আসলে তাদের স্নায়বিক রোগীদের তাদের যৌন বাধা অতিক্রম করতে এবং নিজেদেরকে "ছেড়ে দিতে" পরামর্শ দেন: এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে রোগীরা কখনও কখনও সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে আরও খারাপ হয়ে যায়। সাংবিধানিক পক্ষপাতের কারণে স্নায়বিকরা যৌনতার প্রতি আচ্ছন্ন থাকে এবং

দমন-পীড়নের প্রবণতাও পোষণ করে। যৌন বিরত থাকা স্বাভাবিক পুরুষদের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করে না। বরং, বিরত থাকা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক।

পরিস্থিতি যদি বিবাহের অনুমতি না দেয় তবে একজন পুরুষের কী করা উচিত? কুরআন তাকে তার সতীত্ব রক্ষা করার এবং তার যৌন ক্ষুধা মেটানো থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয় যতক্ষণ না তার পক্ষে উপযুক্ত সঙ্গী পাওয়া সম্ভব হয়: এবং যারা উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে পাচ্ছে না তারা যেন পবিত্র থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাদের সমৃদ্ধ করেন (২৪:৩২)।

ক্ষুধা ও তৃষ্ণার প্রবৃত্তি অপরিহার্য এবং যেকোনো পরিস্থিতিতেই তা পূরণ করতে হবে। তবে, যৌন ইচ্ছার পরিতৃপ্তি নিরাপদে দীর্ঘ সময়ের জন্য, এমনকি চিরকালের জন্যও স্থগিত করা যেতে পারে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার প্রবৃত্তির বিপরীতে, যৌন ক্ষুধা কখনই নিজেকে জাগায় না: এটি সচেতন ইচ্ছা দ্বারা উত্তেজিত করে। বিষয়টি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। একজন মানুষ, এমনকি যখন তার কাজে ব্যস্ত এবং গভীরভাবে নিমগ্ন থাকে, তখনও যখন তার শরীরের জলের প্রয়োজন হয় তখন সে তীব্র তৃষ্ণা অনুভব করবে, সে প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন থাকুক বা না থাকুক। প্রথমে অনুভূতিটি মৃদু হবে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এটি এতটাই অসহনীয় হয়ে উঠবে যে বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকলে তাকে তার কাজ ছেড়ে দিতে হবে।

খাবারের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বজায় থাকবে। কিন্তু যৌন আকাঙ্ক্ষা একেবারেই আলাদা। মানসিক বা শারীরিক কোনও উদ্দীপনা না পেলে এটি কখনই নিজে থেকে একটি বাধ্যতামূলক প্রেরণা হয়ে ওঠে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উত্তেজনাপূর্ণ বিষয় হল যৌনতার চিন্তা যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

এই কারণেই পবিত্রতা কোনও শারীরবৃত্তীয় বা মানসিকভাবে অসম্ভব নয়। কুরআন পবিত্রতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে জনসংখ্যার সমস্যা সমাধানেও সহায়তা করে। পবিত্রতা কেবল বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নয়, এমনকি বিবাহিত দম্পতিদেরও কেবল তখনই যৌন আকাঙ্ক্ষার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত যখন তারা পরিবারে কোনও সংযোজনকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত থাকে। এই আদর্শ শরীর এবং মানব সত্তা উভয়েরই উপকার করবে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর একটি যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণও তৈরি করবে। আজ, নৈতিকতার বর্তমান অবস্থার সাথে, এটি পরিপূর্ণতার পরামর্শ বলে মনে হতে পারে। এটি কেবল কারণ আনন্দের সাধনাই প্রধান লক্ষ্য। আত্মতৃপ্তি জীবনের উদ্দেশ্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে ম্লান করে দিয়েছে, যা নিজেকে অস্তিত্বের উচ্চতর স্তরের জন্য উপযুক্ত করে তোলা। কুরআনের উপদেশ তাদের জন্য যারা এই উদ্দেশ্যের দাবি পূরণে বেঁচে আছেন। এটি কেবল একটি ধার্মিক উপদেশ নয়। কুরআন এটিকে একটি ব্যবহারিক রূপ দেয়। প্রথমত, যৌনতার প্রতি সঠিক মনোভাব গড়ে তোলা। এটি করার

উপায় হল মনে রাখা যে যৌন কার্যকলাপের উদ্দেশ্য কেবল আনন্দ নয়, সন্তান জন্মদান। এটি আবেগের উপর একটি সংযত প্রভাব ফেলবে এবং আমাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ তৈরি করবে। আমাদের উদ্দেশ্যমূলক কর্মের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান আমাদেরকে চিন্তাহীনভাবে কাজ করা এবং সেই কর্তব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখবে যা আমরা সঠিকভাবে পালন করতে পারি না। প্রাণীদের মধ্যে, যৌন আবেগ প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যৌন ইচ্ছা তখনই দেখা দেয় যখন প্রকৃতি গর্ভধারণ করতে চায়। অতএব, প্রাণীরা একটি "পরিকল্পিত পরিবার" গড়ে তুলতে পারে না। অন্যদিকে, মানুষের পছন্দের স্বাধীনতা রয়েছে, যার মধ্যে যৌন বিষয়ও রয়েছে, যাতে সে তার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে সন্তানদের পৃথিবীতে আনতে পারে। তবে, সে তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করতে পারে এবং আনন্দের জন্য যৌনতায় লিপ্ত হতে পারে, যার ফলে ব্যক্তি এবং সমাজের জন্য সমস্ত ভুল-সমন্বয় ঘটে এবং দুর্ঘটনাজনিত এবং অবাঞ্ছিত জন্ম হয়।

মানুষকে এই ধরনের ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে এবং পরিবর্তে সুস্থ ফলাফল আনতে, কুরআন আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করতে বলে। যদি আত্মনিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করা হয়, তাহলে যৌন আবেগকে সুস্থ পথে পরিচালিত করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য যে এটি ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজের জন্যও উপকারী প্রমাণিত হবে। এটি মানুষের নৈতিক তন্তুকে শক্তিশালী করবে এবং একই সাথে অতিরিক্ত জনসংখ্যার বিপদ এড়াবে।

সংক্ষেপে, কুরআন নিম্নলিখিত উপায়ে মানুষের যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়:
১. এটি মানুষকে জীবনের উদ্দেশ্যের উপর স্থিরভাবে দৃষ্টি রাখতে বলে। এটি তাকে আশ্বস্ত করে যে সে পরম মূল্যবোধ অনুসরণ করে এই উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে।

২. এটি নারীকে আশ্বস্ত করে যে সে পুরুষের যৌন তৃপ্তির হাতিয়ার নয়; সেও একজন স্বাধীন, স্বাধীন এবং যুক্তিবাদী সত্তা। "সে নিজের জন্যই এক লক্ষ্য।" তার জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজেকে পুরুষদের জন্য প্রলোভনের উৎস হিসেবে তৈরি করা নয় বরং অর্থপূর্ণ অংশীদারিত্ব প্রদান করা।

৩. কুরআন অশ্লীলতা, অশ্লীলতা, পর্নোগ্রাফি এবং যৌন আবেগকে উত্তেজিত করে এবং চিন্তা করে এমন সকল বিষয়ের নিন্দা করে: বলুন, আমার রব অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করেন, যা প্রকাশ্য এবং যা অন্তরঙ্গ (৭: ৩৩)।

৪. এটি সতীত্বের মূল্য নিশ্চিত করে এবং পুরুষ ও নারী উভয়কে সমানভাবে পবিত্র ও পবিত্র জীবনযাপন করার নির্দেশ দেয়। এটি পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই মানব ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য সতীত্বকে অপরিহার্য বলে মনে করে।

৫. এটি মানুষকে তার সন্তানদের প্রতি তার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাকে তার সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালন করতে, তাদের শিক্ষিত করতে, তাদের মনে মানবিক জীবনযাত্রার স্তর (পশু স্তরের বিপরীতে) এবং স্থায়ী মূল্যবোধ স্থাপন করতে এবং তাদের ন্যায্য মর্যাদা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কিছু আধুনিক লেখক, আদিম এবং সভ্য পুরুষদের যৌনজীবনের উপর বিস্তৃত অধ্যয়নের পর, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে মানবতার অগ্রগতির জন্য সতীত্ব অপরিহার্য। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জে.ডি. আনউইন, প্রায় আশিটি আদিম উপজাতি এবং ষোলটি সভ্য জাতির যৌনজীবন অধ্যয়ন করেছেন। তিনি তার "সেক্স অ্যান্ড কালচার" বইতে তার মতামত তুলে ধরেছেন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল যে যেকোনো মানব সমাজের সাংস্কৃতিক আচরণ নির্ভর করে, প্রথমত, মানব জীবের সহজাত প্রকৃতির উপর, এবং দ্বিতীয়ত, যৌন নিয়ন্ত্রণের ফলে সমাজ যে শক্তির অবস্থার দিকে এগিয়ে গেছে তার উপর।১

আদিম মানুষের উপর তার গবেষণা থেকে তিনি যে সিদ্ধান্তগুলি তুলে ধরেন তা নিম্নরূপ:
১. সেই গোষ্ঠীটি সংস্কৃতির সর্বনিম্ন স্তরে ছিল যেখানে বিবাহ ছাড়া যৌনমিলনের অনুমতি ছিল;
২. যে উপজাতিতে বিবাহ ছাড়া যৌন সম্পর্কের উপর কিছু বিধিনিষেধ ছিল তারা মধ্যম স্তরে ছিল; এবং
৩. সর্বোচ্চ স্তরে ছিল সেই উপজাতিরা যারা বিবাহপূর্ব সতীত্বের উপর জোর দিয়েছিল। ২ তার তদন্তের ফলাফল সংক্ষেপে তিনি বলেন: আমি তাই দাবি করছি যে যৌন সুযোগের সীমাবদ্ধতাকে সাংস্কৃতিক অগ্রগতির কারণ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। ৩

আবারও: কোনও সমাজ সামাজিক শক্তি প্রদর্শন করতে পারে না যদি না একটি নতুন প্রজন্ম এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থার উত্তরাধিকারী হয় যার অধীনে যৌন সুযোগ সর্বনিম্ন পর্যায়ে হ্রাস করা হয়। যদি এই ধরনের ব্যবস্থা সংরক্ষণ করা হয়, তাহলে একটি সমৃদ্ধ এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্য তৈরি হবে, যা মানব এনট্রপি দ্বারা পরিমার্জিত হবে। ৪

আনউইনের উপসংহারমূলক মন্তব্যগুলি সাবধানতার সাথে বিবেচনার দাবি রাখে: যদি একটি শক্তিশালী সমাজ দীর্ঘ সময়ের জন্য, এমনকি চিরকালের জন্যও তার উৎপাদনশীল শক্তি প্রদর্শন করতে চায়, তাহলে আমার মনে হয়, প্রথমে লিঙ্গগুলিকে সম্পূর্ণ আইনি সমতার স্তরে স্থাপন করে এবং তারপরে তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনকে এমনভাবে পরিবর্তন করে নিজেকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে যাতে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে। ৫

কুরআন নারীদের স্বাধীন দায়িত্বশীল নাগরিকের মর্যাদা প্রদান করে, লিঙ্গকে সম্পূর্ণ আইনি সমতার স্তরে স্থাপন করে এবং যৌন সুযোগকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে এনে, কেবল এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছে যা মানব গবেষণা থেকে সমর্থন পায়।

### *তথ্যসূত্র*

১. জে.ডি. আনউইন, লিঙ্গ ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ১৪।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০০-৩২৫।

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩১৭।

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৪।

৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩২।

# উপসংহার

আমাদের গবেষণাপত্রটি শেষ করার আগে, আমরা আশা করি, ধর্ম, এর উৎস, এর বিভিন্ন দিক এবং মানবজাতি, ব্যক্তি এবং বৃহত্তর মানব সমাজের সাথে এর প্রভাব সম্পর্কে আমরা যা আলোচনা করছি তা সংক্ষেপে সংক্ষেপে আলোচনা করলে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, আশা করি ইসলামকে একটি ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করার বিপরীতে।

## ১. ধর্ম এবং দ্বীন

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি পর্যালোচনা করলে অবশ্যই পৃথিবীতে সময়ে সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ইসলামকে একটি হিসেবে গ্রহণের মৌলিক ভ্রান্ত ধারণা এবং মৌলিক ভুল ধারণাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে; এবং সেই ভিত্তিতে দ্বীনের মূল্যায়ন করার অন্যায্যতাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তদুপরি, আমরা যদি সাধারণভাবে বোঝা যায় এমন ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ এবং মানব সমাজের উপর এর প্রভাব বোঝার এবং উপলব্ধি করার চেষ্টা করি তবে এটিও সমানভাবে ভ্রান্ত।

ধর্ম, মানুষ এবং তার স্রষ্টার মধ্যে এক ধরণের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা এই মুহূর্তে এই সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়ে উদ্বিগ্ন নই যা উইলিয়াম জেমসের 'দ্য ভ্যারাইটিজ অফ রিলিজিয়াস এক্সপেরিয়েন্স'-এর মতো বইগুলিতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। যাই হোক, এই ধরনের অভিজ্ঞতার প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন, এটি স্বীকার করা যায় যে এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত চরিত্রের একজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা যার পার্থিব বিষয়গুলির সাথে কোনও সম্পর্ক নেই, এবং একে অপরের সাথে এটি যোগাযোগ করাও সম্ভব নয়। মানুষ এবং তার স্রষ্টার মধ্যে এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক মূলত মুক্তির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

মুক্তি সকল ধর্মের জন্য সাধারণ, এমনকি বৌদ্ধ ধর্মের জন্যও যা স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। মুক্তির ধারণাটি এই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যে পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান ছিল বন্ধনের একটি অংশ। এই বন্ধন থেকে নিজেকে কীভাবে মুক্ত করা যায় তা তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। যৌন সুযোগকে কমপক্ষে দীর্ঘ সময়ের জন্য, এমনকি চিরকালের জন্যও টিকে থাকা সম্ভব এবং সহনীয় করে তোলা। এই ক্ষেত্রে সমাজের মুখ সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার দিকে পরিচালিত হবে; এর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্য ক্রমাগত সমৃদ্ধ হবে, এটি এখনও অর্জিত হয়নি তার চেয়ে উচ্চতর সংস্কৃতি অর্জন করবে; মানুষের এনট্রপির ক্রিয়া দ্বারা এর ঐতিহ্য এমনভাবে বর্ধিত এবং পরিমার্জিত হবে যা আমাদের বর্তমান ইসলামকে ছাড়িয়ে যাবে, অন্যদিকে, এটি মানুষ এবং স্রষ্টার মধ্যে এমন কোনও সম্পর্ক নয়, বা এটি কোনও ব্যক্তিগত প্রকৃতির ব্যক্তির অভিজ্ঞতা দ্বারা চিহ্নিত নয়, বরং মূলত একটি "জীবনবিধি", যা ব্যক্তি এবং মানুষের সামগ্রিক জীবন সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করে। দ্বিতীয়ত, এটি পৃথিবীতে মানুষের জীবনকে বন্ধনের সময়কাল হিসাবে বিবেচনা করে না। যে ক্ষেত্রে t

পরিত্রাণের ধারণা উত্থাপিত হয় না। বিপরীতে, মানুষকে মহাবিশ্বে অত্যন্ত উচ্চ স্থান প্রদান করার পর, ইসলাম আশা করে যে সে জীবনের চ্যালেঞ্জ সাহসের সাথে গ্রহণ করবে যাতে সে তার নিজের এবং মানবজাতির বৃহত্তর সম্প্রদায়ের বিকাশের জন্য প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে। ইসলামকে একটি ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করার ভুল ধারণাটি এই সত্য থেকে উদ্ভূত হয় যে স্রষ্টার প্রতি পরম "বিশ্বাস" এর জন্য মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে, যেমনটি অতীত এবং বর্তমান সকল ধর্মেই কমবেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়, তবে কেবল স্রষ্টার প্রতি "বিশ্বাস"ই নয় যা একটি বা অন্য ধর্মের সঠিক মূল্যায়নে পৌঁছানোর মানদণ্ড হিসাবে কাজ করবে। আমাদের যে আসল প্রশ্নটি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত তা হল, স্রষ্টার ধারণাটি কী যা সাধারণ কারণ বলে মনে করা হয়?

**২. স্রষ্টার ধারণা**

ইসলাম তার পক্ষ থেকে স্রষ্টার ধারণাটি উপস্থাপন করেছে যা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম দ্বারা প্রবর্তিত ধারণার সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্রষ্টো ঈমানের পাশাপাশি, ইসলামী ধারণার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল এই বিশ্বাস যে স্রষ্টা কেবল মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেননি, বরং এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বস্তুর পরিধি এবং কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট আইনও নির্ধারণ করেছেন। "কারণ ও প্রভাবের আইন" এবং "প্রকৃতিতে অভিন্নতার আইন", অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে; এবং এগুলি মহাবিশ্বের বাহ্যিক প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত। এছাড়াও, তিনি মানব জীবন এবং এর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণকারী নির্দিষ্ট আইন নির্ধারণ করেছেন।

বাহ্যিক মহাবিশ্ব সম্পর্কিত ঐশ্বরিক আইনের জ্ঞান প্রকৃতির নিবিড় পর্যবেক্ষণ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আবিষ্কার থেকে উদ্ভূত হয়, তবে মানব জীবন এবং এর আচরণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইনের ক্ষেত্রে তা নয়, যা কেবল রাসূলদের কাছে ওহীর মাধ্যমে এবং স্রষ্টার বার্তাবাহক হিসাবে তাদের দ্বারা মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এখানেই ইসলাম একটি দ্বীন হিসেবে জীবনের বস্তুগত ধারণা থেকেও নিজেকে আলাদা করে যা ওহীর মাধ্যমে ঐশ্বরিক নির্দেশনার কোনও ধারণা রাখে না।

ইসলাম দাবি করে যে এই ধরনের ঐশ্বরিক আইন সময়ে সময়ে বিশ্বের সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর রাসূল, রাসূলগণ, ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের লোকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। একজন রাসূলের মৃত্যুর পর যা ঘটেছিল তা হল, তাঁর অনুসারীরা, বিশেষ করে তাদের স্বার্থান্বেষী নেতারা, তাদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচিত বিষয়গুলিকে কেটে, মুছে ফেলে এবং বিকৃত করে আইনের সাথে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, যার ফলে বিশ্বের ধর্মগুলির মধ্যে কেউই ঐশী ওহীর মূল পাঠ দুর্নীতির কলঙ্কমুক্ত করতে পারেনি। কিন্তু এই ঐশী আইনগুলি তাদের মূল আকারে, শব্দ এবং অক্ষর উভয়ই, সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান এবং সতর্কতার সাথে কোরআনে সংরক্ষিত রয়েছে যা স্রষ্টার

প্রকাশিত গ্রন্থগুলির সিরিজের শেষ এবং শেষ, যেমনটি শেষ রাসূলের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আইনগুলি তাদের মূল আকার এবং নির্মল মহিমা বজায় রাখে, ততক্ষণ এগুলিকে দ্বীন বলা হয়, কিন্তু যখন এগুলিকে বিকৃত করা হয়, তখন এগুলি উচ্চ স্তম্ভ থেকে পড়ে যায় এবং ধর্ম হিসাবে পরিচিত হয়; এবং সেই কারণেই বিশ্বের সমস্ত ধর্মের মধ্যে কেবল ইসলামকেই দ্বীন বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে, অন্য কোন ধর্ম এমন দাবি করে না, এমনকি যদি এমন দাবিও করে যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলের দ্বারা প্রদত্ত একটি প্রত্যাদেশিত গ্রন্থ রয়েছে, এমনকি অক্ষরে অক্ষরে। অন্যদিকে, ইসলাম এমন একটি দাবি করে যা এমনকি অমুসলিম ঐতিহাসিকদের নিরপেক্ষ সাক্ষ্য দ্বারাও যাচাই করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত।

অতএব, ইসলাম হল এমন একটি আইনের কোড যা স্রষ্টা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির নির্দেশনার জন্য অবতীর্ণ করেছেন এবং যা সম্পূর্ণরূপে স্রষ্টার কিতাবে সংরক্ষিত আছে, যা কোরআন নামে পরিচিত; এবং এগুলি আমরা যাকে স্থায়ী মূল্যবোধ বলতে পারি তা গঠন করে। অধিকন্তু, ইসলাম দৃঢ়ভাবে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে এই দাবিটি তুলে ধরে যে, যদি জীবন স্থায়ী মূল্যবোধের সাথে সম্পূর্ণরূপে এবং সম্পূর্ণরূপে অধীনস্থভাবে পরিচালিত হয়, তাহলে বর্তমান সময়ের সমগ্র বিশ্ব যে সমস্ত কষ্ট এবং ঝামেলার মধ্যে পড়ে, তা থেকে মুক্তি পাবে, বিস্ময়কর এবং বিস্ময়কর বস্তুগত এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সত্ত্বেও, মানবতাকে নরকীয় জীবনে নিন্দা করে। এই স্থায়ী মূল্যবোধ অনুসারে জীবন ব্যবস্থাকে কোরআনের সামাজিক ব্যবস্থা, অথবা অন্য কথায়, ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়। তবে এটি স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন যে তথাকথিত মুসলমানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি জীবন ব্যবস্থা অবশ্যই ইসলামী রাষ্ট্র হবে না, কারণ ইসলামী রাষ্ট্র কেবল সেই রাষ্ট্রকে বোঝায় যা ... এর উপর ভিত্তি করে এবং স্থায়ী মূল্যবোধের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ; এবং এই ভিত্তির অভাব থাকলে অন্য যে কোনও রাষ্ট্র কেবল অনৈসলামিক হবে, যদিও তা মুসলমানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সুতরাং একটি ইসলামী রাষ্ট্র হল কোরআনের আদেশ-নিষেধ এবং এতে বর্ণিত নীতির আলোকে প্রণীত আইন প্রয়োগের জন্য একটি সংস্থা।

### ৩. স্থায়ীত্ব এবং পরিবর্তন

তবে, এটা ভুল বোঝা উচিত নয় যে, এভাবে প্রণীত আইনগুলি কঠোর এবং গোপন, যার অগ্রগতির কোনও সুযোগ নেই বা প্রগতিশীল বিশ্বের জীবনের পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রয়োজনীয়তা পূরণে কোনও অনীহা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামী রাষ্ট্র পারস্পরিক পরামর্শের পরে, স্থায়ী মূল্যবোধের কাঠামোর মধ্যে আইন প্রণয়নের জন্য সম্পূর্ণরূপে অনুমোদিত, সময়ের চাহিদা পূরণের জন্য, এবং এইভাবে প্রণীত আইনগুলির মূল অংশটি নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যমান পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনে পরিবর্তন এবং সংশোধন করা যেতে পারে, এই অপরিহার্য শর্ত সহ যে কোনও পরিস্থিতিতে স্থায়ী মূল্যবোধের কাঠামোকে বিঘ্নিত বা হস্তক্ষেপ করা হবে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, ইসলামী রাষ্ট্রকে একটি "নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র" হিসাবে

বিবেচনা করা যেতে পারে, যা পশ্চিমে প্রচলিত গণতন্ত্রের ধারণা থেকে বেশ স্বতন্ত্র, কারণ, সেই ব্যবস্থায় জাতি বা তার প্রতিনিধিরা আইন প্রণয়নের সীমাহীন ক্ষমতা ভোগ করে।

**৪. মানব ব্যক্তিত্ব**

জীবনের বস্তুগত ধারণা এবং ইসলামের ধারণার মধ্যে আরেকটি মৌলিক পার্থক্য হল, যদিও প্রথমটিতে মানুষের জীবন এই পৃথিবীতে মানুষের শারীরিক অস্তিত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং কেবল সীমাবদ্ধ এবং মৃত্যুর সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যায়, দ্বিতীয়টিতে, মানবদেহ ভৌত আইনের অধীনে বিকশিত হয়, বিকাশ লাভ করে এবং অবশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে মানুষের মধ্যে তার দেহ ছাড়াও আরও কিছু আছে, অর্থাৎ তার সত্তা বা ব্যক্তিত্ব, যা তার গঠনগতভাবে ভৌত নয় এবং এটি ভৌত আইনের অধীনও নয়। এটি প্রতিটি মানব শিশুকে তার মতোই দেওয়া হয় তবে এটি কেবল একটি অবিকশিত আকারে। এটিকে পূর্ণ পরিপক্কতা পর্যন্ত বিকশিত করা এবং একটি নিখুঁত এবং সুষম আকার দেওয়া সমস্ত মানবিক প্রচেষ্টার লক্ষ্য। স্থায়ী মূল্যবোধের সাথে সম্পূর্ণ সম্মতিতে সম্পাদিত তার প্রতিটি কাজই এর বিকাশে অবদান রাখে এবং এই মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যা কিছু করা হয় তা এই প্রক্রিয়াটিকে বাধাগ্রস্ত করে এবং সত্তাকে দুর্বল করে। একটি কাজের মধ্যে, এটি লক্ষ করা উচিত, চিন্তাভাবনা এবং উদ্দেশ্যও অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে বিকশিত স্বত্বা বা ব্যক্তিত্ব সহজেই মৃত্যুর ধাক্কা সহ্য করে এবং ভৌত সত্তার বিভাজন এবং বিলীনতা থেকে বেঁচে যায় এবং আরও বিকশিত হতে থাকে, আরও বিবর্তনীয় পর্যায়ের মধ্য দিয়ে, যাকে আমরা "পরকাল" বা "মৃত্যুর পরবর্তী জীবন" বলতে পারি। মানুষের প্রকৃত কর্ম নয় বরং তার চিন্তাভাবনা এবং উদ্দেশ্যও মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে, এই ধারণাটিকে আমরা "প্রতিশোধের আইন" বলি যা প্রকৃতির নিয়মের মতোই অদম্য এবং অপরিবর্তনীয়।

পূর্বোক্ত বিষয়গুলি থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে যে ব্যক্তি স্বত্বা বা মানব ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস করে তাকে স্থায়ী মূল্যবোধের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণভাবে কাজ করতে এবং সেখান থেকে উদ্ভূত নীতি অনুসারে জীবনযাপন করতে রাজি করার জন্য পুলিশের তত্ত্বাবধান বা আদালতের নির্দেশের প্রয়োজন হয় না, কারণ, এই ব্যক্তি তার নিজের পছন্দ এবং ইচ্ছায় তাদের উপর কাজ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে যায় এমন অন্যান্য প্রবণতাগুলিকে সাবধানতার সাথে এড়িয়ে চলে। সম্পূর্ণরূপে সচেতন যে এই ধরনের আচরণ তার নিজের মঙ্গল এবং কল্যাণের জন্য সহায়ক, সে স্বেচ্ছায় এবং তীব্রভাবে এটি অনুসরণ করতে চায়। অতএব, কেবলমাত্র সেইসব ব্যক্তিরাই কোরআনের সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠা করতে পারে, যারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, এই ধরণের জীবন ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং কল্যাণ; এবং তারাই সেই ব্যবস্থা অনুসারে সমাজকে মডেল করার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে স্থায়ী মূল্যবোধের কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আমরা আরও কিছু মৌলিক এবং মৌলিক মূল্যবোধের কথা আবার উল্লেখ করছি, যাতে দেখা যায় যে কীভাবে ব্যক্তিরা এই নীতি অনুসারে তাদের জীবনযাপন করে কেবল তাদের নিজস্ব চরিত্রকেই নয় বরং অন্যদেরও অলংকৃত করে এবং সেই সমাজ কতটা সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ এবং সন্তুষ্ট যেখানে এই মূল্যবোধগুলি ধারাবাহিকভাবে এবং প্রধানত কাজ করে। সংস্পর্শে আসা অন্যান্য ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের শুভকামনার অনুভূতির সাথে একটি আস্থা তাদের মধ্যে কতটা অন্তর্নিহিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কীভাবে শান্তি ও সমৃদ্ধির একটি যুগের সূচনা হবে যখন এই মূল্যবোধগুলি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত এবং কার্যকর হবে - প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে জান্নাতের জীবন। সংক্ষেপে, এমন একটি যুগের সূচনা করাই ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

## ৫. স্থায়ী মূল্যবোধ

এবার আসুন আমরা কিছু মৌলিক স্থায়ী মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করি, যা সংক্ষেপে সংক্ষেপে বলা হয়েছে, পুনরাবৃত্তির জন্য খুব একটা অজুহাত প্রয়োজন হয় না।

**৫.১. সাধারণভাবে মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা:** জন্মের সময় প্রতিটি মানব শিশু সমানভাবে একটি স্বত্ব বা ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়, তাই প্রতিটি ব্যক্তিকে মানব সত্তা হিসেবে সমান সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী করে; এবং তাই জন্ম, পরিবার, গোত্র, জাতি বা সম্প্রদায়, জাতীয়তা, ধর্ম বা লিঙ্গের ক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য করা উচিত নয়, কারণ কোরআন বলে: আমরা সকল আদম শিশুকে (সমানভাবে) সম্মানিত করেছি (১৭:৭০)।

**৫.২. সমাজে উচ্চ মানদণ্ড:** প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য সমান, কিন্তু প্রতিটি ব্যক্তির আপেক্ষিক অবস্থান এবং মর্যাদা নির্ধারণের মানদণ্ড তার নিজস্ব ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং চরিত্রের উপর নির্ভর করে: এবং সকলের জন্য তাদের কর্ম অনুসারে পদমর্যাদা রয়েছে (৪৬:১৯), এবং মূল নীতি হল: আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন যিনি আচরণে সর্বোত্তম (৪৯:১৩)।

**৫.৩. মানবতার মধ্যে ঐক্য:** কোরআন অনুসারে, সমস্ত মানুষ একই ভ্রাতৃত্বের সদস্য এবং একই গাছের শাখা: মানবজাতি একটি সম্প্রদায় (২:২১৩)।

বর্ণগত পার্থক্য বা পৃথিবীতে রেখা টেনে মানবজাতিকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির ভাগে বিভক্ত করা মানবজাতির একক সত্তা হিসেবে ধারণার পরিপন্থী এবং প্রকৃতির উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। একটি বিভাজনের জন্য কেবল একটি মানদণ্ড আছে, অন্য কোন মানদণ্ড নেই - যারা স্থায়ী মূল্যবোধে বিশ্বাস করে তারা এক সম্প্রদায়ের সদস্য, এবং যারা তাদের যত্ন নেয় না এবং তাদের বিরুদ্ধে জীবনযাপন করে, তারা অন্য সম্প্রদায়ের অন্য বিভাগে যায়, যেমন কোরআনে বলা হয়েছে: তিনিই তোমাদের (মানুষ

হিসেবে) সৃষ্টি করেছেন কিন্তু তোমাদের মধ্যে একজন (স্থায়ী মূল্যবোধ) প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যজন বিশ্বাস করে (তাদের উপর, তাই এটিই একমাত্র সীমারেখা) (৬৪:২)।

**৫.৪. মানব ব্যক্তিত্ব বলতে দায়িত্ব বোঝায়:** এর অর্থ হল প্রতিটি মানুষ তার নিজের কর্ম, পুরস্কার এবং প্রতিশোধের জন্য দায়ী থাকবে, যা অন্য কেউ ভাগ করবে না। কোরআন বলে: যে কেউ অপরাধ করে সে তার নিজের বিরুদ্ধেই তা করে (৪:৩), এবং অন্য কেউ এর জন্য দায়ী থাকবে না: কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করে না (৫৩:৩৮)।

এটি স্পষ্ট করে যে "আদি পাপ", "মধ্যস্থতা", বা "প্রার্থনা" ধারণার ইসলামে কোন স্থান নেই। অতএব, কোরআন অনুসারে, একজন ব্যক্তিকে তার নিজের কাজের জন্য দায়ী করা একটি স্থায়ী মূল্য।

**৫.৫. স্বাধীনতা:** কোরআন অনুসারে, প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং তাই সর্বদা স্বাধীন থাকা উচিত; এবং স্বাধীনতার অর্থ হল কেউ, সে যেই হোক না কেন, অন্য কারো কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করতে পারবে না। ইসলামী সমাজে, কেবল কোরআনের আইন মেনে চলা হবে। এটি স্রষ্টার আনুগত্যের সমার্থক, কারণ কোরআন খুব স্পষ্টভাবে দাবি করে: কোন মানুষের অধিকার নেই যে স্রষ্টা তাকে কিতাব এবং কর্তৃত্ব দেবেন এবং (এমনকি) নবুওয়াত এবং সে মানুষকে বলবে "আল্লাহর পরিবর্তে আমার আনুগত্য করো" (৩: ৭৮)।

প্রকৃতপক্ষে, ইসলামী সমাজ হল কোরআনের আইন বাস্তবায়নের জন্য সংস্থা; এবং এটি মুসলিম এবং অমুসলিম ধর্মের মধ্যে পার্থক্য করার প্রধান মানদণ্ড: এবং যারা আল্লাহর অবতীর্ণ ধর্ম অনুসারে বিচার করে না, তারাই কাফের (৫: ৪৪)।

এই বিধানগুলি সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, তার অবস্থান যাই হোক না কেন। অন্যদের কথা তো দূরের কথা, এমনকি আল্লাহর রাসূলকেও ঘোষণা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল: আমি কেবল আমার প্রতি যা ওহী করা হয় তা অনুসরণ করি। প্রকৃতপক্ষে, আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই, তাহলে এক কঠিন দিনের শাস্তির ভয় করি (১০:১৫)।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে ধর্মে উপাসনা হল দ্বীনে স্রষ্টার আইন মেনে চলা।

**৫.৬. ইচ্ছার স্বাধীনতা - কোন বাধ্যবাধকতা নেই:** একজন মানুষের কাজের দায়িত্ব তার নিজস্ব ইচ্ছা এবং অভিপ্রায়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়, এতটাই যে, যদি কাউকে কিছু বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয় বা তার

ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে তাকে এই বিশ্বাস বা কাজের জন্য দায়ী করা হবে না, কারণ, ঈমান হল পূর্ণ দৃঢ়তার অপর নাম। কোরআনে বলা হয়েছে:দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই (২:২৫৬), এবং অন্যত্র বলা হয়েছে:এবং বলো: সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে, তাই যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা সে প্রত্যাখ্যান করুক (১৮:২৯)।

শারীরিক জোর জবরদস্তি এবং মানসিক জোর জবরদস্তি বাদ দিয়ে, যুক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগের পরেও ঐতিহ্যগতভাবে বা প্রচলিতভাবে সম্মত বা অনুসরণ করা যায় তাকে ঈমান বলা যাবে না। ঐতিহ্যগতভাবে কোন কিছু গ্রহণ করা, কোরআন অনুসারে, অবিশ্বাসীদের পথ:

আর যখন তাদের (অবিশ্বাসীদের) বলা হয়, "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অনুসরণ করো," তখন তারা বলে: "না, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যে পথে পেয়েছি তারই অনুসরণ করি।" কি! যদিও তাদের পূর্বপুরুষদের কোন জ্ঞান ছিল না এবং তারা সঠিক পথ অনুসরণ করেনি (২:১৭০)।

অন্যদিকে, মুমিনরা হল তারা: যাদের কাছে যখন তাদের রবের বাণী পেশ করা হয়, তখন তারা বধির ও অন্ধ হয়ে পড়ে না (২৫:৭৩)।

**৫.৭. সহনশীলতা:** ইসলাম কেবল অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সহ্য করে না বরং তাদের সকল মানবতার অধিকারও প্রদান করে এবং তাদের উপাসনালয় রক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করে। কোরআন বলে:

আর যদি আল্লাহ কিছু লোককে অন্যদের দ্বারা বিতাড়িত না করতেন, তাহলে উপাসনালয়, গির্জা, উপাসনালয় এবং মসজিদ, যেখানে আল্লাহর নাম প্রায়শই স্মরণ করা হয়, সেগুলো ভেঙে ফেলা হত; এবং অবশ্যই আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন যে তাকে সাহায্য করবে।

আর তিনি তোমাদের জন্য আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবকিছুই তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন (৪৫:১৩)।

এই কারণেই ইসলাম আমাদের কাছ থেকে দাবি করে যে আমরা প্রকৃতির শক্তিগুলিকে বশীভূত করি এবং তাদের ব্যবহার করি, একমাত্র লক্ষ্য হলো স্থায়ী মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য, ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যে নয়, কারণ এর মূলনীতি হল: পৃথিবীতে কেবল সেই জিনিসই টিকে থাকে যা সমগ্র মানবজাতির জন্য উপকারী (১৩:১৭)।

আমরা উপরে কিছু মৌলিক মূল্যবোধ বর্ণনা করেছি যা মানবিক কার্যকলাপের মৌলিক গুরুত্বকে বোঝায় যা কেবল সতর্কতার সাথে পালন করা উচিত নয় বরং ইসলামী সমাজকে তাদের লঙ্ঘন এবং লঙ্ঘন থেকে সাবধানতার সাথে রক্ষা করতে হবে।

কোরআন অবহেলা বা অবহেলা করে না, বরং এটি মানুষের শারীরিক অস্তিত্বের চাহিদা পূরণ এবং তার আরাম ও আরামের জন্য তার প্রয়োজনীয়তা পূরণের উপর জোর দেয়, অবশ্যই, স্থায়ী মূল্যবোধের নিবিড়ভাবে পালনের মাধ্যমে। যদি তার দৈহিক জীবনের চাহিদা এবং অন্যান্য চাহিদা উভয়ই স্থায়ী মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পূরণ করা হয়, তাহলে কোনও অসুবিধা বা সমস্যা দেখা দেয় না। যখন উভয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্ক বা সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকে, তখন জীবনের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই স্থায়ী মূল্যবোধের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেনে চলাকে অগ্রাধিকার দেবে, কারণ এর মধ্যেই মানব চরিত্রের উচ্চতা নিহিত। এই জীবনধারা মানুষের আত্ম বিকাশ এবং কল্যাণে ব্যাপক অবদান রাখে। অন্যদিকে, জীবনের বস্তুগত ধারণায়, সমগ্র মানব প্রচেষ্টা এবং কার্যকলাপের সর্বোপরি সবকিছু বিলাসিতা এবং প্রাচুর্যে দৈহিক চাহিদা পূরণ করা, যেখানে স্থায়ী মূল্যবোধের কোনও ভূমিকা নেই এমন ধারণাও নেই। এই মনোভাব ইসলামের কাছে ঘৃণ্য। এটি গ্রহণ করতে রাজি হওয়া তো দূরের কথা, ইসলাম কোনও অবস্থাতেই দৈহিক ধারণার সাথে আপস করবে না। অধিকন্তু, ধর্মের প্রতি পরলোকীয় দৃষ্টিভঙ্গি, পার্থিব জীবন এবং এর উপভোগের প্রতি অবজ্ঞা প্রচার করা এবং দৈহিক চাহিদা উপেক্ষা করা, তার দৃষ্টিতে সমানভাবে অগ্রহণযোগ্য এবং ঘৃণ্য।

**৬. তুলনা**

ধর্ম বা মাযহাব এবং দ্বীনের তুলনামূলক অধ্যয়ন আমাদেরকে উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করবে:

৬.১. মাযহাব কেবল এক ধরণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং এটি কেবলমাত্র স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে তথাকথিত ব্যক্তিগত সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত।

দ্বীন একটি বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা এবং সামগ্রিক জীবনের একটি ব্যবস্থা।

৬.২. মাযহাবের প্রতিটি অনুসারী সন্তুষ্ট যে তিনি সর্বশক্তিমানের সাথে একটি যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং প্রতিটি ব্যক্তির লক্ষ্য তার নিজস্ব মুক্তি।

অন্যদিকে দ্বীনের লক্ষ্য হল সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ এবং অগ্রগতি, এবং একটি সমাজের চরিত্র এবং গঠন নির্দেশ করে যে এটি ঐশ্বরিক আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা।

৬.৩. মাযহাব আমাদের এমন কোনও উদ্দেশ্যমূলক মানদণ্ড প্রদান করে না যার মাধ্যমে আমরা নির্ধারণ করতে পারি যে আমাদের কর্মগুলি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তৈরি করছে কিনা।

দ্বীন দ্বারা পরিচালিত সামাজিক ব্যবস্থায়, একটি সামগ্রিক এবং সুরেলা জীবনের বিকাশ সঠিকভাবে নির্দেশ করে যে মানুষ সঠিক পথ অনুসরণ করছে কিনা।

৬.৪. মাযহাব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রতি বিরূপ এবং যুক্তির প্রতিপক্ষ, যাতে অন্ধ বিশ্বাসের সাহায্যে এটি অবাধে বিকশিত হতে পারে।

দ্বীন মানুষের যুক্তি ও জ্ঞানের বিকাশে সহায়তা করে, যুক্তি ও যুক্তির ভিত্তিতে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় এবং স্থায়ী মূল্যবোধের আলোকে মানব জীবনের পথ এবং এর অগ্রগতি আলোকিত করার জন্য সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা অনুসন্ধান এবং আবিষ্কারকে উৎসাহিত করে।

৬.৫. মাযহাব মানুষের সংবেদনশীলতা এবং কুসংস্কার অনুসরণ করে এবং তাদের লালন-পালন করে।

দ্বীন মানুষকে জীবনের বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনের পথে পরিচালিত করতে চায়।

৬.৬. অতএব, প্রতিটি যুগে, জীবনের আসল সমস্যা থেকে মানুষের মনোযোগ দূরে রাখার জন্য মযহাব নতুন মূর্তি এবং মূর্খতা স্থাপন করে।

কিন্তু দ্বীন যুক্তিসঙ্গত এবং মৌলবাদী: এটি পুরাতন এবং নতুন সমস্ত মূর্তি ভেঙে দেয় এবং এর নীতিতে কখনও পরিবর্তনশীল হয় না।

৬.৭. মাযহাব মানুষের মনে চিরস্থায়ী ভয়ের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং তাদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে তাদের সাথে একমত হতে বাধ্য করে;

যদিও দ্বীন ভয়কে এক ধরণের শিরক হিসেবে বিবেচনা করে এবং মানুষকে সাহসী, সাহসী এবং আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে চায়।

৬.৮. মাযহাব মানুষকে ধর্মীয় ও পার্থিব সকল কর্তৃত্ব ও মর্যাদার সামনে মাথা নত করতে উৎসাহিত করে।

দ্বীন মানুষকে মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে এবং আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে উৎসাহিত করে।

৬.৯. মাযহাব মানুষকে জীবন সংগ্রাম থেকে পালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে।

কিন্তু দ্বীন তাকে জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখি হতে আহ্বান জানায়, বিপদ যাই আসুক না কেন।

৬.১০. মাযহাব বস্তুজগতকে অবজ্ঞার চোখে দেখে এবং মানুষকে তা ত্যাগ করতে আহ্বান করে। এটি কেবল পরকালেই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়, যা সঙ্গীর ত্যাগের পুরস্কার হিসেবে পাওয়া যাবে।

অন্যদিকে, দ্বীন জগতের উপর বিজয়ের নির্দেশ দেয় এবং মানুষকে অর্জনের অপরিমেয় উচ্চতায় নিয়ে যায়। এটি তাকে এই পৃথিবীতে কল্যাণ ও সুখের পাশাপাশি পরকালের জীবনে সুখ অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করে।

৬.১১. মাযহাব নিয়তিবাদে বিশ্বাসকে উৎসাহিত করে এবং এটি মানুষকে সক্রিয় জীবন এবং আত্ম-বিকাশ থেকে বিরত রাখে।

দ্বীন মানুষকে ভাগ্যকে চ্যালেঞ্জ করার শক্তি দেয় এবং কর্মক্ষমতা ও আত্ম-বিকাশের জন্য শক্তি প্রদান করে।

৬.১২. মাযহাব দুর্বল, অসহায় এবং নিপীড়িতদের এই বিশ্বাসের মাধ্যমে সান্ত্বনা দিতে চায় যে এই পৃথিবীর বিষয়গুলি স্রষ্টার ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এর গ্রহণযোগ্যতা এবং আত্মসমর্পণ তাদেরকে স্রষ্টার প্রতি আকৃষ্ট করতে সাহায্য করে। এই ধরণের শিক্ষা স্বাভাবিকভাবেই অসুস্থতার দিকে ঝুঁকে পড়ে, এবং তাদের ধর্মীয় নেতাদের উৎসাহিত করে যারা স্রষ্টার ইচ্ছা ব্যাখ্যা করার দাবি করে, যাতে তারা নিখুঁতভাবে তাদের অপকর্মে লিপ্ত হয় এবং অনুসারীদের সম্পূর্ণ এবং শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করতে প্ররোচিত করে।

অন্যদিকে, দীন সকল প্রকার অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। এটি দুর্বল ও নিপীড়িতদের ঐশ্বরিক আইন অনুসরণ করার আহ্বান জানায় এবং এর মাধ্যমে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যেখানে সমস্ত অত্যাচারী ও নিপীড়কদের ন্যায়বিচার ও ন্যায়বিচারের নির্দেশ

মেনে নিতে বাধ্য করা হবে। এই সামাজিক ব্যবস্থায়, কোন স্থান নেই  স্বৈরশাসক, পুঁজিপতি বা পুরোহিতদের। তারা সকলেই দীন-এর শত্রু।

৬.১৩. মাযহাব উপাসনার নামে ধর্মীয় ধ্যানের নির্দেশ দেয় এবং এইভাবে আত্ম-প্রতারণার জন্ম দেয়।

দীন মানুষকে নিজেদেরকে জাহির করতে এবং ঐশ্বরিক সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং অর্জনের পরে এর উন্নতির জন্য ক্রমাগত সংগ্রাম করতে উৎসাহিত করে। দীন-এ উপাসনার অর্থ আসলে স্রষ্টার আইনের প্রতি আনুগত্য।

৬.১৪. শিল্প ও সৌন্দর্যের সমস্ত জিনিসের প্রতি মাযহাব ভ্রুকুটি করে এবং উপহাস করে। দীন তাদের প্রতি অস্বীকৃতি জানায় যারা মানুষের উপভোগের জন্য স্রষ্টার সৃষ্টি করা জীবনের ভালো ও সুন্দর জিনিস উপভোগ করতে নিষেধ করে।

৬.১৫. মাযহাব নতুন সবকিছুর নিন্দা করে এবং সকল বিদআতকে পাপ হিসেবে ঘোষণা করে।

দীন বিশ্বাস করেন যে জীবনের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে মানব জীবনের প্রত্যাশা এবং চাহিদাও পরিবর্তিত হতে থাকে; তাই জীবন নিজেই পরিবর্তন এবং বিদআত দাবি করে। কেবল ঐশী আইন অপরিবর্তনীয়।

এখন আমাদের পক্ষে দ্বীন এবং মাযহাবের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বোঝা সহজ হওয়া উচিত। ইসলামের অর্থ জীবনের প্রতি "হ্যাঁ" বলা; অন্যদিকে ধর্মের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে "না"!

সুতরাং ইসলাম সকল ধর্মের প্রতি একটি উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ।